ঢোঁড়াই চরিত মানস

(প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ একত্রে)

সতীনাথ ভাদুড়ী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফাল্গুন, ১৩৭০
প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবনসরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

আদিকাণ্ড

জিরানিয়ার বিবরণ

অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে[১] এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ি ইস্টিশানে পৌছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন-তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয়—'ভারী সাহার',[২] পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়। পীরগঞ্জে কলস্টর (কালেক্টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাদ্রী সাহেবের গীর্জা আছে? ভা-আ-রী সাহার জিরানিয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে, পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।

শহরের 'বাবুভাইয়ারা' সব ছিলেন 'বাং-গালী'; 'ওকিল, মুখ্‌তার, ডক্‌টর, আমলা' সব। তাঁদের ছেলেপিলেদেরও এ শহরের গর্ব ছিল তাৎমাদেরই মতো। না হলে সেকালের যুগে কালীবাড়ি কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় বিরাটবপু রায়সাহেব জিরানিয়াকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'এটা একটা সামান্য পণ্ডগ্রাম'। ছেলের দল চিৎকার করে তাঁকে আর 'গণ্ডগ্রম' না করে বসে পড়তে বলে। তাদের নাগরিক গর্বে আঘাত লেগেছিল।

তাৎমাটুলির কাহিনী

এ হেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলির মধ্যে আর কোনো গাঁ নেই। সেই

১ তুলসীদাসজীর লেখা রামায়ণের নাম 'রামচরিতমানস'। ভারতবর্ষের মধ্যে রামচরিতমানসই সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানসসরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়।

২ প্রকাণ্ড শহর।

জন্যই তাৎমাটুলিকে বলছি শহরতলি। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর'[১]। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমুলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী 'কারীকোশী'—লোকে বলে 'মরণাধার'। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই রাস্তাকে বলে 'পাক্কী'[২]।

বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে—পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনোদিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করত যে, এরা তাঁতি। এরা চাষবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধ হয় জুটছিল না দ্বারভাঙ্গা জেলায়। তাই এসে তারা 'ধন্না' দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে। তিনি তখনকার একজন বড় 'কিসান'[৩] (জোতদার)। তাঁর আবার জমিদার হওয়ার ভারি শখ। নামমাত্র খাজনায় একরকম জোর করে তিনি এদের এই জমিতে রেখেছিলেন। নিজেই এদের বাড়ি করবার জন্য বাঁশ খড় দিয়েছিলেন। চিঠির কাগজে মনোগ্রাম ছাপিয়েছিলেন—বকরহাট্টা এস্টেট, দেউড়ি ফুকননগর। তাঁর দেওয়া ফুকননগর নাম ধোপে টেঁকেনি। নাম হয়ে গেল তাৎমাটুলি। যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনি রোজ এখানে আসতেন। তাঁর পাড়ার বখা ছেলেরা তাঁর আসার পথ ছেড়ে দিত—'সরে যা, সরে যা—জমিদার সাহেব ক্যাম্প ট্যাটমাঠোলিতে যাচ্ছেন, নিমান্তিনের পকেটে এস্টেটের কাছারি নিয়ে।' মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে তিনি রোজ ধাঙড়টোলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।—সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকানো ধাঙড়দের খড়ের ঘরগুলো, এখান থেকেই যেন দেখতে পেতেন। অঙ্গনে, মেঠোপথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি পর্যন্ত নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। লোকেরা চকচকে কালো; সুন্দর স্বাস্থ্য। সেখানকার ছাগল, কুকুর, গাছ, ল্যাংটো শিশু, সবই যেন তাজা নধর। এতদূর

১ মাত্র এক ক্রোশ।

২ পাকা রাস্তা।

৩ জিরানিয়া জেলায় 'কিসান' বলতে ঠিক যারা নিজের জমি চাষ করে তাদের বোঝায় না। দশ পনের হাজার বিঘা জমি যার সেও কিসান। কেবল গভর্ণমেণ্ট রেভেনিউ দিলেই তবে তাকে বলে জমিদার।

থেকেও যেন দেখা যায়, তাদের কাপড় চোপড়, বাঁদরার[১] ছাইয়ের ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে কাচা। মাদলের শব্দ যেন কানে আসছে পিড়িং পিড়িং।...

বকরহাট্টা এস্টেটের জমিদারবাবু ভাবেন কেন তাঁর প্রজা তাৎমারা এরকম হল না, কেন তারা ধাঙড়দের মতো ঠিক সময়ে খাজনা দিয়ে দেয় না। জমিদারি থেকে রোজগার না হয় নাই হল, কিন্তু প্রজারা একটু পরিষ্কার-টরিষ্কার থাকলে, একটু পাড়াটা দেখতে ভাল হলে, জমিদারের ইজ্জৎ বাড়ে। বাংগালী উকিল হরগোপালবাবু কতদিনই বা জিরানিয়ায় এসেছেন। এখনও ত্রিশ বছর হয়নি। যেবার রেললাইন হল বাংগালী বাবুভাইরা পিঁপড়ের মতো দলে দলে এসে শহরের এদিকে বাড়ি করলেন। ওদিকে সাহেবদের মহল্লা, সাহেবরাই রেললাইন আনিয়েছে নিজেদের পাড়ার কাছ দিয়ে। ওদিকে তো বাংগালী বাবুদের 'দাল গলল না'।[২] ওঁরা এলেন এদিকে। তখন ধাঙড়রা থাকত ঐখানেই। লোক দেখলেই তারা পালায় দূরে। তাই তারা এসে বাসা বাঁধল আজকালকার ধাঙড়টোলায়। ভারি বুদ্ধিমান লোক হরগোপাল-বাবু; পয়সা কামাতে জানেন। কাছারির নিলামে কেনা 'পড়তী' জমি, গরুচরার জন্য লোকে নিত কিনা সন্দেহ, তাই দিলেন ধাঙড়দের মধ্যে বিলি করে। সেই জিনিসই এখন দেখ কেমন কেঁপে ফুলে উঠেছে। ঐ কিরিস্তান বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। যাকগে মরুকগে! রামচন্দ্রজী! 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা'।[৩]

এ অনেক দিনের কথা হল।

এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে 'মরণাধারে' জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমুল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, লু বাতাসে শিমুল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় 'পাক্কীর' ধারের নেড়া অশথ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে। তাৎমাদের মধ্যে কেউ হিসাব জানলে বলত—এ 'ঢের সালের'[৪] কথা—দশ সাল, বিশ সাল, এককুড়ি, দোকুড়ি, তিনকুড়ি সালের কথা। মনে মনে গুনবার মিছা চেষ্টা করত—এর মধ্যে 'ঝোটাহারা'[৫] ক'বার 'স্নান করেছে'[৬]।

১ একরকম পবগাছা।
২ ·রদে কুলোল না; টুঁ ফাঁ। চলবে না ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।
৩ সবই তোমার কৃপা—তুলসী .াস থেকে।
৪ অনেক বছব।
৫ ঝুঁটিওযালী; তাৎমারা মেয়েদের এই নামেই ডাকে।
৬ তাৎমা মেয়েরা সাধারণত বছরে একবার 'ছট' পরবের সময় স্নান করত। যে মেয়েরা একটু বেশি ছিম্‌ছাম, তারা স্নান করে মাসে একবার।

তাৎমাটুলির মাহাত্ম্য বর্ণন

তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে—দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্য রকম। এর বাড়ির উঠোনে আর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে তো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলেভরা একচালাটার নিচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়খানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইঁদারাতলার ঝগড়া সেইরকমই চলতে থাকে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়িটা ফিক্ করে হেসে হয়তো জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোনদিকে যাবেন।

এই হল বাইরের রূপ; কিন্তু বাইরের রূপটাই সব নয়,—

তাৎমাটোলার লোকেরা বলে—রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোন রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজির এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।

মেয়েদের না জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলে—গাঁয়ে আছে কেবল 'পঞ্চায়তি', আর 'পঞ্চায়তি' আর 'পঞ্চায়তি'[১]।

ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত

ধাঙড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের

১ পঞ্চায়তদের মোড়লকে বলে 'মহতো'। চারজন মাতব্বরকে এরা বলে 'নায়েব'। আর যে 'লুটিস্' তামিল করে, আর লোকজনকে ডেকেডুকে নিয়ে আসে তার নাম 'ছড়িদার'। মহতো আর চারজন নায়েব পঞ্চায়েতে থাকে পাঁচজন, 'পঞ্চ'।

ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দীতে কথা বলে।

ধাঙড়দের মধ্যে কয়েক ঘর খৃষ্টান। অধিকাংশ ধাঙড়ই সাহেবদের বাড়ি মালীর কাজ করে, যারা মালীর কাজ না পায় বা পছন্দ না করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোনো কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়।

ধাঙডরা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙড়দের বলে 'বুড়বক কিরিস্তান' (বোকা খৃষ্টান)।

ধাঙড়টুলি পরগণা ধরমপুরে, আর তাৎমাটুলি হাভেলী[১] পরগণাতে। রাজা তোডরমল্লের যুগে যখন এই দুই পরগণার সৃষ্টি হয়, তখনও পরগণা দুইটির মধ্যের সীমারেখা ছিল একটি উঁচু রাস্তা। সেইটাকেই এযুগে পাকা করে নাম হয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। কিন্তু এখন ঐ রাস্তা কেবল ধরমপুর আর হাভেলী পরগণার সীমারেখা মাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙড় এই দুটি হৃদয়েরও বিচ্ছেদরেখা।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাৎমা আর ধাঙড়দের মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই আছে। গায়ে পড়ে ঝগডা আরম্ভ করে তাৎমারাই। ঝগড়াটা বেশ বেধে যাওয়ার পর পালানোর পথ পায় না। তবু অভ্যাস যাবে কোথায়।

বৌকা বাওয়ার আদিকথা

তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। তার নিচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনি হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই'[২]। এই গোঁসাইয়ের সম্মুখে পোঁতা আছে একটা প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাইথান; লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাইদ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল-সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয়, আর চাঁদা করে কেনা একটা ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

এই 'থানে'ই 'বৌকা বাওয়ার'[৩] আস্তানা। বৌকা বাওয়ার আগে কিংবা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু সন্ন্যাসী হয়নি।

১ অন্দরমহল।

২ তাৎমারা সূর্যদেবকেও 'গোঁসাই' বলে; আবার ঐ অশথতলার সিঁদুর মাখানো যিনি আছেন তাঁকেও গোঁসাই বলে।

৩ বোবা সন্ন্যাসী।

ছোটবেলায় বৌকা তার মার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুত। শহরের গেরস্তদের দোরগোড়ায় 'খোখা-আ মুন্নু-উ-উউ'[1] এই ডাক শুনলেই বাড়ির লোকে বলত, 'এইরে বৌকামাই[2] এসেছে, এখন দুটি ঘণ্টা চলবে একটানা চিৎকার। দিদিরা ছোট ভাইকে ভয় দেখাত—কাঁদলেই দেব বৌকামাইয়ের কাছে ধরিয়ে।

সেই বৌকা বড় হয়ে তার দাড়ি-গোঁফ গজালে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, একটা চিমটে আর একটা ছোট ত্রিশূল নিয়ে সেই গোঁসাইথানে বসে আছে। পাড়ার লোকে দেখতে এলে, বৌকা ত্রিশূলটা ইট দিয়ে ঠুকে মাটিতে গেঁথে দিল। সেই দিন থেকে ঐ 'থানে'ই তার আস্তানা। এতদিনকার বৌকা ঐদিন থেকেই বৌকা বাওয়া হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরের কথা। গোঁসাইথানের পাশেই পথের ধারে একটা ঝড়ে-পড়া পাকুড়গাছ বহুদিন থেকে পড়ে ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের জিনিস; কিন্তু তাৎমারা নিয়মিত শুকনো গাছটার থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে নিচ্ছিল। শিকড়ের মোটা কাঠগুলিকে পর্যন্ত তারা গর্ত করে বের করে নিতে ছাড়েনি। পড়ে ছিল কেবল মোটা গুঁড়িটা। এই কাত হয়ে পড়া গুঁড়িটা একদিন সকালে খাড়া দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা যায়। আরও দেখা যায় যে, বৌকা বাওয়া হাত জোড় করে গাছের চারিদিকে ঘুরছে আর প্রত্যেক পরিক্রমার পর একবার করে সূর্যদেবকে প্রণাম করছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। রেবণ গুণী বলে, জিনের কাণ্ড। চশমা-পরা সর্বজ্ঞ পেশকার সাহেব রায় দিলেন—'ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পথের ধারে ডাল পুঁতে গাছ লাগায়। সেই জন্য এসব গাছের ট্যাপরুট নেই—তা না হলে কি এরকম হয়।' বিজনবাবু উকিলের কলেজে-পড়া ছেলে ফরিদপুরের সূর্যোপাসক খেজুরগাছের কথা তোলে। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে,—'নন্তুদা পণ্ডিত হবে না? ও যে কলেজে 'ভুটানি'[3] পড়ে'। এসব ব্যাখ্যা তাৎমা ধাঙড়দের মনে ধরেনি। এই দিন থেকে বৌকা বাওয়ার পসার-প্রতিপত্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। তার নামডাক তাৎমাটোলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। গোঁসাই-থানের বেদীর উপরের তেল-সিঁদুরের প্রলেপ আরও পুরু হয়ে উঠতে থাকে। বাওয়ার আস্তানার জন্য লোকে নিজে থেকে খড় বাঁশ দড়ি পৌঁছে দেয়।

তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে।

১ খোকা, ছোট ছেলে।

২ বৌকার মা; কারও নামের সঙ্গে মাই শব্দটি যোগ করলে অর্থ হয় অমুকের মা

৩ Botany।

তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে 'আহা টাকা অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।'

তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মতো মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।

বৌকামাই মারা যাওয়ার দিন বৌকা যখন নারকেলের মালায় করে তার মুখে জল দিচ্ছিল, তখন সে ছেলের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল— 'অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস—সেখানে খুব ভিক্ষে পাওয়া যায়। পীপড় (অশথ) গাছ কোনোদিন কাটিস না। ধাঙড়টোলার 'কর্মাধর্মার'[1] নাচ দেখতে যাস না, ওদের মেয়েরা বড় খারাপ। অদৌড়ি[2] খেতে বড় ইচ্ছে করছে। নারকেলের মালা যেখানেই দেখবি তুলে নিস, ও এঁটো হয় না।'

—এর পরের কথাগুলো বৌকা মায়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও বুঝতে পারেনি। কেবল শুকনো ঠোঁট দুখান নাড়তে দেখেছিল। মায়ের আধবোঁজা চোখের কোণ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, সেটাকে মুছিয়ে দিয়েছিল লেঙটের খুঁট খুলে নিয়ে। ঠোঁটের কোণের ছোট্ট লাল পিঁপড়েটাকে দু আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছিল—মেরে ফেলতে মন সরেনি।

বাল্যকাণ্ড

ঢোঁড়াইয়ের জন্ম

বুধনীর মনে আছে যে, ঢোঁড়াই যেদিন পাঁচদিনের সেদিন 'টৌনে'[3] ছিল একটা 'ভারী তামাসা'। আর একদিন আগেই যদি ঢোঁড়াই জন্মায়, তাহলেই বুধনী ছদিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন! কেবল খাও, রসুন গুড় আদাবাঁটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেইটা তেলে ভেজে! মরণ! বুধনী কাঁদতে বসে।

ওর স্বামীটা ভারি ভালমানুষ। অন্য তাৎমারা বলে হাবাগোবা তাই রোজগার কম। বুধনীর নিজের রোজগার আছে বলেই, চলে যায় কোনো-রকমে। তার স্বামীকে দিয়ে তাৎমার দল চাল ছাইবার সময় খাপরা বওয়ায়,

১ ধাঙড়দের ভাদ্রপূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পূজা।

২ আদা দেওয়া একরকম বড়ি। ৩ জিরানিয়া।

খাপরার ঝুড়ি নিয়ে মইয়ে চড়ায়; পৌষে মাঘে কুয়ো পরিষ্কার করতে হলে, তাকেই জলের ভিতর বেশিক্ষণ কাজ করায়।

বুধনীকে কাঁদতে দেখে বলে 'তা এখন কাঁদতে বসলি কেন? ছেলেটার দিকেও ছাখ্—ঘাড় কাত করে রয়েছে কেন। তোর জন্যে আবার দুপয়সার মসুরির ডাল কিনে আনতে হবে। কি গরম মসুর ডাল—না?'

তার স্বামী কোনোদিন মসুর ডাল খায়নি! সে কেন, কোনো তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে সেই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা, ছেলেপিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখনি ওদের শরীরের রস শুকোনোর দরকার সেইজন্যে।

বুধনী বলে, 'হ্যাঁ, খেলেই যে গরম আগুন জ্বলে গায়ে।'

'আমি তামাসা দেখে এসে তোকে সব বলব, বুঝলি? কাঁদিস না।'

সেদিন 'টৌন' থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের বাপের বুক দুর দুর করে ভয়ে। দুটো পয়সা ছিল তার কাছে। তামাসায় গিয়ে সে তাই দিয়ে এক পয়সার এক 'পাকিট বাত্তিমার'[১] কিনেছে, আর এক পয়সার খয়নি। বাড়ি গিয়ে এখন কি বলবে বুধনীর কাছে মসুর ডালের সম্বন্ধে, সেই কথাই সে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে; যত বোকা তাকে সকলে ভাবে সে তত বোকা নয়।

'কে আর দোকান খোলা রাখবে, ঐ রাজার দরবারের[২] 'জুলুস' (মিছিল) দেখা ছেড়ে দিয়ে।' এই কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ঢোকে।

বুধনী অনেকক্ষণ থেকে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল, তামাসার খবর শোনবার জন্য।

'কার? কপিল রাজার নাকি?'

কফিল রেজা কুলের জঙ্গলের ঠিকেদার, লা-র ব্যবসা করে। তাকেই সকলে বলে কপিল রাজা।

'না রে না ওলায়তের (বিলাতের) রাজার। তার কাছে কলস্টর সাহেব, দারোগা পর্যন্ত 'থর থর থর থর'[৩]।

দরবার কথাটার ঠিক মানে, ঢোঁড়াইয়ের বাপ নিজেই বুঝতে পারেনি। মনে মনে আন্দাজ করেছে যে বোধ হয় এই মিছিলেরই নাম দরবার। পাছে

১ এক প্যাকেট লণ্ঠন মার্কা সিগারেট। সিগারেটটির নাম ছিল রেড ল্যাম্প।

২ দিল্লী দরবার (১৯১২)।

৩ তাৎমারা কথা বলবার সময় ধ্বনিপ্রধান শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

বুধনী ঐ কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি 'জুলুসে'র হাতি ঘোড়া উটের কথা বলতে আরম্ভ করে।

সে কী বড় বড় হাতি! সোনার কুর্তা পরানো, ইয়াঃ বড় বড় দাঁত, চাঁদি দিয়ে ঢাকা। সে যে কত চাঁদি, তা দিয়ে যে কত ঘুনসি হতে পারে, তার ঠিকানা নেই। একটা হাতি ছিল সেটার আবার একটা দাঁত এই ছোট্ট কদুর মতো। উটগুলো চলেছে টিম-টাম্ টিম-টাম্, সামনে পিছনে—ঠিক খোঁড়া চথুরীটার মতো চলার ধরন। হাতির পিঠে চাঁদির হাওদায় 'কলস্টর সাহাব' (কালেক্টর সাহেব), আর একটায় বুধনগরের কুমাররা, আরও কত সাহেব, কত হাকিম কে কে, সব কি অত চিনি ছাই! সাদা ঘোড়ার পিঠে ভাইচেরমেন সাহাব। কী তেজী ঘোড়া! টকস-টকস টকস-টকস কি চাল ঘোড়ার! তার কাছে যায় কার সাধ্যি। ছত্তিসবাবুর[1] দোকানের বারান্দায় বাঙালী মাইজীদের মিছিল দেখার জন্য চিক টাঙিয়ে দিয়েছিল—ঘোড়াটা তার চার পা তুলে দিতে চায় সেই চিকের উপর। ইয়াঃ তালের মতো বড় বড় খুর!

বুধনী আঁতকে ওঠে ভয়ে 'গে মাইয়া! তাই নাকি।'

আরও কত তামাসার খবর বুধনী শোনে। তার দুঃখের সীমা নেই। উট আর কলস্টর সাহাব দেখা তার পোড়া কপালে রামজী দেন নাই, সে আর কার দোষ দেবে।···

ছেলেটা কেঁদে ওঠে।

ঢোঁড়াইয়ের বাপ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—'নে, নে দুধ দে। অমন করে তুলিস না—ঘাড় মটকে যাবে 'বিলি বাচ্চাটার'[2]।' তারপর ঐ 'বিলি বাচ্চা' ঢোঁড়াইয়ের দিকে মাথা নেড়ে, হাততালি দেয়।

এ মুন্নু! (ও খোকন) এত্তা ভাত খাওগে? (এতগুলো ভাত খাবে) বকড়ি চরাওগে? (ছাগল চরাবে)।

এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে। এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে।

ছেলেকে দুধ দিতে দিতে গর্বে বুধনীর বুক ভরে ওঠে। ছেলেপাগল লোকটার আদর করা দেখে হাসি আসে। তোমার বিলি বাচ্চা কি এখন শুনতে শিখেছে, এখনও আলোর দিকে তাকায় না, ওকে হাততালি দিয়ে দিয়ে আদর হচ্ছে! পাগল নাকি!

ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে গিয়েছে আজ খুব, 'তামাসা'র গল্প আর ছেলে সামলানোর তালে মসুর ডাল না আনার কথা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তার

১ ছত্তীশবাবু। ২ বিড়ালের বাচ্চাটার (আদরে)।

মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে—ছেলের তাকৎ মায়ের দুধে, আর মায়ের দুধ হয় মসুর ডালে।

খানিক পরেই মহতোগিন্নী আসেন, প্রসূতির তদারক করতে। হাজার হোক ছেলেমানুষ তো বুধনী। মা হলে কি হয়, পেট থেকে পড়েই কি লোকে আঁতুরঘরের বিধিবিধান শিখে যাবে। কাল স্নান করার দিন। মহতোগিন্নী না দেখাশুনো করলে, পাড়ার আর কার গরজ পড়েছে বলো। মহতোগিন্নী হওয়ার ঝক্কি তো কম নয়। এসেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন বুধনীকে, মসুর ডালে রসুন ফোড়ন দিয়েছিলে না আদা ফোড়ন? দোকান বন্ধ ছিল। কে বলল? তোমার 'পুরুখ'[১]? আমি নিজের চোখে দেখে এলাম খোলা রয়েছে। দেখে আসা কেন, আমি নুন কিনে এনেছি।...

তারপর চলে মহতোগিন্নীর গালাগালি ঢোঁড়াইয়ের বাপকে। বুধনীও সঙ্গে সঙ্গে রসান দেয়। পাড়ার অন্য কোনো বয়স্থ পুরুষকে এরকম ভাবে বকতে মহতোগিন্নী নিশ্চয়ই পারতেন না। কিন্তু এ মানুষটিকে সবাই বকতে পারে।

তারপর মহতোগিন্নী চলে গেলে ঐ 'পুরুখ' বুধনীর কাছে সব কথা খুলে বলে, নিজের দোষ স্বীকার করে।

বুধনী মনে মনে হাসে। এমন 'পুরুখে'র উপর কি রাগ করে থাকা যায়। লোকের ঠাট্টাটা পর্যন্ত বোঝে না এ মানুষ; না হলে কাল হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে আমাকে খবর দেওয়া হল যে, রতিয়া 'ছড়িদার' রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছে ওকে যে—ছেলের রঙ মকস্দনবাবুর গায়ের রঙের মতো হয়েছে নাকি।

বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ

ঢোঁড়াই হয়েছিল বেশ মোটাসোটা। রংটাও কালো না—মাজা মাজা গোছের—তাৎমারা বলে গরমের রং। তার বাপ সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে এসেই ছেলে কোলে নিয়ে বসত। ছেলে হওয়ার পর থেকে সে রাতে পাড়ার ভজনের দলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই নিয়ে পাড়ার লোকের কত ঠাট্টা। বুধনী উনুনের ধারে উঠনে বসে। আর সে বসে দরজার ঝাঁপের পাশে ছেলে কোলে নিয়ে বুধনীর সঙ্গে গল্প করতে।

'বকড়—হাট্টা—আ—আ
বড়দ বাট্টা—আ—আ
সো জা পাঠ্ঠা—আ—আ'

---

১ স্বামী।

(ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড় জোয়ান), ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ছোট্ট ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে বাপের কোলে।

বুঝলি বুধনী এ ছোঁড়া বড় হয়ে আমার বংশের নাম রাখবে। একে লেখাপড়া শেখাব চিমনীবাজারের বুড়হা গুরুজীর কাছে। রামায়ণ পড়তে শিখবে, পাড়ার দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে; ধাঙড়টুলি, মরগামা, কত দূর দূর থেকে লোক আসবে ওর কাছে, খাজনার রসিদ পড়াতে। ভারি 'তেজ'[1] ছোঁড়াটা; দেখিস না এই বয়সেই কোলে নিলেই ছোট্ট ছোট্ট আঙুল দিয়ে খাবলে ধরতে চায় আমার কান আর নাক।'—ঘুমন্ত ছেলের গালদুটো টিপে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'ওনামাসি ধং গুরুজী পড়হং;—কিরে পড়বি?'[2]

'পড়ে টড়ে খোকন আমার, ভিরগু তশীলদারের মতো জজসাহেবের পাশে কুর্শীতে বসে 'সেসরী' (দায়রা কোর্টের এসেসর্) করবে। আমার সেসর সাহেব ঘুমুলো; আমার সেসর, সাহেব ঘুমিয়েছে। নে বুধনী, চাটাইটা ঝেড়ে একে শুইয়ে দে।'

কিন্তু এত সুখ বুধনীর সইল না।

সেই যেবার কলস্টর সাহাব জিরানিয়ায় হাওয়াগাড়ি আনলেন প্রথম,[3] সেইবারই ঢোঁড়াইয়ের বাপ মারা যায়। ঢোঁড়াই তখন বছর দেড়েকের হবে।

শহরে, দেহাতে, তাৎমাটুলিতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'তামাম হল্লা'—কলস্টর সাহেব হাওয়াগাড়ি এনেছেন অনেক টাকা দিয়ে। আপনা থেকে চলবে,— 'বিলা ঘোড়েকা'—পানিতে আর হাওয়ায় চলবে। আজ প্রথম চলবে হাওয়াগাড়ি। কলস্টর সাহেব যাবেন চাঁদমারীর মাঠে—যেখানে সাহেবরা ফৌজের উর্দী পরে বন্দুক চালানো শেখে—দমাদ্দম্, দমাদ্দম্। 'বড়া' নিশানা ঠিক কলস্টরের হাতের; তাঁর ধাঙড় মালী বড়কাবুদ্ধু বলে যে, মেমসাহেবের হাতে পেয়ালা রেখে নাকি গুলি মেরে চুরচুর করে দেয়। চাঁদমারীর মাঠে কাউকে যেতে দেয় না—ওটা পড়ে সাহেব পাড়ায়। কেউ গেলেই আর দেখতে হচ্ছে না; সোজা হিসাব, নও দো, এগারহ (নয় আর দুয়ে এগারো) একেবারে সিধা ফাটক।

তাই লোকে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছিল কামদাহা রোডের দুপাশে—

১ বুদ্ধিমান।

২ পড়া আরম্ভ করার সময়, এদেশের ছেলেদের 'ওম্ নমস্ সিদ্ধং' বলে আরম্ভ করতে হয়। ছেলেরা তার মানে বোঝে না। তারা বিকৃতভাবে কথাটা উচ্চার করে 'ওনামাসি ধং, গুরুজী পড়হং' বলে পণ্ডিতমশায়কে চটায়।

৩ কালেক্টরের নাম ছিল কিলবি সাহেব—১৯১৩ সালের কথা।

হাওয়াগাড়ি দেখবার জন্য। ঢোঁড়াইয়ের বাপের হয়েছিল জর ক'দিন থেকে। নিশ্চয়ই পেয়ারা খেয়ে, কেননা সেটা বাতাবিলেবুর সময় নয়। জর কী জন্যে হয় তা আর তাৎমাদের বলে দিতে হবে না—সবাই জানে, আশ্বিনের পরে জর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জর হয় পেয়ারা খেয়ে।

কলস্টর কখন যাবেন চাঁদমারীর মাঠে তা কেউ জানে না। সেইজন্য সকাল থেকে ঢোঁড়াইয়ের বাপ দাঁড়িয়েছিল রোদ্দুরে হাওয়াগাড়ি দেখবার জন্য। ভয় ভয়ও করছিল—'জিনে' (ভূত) কলের ভিতর থেকে গাড়ি চালাচ্ছে সে ভেবে নয়,—এত বোকা সে নয়,—ওসব ছেলেপিলেরা ভাবুক, না হয় দেহাতী ভূতরা ভাবুক—সে ঠিকই জানে যে, হাওয়াগাড়ি চলে পানি আর হাওয়াতে। তবে তার ভয় করছিল যে, গাড়িটা আবার তার গায়ের উপর এসে না পড়ে,—কলকব্জার কম্ম, বলা তো যায় না।

ঐ আসছে! আসছে!

শব্দ হচ্ছে রেলগাড়ির মতো। কেমন দেখতে কিছুই বোঝা যায় না, কেবল ধুলো! না ধুলো কেন হবে, ধোঁয়া। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার! আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ হাওয়াগাড়ির। দপ্ করে আগুন জলে ওঠে—প্রথমে অল্প, তারপরে হঠাৎ দাউ দাউ করে। কী হয়ে গেল হাওয়াগাড়ির! হাওয়া আর পানির গাড়ি আগুন হয়ে গেল। অধিকাংশ লোকই যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। কেউ কেউ আগুনের দিকে এগিয়ে যায়।

জর গায়ে ঢোঁড়াইয়ের বাপ পালাতে আর পারে না।

ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি যখন পৌছায় তখন ঢোঁড়াই ঘুমুচ্ছে। বুধনী আসছে জল নিয়ে 'ফৌজী ইঁদারা' থেকে। ফৌজের লোকদের কোশী-শিলিগুড়ি রোড দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় দরকার লাগবে বলে, এই ইঁদারাগুলো পথের ধারে ধারে বানানো হয়েছিল একসময়ে। আগেই ইঁদারাতলায় হল্লা হয়ে গিয়েছে যে পানি ছিল না বলে হাওয়া-গাড়ি জলেছে। তাই বুধনী হাঁকুপাঁকু করতে করতে এসেছে, খুঁটিয়ে আসল খবর নেওয়ার জন্য 'পুরুখের' (স্বামীর) কাছ থেকে। মাই গে! এ আবার কী! এসে দেখে 'পুরুখ' চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। চোখ দুটো লাল শিমুল ফুলের মতো! গা পুড়ে যাচ্ছে। কলসী ভরা জল খেতে চায়! খাও আরও পেয়ারা! বাপের কাতরানির চোটে ঢোঁড়াই ওঠে। এদিকে বাপ চেঁচায়, ওদিকে ঢোঁড়াই চেঁচায়। বাপে বেটায় চমৎকার! তারপর ক'দিন জরে বেহুঁস। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, 'জড়ীবুটী', টোটকা-টাটকী অনেক হল। কিছুতেই কিছু নয়। জরের ঘোরে 'গজর গজর গজর গজর' কী সব বলে।

কখনও বোঝা যায় কখনও বা যায় না। কখনও ঢোঁড়াই, কখনও সেসর সাহেব, কখনও হাওয়াগাড়ি। কদিন কী টানাপোড়েনই না গিয়েছে বুধনীর। তারপর তো শেষই হয়ে গেল সব।

একটা পয়সা নেই ঘরে। কিছুদিন আগে থেকেই রোজগার বন্ধ ছিল জ্বরের জন্য। বুড়ো মুন্নুলাল তখন 'মহতো'। সে ছিল মহতোর মতো মহতো। পুলিশের হাত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেবার তার নাকি 'একতিয়ার' ছিল। সে পঞ্চায়তির জমা টাকা থেকে এক টাকা দশ আনা খরচ করে, নাপিত, ঘাট, 'কিরিয়াকরম' (ক্রিয়াকর্ম) সব করিয়ে দেয়। দেড় বছরের ঢোঁড়াই মাথা নেড়া ক'রে, আর গাঁসুদ্ধ লোকের নেড়া মাথা দেখে, চেনা মুখকেও চিনতে পারে না। বুধনী কপালের মেটে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চাঁদটা মুছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

অভ্যাসমতো মহতো বলে—

ছিতি জল '

পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা ॥[১]

ওঠ্ বুধনী। এখানে বসে বসে কাঁদলেই কি চল্‌বে। কোলের ছেলেটার কথাও তো ভাববি?

বুধনী বিধবা ছিল প্রায় বছর দেড়েক। বর্ষা নামলেই শুকনো বকরহাট্টার মাঠ নতুন ঘাসে সবুজ হয়ে যায়। এর পর মাস কয়েক বুধনী ঘাস বিক্রি করে টৌনে। অঘ্রানে যায় ধান কাটতে পূবে। মাঘ মাসে বুনো কুল, ফাগুন চোতে শিমুল তুলো, আর কচি আম, বাবু ভাইয়াদের বাড়ি বিক্রি করে। এ দিয়ে পেট চালানো বড় শক্ত। অন্য কোনো রকম মজুরি করা তাৎমা মেয়েদের বারণ। তার উপর ঢোঁড়াইটাও আবার ভাত খেতে শিখল, আস্তে আস্তে। দু দুটো পেট চালাতে বড় মেহনত ক'রতে হয়। তাও চলে না।

বাবুভাইয়ারা আনাগোনা আরম্ভ করেন; বাবুলাল ঘোরাঘুরি করে তার বাড়িতে। পাড়াপড়শী, 'নায়েব' 'মহতো' সবাই খোঁটা দেয়—মেয়েমানুষ আবার বিধবা থাকবে কী!

বুধনীও ভাবে, যদি অন্যের পয়সাই নিতে হয়, তবে বয়স থাকতে তাকে বিয়ে করাই ভাল। তার বয়সও ছিল, আর 'সিঁদুর লাগানোর'[২] শখ যে ছিল না তা নয়। বাবুলালটা আবার এরই মধ্যে ডিস্টিবোডে ভাইচেরমেন সাহেবের চাপরাসীর কাজ পেয়ে গেল। লোকটা বড় হিসেবী। সে নিজের

---

১ মাটি জল আগুন আকাশ বাতাস—এই দিয়েই নশ্বর দেহ রচিত।

২ বিয়ে করবার।

বিড়িতে একসঙ্গে দুটোর বেশি টান দেয় না। তারপর নিবিয়ে কানে গুঁজে রাখে। বুধনীকে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তিন বছরের ঢোঁড়াইয়ের ভার নিতে চায় না। 'চুমৌনা'[১] করতে ইচ্ছে হয় কর, না করতে ইচ্ছে হয় কোরো না; তা বলে পরের ছেলের ভার নিচ্ছি না।

অনেকদিন গড়িমসি করবার পর বুধনী মন ঠিক করে ফেলে।

একদিন সকালবেলায় গোঁসাইথানে বৌকাবাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের দুঃখের কথা বলে। তারপর ঢোঁড়াইকে ঐখানে রেখেই বাবুলালের বাড়ি চলে যায়। ঢোঁড়াই তখন আঙুল-চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল[২]।

বস্ত্রলাভের উপাখ্যান

বুধনীকে বৌকা বাওয়া দোষ দেয়নি, পাড়ার লোকেও দেয়নি। করতই বা কী বেচারি। 'বিয়ে বিধবাকে করতেই হবে—যদি ছেলেপিলে হবার বয়স না গিয়ে থাকে। রইল—ছেলের কথা। এখন বাবুলাল খাওয়াতে রাজী না, তা বুধনী কী করবে।

মাকে ছেড়ে ছেলেটা কান্নাকাটি বিশেষ করেনি। প্রথম প্রথম যখন তখন মার কাছে পালিয়ে যেত। বাবুলাল বাড়িতে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন বুধনী কোলে করে ঢোঁড়াইকে 'থানে' পৌছে দিয়ে যায়। দিনকয়েকের মধ্যে ছেলেটা বুঝে গেল যে, দুপুরবেলায় বাবুলাল থাকে না বাড়িতে। কিন্তু এই দুপুরবেলায় বুধনীর কাছে যাওয়ার অভ্যাসও দু-তিন মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে কেটে যায়। ও যে ওখানে অবাঞ্ছিত, সেটা বুঝে, না বন্ধুদের সঙ্গে খেলার টানে, বলা শক্ত।

ছেলেটা কান্নাকাটি করে না, তবে দিন দিন রোগা হয়ে যায়। বাওয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে—দিব্যি দামাল ছেলে ছিল।

একজন পশ্চিমা ফৌজের লোক বহুদিন আগে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে না পেন্সন নিয়ে জিরানিয়ার বাজারে একটা রামজীর মন্দির বানিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁকে লোকে বলত 'মিলিট্রি বাওয়া'। তাঁর একটা পোষা চিতাবাঘ

১ সাঙ্গা।

২ 'কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গভীর জান জিন্‌হ দেখা॥ তুলসীদাস: বালকাণ্ড।

ছিল। তারই হাতে নাকি 'মিলিট্রি বাওয়া'র প্রাণ যায়। মন্দিরের উঠোনে তাঁর বাঁধানো সমাধিস্থান আছে। আর এই মন্দিরের নাম হয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি'।

বোকা বাওয়া রোজ যেত 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে'—নামে রামায়ণ শুনতে আসলে গাঁজা খেতে।

বাওয়া দেখে যে, ঢোঁড়াই রোগা হয়ে যাচ্ছে; পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যাচ্ছে, এই মায়ে-খেদানো বাপমরা ছেলেটির। রামজীই পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে—এখন তাঁর মনে কী আছে, কে জানে। রোগটা জানা রোগ; সবাই জানে যে, ছেলেটার হয়েছে 'বাই-উখড়ানোর'[1] রোগ। এ-রোগে পাতা, শিকড়ে কিছু উপকার হয় না, তবে দুধে হয়। দুধ তো বাবু-ভাইয়াদের জন্য। তারা 'রাজা লোগ'। 'পরমাৎমা' তাদের দুধ খাবার সামর্থ্য দিয়েছেন। তবে 'বাই-উখড়োলে' শুষনির শাকটাও বেশ উপকার করে—ভাত আর শুষনির শাক দুবেলা; না হয় শুষনির শাক, আর কাঁচা চিড়ে না ভিজিয়ে। মুড়ি খবদ্দার না—পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ি…

ভাবতে ভাবতে বাওয়ার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে; ঢোঁড়াইটাকে একটু দুধ-টুধ খাওয়াবার এক উপায় করে দেখলে হয়।

সে ঢোঁড়াইকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি'তে। এক মিনিটের মধ্যে ঢোঁড়াই মোহন্তজীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। ল্যাংটা ঢোঁড়াইকে চিমটেটা দেখিয়ে মোহন্তজী বলেন, খবদ্দার 'পিসাব'[2] করো না এখানে। ওই হাড়-জিলজিলে ছোঁড়া, কোথায় একটু ভয় পাবে, তা-না খলখল করে হাসে। সেই দিন থেকেই রামায়ণ শুনলেই ঢোঁড়াইয়ের 'পাক্কা প্রসাদী' (ভোগের প্রসাদ) মঞ্জুর হয়ে যায়। এইতেই 'বাই-উখড়োনোর অসুখের হাত থেকে ছোঁড়াটার জান বেঁচে যায়।

না, না, এতে বাওয়ার কিছু কৃতিত্ব নেই। যিনি পাঠিয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে তার কাছে, তিনিই ছেলেটাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁরই কৃপাতে এ-ছেলে বেঁচে-বর্তে থাকলে সে বাওয়ার উপযুক্ত চেলা হবে। আবছা স্বপ্নরাজ্য বাওয়ার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে…গোঁসাইথানে প্রকাণ্ড মন্দির হয়েছে… মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির চাইতেও বড়, বড় নৈবেদ্যর থালায় মন্দিরের মতো করে চিনি আর স্তূপাকার করে পেঁড়া সাজানো। ঢোঁড়াইকে ঐ থানের 'পূজারী'

১ বায়ু উপড়োবার রোগ। যে কোনো অনিশ্চিত রোগকে এখানকার অশিক্ষিত লোকেরা বলে, 'বাই উখড়োনো'র ব্যারাম। ২ প্রস্রাব।

করে, না পূজারী কেন হবে, মোহন্তের 'চাদর'[১] দিয়ে, সে চলে গিয়েছে অযোধ্যাজী…

'করউ কা্হ মুখ এক প্রশংসা'[২]…মাত্র একটা মুখ, তাও কথা বলতে পারি না।…তা দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি রামজী!

তোমার কৃপা না হলে যেদিন মোহন্তজী সরকারকে লড়ায়ে জেতাবার জন্য যজ্ঞ করলেন মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে, সেদিন ঢোঁড়াইকে নিজে সামনে বসে পুরী হালুয়া খাওয়ালেন—যত খেতে পারে। সে কী হালুয়া। ঘিতে জবজব জবজব। যত না ঘি আগুনে ঢালা হয়েছিল তার চাইতেও বোধ হয় বেশি ঢালা হয়েছিল হালুয়ার প্রসাদে। চারিদিক থেকে সকলে ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া দেখছে; ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। মোহন্তজী ঢোঁড়াইয়ের পাতের একখানা পুরী দেখিয়ে বৌকা বাওয়াকে বুঝোন যে, পুরীর মোটা দিকটা, এমন কড়া করে কোথাও ভাজে না, কোনো ভোজে না। এ হচ্ছে সীতারামের খাওয়ার জন্যে, এতে কি ফাঁকি দেওয়া চলে।

তারপর মোহন্তজী বাওয়াকেও কড়া পুরীর প্রসাদ চাখানোর জন্য, বড় চেলাকে হুকুম দেন।

ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখাচোখি হয়। বাওয়ার মনে হয় যে, ঐ একরত্তি ছোঁড়াটা যেন বুঝছে যে, বাওয়া যে পুরী পেল খেতে, সেটা মোহন্তজীর সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের এত আলাপ সেই জন্যে।…

হয়তো এটা বাওয়ার ভুল; কিন্তু সেদিন বাড়ি ফিরবার সময়, মোহন্তজী যখন বাওয়াকে একখানা কাপড় দিলেন, ছিঁড়ে লঙট আর গামছা করবার জন্য, তখন ঢোঁড়াইয়ের কী কান্না! কাপড়খানা যেন তারই পাওয়ার কথা ছিল।

এস. ডি. ও. সাহেব এসেছিলেন যজ্ঞ দেখতে সকালবেলায়। তিনিই খুশি হয়ে মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে যজ্ঞের জন্য তিনজোড়া 'লাট্টুমার রৈলী' অর্থাৎ লাট্টু মার্কা র‍্যালি ব্রাদার্সের কাপড়, 'সরকারী খাজনা'[৩] থেকে দেন। তারই একখানা মোহন্তজী বাওয়াকে দিয়েছিল।

ঢোঁইয়ের কান্না আর থামে না। বাওয়া বুঝোয় তোর জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি, তোকেই তো দিয়েছেন মোহন্তজী।

না, আমি আর কোনো দিন যাব না রামায়ণ শুনতে। আমাকে দিলে বড় কাপড় দেবে কেন?

---

১ মহন্ত পদের নিদর্শন।
২ 'একটি মাত্র মুখ দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করিতে পারি'?—তুলসীদাস থেকে।
৩ গভর্ণমেণ্ট কাণ্ড।

বাবুলাল ঐ কাপড় দেখে বলে, বাওয়া তুমি পরতে লেঙট। তুমি এ পাড়ওয়ালা কাপড় নিয়ে করবে কী। সরকারী 'গিরানির'[১] দোকান আছে না, যেখান থেকে হাকিম, বাঙালীবাবু আর চাপরাসীদের শস্তায় কাপড় চাল দেয়, সেখান থেকে আমি পেয়েছি খুব ভাল মার্কিন, 'জাপৈনী' (জাপানী) আট আনা করে, পাঁচ-শ পঞ্চান্ন নম্বর থেকেও ভাল জিনিস। পাঁচ গজ তাই দিচ্ছি তোমাকে—এ ধুতি আমাকে দাও।

বাওয়াও খুশি। তা না হলে অতবড় কাপড় কি ঢোঁড়াই পড়তে পারে।

এই মার্কিন ছিঁড়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রথম কাপড় হল। লেঙট ছাড়া, চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সে এই কাপড়খানাই দেখেছে।

বাওয়া আবার কাপড়খানা নিয়ে যায় পাক্কীর ধারের কপিল রাজার বাড়িতে। কুলের ডালের পোকা থেকে গালার ঘুঁটে তোয়ের করে চালান দিত কপিল রাজা। তার উঠোনের গামলায় থাকে লাল রং গোলা। তাই দিয়ে বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের ধুতি রং করে দেয়।

এই ধুতি কোনো রকমে কোমরে বেঁধে ঢোঁড়াই পাড়াসুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে আসে—মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির মোহন্তজী দিয়েছে তাকে। কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে সকলকে বোঝাতে চায় যে, মোহন্তজী এ কাপড় বাওয়াকে দেয়নি। পাঁচ বছর তো বয়েস হবে, কিন্তু তখনই সে কারও কাছে ছোট হতে চায় না—বাওয়ার কাছে পর্যন্ত না। তবে বাবুভাইয়ারা 'বড আদমী', তাদের দেখলেই আদাব করতে হবে; আর সাহেব দেখলে কাছাকাছি থাকতে নেই, এ তাৎমাটুলির সব ছেলেই জানে। ওর মধ্যে ছোট হওয়ার প্রশ্ন নেই।

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছে যে কাপড়খানা পরে থাকে,—তার কোনো বন্ধুর কাপড় নেই, ঐ কাপড়খানা দেখিয়ে তাদের চেয়ে একটু বড় হয়, কিন্তু বাওয়া কিছুতেই তাকে কাপড়খানা পরতে দেবে না; তুলে রেখে দেবে। লাল কাপড় পরে ভিক্ষে চাইতে গেলে লোকে এক মুঠিও চাল দেবে না। ও কাপড় পরে দেখতে যেতে হয় তামাসা, মেলা, মোহরমের দুলদুল ঘোড়া। তবুও হারামজাদা ছেলেটা মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে! ঢোঁড়াইকে ভয় দেখানোর জন্য বাওয়া চিমটে ওঠায়।

---

১ গিরানির অর্থ আক্রা। গভর্ণমেণ্ট-স্টোর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শস্তায় কাপড় দেওয়া হত সেখান থেকে সকলে পেত না এ কাপড়।

ঢোঁড়াইয়ের মায়ের সন্তানবাৎসল্যের বিবরণ

ছোঁড়াটা বুধনীর কাছে যেতে চায় না, এর জন্য বাওয়া বুধনীকে দোষ দেয় না। বাওয়া যতদূর জানে বুধনী কোনো দিন ঢোঁড়াইকে হতশ্রদ্ধা করেনি। করবে কী করে, নিজে পেটে ধরেছে যে। আর একটা 'চুমৌনা' করেছে বলে কি নিজের মাড়ীর সম্বন্ধটা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে পারে। তা হয় না, তা হয় না। রামজী তেমন করে মানুষ গড়েননি। সময়ে অসময়ে বুধনী ঢোঁড়াইয়ের জন্য করেছে বইকি।

—ঐ যখন 'জার্মানবালা' রথ তারা হয়ে রাতের আকাশে ছুটে যেত ;—সে রথ কোথায় নামে, কী করে, কেউ বলতে পারে না ; বাওয়া অবশ্য সে রথ দেখেনি তবে তার চাকার কালো দাগ কচুর পাতার উপর তাৎমাটুলির সবাই দেখেছে ; সেই সময় বুধনী কতদিন বাবুলালকে লুকিয়ে ঢোঁড়াইকে ভাত খাইয়েছে। তখন চালের দাম উঠেছে দু আনায় আধ সের। ঐ আক্রাগণ্ডার দিনে ভিক্ষে আর দিত কজন,—সে সাধুকেই হোক আর সন্তকেই হোক। তখন 'অফসর আদমী'দের সরকারী দোকান থেকে শস্তায় চাল দিত। বাবুলালের বাড়িতে সেই জন্যে চালের অভাব ছিল না। তখন যদি বুধনি ঢোঁড়াইকে লুকিয়ে চুরিয়ে না খেতে দিত, তা হলে সাধ্যি কি বাওয়ার, সে সময় ঐ ছেলে মানুষ করার। সে সময় অতটুকু ছেলে রামায়ণের চৌপই গেয়ে 'ভিখ মাঙলেও' টৌনের কোনো গেরস্থ উপুড়হস্ত করত না।

আর কেবল খাওয়ানো কেন, ঢোঁড়াইয়ের উপর বুধনীর প্রাণের টান বাওয়া আরও একদিন দেখেছে। মিছে বলবে না। পাড়ার মেয়েরা যে যা বলুক। বাওয়া নিজের চোখে সাক্ষী, আর সাক্ষী ভুপলাল 'সোনার'[১]। ভুপলাল সোনারের নাও মনে থাকতে পারে, সে রাজা আদমী, তার 'গাহকীর ভরমার'[২]। ঢোঁড়াই তখন পাঁচ ছ সালের (বছরের) হবে। বাবুলাল গিয়েছে ভাইচেরমেন সাহেবের সঙ্গে দেহাতে, দিন কয়েকের জন্য। বুধনীর তখন ভুখিয়া পেটে। এমনি তো বাবুলাল বৌকে বাড়ির কাজ করতে দেয় না ; 'ইজ্জৎবালা আদমী'[৩] সে। তাই বুধনী সেই ফাঁকে সাত আনা পয়সা রোজগার করেছিল। লগা দিয়ে শিমুল ফল পেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে, সেই ভিজে শিমুল তুলো বেচেছিল 'কিরানীবাবুর জানানার'[৪] কাছে। 'কিরানীবাবু'

১ সেকরা। ২ দোকান খদ্দেরে ভরা
৩ সম্মানিত লোক। ৪ কেরানীবাবুর স্ত্রী।

বাবুসাহেবের অফিসের মালিক। বুধনীর ভারি ইচ্ছে ঢোঁড়াইকে 'চাঁদির জেবর'[1] দেয়—কোনো দিন তো কিছু দেয়নি। বুধনী বাওয়াকে বলে, দাও বাওয়া একটা চাঁদির সিকি কিনে ভূপলাল সেকরার দোকান থেকে ঢোঁড়াইয়ের ঘুনসিতে দেবার জন্য। বাওয়ার ভারি আনন্দ হয় কথাটা শুনে। একটু ভয় ভয়ও করে. চাঁদির ঘুনসিটা লেঙটের তলায় ঢেকে রাখতে হবে ঢোঁড়াইয়ের, না হলে ভিক্ষে জুটবে না। বাওয়ার সেদিনকার কথা সব মনে আছে,—তার ঢোঁড়াই গয়না পাবে, আর তার মনে থাকবে না সেদিনকার কথা। সেদিন বাওয়া আর ঢোঁড়াই মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি থেকে রামায়ণ সেরে, যখন ভূপলাল সোনারের দোকানে আসে, তখন বুধনী সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অত লোকের মধ্যে ঢোঁড়াইকে কোলে টেনে নিয়েছিল, সেদিন সেকরার সঙ্গে কথা বলার সময়। সেকরার দোকানের সিঁড়ির উপর বুধনী ওকে একটা বিড়িও ধরিয়ে দিয়েছিল। ও ছোঁড়া তখনও কাশে। ভূপলাল সোনার তো শুনেই আগুন। ভারি আদমি (বড়লোক)—তার কথার ঝাঁঝ থাকবে না? সে বলে সিকির দামই তো হল আট আনা—তার উপর শালা পুলিশদের নজর বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুধনী ভয় পেয়ে বলে যে ঘুন্‌সি করলে যদি পুলিশে ধরে, তবে অন্য একটা কিছু করে দাও সিকি দিয়ে। ভূপলাল হুংকার দিয়ে ওঠে—'জাহিল আওরৎ,'[2] কিছু বুঝবে না কথাটা, আর করে দাও করে দাও। আমার কাছে সোজা কথা, সাত আনায় হবে না। সিকির উপর আবার ছেঁদা করার মেহনতানা আছে।

সে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে। তখন আর কী করা যায়। বাওয়া বুধনীকে নিয়ে যায় 'ছত্তিস' বাবুর দোকানে সওদা করাতে। ঐ পুরো সাত আনা খরচ করে বুধনী সেখান থেকে কেনে 'কজরৌটী'[3]—পেটের ছেলের জন্য। এর দেড়মাস পরে দুখিয়া আসে ওর কোলে। বাওয়ার সেদিন কী দুঃখই হয়েছিল। অমন একটা গয়না ছেলেটা পেতে পেতে পেল না। রাগ করবে সে কার উপর। ভূপলাল সোনারও অন্যায় কিছু বলেনি। বুধনীকেই বা কী বলা যায়। দেড় মাস পরই কাজললতাটার দরকার; ওর নিজের কামানো পয়সা; আর মায়ের মনের শখ। ভূপলাল দিলে কি আর ও ঘুন্সির চাঁদি কিনত না।

ঢোঁড়াইটারও সেই সময় যেন একটু চোখ ছলছল ছলছল করেছিল;—ও ছোঁড়া কাঁদতে তো জানে না।

---

১ রূপার গহনা। ২ নিরক্ষর স্ত্রীলোক।
৩ কাজললতা।

বুধনী লোভে পড়ে আর ঝোঁকের মাথায় কাজললতাটা কিনবার পর, নিজেকে একটু দোষী দোষী মনে করে। ভাবে যে ঢোঁড়াই আর বাওয়ার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। তার পেটের ছেলের জন্য কাজললতা, বাবুলাল নিশ্চয়ই কিনে দিত। তবে নিজের রোজগার করা পয়সা ও-কাজে খরচ করার দরকার কী ছিল।

আসলে ঢোঁড়াইয়ের উপর টান তার একটু কমেছে। ঢোঁড়াই ঠিকই ধরেছে—ছোট ছেলেপিলের মতো এ জিনিস বুঝতে আর কেউ পারে না।

তাই মধ্যে মধ্যে বুধনী ঢোঁড়াইকে আর বিশেষ করে বাওয়াকে জানিয়ে দিতে চায় যে, তার ছেলের উপর ভালবাসা একটুও কমেনি—যেটুকু কম লোকে দেখে, তা বাবুলালের ভয়ে। এইটা জানানোর জন্যই বুধনী বাওয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ভূপলাল সোনারের দোকানে।

নিজের দোষ কাটানোর জন্যেই না কি সে দিনকয়েকের মধ্যেই ঢোঁড়াইকে ডেকে পেট ভরে মেঠাই খাওয়ায়—একেবারে হঠাৎ। ভাইচেরমেন সাহেব ডিস্ট্রীবোডে লড়াই থামবার জন্য ভোজ আর দেওয়ালী করেছিলেন। সেদিন মশার ছবির তামাসা দেখিয়েছিল সেখানে। সারা দেওয়াল জোড়া অত বড় বড় কখনও মশা হয়? 'ভাগ!' ওসব দেহাতীদের বোঝাস। কিরানীবাবু মোচ মুড়িয়ে 'কিষণজীভগবান'[১] সেজেছিলেন। সে দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। কলস্টর সাহেব—তাকে এখানে বলে চেরমেন সাহেব[২]—তিনি পর্যন্ত দেখেছিলেন। ভাইচেরমেন সাহেব তাঁকে 'লাটক' বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইদিন বাবুলাল বাড়ি আসবার সময় ভাইচেরমেন সাহেবের চিঠি রাখবার যে বেতের ঝুড়ি আছে, তাইতে করে এক ঝুড়ি ভরে কত রঙবেরঙের মেঠাই এনেছিল। বুধনী সে সবের নামও জানে না। জানতে চায়ও না। তার বরাতই অমনি। সেবার 'দরবারের' তামাসার সময় ও ছিল আঁতুড়ে; আবার, এবার যুদ্ধ থামবার তামাসার সময়ও আঁতুড়ে। আঁতুড়ে তো মেয়েছেলেদের মিষ্টি খেতে নেই, তা এত মিষ্টি কী হবে। তাই ও নিজেই বাবুলালকে বলে, ঢোঁড়াইকে ডেকে নিয়ে আসতে। বাবুলালেরও মনটা খুশি ছিল—ছেলে হয়েছে নতুন। একটা দমকা উদারতার ঝোঁকে সে একখানা প্রকাণ্ড কচুরপাতা ভরে ঢোঁড়াইকে খাবার সাজিয়ে দেয়। বলে—'বাওয়া যে গলায় তুলসীর মালা দেওয়া 'ভকত'। না হলে তো তাকেও খাওয়াতাম।'

১ কেষ্ট ঠাকুর।

২ তখন বেসরকারী লোক জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারতেন না।

বুধনী নতুন খোকাকে কোলে নিয়ে মাচার উপর বসে ছিল। সে বাবুলালকে বলে—তুমি একটু বাইরে বেরিয়ে এসো, তোমার সামনে ঢোঁড়াই খেতে পাচ্ছে না।

'লজ্জা আবার কিসের' বলে একটু বিরক্ত হয়ে বাবুলাল চলে যায়।

ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া হলে বুধনী ঢোঁড়াইকে কাছে ডাকে, একটু আদর করবার জন্য। অতটুকু কচি ছেলে কোলে নিয়ে উঠে তো আসতে পারে না।

ঢোঁড়াই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্য দিকে তাকিয়ে। তার একটুও ভাল লাগে না এই লাল খোকাটাকে, আর তার মা'টাকে; বাওয়ার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে। তার চোখ ফেটে কান্না আসবে বোধ হয়। রাম্ রাম! সে কোনো কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে যায় 'থানের' দিকে।

রেবণগুণীর কৃপায় ঢোঁড়াইয়ের পুনর্জীবন লাভ

ঢুখিয়া হওয়ার পর থেকে বুধনী হয়ে যায় ঢুখিয়ার মা। পাড়ার সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকতে আরম্ভ করে। আর সত্যি সত্যিই এর পর থেকে, ঢোঁড়াইয়ের কথা তার খুব কম সময়েই মনে পড়ে। একে ঢোঁড়াই মা'র কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়, আর এদিকে ঢুখিয়ার মা'রও সংসারের নানান লেঠা। ঢুখিয়ার মা'র ছোট্ট মনের প্রায় সমস্ত জায়গাটুকুই জুড়ে থাকে ঢুখিয়া। এ সোজা কথাটা বাওয়াও মর্মে মর্মে বোঝে, আর সেই জন্যই আজ দরকারে পড়েও তাকে ডাকতে ইতস্তত করছিল।

সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোক গুনে গিয়েছে।[১] সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায়, তাৎমাটুলিতে, ধাঙডটুলিতে, কী অসুখ! কী অসুখ! 'বাই উখড়োনোর' ব্যারাম—বেহুঁশ জ্বর—'ঝট্‌দে বিমার পট্‌দে খতম'[২]।

কপিল রাজার বাড়িসুদ্ধ সবাই উজাড় হয়ে যায় এই রোগে সেইবার। হবে না! বকরহাট্টার মাঠের সব শিমুল গাছ সে কাটিয়েছিল, চা চালান দেওয়ার বাক্স তৈরি করার জন্য। শিমুল তুলো যে তাৎমানীদের রুজী সে কথা একবার ভাবল না। কাটাচ্ছিলেন ওই নিরেট ধাঙড়গুলোকে দিয়ে। আহাম্মকগুলো বোঝে না যে ধাঙড়ানীদেরও শিমুল তুলো বেচে রোজগার হয়। সেই তো

১ আদম-শুমারি। ২ লোকে অসুখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরে।

নির্বংশ হয়ে গেলি কপিল রাজা, কিন্তু যাওয়ার আগে 'ঝোটাহারদের' রোজগার মেরে রেখে গেলি। থাকগে, সে যাদের স্ত্রী মেয়ে আছে তারা ভাবুকগে যাক। কিন্তু তার তো সম্বল ঐ একমাত্র ঢোঁড়াই।

সকালে ঢোঁড়াই ঘুম থেকে ওঠেনি। মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে রামায়ণ শুনতে যাওয়ার সময় হল, তবুও ওঠে না। বাওয়া ত্রিশূল দিয়ে খোঁচা মারে। হল কী ছোঁড়ার। বাওয়ার মনটা ছাঁৎ করে ওঠে। কপিল রাজার বাড়ি থেকে একটার পর একটা 'মূর্দা' বের করেছে—পরপর চারটে। ঝুমলাল মহতো খতম হয়ে গিয়েছে গত সপ্তাহে···

গায়ে হাত দিয়ে দেখতে ভয় ভয় করে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে যা ভেবেছে তাই। ও ঢোঁড়াই কথা বল্—চুপ করে কেন? ভিক্ষের বেরুনো, রামায়ণ শুনতে যাওয়া মাথায় চড়ে। এ কী করলে রামজী, আমার! এ রোগে তো ভাববার পর্যন্ত সময় দেয় না। দুখিয়ার মাকে খবর দেব কিনা, ডাকা উচিত হবে কিনা সেই কথাই বাওয়া ভাবছে। দুখিয়ার মা তো মনে হয় একেবারে ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে মন থেকে। এক বছরের মধ্যে একটি দিন খোঁজ করেনি। বাওয়া ভেবে কূল-কিনারা পায় না।

শেষ পর্যন্ত গিয়ে খবরই দেয়। তার পেটের ছেলে, কিছু একটা ঘটে গেলে, হয়তো সারাজীবন দুঃখ থেকে যাবে। আসতে ইচ্ছে হয় আসবে, মন না চায় আসবে না। বাওয়া নিজের কর্তব্য করবে না কেন।

খবর দিতেই দুখিয়ার মা আঁতকে ওঠে। দুখিয়াকে বাবুলালের কোলে ফেলে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসে। আর যেন সে-মানুষই না। পুরনো বুধনী ফিরে এসেছে যেন। বাবুলাল পিছন থেকে হাঁ হাঁ করে। কে কার কথা শোনে। গোঁসাই নেমে এলেও তার পথ আটকাতে পারতেন না তখন। এসেই ওই নেতিয়ে পড়া ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। ঢোঁড়াই তখন বেশ বড—বছর আষ্টেক বয়স হবে। ওই বুড়ো-ধাড়ী ছেলেকে, কোলে নিয়ে ছোটে রেবণগুণীর বাড়ির দিকে। ওর গায়ে মহাবীরজী তাকৎ জুটোচ্ছেন। বাওয়া তো গুণীর বাড়ি যেতে পারে না; গেলে, লোকে সে সন্ন্যাসীকে মানে না। তাই সে খানিকদূর সাথে সাথে গিয়ে পথের ধারে এক জায়গায় বসে পড়ে। সেখানে গিয়ে দুখিয়ার মা ঝাড়ফুঁকের কথা তুলতেই রেবণগুণী ফুঁ দিয়ে তামাক ধরাতে ধরাতে বলে,—তুই তো বাসি পেটে আসিসনি।

দুখিয়ার মা হকচকিয়ে যায়। সকালে কী খেয়েছে মনে করতে চেষ্টা করে। গুণী যখন বলেছে নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে থাকবে। ওমা, সত্যিই তো!

খয়নি তো সে খেয়েছে। ঐ যে তখন, বাবুলাল জলে নিয়ে খাওয়ার সময় তাকেও একটু দিয়েছিল। উৎঠার জায়গায়—ভয়ের ছাপ পড়ে তার মুখে। রেবণগুণী তো চটে লাল। এই মারে তো এই মারে। তুই বুড়ো মাগী, জিন্দিগি গেল ছেলে বিইয়ে। সাতকাল তাৎমাটুলিতে কাটিয়ে তুই জানিস ঝাড়ফুঁক করতে আসতে হলে খালি পেটে আসতে হয়, ভোর বেলাতে আসতে হয়।

রেবণগুণীর নামে পাড়ায় লোকে কাঁপে। তাৎমাটুলির আইবুড়ো মেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখলে পালায়। মায়েদেরও মেয়েদের উপর সেই রকমই হুকুম। এক তো তুকতাকের ভয়; তার উপর থাকে চব্বিশ ঘণ্টা নেশা করে। পরপর ছটা বিয়ে করেছে, এখনও দুটোকে নিয়ে ঘর করে। গোঁসাইথানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতি বছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন। সেই সময় সে ভেড়ার রক্ত কাঁচা খায়; মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে, সে হুংকার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্যে দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের বেতের ঘেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। কুমারী মেয়েরা সে সময় পালায় সেখান থেকে। পাঁচবার সে একটা একটা মেয়েকে ছুঁয়ে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। কোনও মা বাবার সাধ্যি নেই যে, সেই সময়কার গোঁসাইয়ের কথায় নড়চড় হতে দেয়।

পথে আসবার সময়ই দুখিয়ার মা'র এসব কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢোঁড়াইটাকে বাঁচাতে হলে ঐ গুণী ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই। টৌনের হাসপাতালে গেলে কোনো লোক আর বাড়ি ফিরেই আসে না। কপিলরাজা তো বাংগালী 'ডকটর' দিয়েও দেখিয়েছিল। কিছু কি হল?

রেবণগুণী গালাগালি দিয়ে চলেছে দুখিয়ার মাকে। 'ভরা দুপুরে কি মন্তরের ধক থাকে নাকি? বেরো শিগগির এখান থেকে।' দুখিয়ার মা গুণীর পা জড়িয়ে ধরে, ডুকরে কাঁদে।—এটার বাবা নেই গুণী। তুমি একে পায়ে ঠেলো না।

গুণীর মেজাজ বোধ হয় গলে। বলে, কালই তো শনিবার। কাল আসিস। কাল তো আবার হাড়তাল না কী বলে, ওই কী একটা নতুন হয়েছে না আজকাল,—গত বছরেও হয়েছিল একবার--দিনের বেলা সওদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে। সাঁঝের পর দোকান খুললে পান সুপারি কিনে নিয়ে রাতে আসিস। 'সিন্দুর' তো

তোর আছেই। 'ভানমতীর'[১] দয়ায় সেরে যাবে এই বদমাসটা। বলে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়।

দুখিয়ার মা'র মনটা একটু হাল্কা হয়ে ওঠে। রেবণগুণীর মন তা হলে গলেছে। সে বলেছে সেরে যাবে, তার দুশ্চিন্তা অর্ধেক দূর হয়ে যায়। কিন্তু কাল রাত্তির পর্যন্ত দেরি করা কি ঠিক হবে? চিকিৎসা আরম্ভ করতে তার সবুর সয় না। কালই কি আবার ঐ কী যে বলে ছাই, 'হাড়তাল' না কী না হলেই হত না। দুনিয়ার সকলের আক্রোশ কি তারই উপর? এখানে আসবার আগে রেবণগুণীকে যতটা ভয় ভয় করছিল, এখন কথাবার্তা বলার পর ততটা ভয় করে না।

সাহসে বুক বেঁধে গুণীকে জিজ্ঞাসা করে—'আচ্ছা আজকে পান সুপারি কিনে, কাল সকালে এলে হয় না—শনিবার আছে··'

'যা বললাম তাই কর'—চিৎকার করে ওঠে গুণী, 'তোর বুদ্ধিতে আমি চলব, না আমার বুদ্ধিতে তুই চলবি?'

দুখিয়ার মা ভয়ে কাঁপে—গুণীর মুখের উপর কথা বলা তার অন্যায়ই হয়েছে।

গুণী একটু নরম সুরে বলে, 'আজকের কেনা পান সুপুরিতে মন্তর ধরবে না। আর ছেলেকে আনবার দরকার নেই। এখান থেকেই কাজ হয়ে যাবে। তুই একা এলেই চলবে। আজকের রাতে শোবার সময় ছেলেটার চোখে ধোঁধলের ফুলের রস দিয়ে দিস। আর মরণাধারের এই মন্তর দেওয়া মাটি নিয়ে যা ওর কপালে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে। ঢোঁড়াই তখন দুখিয়ার মা'র কোলে নেতিয়ে পড়েছে। ঢোঁড়াইকে নিয়ে ফিরে আসবার সময় দুখিয়ার মা'র কানে আসে—রেবণগুণী আপন মনে বলছে···গত অমাবস্যাতে আদ্ধেক রাত্তিরে যখনই দেখেছি মুরবলিয়া[২] ফৌজের দল পাক্কী দিয়ে গিয়েছে, তখনই বুঝেছি যে উজাড় হয়ে যাবে গাঁ। কাটা গলার উপর একটা করে আবার পিদীপ জ্বলছিল।···ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যায়।··যাক্ সে যাত্রা রেবণগুণীর কৃপায় ঢোঁড়াই বেঁচে যায়। ঝাড়ফুঁকের জন্য দুখিয়ার মাকে যে দাম দিতে হয়েছিল, তার জন্য সে কোনোদিন দুঃখিত হয়নি। ঐ রোগে কত লোক মরেছিল গাঁয়ে, শুধু রেবণগুণীরই মন্ত্রের জোরে ঢোঁড়াই বেঁচেছে, এ উপকার দুখিয়ার মা ভুলতে পারবে না। এমন শনিবার রাত্রের মন্তরের

১ ভানুমতী যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

২ কন্ধকাটা ভূত। ঐ সময় কন্ধকটা মিলিটারি উর্দী পরা ভূতের দল গিয়েছিল কোশী-শিলিগুড়ি রোডের উপর দিয়ে।

ধক যে, জ্বর ছাড়বার পরও যত বিষ শরীরে ছিল, কালো কালো রক্তের ছাপের মতো হয়ে, নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়েছিল কদিন ধরে।

অসুখ সারবার পরও এক হপ্তা দুখিয়ার মা ঢোঁড়াইকে রেখেছিল বাড়িতে। এ ঢোঁড়াইয়ের এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার শরীর তখনও দুর্বল। বাতায় গোঁজা কাজললতাটার দিকে শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ টন টন করে, হাঁড়ি ঝোলানোর শিকেগুলো বিনা হাওয়াতেও মনে হয় কাঁপে, ভাত আনতে দেরি হলে রাগে কান্না পায়। বাঁশের মাচার উপর একদিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে দুখিয়া, আর মধ্যেখানে দুখিয়ার মা। দুখিয়ার মা'র গায়ের গরমের মধ্যে মুখ গুঁজে, গল্প শোনে ঢোঁড়াই...রাজপুত্তুর সদাবৃচ মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন রাজকন্যা সুরঙ্গার মহলে যাওয়ার জন্য ; অন্ধকার ঘুরঘুট্টি সুড়ঙ্গ, পিছল দেওয়াল, তার মধ্যে দিয়ে জল চুইছে টপ টপ করে।[১]...

ঢোঁড়াইয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে দুখিয়ার মা'র হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে নাকিরে ঢোঁড়াই, এই তো আমি কাছে রয়েছি, কথা বলছি তবুও ভয় করছে! অসুখের পর এমনিই হয়।....

ওদিকে হিংসুটে দুখিয়াটা উঠে বসেছে হাতের মুঠো দিয়ে নাক রগড়াতে রগড়াতে। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখান দিয়ে সে ঢোঁড়াইকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় আর ঢোঁড়াই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

'ছি দুখিয়া, ঢোঁড়াই ভাইয়ার যে অসুখ,' দুখিয়া কান্না জুড়ে দেয়। বাবুলাল অন্য মাচা থেকে চেঁচায়, 'ও কাঁদছে কেন?'—শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দুখিয়াকে নিয়ে যায় নিজের কাছে।

ঢোঁড়াই ছোট হলেও বোঝে যে, বাবুলাল রাগ করে দুখিয়াকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আর রাগটা বোধ হয় তারই ওপর। দুখিয়ার মা-ও চুপ করে গিয়েছে। তার চুলের গন্ধটা আসছে নাকে, বাওয়ার জটার গন্ধের মতো না, অন্য রকম। কোথায় ভেবেছিল যে, আজ বিজা সিং-এর গল্পটা শুনবে এর পর। বাবুলালটা সব মাটি করে দিল। ভারি ভাল লাগে বিজা সিং-এর গল্পটা। ঘোড়া ছুটিয়ে, তরোয়াল নিয়ে যাচ্ছেন বিজা সিং—কার সাধ্যি তার সম্মুখে দাঁড়ায়—হাওয়া গাড়ির চাইতেও কি বেশি জোরে তাঁর ঘোড়া ছুটে। দুখিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করবে নাকি যে, এঞ্জিনের চাইতেও কি বিজা সিংয়ের গায়ে বেশি জোর। না দুখিয়ার মা টা বাবুলালের ভয়ে এখন কথা বলবে না, তাই চুপচাপ শুয়ে রয়েছে।

১ সুরঙ্গা সদাবৃচের রূপকথা সবাই জানে এখানে। কিন্তু ওটা বলতে হয় গান করে, সেইটা সকলে পারে না।

'কিরে ঢোঁড়াই ঘুমোলি নাকি ?'

ঢোঁড়াই উত্তর দেয় না। চুপচাপ চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। এইবার দুখিয়ার মা ওঠে। ঢোঁড়াই জানে যে, তাৎমাটুলির প্রত্যেক মেয়েছেলেই রাত্রে পুরুষের পা টিপে দেয়—তেল থাকলে পায়ে তেল দিয়ে দেয়। তার বাওয়ার কথা মনে পড়ে। দুখিয়ার মা যদি বাওয়ার পায়ে তেল দিত, তাহলে বেশ ভাল হত। বাবুলালটাও ভাল না, দুখিয়ার মা-টাও ভাল না, আর দুখিয়াটাও ভাল না। বাওয়া এখন কী করছে, কে জানে। আজও তো নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল—দুখিয়ার মা যেতে দেয়নি। কালই সে চলে যাবে 'থানে', বাওয়ার কাছে···বিজা সিং-র ঘোড়ায় চড়ে।···তরোয়াল হাতে নিয়ে রাজপুত্তুর সদাবৃচের মতো···

ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

বোকাবাওয়া ঢোঁড়াইয়ের কদর বোঝে। ছোঁড়া বেশ বুদ্ধিমান। বাওয়া বোবা। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও অসুবিধে হয় না; চোখের ইশারাতেই সে সব মনের কথা বুঝে যায়। আর ওর জন্যে ভিক্ষেটাও পাওয়া যায় খুব, গলাটা ওর খুব ভাল কিনা। মাইজীরা ওকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'সীয়-রাম-পদ-অঙ্ক বরায়ে। লক্ষণু চলাই মগু দাহিন বাঁয়ে॥'[১] শোনেন। কিছুদিন থেকে বাওয়া দেখছে যে, ঐ গানটায় আর সেরকম ভিক্ষে পাওয়া যায় না। সে ও ছোঁড়াও বুঝেছে। এই যবে থেকে 'হাড়তাল' টাড়তাল আরম্ভ হয়েছে, তবে থেকে 'বটোহীয়'[২] গ্রাম্য গানের হাওয়া লেগেছে দেশে। কী যে গান বুঝি না—যে কোনো কথার শেষে রে বটোহিয়া জুড়ে দাও, আর অমনি গান হয়ে যাবে। যখন যে হাওয়া চলে আর কী !

বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারায় বলে, 'এই পাশের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলি কোথায় ?'

'ও বাড়িতে অসুখ।'

সব খবর ঢোঁড়াই রাখে। কোন বাড়িতে অসুখ, কোন বাসায় মাইজীরা দেশে গিয়েছে দশহরার ছুটিতে, কোন কোন বাড়িতে দুপুর বেলায় যেতে হয়

---

১ রাম ও সীতার পায়ের দাগ এড়িয়ে লক্ষণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরে রা চলছেন

২ পথিক। এই নামের একটি গ্রাম্য সুর ১৯২০ সালের পর থেকে প্রচলিত হয়। এখন গান প্রায় লুপ্ত।

বাবুরা আপিস কাছারি গেলে, কোন বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, পুজো সব ঢোঁড়াইয়ের নখদর্পণে। বাওয়াকে সে-ই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাওয়ার ভিক্ষের অভিজ্ঞতা দুপুরুষের। তবুও এতসব খুঁটিনাটি মনে থাকে না। ঢোঁড়াই গান গাইছে…

সুন্দরা আ সু। ভূমি ভাইয়া-আ।
। ভারাতা-আ কে। দেশা-বাসে।
মোরা প্রাণা-আ। বসে হিম-অ
। খোহরে বটোহিয়া-আ-আ··।[১]

বাওয়া বলে, 'চল এখান থেকে, কেউ সাড়া দেবে না কঞ্জুসের দল। এক দুয়োরে কতক্ষণ গলা ফাটাবি।

ঢোঁড়াই ভাবে, বাওয়া বোঝে না তো কিছুই, খালি চল্ চল্। হড়বড় করলে কি ভিক্ষে পাওয়া যায়। মাইজী এখন বসেছে পুজোয়। বাবু আপিসে গেলে, তারপর স্নান করে পুজোয় বসে। এখুনি উঠবে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই।

বুড়ি মাইজী মটকার থান পরে ভিক্ষে দিয়ে গেলেন, সঙ্গে আবার একটা বেগুন।

বাওয়া অপ্রস্তুত হলেও মনে মনে খুশি হয়—এ ছোঁড়া উপযুক্ত চেলা হবে বড় হলে। একটু খালি শাসনে রাখতে হবে। বড় দুরন্ত ছেলে দিনরাত খেলার দিকে মন। রোজগারের দিকে মন বসে না। সকালবেলা ধরতে পারলে তো সঙ্গে আসবে। একটু নজরের বার করেছ কি ফুট করে কখন যে থান থেকে সরে পড়বে, তা কেউ বুঝতেও পারবে না। তারপর কেবল সারাদিন টো টো, আজ এর সঙ্গে ঝগড়া, কাল ওর সঙ্গে মারামারি। ঠিক যে সব কাজ বাওয়া পছন্দ করে না সেই সব কাজ। একদিন বাওয়া দেখে একটা গাধা ধরে তার পিঠে চড়েছে। ঐ খৃষ্টান ধাঙড়গুলোর ছেলেদের সঙ্গে পর্যন্ত ওর আলাপ। 'মহতো' একদিন এ নিয়ে নালিশও করেছে তার কাছে। বুড়ো শুক্রা ধাঙড়, যে ওকিল সাহেবের বাগানে মালীর কাজ করে, সে আবার ঢোঁড়াইকে বলে 'সন্ বেটা' (ধর্মছেলে)। রতিয়া ছড়িদার এই কদিন আগেও এসে বাওয়ার কাছে নালিশ করেছে ঢোঁড়াইয়ের নামে।

'গিয়েছিলাম চিমনি বাজারে রাঙা আলু কিনতে। দেখি তোমার গুণধর

---

১ সুন্দর সুভূমি ভারত দেশটা,
আমার প্রাণ থেকে হিমালয়ের গুহায়,
রে পথিক।…

ছেলে ঢোঁড়াই, গলায় একটা দড়ি জড়িয়ে বোবা সেজে, গেরস্থ বাড়িতে, গরু মরেছে বলে ভিক্ষা করছে। তাৎমাদের নাম হাসাল। তোমার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুলেই হয়—তাতে তো বেইজ্জতি নেই। এর বিহিত একটা করতেই হয় বাওয়া তোমাকে।'

বাওয়া চটে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আলাদা রোজগার করতে শিখেছে লুকিয়ে। কী করেছিস সে চাল আর পয়সা বল। কল্কের তামাকটা পর্যন্ত শেষ করে টানি না, পাছে ঐ ছোঁড়াটা ভাবে যে, ওর জন্যে রাখল না কিছু, আর এ তলে তলে রোজগার করে খরচ করে—নেমকহারাম হারামজাদা কোথাকার। আংটা পরানো ত্রিশূলটা নিয়ে সে ঢোঁড়াইকে তাড়া করে যায় মারতে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? অনেকদূর যাবার পর, ঢোঁড়াই বাওয়ার নকল করে চলতে আরম্ভ করে—ঠিক যেন ত্রিশূল আর ঝোলা নিয়ে বাওয়া সকালে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। রতিয়া 'ছড়িদার', হেসে ফেলে। বাওয়া আরও চটে যায়—হাসছ কী, তোমাদের ছেলেরা যায় রোজগারে খুরপি নিয়ে ঘাস তুলতে, না হয় ঝুড়ি নিয়ে কুল কুড়োতে। এ ছোঁড়া যাবে তাদের সঙ্গে সমানে তাল দিতে, কিন্তু রোজগারের কথাও ওর কানে এনো না, তবে থাকবেন খুশি। আমি এনে দেব তবে চারটি খেয়ে উপকার করবেন। না, ছোঁড়াটা দেখছি ধাঙড়টুলির পথ ধরেছে। যা তোর সাতজন্মের বাপদের কাছে!···তারপর রাগটা একটু কমে এলে, বাওয়ার উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। বদরাগী পাগল ছেলেটা আবার কী না কী করে বসে। মরণাধারের ওপারে 'গোঁসাই' (সূর্য) ডুবে যায়। বকরহাট্টার মাঠের তালগাছ কটার উপরের আলোর রেশ মুছে যায়। গোঁসাইথানের অশথ গাছটির উপরের পাখির কাকলীর বন্ধ হয়ে যায়। তবুও ঢোঁড়াই আসে না। অনুতাপে বাওয়ার চোখ ছলছল করে; তামাকে স্বাদ পায় না। সে কি গিয়েছে এখন। তখন 'গোঁসাই' ছিল মাথার উপর। সে তালপাতার চাটাইটা ঝেড়ে, অসময়ে শুয়ে পড়ে। খানিক পরে কাঠের বোঝা ফেলবার শব্দে বুঝতে পারে যে, ঢোঁড়াই জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে ফিরেছে। ঢোঁড়াই আগে কথা বলবে না, বাওয়াও ওর দিকে তাকাবে না। কোনোদিকে না তাকিয়ে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করে। বাওয়া শব্দ শুনে বোঝে যে এই মাটির মালসাতে জল চড়াল, এইবার ভিক্ষের ঝুলি থেকে চাল বের করছে। আর চুপ করে থাকা যায় না। বাওয়ার খাওয়ার জন্যে জিবছীর মা, গোটা কয়েক 'সুথনী'[১] দিয়ে গিয়েছে। এখনও মাথার কাছে রাখা রয়েছে। ঢোঁড়াইটা

[১] একপকার কন্দ; কেবল গরীবরাই এই কন্দ খায়।

জানে না—এখন ভাতে না দিলে সিদ্ধ হবে কী করে। বাওয়া ত্রিশূলটি নেড়ে ঝম্ ঝম শব্দ করে। এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের অভিমান ভাঙে,—বাওয়া তাহলে তাকে ডেকেছে।

'এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লে কেন বাওয়া? খাবে না?'

রাতে আবার ঢোঁড়াই বাওয়ার চাটাইয়ের উপর তার কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। এর মধ্যে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে না।

এই হচ্ছে আজকালকার নিত্যকার ঘটনা। বাওয়া মধ্যে মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার ভাবে যে অল্প বয়স। যে বয়সের যা। ওর সমবয়সীদের সঙ্গে না খেললে ধুললে কি ওর এখন ভাল লাগে। হাঁ তবে খেলবি খেল। নিজের রোজগারের কাজটা করে তারপর খেলা; আর ঐ দলের পাণ্ডামিটা ছেড়ে দে। এই এখনই থানে ফিরবে। আর কি ওর টিকি দেখবার জো থাকবে সেই গোঁসাই ডুববার আগে। আর কী জেদী, কি জেদী! বকে ঝকে কি ওকে সামলানো যায়। ঝোঁক একবার উঠলে হল। এখন এই ঝোঁক থানের দিকে আর ভিক্ষের দিকে গেলে হয়, বড় হলে। তবে না আমার উপযুক্ত চেলা হতে পারবে। রামজীর মনে যা আছে তাই তো হবে। সিতারাম! সিতারাম! ঢোঁড়াই গেয়ে চলেছে সেই 'বটোহর' গান। বুকের জোর আছে ছোঁড়াটার। গানের শেষে বটোহিয়ার আ-টা যা ছেড়েছে একেবারে ভাইচেরমেন সাহেবের দরোয়ানের কুঠরির জানলা খুলিয়ে ছেড়েছে। ঐ যে তাঁর বিজলী-ঘরের মিস্ত্রিও জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে দেখছি। ঝুলিটা ভরে গিয়েছে রে ঢোঁড়াই। চল্, ফেরা যাক থানে। আবার সাওজীর দোকান থেকে একটু নুন নিতে হবে।

গানহীবাওয়ার বার্তা

কপিল রাজার বাড়িটা ভূতের বাড়ির মতো পড়েছিল একবছর থেকে। বাড়ির লোকেরা মারা যাবার পর, তার জামাই এসেছিল, বাড়িটা বিক্রি করতে॥ খদ্দের জোটেনি। বাড়ি তো তেমনিই, তার উপর শহর থেকে এতদূরে। জমির দাম এখানে নামমাত্র বললেই হয়। ঐ ভুতুড়ে বাড়ির, খড়ের চালা কিনবার জন্য কে আর পয়সা খরচ করতে যাবে। কপিল রাজার জামাইটা আবার ফিরে এসেছে, দিন কয়েক হল। শোনা যাচ্ছে যে, চামড়ার ব্যবসা করবে। আজ বাদরা মুচির সঙ্গে নাকি সে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছে। কাল দু'গাড়ি নুন এসেছে তার বাড়িতে।

এই কথাই উঠেছিল সাঁঝের ভজনের আখড়ায়। ধন্না 'মহতো' বসে বসে কথাটা ভাববার নটে। তা বাবুলালকে আসতে দে। একে সে পাড়ার পঞ্চায়েতের একজন 'নায়েব', তার উপর 'অফসর আদমী'; হাকিম হুকুমের সঙ্গে কথা বলেছে। তার উর্দি পাগড়ির রং বদলেছে কিছুদিন আগে—কনস্টেবের জায়গা নিয়েছে ওর ভাইচেয়রমেন সাহেব সেইজন্য। বাবুলাল বলেছে যে, ওর ভাইচেয়রমেন সাহেবকে এখন চেয়রমেন সাহেব না বললে চটে—আচ্ছা বাবা মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছ, যা বল তাই শুনতে রাজী আছি।

ঐ বাবুলালকে দিয়ে চেয়রমেন সাহেবকে বলাতে পারলে কপিল রাজার জামাইটার এ অনাছিষ্টি কাণ্ড বন্ধ করা যেতে পারে। বাদরা মুচীটাকেই যদি চেয়রমেন সাহেব একবার বকে দেয় তাহলেই এঁর চামড়ার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ছি ছি ছি ছি, জাত-ধর্ম আর থাকবে না। দুর্গন্ধে পাড়ায় টেঁকা যাবে না, হাজারে হাজারে শকুন বসবে আমাদের ঘরের উপর। আর সেসব মা-তো চামড়া—নাম আনা যায় না মুখে। হ্যাক। থুঃ! থুঃ! সিতারাম!

কিন্তু বাবুলাল আজ আসেই না, আসেই না অফিস থেকে। চেয়রমেন সাহেবের বাড়িতে চিঠির ঝুড়ি পৌঁছে, তারপর হাট করে রোজ সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরে আসে। আজ রাত দশটা বাজল। আরে দুখিয়ার মা'র কাছ থেকে খবর নে তো ঢোঁড়াই যে, বাবুলাল কিছু বলে গিয়েছে নাকি বাড়িতে।

আমি যাই না ও-বাড়িতে।

মহতো বলে যে, বাওয়া ছেলেটার মাথা একেবারে খেল; নেমকহারাম কোথাকার; গত বছরও তো অসুখ হয়ে অতদিন পড়ে থাকলি দুখিয়ার মা'র কাছে। আচ্ছা গুদর তুই-ই যা বাবুলালের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয়। তারপর বিকৃত উচ্চারণে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমি যাব না ও-বাড়িতে। বদমাস কোথাকার।'

'কাহুহি বাদি ন দেহিয় দোষু'[১]—মিছে দোষ দিস না দুখিয়ার মায়ের আর বাবুলালের।

এরই মধ্যে বাবুলাল এসে পড়ে। সে আর কাউকে প্রশ্ন করার অবকাশ দেয় না যে, আজ দেরি কেন হল।

ডিষ্টিবোর্ড আপিসে আজ ভারি হল্লা ছিল। মাস্টার সাহেব নৌকরিতে ইস্তফা দিয়ে সব ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা ডিষ্টিবোর্ডের

১ 'কাহহি যদি ন দেইয় দোষু'
কাউকে মিছে দোষ দিও না—(তুলসীদাস)

ঘড়িঘরের[১] সম্মুখে 'সাভা'[২] করতে এসেছিল। মুফীলুদ্দীন সাহেব মোক্তার আছে না, ঐ যে সব সময় আফিং খেয়ে ঢোলে, সে আজ কিতাব হাতে নিয়ে সদর[৩] হয়েছিল।

'সে হালুয়া![৪] মাস্টার সাহেবের...'

'ছুট্ গয়ী নৌকরি, সটক গয়া পান[৫]'

'কেন? মাস্টার সাহেবকে আবার পাগলা কুকুরে কামড়াল কেন?'

'নৌকরি থেকে সরকার নিশ্চয়ই বরখাস্ত করেছে। টাকা পয়সার ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে?'

বাবুলাল সকলকে বুঝিয়ে দেয়—না না ওসব কিছু নয়, মাস্টার সাব গানহী বাবার চেলা হয়েছে।

গানহী বাবা কে? গানহী বাবা?

'বড়া গুণী আদমী[৬]। বৌকা বাওয়া আর রেবণগুণীর চাইতেও 'নামী'। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে। গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে 'পরহেজ'[৭]। সাদি বিয় করেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল[৮]।'

বাঙ্গালী বাবু চিংড়ী মছলী খাবু। এত তকলীফ কি সইতে পরিবে?

জমি-জমা করে নিয়েছে বোধ হয়।

প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বাবুলাল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বহু রাত পর্যন্ত নানারকম কথা হয়। বাঙালীরা বুদ্ধিতে এক নম্বরের, কিন্তু একটু পাগলাটে গোছের। ঠিক সাহেবদেরই মতো। তবে তার চাইতে একটু কম বদরাগী ভয় ভয়ই করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। বিজনবাবু ওকিলের ঘরের খাপড় উল্টোবার সময় সেদিনও দেখেছি—জয়শ্রী চৌধুরী, ব্রাহ্মণ, অত বড় কিষাণ বিজনবাবু ওকিল ছুঁড়ে ফেলেছে তার কাগজ। একবার বসতে পর্যন্ত বলল না কে। কী রাগ! কী রাগ। চাক তো দেখি টিকিটবাবু রেলগাড়িতে

---

১ ক্লক টাওয়ার।

২ মিটিং, সভা।

৩ সভাপতি। ৪ আশ্চর্য।

৫ এটি একটি অতি চলিত কথা তাৎমাদের মধ্যে। 'চাকরিও গেল, পান খাওয়াও গেল।'

৬ গুণীন মানে যাদুকর।

৭ সংযমী।

৮ উলঙ্গ থাকে একেবারে।

বাঙালীবাবুর কাছে টিকট। তবে বুঝব। আর 'বাজা ছাজা কেস, তিন বাঙ্গালা দেস।'[১]

আজ সভায় সরকারকে, লাটসাহেবকে, বাদশাকে অনেক কথা শুনিয়েছে মাস্টারসাব।

ও কেবল 'কথার তুলো ধোনা', বলত দারোগা সাহেবের খেলাপে, তবে না বুঝতাম হিম্মৎ। বলত টমাস সাহেবের খেলাপে, তো গুলী মেরে উড়িয়ে দিত। চাঁদমারীতে মস্ত করা হাত ওর।

চেরমেন সাহেব কলস্টর সাহেবকে খবর দিতে গেলেন যে তাঁর হাত্তায় 'সাভা' করছে লোকে, মানা করলেও শোনে না।

তবে যে তুই বললি যে তোর চেরমেন সাহেব, কলস্টরের জায়গা নিয়েছে।

বাবুলাল এই বোকাগুলোর মূর্খতায় বিরক্ত হয়ে বলে—আরে সে তো কেবল ডিস্টিবোডে। জেলার মালিক তো কলস্টর আছেই।

'তাই তো বলি, কলস্টরের জায়গা কী করে নেবে।'

'কিন্তু চেরমেন সাহেব সেই যে গেলেন, আজও গেলেন কালও গেলেন। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত এলেন না—না কলস্টর, না সেপাই, না কেউ, আপিসের বাবুরা তাদেরই এস্তেজারিতে এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়ে বসে। তাইতেই তো এত দেরি।'

বাবুলালের খাওয়া হয়নি এখও। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে গল্পে গল্পে। সকলে উঠে পড়ে, সে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে। ঢোঁড়াই যেন বকুনি খাওয়ার পর থেকে এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। কেবল সেই লক্ষ্য করে যে, যে চামড়ার নাম করতে নেই, সেই চামড়ার গুদাম পাড়ার কাছে হওয়ার কথাটা, এই গোলমালে একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। ঐ বেড়ালের মতো গোঁফ বাবুলালটা কতকগুলো গল্প বলল তাতেই। গানহী বাওয়া রেবণগুণীর চাইতেও বড়, বৌকা বাওয়ার চাইতেও বড়, মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির মোহন্তর চাইতেও বড় এক নম্বরের গপ্পবাজ বাবুলালটা! 'ঝুটফুস'[২] বললেই হল।

গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন

'পাক্কীর'[৩] ধারের বটগাছে মৌমাছির চাক হয়তো কতকাল থেকে আছে, কেউ তাকিয়েও দেখেনি; কিন্তু একদিন যদি দেখে ফেলে সেটা, তাহলে

১ বাজা ছাজা কেস, তিন বাংগালা দেশ—বাদ্য, ঘরছাউনি, মাথার চুল (মেয়েমানুষের) এই তিনটি জিনিস বাংলাদেশের ভাল।

২ বাজে মিথ্যে। ৩ কোশী-শিলিগুড়ি রোড।

তারপর ওখান দিয়ে যতবার যাবে, নজরে পড়বে। গানহী বাওয়ার খবরের বেলায়ও হল এই রকমই! এমনি কেউ নামই শোনেনি। ঐ যে সেদিন রাতে বাবুলালের কাছ থেকে শুনল, তারপর কিছু দিন চলল নিত্যি নূতন খবর। মাস্টার সাবকে মসজিদের 'সাভায়' গ্রেফতার করেছে দারোগা সাব। পা ম্যাজ ম্যাজ করলেও গানহী বাওয়ার চেলাদের দৌরাত্ম্যে কালালীর[১] দিকে যাওয়ার উপায় নেই। চেলারা আজ কাছারীতে, কাল ছত্তিসবাবুর দোকানের সম্মুখে, কী বলে, কী করে, কী চেঁচায় কিছু বোঝাও যায় না। কত জায়গা থেকে কত রকম আজগুবি খবর আসে। এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা মনের মতো ভাবে জমল একদিন হঠাৎ। ভোরে বৌকা বাওয়া সবে হাতের দাঁতনটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ঢোঁড়াইটার ঘুম ভাঙিয়েছে, এমন সময় শোনা গেল রবিয়ার গলা ফাটানো চিৎকার। কী বলছে ঠিক বোঝা যায় না। বাওয়া ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়ির দিকে দৌড়োয়। রবিয়া পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, গানহী বাওয়া,—কুমড়োর উপর। পাগল হয়ে গেল নাকি, ভাঙের সঙ্গে ধুতরোর বীচি-টিচি খেয়ে। একদণ্ড দাঁড়িয়ে যে রবিয়া ঠাণ্ডা হয়ে কথার জবাব দেবে, তার সময় নেই ওর। রবিয়ার বাড়িতে ঢুকে দেখে যে, তাব উঠন ভরে গিয়েছে পাড়ার লোকে। নিচু চালের ছাঁচতলা থেকে একটা বিলিতি কুমড়ো ঝুলচে। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই খানটায়।

ঠিকই। যা বলেছে তাই। বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত[২] আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কী করা যায়? এরকম করে তো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। মহতো নায়েবরা বৌকা বাওয়াকেই সালিশ মানে। ঢোঁড়াইয়ের ভারি আনন্দ হয় যে মহতো এসব ব্যাপারে বাওয়ার চাইতে ছোট। কুমড়োটার বোঁটা কাটার অধিকার বাওয়াই পেল; বাবুলালও না, মহতোও না। বোঁটাটা কাটবার সময় উঠনভরা লোকের ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাওয়ার হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। ঢোঁড়াই ভাবে, সেদিন বাবুলাল মিথ্যে বলেনি, গানহী বাওয়া, বৌকা বাওয়ার চাইতেও গুণী। না হলে কুমড়োতে আসে!

১ মদের দোকান।
২ মূর্তি।

থানে কুমড়োটার পূজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে। সেদিন ঢোঁড়াইয়ের কী খাতির! বাওয়া পূজো নিয়েই ব্যস্ত। ঢোঁড়াইকেই করতে হল দৌড়োদৌড়ি পাড়ায়, বাজারে। সেদিন এরকম একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে, বাওয়া সকলের সম্মুখে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দিল। মালা গলায় দিলেই সে হয়ে যাবে 'ভকত'। আর কেউ তাকে ঢোঁড়াই তাৎমা কিংবা ঢোঁড়াই দাস বলতে পারবে না। সে আর কেউকেটা নয় এখন, তাঁকে বলতে হবে ঢোঁড়াই ভকত। বৌকা বাওয়ার সমান বড় হয়ে গিয়েছে সে, গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের দিনেই। তাকে আজ থেকে প্রত্যহ স্নান করতে হবে। আর অন্য চ্যাংড়া ছেলেদের মতো নয়, মাস মছলী থেকে পরহেজ[1]। গুদরকে দেখে ঢোঁড়াইয়ের মায়া হয় সেদিন; বেচারার গলায় কণ্ঠি নেই।

তারপর সেই গানহী বাওয়ার 'মূরত' বালা[2] কুমড়োটা মাথায় করে ঢোঁড়াই নিয়ে আসে মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে। পরনে সেই লাল কাপড়খানা। আগে আগে আসে ঢোঁড়াই আর পিছনে সব তাৎমারা। মহতো পর্যন্ত পিছনে।

ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছে তাদের সব উৎসাহ জল হয়ে যায়। মোহন্তজী বলেন, 'কী রে ঢোঁড়াই, তোর যে আর দেখাই নেই। যে ঠাকুরবাড়িতে রামসীতার মূরত আছে সেখানে গানহী মহারাজের 'মূরত' রাখা ঠিক নয়। তুলসীদাসজী তাই বলে গিয়েছেন।—চুথিয়া সরকার!…'

তুলসীদাসজীর নির্দেশ পর্যন্ত তাৎমারা বুঝতে পেরে ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে চুথিয়া সরকারের কী সম্বন্ধ, তা তারা ঠিক ধরতে পারেনি।

'মূরতটাকে' নিয়ে মহাবিপদ। এখন কী করা যায়! কি করা যায় ওটাকে নিয়ে! এমনভাবে মূরতের 'দর্শন' পাওয়া গিয়েছে। রাম সীতার পাশে যদি না রাখতে পারা যায়, তা হলে 'থানেই' বা 'গোঁসাইয়ের' পাশে কী করে রাখা যাবে? বাওয়া ঘাড় নাড়ে—সে তো হতেই পারে না। তবে উপায়? এ কী পরীক্ষায় ফেললে রামজী। এত কৃপা করে, আমাদের ঘরে এলে গানহী মহারাজ, আর আমরা তোমাকে রাখবার জায়গা দিতে পাচ্ছি না। থাকত টাকা সাহেবদের মতো, বাবুভাইয়াদের মতো, রাজ দ্বারভাঙ্গার মতো, দিতাম একটা ঠাকুরবাড়ি বানিয়ে, গানহী বাওয়ার জন্যে। ঠিকই বলে গিয়েছে তুলসীদাসজী—'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী'[3]। বাওয়ার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে। সারা জীবন তার ভিক্ষে করে কেটেছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও দুবেলা ভাত খেয়েছে বলে মনে

---

১ সংযমী: মাছ মাংস ছেড়ে দিতে হবে। ২ মূর্তি আঁকা।
৩ পৃথিবীতে দারিদ্র্যের মতো দুঃখ আর নেই (তুলসীদাস)।

পড়ে না। একবেলা 'জলপান', একবেলা ভাত—তাও জুটলে, এই তো সব তাৎমাই খায়। এ কেবল তার একার কথা নয়, তবুও 'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী' এই আবছা কথাগুলোর মানে, এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাপলরাজার ঐ 'পাখণ্ডী, চামড়াবালা' জামাই[1] গানহী বাওয়ার নামে সিন্নি দেওয়ার জন্য যে গুড়, আটা আর কাঁচকলা পাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তা অমনিই পড়ে থাকে।

এমন সময় রেবণগুণী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। আজকাল বিকালের দিকে গানহী বাওয়ার চেলারা 'কালালী'তে বড় জ্বালাতন করে। তাই সে দুপুরের দিকেই কাজটা সেরে আসে। সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ লোকমুখে গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের কথা শুনেছে সে। তাই সে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। টোপা কুলের মতো চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দৌড়ুবার মেহনতেও হতে পারে, আবার মদের জন্যও হতে পারে। সে এসে ঝুঁকে পড়ে কুমড়োটার উপর। অন্য কেউ হলে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠে তাকে আটকাতে যেত; কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা যে রেবণগুণীর মুখের উপর কিছু বলে। ঢোঁড়াইয়ের বুক দুর দুর করে ভয়ে। এই বুঝি গুণী মুরতটাকে একটা কিছু করে বসে—যা মেজাজ। তাৎমা মেয়েরা রেবণগুণীকে দেখে মাথায় কাপড় টেনে দেয়।

'ঠিকই তো। টৌনে যা শুনেছিলাম বিলকুল ঠিক। ঠিক! ঠিক! ঠিক! গানহী বাবা ফুটে বেরুচ্ছেন কুমড়োটার গায়ে। কেবল হাত পা-টা ওঠেনি—জগন্নাথজীর মতো।'

রেবণগুণী কুমড়োটাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, তারপর চিৎকার করে ওঠে, 'লোহা মেনেছি[2]; লোহা মেনেছি আমি গানহী বাওয়ার কাছে।'

অবাক হয়ে যায় সকলে। রেবণগুণী 'লোহা মেনেছে'! চাকের মৌমাছি নড়ে বসার মতো একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় দর্শকদের মধ্যে। রেবণগুণী যার 'লোহা মানে' সে তো প্রায় রামচন্দ্রজীর সমান। অত বড় না হোক, অন্তত গোঁসাই কিংবা ভানমতীর মতো জাগ্রত দেবতা তো বটেই।

মৃদু গুঞ্জন উঠবার আগেই গুণী আবার বলে ওঠে, 'আজ থেকে কোন্ হারামীর বাচ্চা কালালীতে গিয়ে গানহী বাওয়ার কথার খেলাপ করে। আজকে যা করে ফেলেছি, তার তো আর চারা নেই। কাল থেকে গানহী বাওয়া, পচই ছাড়া আর কিচ্ছু খাব না।' সে কেঁদে ফেলল বুঝি এইবার।

---

১ পাখণ্ড চামড়াওয়ালা। ২ পরাজয় স্বীকার করা।

'দেখে নিও মহতো।'

এইবার মহতো বর্তমান সমস্যার কথাটা তোলে।

গুণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়! গানহী বাওয়াকা জয় হো, বলে লাফিয়ে উঠে মাথার পাগড়িটা সামলে নেয়। বাওয়া ঢোঁড়াইকে বলে, যা তুই পৌঁছে দিয়ে আয় মুরতটা ওর বাড়িতে। সে ঠিক বিশ্বাস পাচ্ছে না গুণীটাকে। ঢোঁড়াইও সেই কথাই ভাবছিল। বাওয়া ঠিক তার মনের কথা বুঝতে পারে।

সে রাত্রে রেবণগুণীর বাড়িতে ভজনের আসর জমে—যা গ্রামের ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। ঢোঁড়াই 'ভকত' গানহী বাওয়ার নাম দেওয়া বটোহীর গান গায়। গুণী তার সঙ্গে তান ধরে। সে রেবণগুণীর সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে গানহী বাওয়ার দৌলতে।

পরের দিন সকালে কুমড়োটাকে কাপড় ঢেকে গুণী চলে যায় মেলায়। অনেক দিনের মদের খরচ সে রোজগার করেছিল যাত্রীদের কাছ থেকে ঐ মুরতটা দেখিয়ে। একটা করে পয়সা দিলেই, কাপড়ের ঢাকা তুলে কুমড়োটাকে দেখাত।

ঝোটাহা উদ্ধার

তাৎমাটুলির পঞ্চায়তিতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবৎ উঁচুদরের সন্ন্যাসী গানহী বাওয়া মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে। একবার কপিল রাজার জামাইটার সঙ্গে দেখা করাতে পারলে হয়, তাঁকে আনিয়ে। ওবে আসবে না রে আসবে না। মাস্টারসাবদের মতো বাবুভাইয়া চেলা থাকতে, তোদের এখানে আসবে না, না হলে চালার উপর এসে রবিয়ার ঘরে ঢোকেনি। থানের মতো ঘর-দুয়োর-আঙ্গন 'সাফসুৎরা' রাখতে পারিস তবে না সাধুসন্ত এসে দাঁড়াতে পারে। এ একটা 'মার্কা'র[১] কথা বলছিস বটে। সকলের কথাটা মনে ধরে। মরগামার গয়লারা রবিবারে গরু দোয় না। সেদিন তারা তাদের ঘর-বাড়ি সাফ করে, তারা সিরিদাস বাবাজীর চেলা কিনা। ধন্নুয়া মহতোর মাথায় ঢোকে যে আচ্ছা রবিবারে গানহী বাওয়ার নামে কাজে না গেলে বেশ হয়। রবিবার 'তৌহারের'[২] দিন। সরকার বাহাদুর পর্যন্ত কাছারী বন্ধ রাখে, চেরমেনসাহেব ডিস্টিবোড বন্ধ রাখে, পাদ্রীসাহেব দুধ বিলোয়—খৃষ্টান ধাঙড়দের। সকলেরই এ বিষয়ে খুব

১ কথার মত কথা। ২ পর্বের দিন।

উৎসাহ। রবিবারে কাছারী বন্ধ থাকায় বাবুভাইয়ারা বাড়িতে থাকে, আর যতক্ষণ তাৎমায়া তাদের বাড়িতে কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌ করে। অন্য কোনো কাজ নেই তো ঘরামির পিছনেই লাগে। ঢোঁড়াইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাঁধা ঘরগুলোতে রবিবারের দিনই ভিক্ষে দেয় বিশেষ করে যারা আধলা দেয় তারা। বৌকা-বাওয়া যে পঞ্চায়তিতে আসে না। সে এলে এর প্রতিবাদ করতে পারত। ঢোঁড়াইয়ের কথা তো কারও মনেই পড়েনি। ছোকরা ঢোঁড়াই দূর থেকে বলে, আমাদের 'পেট কেটো' না মহতো[১]। রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার। অর্বাচীনের ধৃষ্টতায় নায়েব মহতোরা অবাক হয়। এতটুকু ছেলে পঞ্চায়তির মধ্যে কথা বলতে এসেছে।

তুই আবার কন্ঠি নিয়ে 'ভকত' হয়েছিস না? গানহী বাওয়া বড় না তোর রোজগার বড়?

কোন্‌টা বড় ঢোঁড়াই সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করতে পারে না। কাঁচুমাচু মুখ করে সে বসে পড়ে। তার আর বাওয়ার রোজগারের কথাটা 'মুখিয়ারা'[২] একবারও তো ভাবল না; গানহী বাওয়া কর তাতে কিছু বলবার নেই, সে তো ঢোঁড়াই চায়ই, গানহী বাওয়া তো তারই দলের লোক; কিন্তু নিজের 'পেট কেটে' গানহী বাওয়া করা, এটা সে বুঝতে পারে না। রোজগারের কথাটা ঢোঁড়াই এই বয়সেই ঠিক বুঝেছে। বৌকা বাওয়া যতই ভাবুক না কেন যে ছোঁড়ার সেদিকে খেয়াল নেই।

ঢোঁড়াইয়ের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে পঞ্চায়তির ধনুয়া মহতো, আর বাবুলালটার উপর। কিন্তু তার বিষয় ভেবে পঞ্চায়তি এক মিনিটও সময় বাজে খরচ করতে রাজী না। ততক্ষণে একটা অনেক বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, সেখানে 'ঝোটাহা'দের নিয়ে। খালি রবিবারে আঙ্গন সাফ করলেই হবে না। ঝোটাহাদেরও একটু 'পাক সাফ'[৩] থাকতে হবে। মেয়েমানুষের জাতটাই এমন। হাজার বলেও ওদের দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।

কে কথা শুনবে না, কোন 'ঝোটাহা' শুনি! মাসে একদিন করে সব 'ঝোটাহা'দের স্নান করে 'পাক সাফ' হতে হবে। গাঁটের পয়সা খরচ করে বিয়ে করেছি না, না মাঙনা?

খোঁড়া চথুরী বসে ছিল দূরে। তার বৌ তার সঙ্গে থাকতে চায় না বলে মহতো নায়েবরা তার 'সাগাই'[৪] করে দিয়েছে ইসরার সঙ্গে। সে বলে

১ রোজগার মেরো না।
২ (মুখ্য শব্দ থেকে) মাতব্বর।
৩ পরিষ্কার ঝরিষ্কার।
৪ সাঙা।

মহতো আর ছড়িদার ইসরার কাছ থেকে টাকা খেয়েছে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, ঝোটাহাদের মাথায় চড়াও তো তোমরাই। 'পঞ্চ'রা যদি কড়া হয় একটু, তাহলে ঝোটাহাদের সাধ্যি কী যে তারা 'চুলবুল' করে। তার ভর দিয়ে চলার লাঠিটা মাথার উপর ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—'তাহলে একটু চালের থেকে বেচাল হয়েছে কি…।' আর একদিক থেকে চেঁচামেচি ওঠায় তার শেষের কথাগুলো, বোঝা যায় না, তবে খোঁড়া চথুরীর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো দেখে মনে হয় যে, সে একটা মারাত্মক রকমের ওষুধের কথা কিছু বলেছে। যেদিক থেকে গোলমালটা ওঠে, সেদিকে দেখা যায় কয়েকজন মিলে ইসরাকে ঠাণ্ডা করিয়ে বসাচ্ছে।

আরও কত রকমের প্রশ্ন ওঠে সেখানে। এত বড় একটা প্রশ্ন রেওয়াজের খেলাপ অমনি এক কথায় নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে না। সবচাইতে বড় প্রশ্ন ঝোটাহাদেব কাপড় শুকোবার। একখান করে তো কাপড; গরমের দিন না হয় গায়ে শুকোতে পারে। কিন্তু শীতকালে ?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়—মাসে একদিন স্নান মেয়েদের করতেই হবে। কোনো ওজর শোনা হবে না। 'গোঁসাই' হু-উ-উ, মাথার উপর আসবার পর, আর কোনো মরদ 'ফৌজ' ইঁদারার উত্তরে বাঁশঝাড়টার দিকে যেতে পারবে না—ওখানে 'ঝোটাহারা' কাপড় শুকোবে।

এরপর নিত্য নতুন কাণ্ড। আজব আজব খবর গানহী বাওয়ার। বৌকা বাওয়ারা দেখতে গেল কাঝা গণেশপুরে। ঢোঁড়াইকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না—সে অনেক দূর, সাতকোশ—অতদূর যেতে পারবি না তুই। তারপর তারা যখন বনভাগের সাঁকো পার হয়েছে, তখন দেখে যে ঢোঁড়াই ভকত লাল কাপড়খান পরে ছুটতে ছুটতে আসছে পিছন থেকে। কী জেদী ছেলে রে বাবা! ঢোঁড়াইকে জিরোবার ফুরসত দেবার জন্য বাওয়াকে কুলগাছতলায় বসতে হয়। তারপর কাঝা গণেশপুরের বেলগাছটার তলায় পৌঁছে দেখে যে, যা শোনা গিয়েছিল ঠিক তাই। প্রকাণ্ড বেলগাছের মগডালের পাতা তিরতির তিরতির করে নড়ছে—তিনটে করে পাতা একসঙ্গে। পাতাগুলোয় কী যেন লেখা লেখার মতোই লাগে। ঠিকই গানহী বাওয়ার নাম। জয়, জয় হো! নয়ন সার্থক, জীবন সার্থক বাওয়ার আজ। ঢোঁড়াই-এর এত কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। জয় হো গানহী বাওয়া। তোমার নামের গুণেই না এত লোক বেলগাছটার ডালে ডালে হুঁকো বেঁধে দিয়ে গিয়েছে। ঐ বেলতলার ধুলো ঢোঁড়াই লাল কাপড়ের খুঁটে করে বেঁধে নিয়ে আসে।

পরদিন ভোরে 'থানে' পৌঁছেই, না মুখ ধোয়া না কিছু, বাওয়া তার

নিজের কল্কেটা ঢোঁড়াইকে চড়িয়ে দিল মহতোর বাড়ির পাশের 'বরহমভূতবালা'[1] বেলগাছটায়। ঢোঁড়াই বেলগাছে বাওয়ার হুঁকোকল্কেটা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে এল।

তামাক না খেয়ে সেদিন বাওয়ার কী ছটফটানি! ঢোঁড়াই বুঝতে পেরে চুপটি করে বাওয়ার পাশে বসে থাকে। দুদিন রোজগার নেই, ঝুলি খালি। মেটে আলুর গাছের মতো এক রকম লতার, ওলের মতো কন্দ ধাঙড়রা খায়। ঢোঁড়াই তাদের কাছ থেকেই শিখেছে যে, ওই আলুগুলোকে চুন দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তার তেতোটা কেটে যায়। এগুলো অযচ্ছল পাওয়া যায় আলের আশেপাশে, অথচ তাৎমারা ওকে বলে বিষ! ঢোঁড়াই অনেকক্ষণ ধরে ঐ আলু সিদ্ধ করে। সময় আর কাটতেই চায় না। অথচ আজকের মতো দিনে বাওয়াকে ছেড়ে দূরে থাকতে ঢোঁড়াইয়ের মন সরে না। বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারা করে বলে—তোর ভালই হল,—আর আমার জন্য তোর তামাক সাজতে হবে না। বাওয়া মড়ার মতো শুয়ে পড়ে থাকে। ঢোঁড়াইয়ের বড় মায়া হয় বাওয়ার উপর! নিশ্চয়ই গা হাতপা আনচান করছে। পা-টা একটু টিপে দি। বাওয়া আপত্তি করে না, বরঞ্চ বলে, গায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে।

বাওয়ার গা টিপে দিতে দিতে কেন যেন ঢোঁড়াইয়ের দুখিয়ার মা'র কথা মনে পড়ে। বেশ হত সে যদি বাওয়ার পা টিপে আরাম করে দিত। তার অসুখের সময়ের সেই রাত্রের কথা মনে আসে। দুখিয়ার মা, বাবুলালের মাচায়, ওই বিড়ালের মতো গোঁফওয়ালা বাবুলালের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে—শালা নবাব···

'পরণাম বাওয়া!'

'মহতো যে! হঠাৎ রাতে যে! ছড়িদারকেও সঙ্গে দেখছি!'

'এই সঙ্গত করতে এলাম। খুব ছেলের সেবা খাচ্ছ।'

ঢোঁড়াই লজ্জিত হয়ে যায় বাওয়ার চাইতেও বেশি—বাওয়ার গায়ের উপর পা দিতে বাইরের লোকে দেখে ফেলেছে বলে। চেলাতে দেবে গুরুর গায়ে পা! কালই হয়তো মহতো এই নিয়ে দশ কথা বলবে লোকের কাছে।

বাওয়া লজ্জিত হয়ে উঠে বসে। ছড়িদার আর মহতো বিনা মতলবে খানে আসার লোক নয়।

ঢোঁড়াই লজ্জা কাটানোর জন্য বলে,—আজ তামাক না খেয়ে বাওয়ার শরীরটা অস্থির অস্থির করছে। মহতো রসিকতা করে বলে, 'আর তোর?'

১ ব্রহ্মদৈত্য থাকেন যে গাছে।

'আমি পেলে একটান মারতাম। না পেলে পরোয়া নেই।'

মহতো দুঃখ করে বলে আমারই হয়েছে বিপদ। তামাক বিড়ি না খেলে এক ঘণ্টাও চলে না। বুঝি অতি খারাপ জিনিস তামাক। তার উপর আজকাল আবার শুনছি অনেক জায়গায় গরুর রোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে তামাকে…বলেই সে বারকয়েক কেশে থুতু ফেলে—যেন তার গলায় একটা রোঁয়া তখনও লেগে রয়েছে…

'ছড়িদার' বলে—'বুঝি তো সব। রামজীর দেওয়া শরীর, তামাকের পাতা দিয়ে তৈরি কোনো রকম জিনিস, নিতে চায় না। খয়নি খাও—থুথুর সঙ্গে ফেলে দিতে হবে; নস্যি নাও, নাক ঝেড়ে ফেলতে হবে; জর্দা খাও, পানের পিচ ফেলতে হবে; তামাক সিগ্রেট খাও, ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে হবে। এ হারামজাদার নেশা কিন্তু—ছাড়তে—পারব না। বাওয়া, তোমারও আগে সাতদিন কাটুক তারপর বুঝব।'

'সুরাজ (স্বরাজ) অত সোজা না' বলে মহতো তামাকের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দেয়।

তারপর মহতো আসল কাজের কথাটা পাড়ে।—তাদের ইচ্ছে 'ভকত' হবার।

মহতো 'ভকত' হওয়ার সুবিধে অসুবিধে বেশ ভাল করে খতিয়ে দেখেছে। প্রথম অসুবিধে মাছ মাংস খেতে পাবে না। মাংস তো এক ভেড়া বলির দিন খায়—মাছ ন'মাসে-ছ'মাসে মরণাধারে জল এলে হয়তো এক আধবার জুটে যায়। কাজেই ওটা বড় কথা নয়। প্রত্যহ স্নান করা—এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কষ্টটুকু সে স্বীকার করতে রাজী আছে। একমাত্র সত্যিকারের অসুবিধা যে, সে ভকত ছাড়া আর কারও বাড়ি ভোজে কাজে খেতে পারবে না। কিন্তু এর বদলে সে পাবে অনেক কিছু। লোকের চোখে সে বড় হয়ে যাবে। এমনিই মহতো, ছড়িদার নায়েবদের সম্বন্ধে লোকে কিছুদিন থেকে অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এ জিনিস আগে ছিল না। ঐ তো সেদিন খোঁড়া চথুরী পঞ্চায়তির মধ্যে চেঁচিয়ে কী সব বলে দিল। খারাপ হাওয়ার দিন আসছে। মহতো নিজের জায়গা আরও একটু মজবুত করতে চায়। বছরে একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহলে মহতোগিরি থেকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে তার সমাজে পসার প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে; চাইকি সে তার আগের মহতো ঝুহুলালের সমান হয়ে যেতে পারে খ্যাতিতে।

তাই তারা এসেছে বাওয়ার সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে।

ঢোঁড়াইয়ের কথাটা একটুও ভাল লাগে না। এ যেন তাদের ঘরের জিনিসে বাইরের লোক হাত দিচ্ছে। রবিবারে রোজগার বন্ধ করবার সময় বাওয়ার সলার দরকার ছিল না, আর এখন নিজের গরজ পড়েছে, আর দরকার হয়েছে বাওয়ার সলার। বাওয়া যদি না বলে দেয় তো বেশ হয়।

বাওয়া আবার অদ্ভুত ধরনের 'জীব'। সে খুব খুশি হয় ছড়িদার আর মহতোর প্রস্তাবে। তাদের পিঠ চাপড়ে হেসে অস্থির। আঙুলের কর গুনে, আকাশের দিকে দেখিয়ে, মাথার চুল দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেয়, রবিবারে সকালে স্নান করে এলেই, বাওয়া তাদের গলায় তুলসীর মালা দিয়ে দেবে।

ঢোঁড়াই বাওয়ার উপর রাগে গজরায়; ওঁর আবার পা টিপে দেবে! মহতোর মতো লোক ভকত হলে আর সে চায় না ভকত থাকতে।

তাৎমা ধাঙড় সংবাদ

ঢোঁড়াই ঠিক বোঝে না গানহী বাওয়াকে। মহতো আর ছড়িদার ভকত হবার পরদিনই দেখা গেল, গানহী বাওয়া তাদেরই উপর সদয়, ঢোঁড়াইয়ের উপর নয়।

সকালে স্নান করেই মহতো আর ছড়িদার তাৎমাটুলির মোড়ের উপর খানিকটা জায়গা বেশ করে লেপতে বসে, গোবর দিয়ে। সেখানে রাখে একটা ঘটি। তারপর ঘটিতে খানিকটা জল ঢেলে দেয় মহতো। রতিয়া 'ছাড়িদার' ঘটির উপর গামছা ঢাকা দিয়ে তিনটে তুলসীপাতা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহতো মনে মনে গানহী বাওয়ার মন্তর পড়তে থাকে।

প্রণাম করে গামছা সরানোর পর দেখা গেল যে, গানহী বাওয়া ঘটির জলে এসেছেন; জল বেড়ে গিয়েছে; ঐ তো বেড়ে গিয়েছে, চোখে দেখছিস না। দু আঙুল তো জল ঢালা হয়েছিল মোটে। সত্যিই তো! ছুঁস না ছুঁস না ঘটি; ও জল আবার সৌরা নদীতে দিয়ে আসতে হবে।

ঢোঁড়াইয়ের হিংসে হয় মহতো আর ছড়িদারের উপর। তারা ভকত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানহী বাওয়াকে আনাচ্ছে। সে নিজেও চুপি চুপি খানে চেষ্টা করে দেখে। কিন্তু তার ঘটিতে গানহী বাওয়া আসেন না—জল সেই যেমন তেমনিই আছে। গাহনী বাওয়ার এই একচোখোমি তার মনে বড় আঘাত দেয়। কিন্তু সে একথা প্রকাশ করতে পারে না কারও কাছে; তার 'ভকত'গিরির তাকৎ নেই, একথা লোকে জানলে, সে ছোট হয়ে যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সেদিনকার প্রার্থনা বোধ হয় গানহী বাওয়া শোনেন।

মহতো আর ছড়িদারকে ধাঙড়রা 'আচ্ছা রকম' বেইজ্জত করে। রবিবারের দিন দুপুরে মহতোর দল গিয়েছিল, নতুন তুলসীর মালা দেখাতে ধাঙড়টুলিতে। ধাঙড়দের সঙ্গে আসল ঝগড়া তাৎমাদের রোজগার নিয়ে। তারা সব কাজ করতে রাজী। তার উপর সাহেব পাদ্রী, বাবুভাইয়ারা, কপিল রাজা সকলেই ছিল তাদের দিকে। কপিল রাজার জন্যে বড় শিমুলগাছগুলো একেবারে নির্মূল করে দিয়েছিল তারা। লড়ায়ের আমলে লা-র জন্য কুলের ডাল কাটত কপিল রাজার জন্য তারাই। শুয়োরখোর, মুর্গীখোর লোকগুলোকে গানহী বাওয়ার নামে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়েছিল দুই নতুন 'ভকত'। গিয়েই তাদের বলে যে, তোদের শুয়োর-মুর্গী ছাড়তে হবে—গানহী বাওয়ার হুকুম মাস্টারসাবও সসুরায়[১] থেকে বেরিয়ে বলেছে। জয়সোয়াল সোডা কোম্পানিতে কাজ করে বুড়ো এতোয়ারী। সে ফোকলা দাঁতে হেসেই কুটি কুটি। আরে গানহী বাওয়া তোদের 'খত'[২] দিয়েছে নাকিরে? তাহলে ডাকপিয়ন এসেছে বল, তোদের পাড়ায়। শনিচরা ধাঙড় বলে—'সে ডিগি ডিগি! তাই বল! মহতো 'ভকত' হয়েছিস। ছড়িদারও দেখছি তাই। 'বিল্লি ভকত আর বগুলা ভকৎ'![৩] তাই গানহী বাওয়ার হুকুম ফলাতে এসেছিস। পরশুও তো ছড়িদারকে 'কলালীতে'[৪] দেখেছি সাঁঝের পর।'

'মিছে বলিস না খবরদার! জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

'আয় না মরদ দেখি।'

এতোয়ারী শনিচরাকে চুপ করতে বলে। তারপর মহতোকে পরিষ্কার বলে দেয় যে, সাহেব-মেমদের কাছে শুয়োরের মাংস, আর মুর্গীর ডিম বেচে তাদের পয়সা রোজগার হয়। গানহী বাওয়া যদি আমাদের 'পেট কাটেন,' তাহলে তিনি তোমাদেরই থাকুন! আর 'পচই' আমাদের পুজোয় লাগে; ও ছাড়তে পারব না। মাস্টারসাব 'বাবুভাইয়া' লোক। তাঁদের যা করা সাজে আমাদের তা করা সাজে না। ঐ যে সেবার 'টুরমন'-এর তামাশা[৫] হল বিকটিহার মাঠ ঘিরে, তাতে যে রংরেজ জার্মান লড়াই[৬] হল;—আমাদের ভিতরে যেতে দিয়েছিল? তোদের যেতে দিয়েছিল? 'গিরানী'র দোকানের[৭]

১ শ্বশুরবাড়ি; এখানে জেলখানা।
২ চিঠি।
৩ বিড়াল তপস্বী আর বকধার্মিক।
৪ মদের দোকান।
৫ ১৯৪৭ সালে কয়দিনব্যাপী একটি উৎসব হয় জিরানিয়াতে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রচারের জন্য। এর নাম ছিল ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট থেকে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়।
৬ টুর্নামেন্টে ইংরাজ-জার্মানদের mockfight হয়েছিল।
৭ যুদ্ধের সময়ের গভর্নমেন্ট স্টোরস: এখানে শস্তায় জিনিস পাওয়া যেত।

শস্তা চাল, তোদের দিত সে সময় ? এস. ডি. ও. সাহেবের সরকারী কাছারির দোকানের 'লাট্টু মার', আর পেয়ারা মার্কা 'রেলী'[1] আমাদের দিয়েছে কোনো দিন ? আর রোজ স্নান করা,—তোরা আজ 'ভকত' হয়ে করছিস। আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত চিরকাল প্রত্যহ স্নান করে এসেছে। মহতো আর তার দল চটে আগুন হয়ে যায়। আমাদের মেয়েছেলেদের উপর ঠেস দিয়ে কথা। ঐ মেমসাহেব—ধাঙড়নীদের দিস পাঠিয়ে সাহেবটোলায়, আর ঐ মুসলমানদের বাড়িতে, যাদের সঙ্গে মিলে তোরা শিমুলগাছগুলো সাবড়ে দিয়েছিস। পাঠিয়ে দিস শনিচার বৌটাকে, মলি সাহেবের পাকা চুল তুলে দিতে।

তুলমারী কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যায়। কারও কথা বোঝা যায় না হট্টগোলের মধ্যে। তাৎমাদের সজীব গালির তোড়ে ধাঙড়রা থই পায় না। শেষকালে একরকম দিশাহারা হয়েই তারা তাৎমাদের তাড়া করে। চিরকালের অভ্যাসমতো আজও তাৎমারা পালায়। সোজা 'পাক্কী'র দিকে, লাঠি ফেলে, টিকি উড়িয়ে, পাক্কীর হোঁচট খেয়ে ; পালা পালা ! তারপর রাস্তা পার হয়ে, তারা পাক্কীর তাৎমাটুলির দিকের গাছের সারির নিচে,—রাস্তার মাটিকাটার গর্তের মধ্যে দাঁড়ায়। এখানে আবার নতুন 'মোর্চাবন্দী' করে[2] তারা গালাগালির লড়াই আরম্ভ করে। ধাঙড়রা হাসতে হাসতে ফিরে যায়। তাদের চিরকালের নিয়ম, তারা পাক্কী পার হয়ে গিয়ে কখনও তাৎমাদের সঙ্গে মারপিট করে না। কেবল চিৎকার করে বলে যায়' হাভেলী পরগনায়[3] পৌঁছে দিয়েছিল সঙ্গে করে। 'সিন্নুর' লাগাস, 'সিন্নুর'[4]। দুই ভকতে। 'বিল্লি ভকৎ আর বগুলা ভকৎ। দুজনের গলার হার দুটো দেখাতে ভুলিস না বোটাহাদের।' তারপর ধাঙড়রা ফিরবার সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, শালাদের রক্তের ঠিক আছে ? সন্ধ্যার সময় দেখিস না কত বাবুভাইয়ারা, তাৎমাটুলির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করে। সাহস আসবে কোথা থেকে ? সব রক্ত পানি হয়ে যাচ্ছে। হত আমাদের টোলা, দিতাম বাবুদের মজা টের পাইয়ে। বাবুভাইয়ারা মিহি চালের ভাত খায়, গরু দেখলে ভয় পায়।

১ লাট্টু মার্কা আর পেয়ারা মার্কা র‍্যালি ব্রাদার্সের কাপড়।

২ ব্যূহ রচনা করে।

৩ রাস্তার এ পারটা পড়ে হাভেলী পরগণাতে : আর হাভেলী কথাটার অর্থ অন্দর মহল, এই নিয়েই ধাঙড়রা বিদ্রূপ করে।

৪ সিঁদুর।

শনিচরা বলে, 'বিয়ের আগে আমিও তো কত বাবুভাইয়ার বাড়ি ভাত খেয়েছি! এত সাদা চাল! একদম মিঠা না। সেরভরের কম ও চালে পেটই ভরে না। তারপর এক লোটা জল খাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ফুস্-স্স্।' বলে সে একটি তুড়ি দেয়।

একমাত্র শুক্রা ধাঙড় এই অনধিকার চর্চার প্রতিবাদ করে। 'জানিস, মিহি চাল খেলে বুদ্ধি খোলে। ঐ মিহি চালের জোরেই বাবুভাইয়ারা গেলে হাকিম বসতে 'কুসি' দেয়। তোকে আমাকে দেয়? তাৎমাদের দেয়? এইসব টোলায় ডাকপিয়ন আসে চিঠি নিয়ে? যা রয় সয় তাই বলিস।'

তাৎমা খেদানোর উল্লাসের মধ্যে শুক্রা কী সব বাবুভাইয়াদের কথা এনে সমস্ত জিনিসটাকে তেতো করে তুলেছে।

বুড়ো এতোয়ারী লাল চাল খেলেও বেশ বুদ্ধিমান। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে বলে, 'চল চল। সিঙ্গাবাদ থেকে শনিচরা নতুন মাদল এনেছে। মুচিয়ার মাদল কোথায় লাগে এর কাছে। চল শীগ্‌গির খেয়ে দেয়ে বাবা গাছের তলায়। ঘুঁটে ধরিয়ে আনতে ভুলিস না শনিচরা। শীগ্‌গির।'

বিরৌলীকে হাটিয়া—আ—
দৌড়ে নৌকানিয়া—আ—
ঠস ঠস রে বোলে বুনিয়া—আ-আ-আ-আ...[১]।

জলদিয়ে জলদি!

সামুয়রের ভৎ'সনা

ঢোঁড়াই বড় হয়ে উঠেছে। আর সে তাৎমাটুলির অলিতে গলিতে 'কনৈল' খেলার ঘুচ্‌চী'[২] কাটে না, বাঁশের চোঙের মধ্যে দরদময়দার ফল দিয়ে বন্দুক ফোটায় না, মোরব্বার[৩] পাতা দিয়ে ঘর ছাইবার খেলা খেলে না। ও সব বাচ্চারা করুক। সে এখন মোহরমের সময় ফুদীসিংয়ের দলে 'মাতুম' যায়[৪] তুল তুল ঘোড়ার মেলায়—

হিন্দু মুসলমান ভাইয়া, জোরহু রে পীরিতিয়া রে ভাই,
হায় রে হায়![৫]

---

১ ধাঙড়দের দ্রুততালের গান। বিরৌলীর হাটে দৌড়চ্ছে দোকানদার, বোঁদে (মিঠাই) থেকে ঠস্‌ঠস্ হচ্ছে।

২ কন্দেফুলের বীচি দিয়ে খেলার জন্য গর্ত।

৩ aloe—আনারসের মতো পাতা দেখতে।

৪ মহরমের শোকের গীত—এর প্রতি লাইনের শেষে, হায়রে হায়, কথা কয়টি থাকে।

৫ হিন্দু-মুসলমান ভাই, প্রীতির বন্ধনে বাঁধোরে ভাই, হায়রে হায়।

বর্ষা শেষ হলেও যেমন মরণাধারে জল থেকে যায়, গানহী বাওয়ার হাওয়া পড়ে আসবার পরও সেই সময়ের রেশ রেখে যায় এই মাতুমগানে।

মরগামার তাৎমাদের 'ঝুগিরা'[1] নাচের দলে তাকে নিয়ে টানাটানি। মরগামার ওরা 'মুঙ্গেরিয়া তাৎমা', আর তাৎমাটুলির তাৎমারা, 'কনৌজিয়া তাৎমা'। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা জাতে ছোট বলে, তাদের সঙ্গে এত মাখামাখি —তাৎমাটুলির লোকেরা পছন্দ করে না।

কিন্তু, ও ছোঁড়া কি কারও কথা শুনবে। ধাঙড়টুলির 'কর্মাধর্মার' নাচের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে বসে আছে। ধাঙড়টুলিতে বাওয়াই ছাড়ল না—অন্য জায়গায় যাওয়া ছাড়ল কি না ছাড়ল—তাতে কী আসে যায়।

বাওয়া মনে মনে এক বিষয়ে খুশি যে, ধাঙড়টুলি থেকে আম, লিচু নানারকম ফল ঢোঁড়াই নিয়ে আসে—এমন এমন জিনিস যা তাৎমারা কোনোদিন দেখেওনি। ধাঙড়রা সাহেবদের বাগান থেকে এই সব কলম চুরি করে এনে লাগিয়েছে। তারা তাদের সনবেটাকে[2] খাওয়ার জন্য দেয়। ঢোঁড়াই আবার সেসব, পাড়ার তার দলের ছেলেদের এনে দেয়, বাওয়ার জন্যে রেখে দেয়। কার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের আলাপ না। 'কালো ঘাগরাওয়ালী' পাদ্রী মেম যিনি ধাঙড়টুলিতে আসেন, তার সঙ্গে পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের আলাপ।

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের সব দোষ সহ্য করে যায়, কিন্তু ঐ রোজগারে বার হওয়ার সময় যে অধিকাংশ দিনই তার টিকি দেখার জো নেই, এ জিনিসটা সে সহ্য করতে পারে না। ভিক্ষের রোজগারে ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব অন্যর কাছে, এটুকু বাওয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেইজন্যই বাওয়ার চিন্তা সব চাইতে বেশি। ভোরে উঠেই ছোঁড়া পালিয়েছে। তার বন্ধুরা তো সব রোজগারে বেরিয়েছে, ওটা কোথায় থাকে, কী করছে এখন, বাওয়া কিছুই ঠিক করতে পারে না। ঢোঁড়াই হয়তো তখন মরণাধারের কাঠের সাঁকোটির উপর পা ঝুলিয়ে বসে বকের পোকা খাওয়া দেখছে। মন উড়ে গিয়েছে কোথায় কোন স্বপ্নরাজ্যে···বিজা সিং চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন কুয়াশার বাষ্পের মধ্যে দিয়ে··অসংখ্য জোনাকি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে অন্ধকারে···সে তার চাইতেও জোর চালাবে রেলগাড়ি···কোথায় চলে যাবে এঞ্জিনের 'সিটি' দিতে দিতে। বাওয়ার দেখাশুনা করবে দুখিয়ার মা;—না ও মাগীর দায় পড়েছে।···বিজা সিং যদি তরোয়াল দিয়ে দুখিয়ার মা আর বাবুলালকে কেটে ফেলে।···

১ একপ্রকার গ্রাম্য গীতিনৃত্য।

২ ধর্ম-ছেলে :

এমনভাবে বকগুলো পা ফেলে যে, দেখলেই হাসি আসে—'বগুলা চুনি চুনি খায়'[1]...ময়না বার 'লম্বী গোয়ারিন'[2] যাচ্ছে ঐ দূরে পাকীর উপর দিয়ে। গুঁটকো হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দিয়েছে—বোধ হয় রাস্তায় কাদা, ঠিক বকের চলার মতো করে চলছে...'গে-এ এ...লম্বী গোয়ারিন! বগুলা চুনি চুনি খায়।' বলে ঢোঁড়াই নিজেই হাসে। লম্বী গোয়ারিন এদিকে তাকায়—বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারে না। হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে টৌলে।... বকটা ঘাড় কাত করে অতি মনোযোগের সঙ্গে কী যেন একটা গর্ত না কী লক্ষ্য করছে। ভিক্ষা পাওয়ার পর চলে আসবার সময়, বাওয়াও ঠিক অমান করে, এক মুঠো চাল হাতে নিয়ে, ঘাড় কাত করে দেখে—চালটি ভাল না খারাপ। চাল খারাপ হলে বাওয়ার মুখ অমনি অন্ধকার হয়ে ওঠে। সে চাল কটিকে ঝুলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে, জোরে জোরে পা ফেলতে আরম্ভ করে। ত্রিশূলের সঙ্গে লাগানো পিতলের আংটাটা ঝমড় ঝমড় করে বাজে। ঢোঁড়াইয়ের মুখ দুষ্টুমির হাসিতে ভরে ওঠে।...

ছাই রঙের ডানাওয়ালা বকগুলিকে সাদা বকরা নিশ্চয়ই দেখতে পারে না। বাবুভাইয়ারা কি তাৎমা ধাঙড়দের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ছাই রঙের ডানা হয়েছে বলে কি তার 'হুক্কা পানি'[3] একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। 'বগুলা ভকৎ'[4] দেখতে ঐ ভাল মানুষ, কিন্তু তার পেটে পেটে শয়তানি!

'আরে বগুলা ভকৎ কী করছিস, বকের মতো ঠ্যাং ঝুলিয়ে?'—সামুয়র হাসতে হাসতে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে।

ঢোঁড়াই চমকে উঠেছে। সামুয়রটা কোন দিক থেকে এসে গেল, ঢোঁড়াই অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করেনি এতক্ষণ! এই খাঁকির হাফপ্যান্টি পরা কিরিস্তান ধাঙড় ছেলেটা কি 'গুণ'[5] জানে নাকি। না হলে হঠাৎ তাকে বগুলা ভকৎ বলে ডাকল কেন? সেও যে ঠিক ভকতের কথাটাই ভাবছিল। ঐ পাদ্রী সাহেবের 'টাট্টু'[6] সামুয়রটা কি তাকে এক দণ্ডও নিরিবিলিতে থাকতে দেবে না তার আসল নাম স্যামুয়েল, বয়সে ঢোঁড়াইয়ের চেয়ে-দু-এক বছরের বড়; ফুটফুটে ফরসা, নীল চোখ, কটা চুল, মুখে বিড়ি, চোখেমুখে কথা, দরকারের চাইতে বেশি চটপটে; শুয়রের কুঁচির মতো খাড়া অবাধ্য

১ বক বেছে বেছে খায়। ২ লম্বা গয়লানী।
৩ হুঁকো জল। এর অর্থ একঘরে করা।
৪ বকধার্মিক। ৫ ইন্দ্রজাল।
৬ আদুরে গোপাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থ টাট্টু ঘোড়া।

চুলগুলিতে জবজবে করে সরষের তেল মেখে টেড়ি কেটেছে। জেমসন সাহেব নীলকুঠিবহুল জিরানিয়াতে, নীলকুঠির পড়তি যুগে একটা পাউরুটির কারখানা খুলেছিল। পরে সে স্নানের ঘরে, ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে। তার ভিটের মিষ্টি কুলের গাছটা তাৎমা আর ধাঙড় ছেলেদের লোভ আর ভয়ের জিনিস। মিষ্টি ফলের তুলনা দিতে গেলেই তারা বলে, 'গলাকাটা সাহেবের' হাতার কুলের মতো মিষ্টি। দিনের বেলাতেও রাখাল ছেলেরা একলা সে গাছের তলায় বসতে ভয় পায়। সেই 'গলাকাটা' সাহেবের মেমকে পাউরুটি তৈরী করতে সাহায্য করত, সামুয়রের দিদিমা। 'গলাকাটা সাহেব' পান খেত, গড়গড়া টানত। সামুয়রের দিদিমার স্নানের জায়গার জন্য চুনার থেকে নৌকোয় করে একটা চৌকোণা পাথর এনে দিয়েছিল। সেটা এখনও পড়ে আছে সামুয়রদের বাড়ির উঠোনে। কালো ঘাগরাওয়ালী পাদ্রী মেম, ধাঙড়টুলিতে এলে, ঐ পাথরখানার উপরেই তাঁকে বসতে দেওয়া হয়।

আবলুসের মতো কালো সামুয়রের দিদিমার যখন ফুটফুটে মোমের মতো রঙের মেয়ে হয় তখন সেইজন্যে কেউ আশ্চর্য হয়নি।

সামুয়রও পেয়েছে মায়ের রঙ।

'কিরে বগুলা ভগৎ, আজকে রবিবার। আজ যে বড় বোকা বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুসনি?'

প্রশ্নটিতে ঢোঁড়াইয়ের যেন একটু অপমান অপমান বোধ হয়।

'কারও চাকরও না, কারও পয়সাও ধার করিনি! তোদের মতো তো নয় যে, আজকে গির্জায় যেতেই হবে, নইলে পাদ্রী সাহেব দুধ বন্ধ করে দেবে।'

'আরে যা যা! 'লবড় লবড়'[১] বলিস না। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষে করার চেয়ে পাদ্রী সাহেবের দেওয়া দুধ নেওয়া ঢের ভাল।'

'মুখ সামলে কথা বলিস। চুকন্দর[২] কোথাকার। সাধু সন্তকে কি লোকে ভিক্ষে দেয় নাকি? ও তো গেরস্তরা রামজীর হুকুমমতো সাধুদের কাছে নিজেদের ধার শোধ করে। না হলে বাওয়া কি 'বরমভূত'কে দিয়ে ঝরণাধারের নিচে থেকে আশরফির ঘড়া বার করতে পারে না।'

'থাক থাক, তোর বাওয়ার মুরোদ জানা আছে। সেবার যখন টোলায় পিশাচের উপদ্রব হল, কোথায় ছিল তোর বাওয়া। রেবণগুণী 'তুক' করে, যেই না বালি ছুঁড়ে 'বাণ' মারা[৩] অমনি সেটা একটা বিরাট বুনো মোষ হয়ে

১ বাজে বকা। ২ বীটপালং।

৩ যাদুবিদ্যার প্রক্রিয়া বিশেষ।

কাশবনের মধ্যে থেকে মরণাধারে ঝাঁপ দিল। তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করিস তোদের মহতোকে।'

এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে আর ঢোঁড়াইয়ের তর্ক চলে না, কিন্তু বাইরের লোকের মুখে বাওয়ার নিন্দা সে কখনই সহ্য করতে পারে না।

'থাম, থাম। ফের ছোট মুখে বড় কথা বলবি তো, পিটিয়ে তোর সাদা চামড়া আমি কালো করে দেব। গির্জেতে যে টুপিতে করে পয়সা নিস তার নাম কী? তুই নিজেই তো দেখিয়েছিস।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে সব শালা তাৎমাদের।'

'বিল্লির মতো চোখ, কিরিস্তান, তুই জাত তুলে গালাগালি দিস্।' ঢোঁড়াই সামুয়রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'আর বলবি? বলবি? বল।'

সামুয়রকে 'না' বলিয়ে তবে ঢোঁড়াই তাকে ছেড়ে দেয়। সামুয়র যেতে যেতে গায়ের ধুলো ঝাড়ে—আর যাওয়ার সময় বলে যায় যে আজ রবিবার না হলে দেখিয়ে দিতাম।

এ ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা; কিন্তু অন্য তাৎমার মতো সে গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে না, আর ঝগড়া একবার আরম্ভ হয়ে যাবার পর সে পালায়ও না।

পঞ্চায়েত কাণ্ড

দুখিয়ার মায়ের খেদ

অনেকে দুখিয়ার মা না বলে, বলে 'বাবুলালকা-আদমী'[১]। কথাটা খুবই ভাল লাগে দুখিয়ার মা'র, বিশেষ করে যখনই আপিসের উর্দিপাগড়ি পরা বাবুলালের চেহারা তার মনে আসে। এমন মানায় এ পোশাকে বাবুলালকে। বুধনী ভাবে পাড়ার সকলে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। দুখিয়ার মাকে রোজগার করতে হয় না বলে সত্যিই পাড়ার মেয়েরা তাকে হিংসে করে। এত লোকের বিষের নজর এড়িয়ে দুখিয়াটা বাঁচলে হয়! বড় হলে সেও আবার উর্দিপাগড়ি পরে, বাবার জায়গায় কাজ করবে। ও কাজের কি সোজা ইজ্জৎ! দুখিয়ার মা বাবুলালের কাছে শুনেছে যে, চেরমেনসাহেবের ঘরে,—না না চেরমেনসাহেব বললে আবার আজকাল বাবুলাল চটে. আজকাল বলতে হবে রায়বাহাদুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাম বদলালে আর মনে না থাকার দোষ কী?—যে রায়বাহাদুরের ঘরে ঠিকেদার সাহেবরা, গুরুজীরা পর্যন্ত ঢুকতে পায় না, সেখানে বাবুলালের

[১] স্থানীয় ভাষায় 'আদমী. মানে স্ত্রী। মানুষ অর্থেও প্রচলিত।

অবারিত দ্বার। গর্বে দুখিয়ার মা'র বুক ফুলে ওঠে। আজ সে আপিস ফেরত বাবুলালকে ভাল করে খাওয়াবে। তাই সে তাল গুলতে বসে। তার ভিতর গুড় আর নুনের জল দিয়ে সে বরফি করবে। রায়বাহাদুরের ডেরাইভারই কত বড় লোক, না হলে কি আর তার বৌয়ের ছেলে হওয়ার সময়, বাবুলাল চাপরাসী রাতদুপুরে চামারনী ডাকতে ছোটে। ডেরাইভার-সাহেবই তো ধনুয়া মহতোর সমান 'অকত্তিয়ারের'১ লোক। সেই ডেরাইভার-সাহেবকেও চাকর রাখে রায়বাহাদুর। এত বড় লোকটিকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে একবার দুখিয়ার মা'র। কত কথা সে শুনেছে তাঁর সম্বন্ধে বাবুলালের কাছ থেকে। যেই ঘন্টিতে হাত দেবে অমনি বাবুলাল চাপরাসীকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে 'হজৌর'। আজব দুনিয়াটা। বড়র উপরও বড় আছে। রায় বাহাদুরের উপরেও আছে দারোগা, কলস্টর···ঢোঁড়াইয়ের বাপের কথা হঠাৎ বুধনীর মনে পড়ে—সেই ঢোঁড়াই যেবার হয়-হয় সেইবার কলস্টর দেখে এসেছিল। বাবুলালের মতো এত 'ইজ্জৎদার আদমী'২ ছিল না বটে, কিন্তু ছিল বড় ভালমানুষ। · ·এক রত্তি ঢোঁড়াইকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সুর করে গাইত—'বকড়হাট্টা; বরদ্ বাট্টা; সো যা পাঠ্ঠা'··। সে আর আজ ক'দিনের কথা। তবু সে সব ঝাপসা মনে পড়ায় দাগগুলো পর্যন্ত একরকম মুছে গিয়েছে। অনুতাপ নয়, তবুও কোথায় যেন একটু কী খচ্ খচ্ করে বেঁধে···

খাবারের লোভে দু-একজন করে দুখিয়ার বন্ধুরা এসে জড়ো হয়। সকলেই এক একটা তালের আঁটি চুষছে। কার তালের দাড়ি কত বড় তাই নিয়ে ঝগড়া জমে উঠেছে, কিন্তু নজর সকলেরই রয়েছে দুখিয়ার মা'র দিকে।

'নে দুখিয়া। নে নে তোরা সকলে আয়; একটু একটু নে। যা, এখন ভাগ জলদি!'

এক দণ্ড নিশ্চিন্দি নেই এদের জ্বালায়। পাড়াসুদ্ধ শুয়ারের পালের মতো ছেলেপিলেকে দুখিয়ার মা তালের মিঠাই খাওয়াল। কিন্তু ঢোঁড়াই! ঢোঁড়ায়ের কথা তার আজ বড্ড বেশি করে মনে পড়ছে অনেক দিনের পর। বহুদিন তার খোঁজখবরও করা হয়নি। পথে ঘাটে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। ছোঁড়া পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। যাক ছোঁড়া ভাল থাকলেই হল। গোঁসাইথানের মাটির কল্যাণে আর বাওয়ার আশীর্বাদে ছেলেটা বেঁচে বর্তে থাকলেই হল। সে আর ও ছেলের কাছ থেকে কী চায়।

১ অধিকার। ২ সম্মানিত লোক।

অনেকদিন ছেলেটাকে কিছু খাওয়ানো হয়নি। বাড়িতে ডেকে পাঠালেও আসবে কি না কে জানে। দুখিয়ার মা একখান কচুপাতায় করে খানকয়েক তালের বরফি নিয়ে গোঁসাইথানে যাবে বলে বেরোয়।...সে ছোঁড়া কি আর এখন গোঁসাইথানে আছে। হয়তো মুখপোড়া ধাঙড় ছেলেগুলোর সঙ্গে 'পাক্কীতে', বিসারিয়া থেকে যে নতুন 'লৌরী'[1] খুলেছে, তাই দেখতে গিয়েছে। 'লৌরী' আসবার সময় ওরা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, না হয় রাস্তার উপর গাছের ডাল ফেলে পালিয়ে আসে। একদিন ধরবে তালে মহলদার 'রোড সরকার' তো মজা টের পাইয়ে দেবে।...ঢোঁড়াই এখন কত বড় হয়ে উঠেছে। কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য।...ওই তালে মহলদার, ডিস্টিবোর্ডের রোড সরকার, যার নাম করে বাবুলাল 'পাক্কীর' পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি যেতে দেখলে, গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে; তারপর দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেয়,—সেই তালে মহলদার একদিন ঢোঁড়াইকে দেখে ধাঙড়দের ছেলে বলে ভেবেছিল, ভুল ধরিয়ে দিলে বলেছিল যে, এমন 'পাঠ্‌ঠা যোয়ান' তো তাৎমার ছেলে হয় না। লোকটা অন্ধ না-কি! ঢোঁড়াইয়ের রঙ ধাঙড়দের মতো কালো নাকি? সামুয়রের মতো ফর্সা না হলেও আখার মতো কালোও তো না। মকস্থদনবাবুর রঙের সঙ্গে ওর রঙের মিল থাকতেও পারে; বলা যায় না...ঐ তো বাগভেরেণ্ডা গাছের ফাঁক দিয়ে বৌকা বাওয়ার কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে গোঁসাইথানে।...আ মর, মহতোর ছাগল কিনা তাই সাধারণ লোক দেখে আর পথ থেকে সরবার নাম নেই! হট্! হট্!...

'আরে কোথায় চললি দুখিয়ার মা?'

'এই একটু ঐদিকে, কাজ আছে।'...এতদিনের অনভ্যাসের পর ঢোঁড়াইয়ের কাছে যাচ্ছি বলতে সংকোচ লাগে লোকের কাছে।...আজ আর কেউ তাকে ঢোঁড়াইয়ের মা বলে ডাকে না। অথচ ঢোঁড়াই হচ্ছে প্রথম ছেলে;—তার দাবিই সবার উপর। সেই প্রথম ছেলে হওয়ার আগের ভয়, আনন্দ, বুড়ো মুন্নুলাল মহতোর বৌয়ের আদর যত্ন বকুনি, কত নতুন অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা মেশানো—ঢোঁড়াইয়ের পৃথিবীতে আসার সঙ্গে। সব সেই পুরনো অস্পষ্ট স্মৃতিগুলোর হালকা ছোঁয়াচ লাগছে মনে।...না ঐ তো দেখা যাচ্ছে ঢোঁড়াইকে, বাওয়ার লোটা মাজছে। আজ ভাগ্যি ভাল। বাওয়া আজ তাকে দুপুরে বেরুতে দেয়নি দেখছি।...

কিন্তু এ ভিক্ষে করে আর কতকাল চলবে?...

'এই বাওয়ার 'দর্শন' করতে এলাম'—বলে দুখিয়ার মা গোঁসাইথানের

[1] লরী—মোটরবাস।

মাটির বেদীটিকে প্রণাম করে। তারপর বাওয়াকে বলে, 'পরণাম'। বাওয়া আগেই আড়চোখে তার হাতের কচুপাতার মোড়কটা দেখে নিয়েছে। দুখিয়ার মা যে ঢোঁড়াইয়ের কাছে এসেছে সে কথা প্রকাশ করতে চায় না। ঢোঁড়াইও তার দিকে না তাকিয়ে একমনে নিজের কাজ করে যায়। লোটা মাজে, বাওয়ার ত্রিশূল, চিমটে ছাই দিয়ে ঘষে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখে। তার কাজের আর শেষ নেই। একবার যখন ধরা পড়েছে, এখন গাছতলাটা ঝাঁট দেওয়ার আগে আর বাওয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই। তারপর আবার কোন কাজ বাওয়ার মনে পড়বে ঠিক নেই। দুখিয়ার মা-টা আবার এই অসময়ে কোথা থেকে এসে জমিয়ে বসল! কী গল্পই করতে পারে এই মেয়েজাতটা। ধনুয়া মহতোর একদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে। ধনুয়া তার স্ত্রীকে বকছিল, 'কাজের মধ্যে তো খাস ছেলা আর উনুনের পাশে বসে লবড় লবড় বকা।[১] চাবুকের উপর রাখতে পারলে তবে তোদের জাতের চাল বিগড়োয় না।' মহতোগিন্নি গিয়েছিল মহতোর দিকে এগিয়ে—'রামজী মোচটা দিয়েছেন বলে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবে নাকি? চাবুক! মরদ চাবুক দেখাতে এসেছ!…এসো না দেখি!'…ধনুয়া মহতোর সেইদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের খুব মনে ধরেছিল। মেয়েজাতটাই এই রকম! কী রকম তা সে এখনও ঠিক বুঝতে পারে না, তবে খারাপ নিশ্চয়ই। আর বাবুলালের পরিবারের উপর সব তাৎমাই মনে মনে বিরক্ত। দুখিয়ার মা'র নাকি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—চাপরাসীর বৌ বলে। সে ঘাস বিক্রি করে না, কোনো রোজগার করে না, পারতপক্ষে বাবুলাল তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না; বাবুভাইদের বাড়ির মেয়েদের মতো সে তার নিজের স্ত্রীকে রাখতে চায়। যখন তখন দুখিয়ার মাকে চটে মারতে যায়—তোর তাৎমানী থাকাই ভাল—তোর আবার চাপরাসীর স্ত্রী হওয়ার শখ কেন। মাথা কাটা যায় নাকি তার, দুখিয়ার মা'র বেহায়াপনায়…

ঢোঁড়াই গাছতলা ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ করে। রোজ ঝাঁট দেওয়া হয় তবু এত ময়লা কোথা থেকে যে আসে সে ভেবে পায় না। পাড়ার যত ছাগলের আড্ডা, বর্ষাকালে এই গাছতলায়!

চেরমেন সাহেবের ডেরাইভারের সামনে বাবুলাল চাপরাসী চুপচাপ চোরের মতো থাকে, আর বাবুলালের স্ত্রী, গোঁসাইথানে প্রণাম করতে এসেও চুপ করে থাকতে পারে না। গোঁসাই উপর থেকে সব দেখছেন।…হঠাৎ দুখিয়ার মা'র গল্প কানে আসে…

১ বাজে বকা।

…'আপনারা সাধুসন্ন্যাসী মানুষ ; আপনারা ভিক্ষে করেন সে এক কথা ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও কি সারা জীবন ভিক্ষে করে জীবন কাটাবে ? ও ছেলে কি কোনোদিন আপনার চেলা হতে পারবে ? কিরিস্তান ধাঙড়দের সঙ্গে আলাপ, না আছে কথার 'ঢং'[১], না আছে মনের ঠিকানা, উনি আবার হবেন সাধুবাবা। অন্য ঘরের ছেলে হলে এতদিন একটা রোজগারের 'ধান্ধা' দেখে নিত। বয়স তো কম হল না। ওর বয়সী ঘোতাই, গুদর তো ঘরামির কাজে বেরুনো আরম্ভ করেছে। আপনি বাওয়া ছেলেটার মাথা খেলেন…'

ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে উঠেছে। বাওয়ার মুখের উপর এতবড় কথা!…

'বলেন তো, চাপরাসী সাহেবকে বলে ঢোঁড়াইকে ডিস্টিবোডের পাংখা টানার কাজে বাহাল করিয়ে দিতে পারি। বছরে চারমাস কাজ। আট টাকা করে পাবে। তার মধ্যে থেকে দু টাকা করে বহালীর[২] জন্য চাপরাসী সাহেবকে দিতে হবে ; বাকি টাকা তোমার হাতে এনে দেবে। বছরের মধ্যে বাকি আট মাস, কেরানীবাবুর বাড়ি কাজ করবে। তাঁর ছেলেমেয়ে রাখবে। ওজর না থাকে তো বাওয়া বলুন। কত লোক এ নিয়ে চাপরাসী সাহেবের কাছে ঘোরাঘুরি করছে।'…

ঢোঁড়াই লক্ষ্য করে যে বাওয়ার মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখোচোখি হয়ে যায়। দুজনেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। প্রস্তাবটি কারও মনঃপূত নয়। বাওয়া ভাবে ঢোঁড়াই করতে যাবে চাকরি! পরের ছেলেকে আপন করে নিলাম কিসের জন্য ? ওর জন্য এত কষ্ট সইলাম কেন ?

আর ঢোঁড়াই ভাবে শেষকালে বাবুলালের খোসামোদ করে দিন কাটাতে হবে ; তার দয়ার রোজগার! এও রামজী কপালে লিখেছিলেন ? বাওয়ার সেবা করে, বেশ তো তার দিন কেটে যাচ্ছে! দুখিয়ার মা'টার 'বুকের উপর মুগের দানা রগড়াচ্ছে'[৩] কে এর জন্যে। সকলেই তাকে ভিক্ষের কথা নিয়ে খোঁচা দেয়। বাবুলালের পরিবারেরও এই কথা নিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই। অন্তরের থেকে সকলেই তাদের ভিখিরি ছাড়া আর অন্য কিছু মনে করে না।

বাওয়া ভাবে, দরদ! এতদিনে মায়ের দরদ উছলে উঠল!

১ স্ত্রী : আদবকায়দা। ২। নিযুক্তি।
৩ 'পাকা ধানে মই দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত।

সে আংটা লাগানো ত্রিশূলটা ঢুখিয়ার মা'র সম্মুখে মাটিতে তিনবার ঠোকে ; তারপর তিনবার মাথা নাড়ে—না, না, না।

অপমানে ঢুখিয়ার মা'র চোখে জল এসে যায়। সে কচুপাতায় মোড়া বরফি ফেলে উঠে পড়ে। কার জন্যে এত ভেবে মরি !

কার জন্য তাদের বরফিগুলো এনেছিল, সে কথা আর বলা হয় না।

সে চলে গেলে বাওয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়। ঢোঁড়াই হঠাৎ কচুপাতার ঠোঙাটি তুলে নিয়ে দূরে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঝোপের নিচের ভাদ্রের ভরা নালায়, একটা ব্যাং লাফিয়ে পড়ে।

'ভিখ দিতে এসেছেন, ভিখ ! তোর দেওয়া ভিখ যে খায়, তার বাপের ঠিক নেই। ডিষ্টিবোডের পয়সা দেখাতে এসেছেন ! অমন খাবারে আমি···'

তারপর ঢোঁড়াই আর বাওয়া চুপ করে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকে ! একই বেদনায় দুটো মন মিলে এক হয়ে যায়।

ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ-ঘোষণা

পরের দিন ভোরে উঠেই ঢোঁড়াই যায় ধাঙড়টুলিতে শনিচরার কাছে। এত ভোরে তাকে দেখে শনিচরা অবাক হয়ে যায়।

'কী রে ? সব ভাল তো ?'

'ভালও, আবার মন্দও। আমি 'পাক্কী' মেরামতির দলে কাজ করতে চাই। আমাকে ভর্তি করে নেবে ?'

শনিচরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

'এতদিনে তাহলে তাৎমাদের বুদ্ধি খুলেছে। গয়লার ষাট বছরে, আর তাৎমার সত্তর বছরে বুদ্ধি খোলে। আরে এতোয়ারী, শুক্রা, আকলু, বিরসা বড়কাবুদ্ধু, ছোটকা বুদ্ধু, শোন শোন; শুনে যা খুশখবরী[1]। মজার খবর। ময়নার বাচ্চার চোখ ফুটেছে।'

সকলে এসে জড়ো হয়। হাসি মস্করার মধ্যে মেয়েরাও এসে যোগ দেয়।

'এতদিনে তাৎমারা 'বেলদার'[2] হয়ে গেল।'

'আরে বাবা, করবি তো মজুরি। যেখানে পয়সা পাবি সেখানে কাজ করবি। তার মধ্যে আবার বাছ বিচার।'

১ সুখবর।

২ বেলদার আর গুনিয়া, এই দুটো জাতই কেবল এই অঞ্চলে মাটিকাটার কাজ করে।

শুক্রা বাধা দিয়ে বলে, 'তাই বলে নিজের মান ইজ্জৎ নেই। পয়সা পেলেই মেথর ডোমের কাজও করতে হবে নাকি?'

এতোয়ারী শুক্রাকে ঠাণ্ডা করে—'কোথায় মেথরের কাজ, কোথায় মাটিকাটার কাজ।'

'কালে কালে কিন্তু সকলের ফুটানি ভাঙবে। দেখ অতবড় গেরস্থ মৈত্রী চৌধুরী, বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবার, পাড়াসুদ্ধ লোকের সম্মুখে হাল চালিয়েছে। জাতের মাথা দ্বারভাঙ্গারাজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে টুঁশব্দ করেননি। একে শখের হাল চালানো ভাবিস না। দিন আসছে; চনরচুড় ঝা, একতাল 'ফুটানি ছাঁটত'[১] যে সে গরুর গাড়িতে চড়ে না। সেদিন দেখি কামিখ্যাথানের মেলায় গরুর গাড়ি থেকে নামছে। লোটাতে করে জমানো পয়সা ঘরের মেঝেতে পোঁতা থাকলে তবেই 'বিবিকে' কাজ করতে বারণ করা যায়।'

'এসব তো অনেক হল। এখন 'বেটা'[২] তুই বল, তুই যে রাস্তামেরামতির কাজ করবি, পাড়ার মহতো নায়েবদের জিজ্ঞাসা করেছিস?'

'তারা কি আমায় খেতে দেয়? জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন? আর জিজ্ঞাসা করলে জানাই আছে যে, তারা মাটিকাটার কাজ করতে দেবে না।'

'দেখিস না পঞ্চায়েত তোর কী করে। নোখে বেলদার কবে পশ্চিম থেকে এসে, এক কুড়ি বছরের উপর এই এলাকায় আছে। তাকে কি তোর জাতভাইরা মানুষ বলে ভাবে? সে বেচারা রোজ কাজ করার সময় এই নিয়ে দুঃখু করে।'

সেই দিন থেকেই ঢোঁড়াই কোশী-শিলিগুড়ি রোডের একুশ থেকে পঁচিশ মাইলের গ্যাং-এ বহাল হয়।

সব ধাঙড়রা তাকে ঠাট্টা করে বলে যে তোকে এবার থেকে 'বাচ্চা বেলদার' বলব। শুক্রা ধাঙড় তার বাড়ির মাইজীর কাছ থেকে, মাইনের থেকে এক টাকা আগাম নেয়; তার 'সনবেটায়' কোদাল কিনবার জন্য। বুড়ো এতোয়ারী ধাঙড়ের দল নিয়ে বেরোয় বকরহাট্টার মাঠের থেকে ময়নার ডাল বাছতে,—বাচ্চা বেলদারের কোদালের বাঁটের জন্য।

বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের দেখা হয় ধাঙড়টুলির ডাইনীবুড়ি আকলুর মা'র সঙ্গে। সে মাটি খুঁড়ে একটা কী বার করছিল, মাটির ভিতর থেকে। ঢোঁড়াইকে দেখে হেসেই আটখান। ছালটা পোকায়

১ বড়াই করত।

২ ঢোঁড়াই শুক্রার সনবেটা অর্থাৎ ধর্মছেলে; সেইজন্যই অন্য ধাঙড়রাও তাকে ছেলে বলে।

খাওয়া-খাওয়া গোছের, একটা প্রকাণ্ড শাঁক আলু ঢোড়াইয়ের হাতে দেয়। 'নে নাতি, অসময়ের জিনিস।' সবাই একে ডাইনী বলে ভয় করে। কিন্তু এর চোখে একটা অনভূত কোমলতার আভাস দেখে, ঢোঁড়াই ভয় করবার অবকাশও পায় না সেদিন।

মহতো নায়েব আদির মন্ত্রণা

সেই রাতেই ধনুয়া মহতোর বাড়িতে পঞ্চায়েত বসে। অন্য সময় হত তার বাড়ির সম্মুখের মাঁদার গাছটার নিচে, বাঁশের মাচার পাশে ; দুই একজন বিশিষ্ট দর্শক বসত মাচার উপর। এখন ভাদ্রমাসের টিপটিপুনি বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বসা যায় না। তাই সবাই বসেছে একচালাটির ভিতর। ছড়িদার আর নায়েবরা বাঁশের চাটাইয়ের উপর, আর ধনুয়া মহতো বসেছে ঘরের জিয়লের খুঁটিটিতে হেলান দিয়ে। খুঁটিটা থেকে এক গোছা পাতা বার হয়েছে ; বুড়ো তাৎমাদের মত জিয়লের ডালও মরতে জানে না। মহতোর সম্মুখে একখান ঘুঁটে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে,—বাবুলালের তামাকের খরচ আজ বাঁচবে। তেতর কাশছে, বোধ হয় এইবার কথা বলবে। ঠিকই সে কথা বলে—'চাটাইটার দেখছি আর কিছু নেই।'

জবাব দেয় রতিয়া ছড়িদার, 'বাবুদের বাড়ি থেকে যে বাঁশের টুকরোগুলো নিয়ে আলো, সেগুলো তো পঞ্চায়েতের পাওয়ার কথা। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, দুখলাল মহতোর সময়ে। সেখান থেকে আনা 'ঔজার'[১] আর ঘাস দড়ি হবে, যে আনবে তার ; আর বাঁশ আনলে আদ্ধেক হবে পঞ্চায়েতের, এই ছিল চিরকালের নিয়ম। কেউ দিয়েছে দুবছরের মধ্যে, যে চাটাই নতুন থাকবে ?'

সকলেই দোষী ; কেউ আর কথাটা বাড়াতে চায় না। নায়েব বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করে 'কেবল টিপটিপুনি বৃষ্টি এ বছর। আরে হবি তো জোরে হ। এ জলে আর কে চালের খাপড়া বদলাবে। অথচ ব্যাঙের ডাকের কামাই নেই।'

বাসুয়া বলে, 'হয় একদিন তিসুর সালের[২] মতো জল। এক বৃষ্টিতে সেবার মরণাধারের কাঠের পুল ডুবে গিয়েছিল।'

'বাবুভাইয়াদের সে কী দৌড়োদৌড়ি তাৎমাটুলিতে সেদিন। অমন আর কখনও দেখিনি। মহতো সেবার খুব হিম্মৎ দেখিয়েছিল বাবুভাইয়াদের কাছে।'

১ যন্ত্র, হাতিয়ার।
২ গত বছরের আগের বছর।

মহতো এই প্রশংসায় খুশি হয়ে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলে—বৃষ্টিতে যে কতদিন বাড়িতে বসে থাকি, সেটা দেখবে না, এক আনা বেশি চাইলেই চালার মাপের হিসেব দেখাবে। মৌকা পেলে বাবুভাইয়াদের কাছ থেকে চুটিয়ে নেব ; ছাড়াছাড়ি নেই আমার কাছে। 'খাইতো গেঁহু, নহিতো এহু'[১]।

মহতো হুঁকোটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। স্ত্রীকে বলে, 'গুদরমাই (গুদরের মা), বাইরের শুকনো ঘাসগুলো তুলিসনি তো? কী যে তোদের আক্কেল তা বুঝি না, যেমন মা তার তেমনি ছেলে। আবার খটাশের মতো তাকাচ্ছিস কি? ওগুলো যে পচে গলে যাবে। হরনন্দন মোক্তারের বাড়িতে কাজ করার দিন এনেছিলাম, আজও সেই পড়ে রয়েছে। কত ধানে কত চাল তা তো আর বুঝিস না। আমাদের কাজ শেষ হওয়ার সময় তারা লোক রেখে দেয় পাহারায়। সেইগুলোকে ভিজাচ্ছিস। ও ঘাসে উই লাগতে কদিন। গতবার ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে কাজ করবার সময় এনেছিলাম 'উপর করে'[২] এই এত বড় দা, তিনপোয়া ওজন হবে, সেটাকেও হারিয়েছে ওই মায়ে বেটায় মিলে। করে নে ফুটানি যে কটা দিন এই মহতো বেঁচে আছে। পরমাত্মা কী পদার্থ দিয়ে যে আজকালকার ছেলেদের গড়েছে! এই দ্যাখো না ঐ ঢোঁড়াইটার কাণ্ড!

পয়স পলি অহি অতি অনুরাগা।
হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা॥[৩]

'উনি আবার গলায় তুলসীর মালা নিয়ে সাধুবাবাজী হবেন।'

সকলে এই বিষয়টারই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ থেকে। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

'বাওয়ার ছেলে হয়েছেন তো মাথা কিনেছেন।'

'পঞ্চ-এর কথার খেলাপ গিয়েছে অতটুকুনি ছোঁড়া! হারামজাদা!'

আজকের 'পঞ্চায়তি' থেকে মহতো নায়েব ছড়িদার কারও এক পয়সা রোজগার নেই[৪]। কেবল জাতের ভালর জন্য, আর দশের মঙ্গলের জন্য,

---

১ খাই তো গম, না হলে কিছুই খাই না। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার এই অর্থে।

২ যোগাড় করে।

৩ অতি আদরের সঙ্গে পায়স খাইয়ে পালন করলেও কাক কি কখনও নিরামিষ আহারী হয়। —তুলসীদাস।

৪ সাধারণত কেউ পঞ্চায়তের কাছে নালিশ করলে তাকে দু টাকা ছ আনা জমা করতে হয়। এর ছয় আনা ছড়িদারদের প্রাপ্য, এক টাকা মহতোর, আর এক টাকা বারোয়ারী ফণ্ডের। এই ছিল নিয়ম। কিন্তু আজকাল এ নিয়ম চলে না। নায়েব মহতো ছড়িদার এরা মিলে সব টাকাই নিজেরা আত্মসাৎ করে। এর জন্য নিত্য নূতন মিথ্যা মোকদ্দমাও তারা তৈরি করে।

আজকের পঞ্চায়েতের বৈঠক করা হচ্ছে। ঢোঁড়াইকে ডাকা হয়েছিল 'পঞ্চায়তিতে'। ঢোঁড়াই আসেনি এখনও।

তাৎমাটুলিতে 'পঞ্চায়তি' নিত্যি লেগেই আছে—এর বৌ ওকে দেওয়া, কোন পক্ষের কোন ছেলেটা মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখাগ্নি করে নিয়েছে, মৃতের বাড়ির বেড়া আর বাঁশগুলো পাবে বলে; কে জোর করে স্বামীর সাক্ষাতে তার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে তাকে স্ত্রী বলে দাবি করছে; আরও কত রকমের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা।

কিন্তু এতটা বয়স হল, 'পঞ্চ'রা কখনও দেখেনি যে, জাতের 'পঞ্চায়তি'তে কাউকে ডেকে পাঠিয়েছে, আর সে আসেনি। কথায় বলে 'পঞ্চ' যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন ছার। এত বুকের পাটা ঐ একরত্তি ছেলেটার! এ অপমান 'পঞ্চ'দের পক্ষে অসহ্য।

সব আসামীই তাৎমাটুলির 'পঞ্চায়তি'তে[1] আসতে ভয় পায়। শাস্তির প্রথম দফা পঞ্চায়তের বৈঠকের মধ্যেই হয়ে যায়। মোটামুটি 'ফয়সালা' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর উপর চড়চাপড় পড়তে আরম্ভ করে। এগুলো কিন্তু আসল শাস্তির ফাউ। এই উপরি পাওনার পর অন্তিম রায় বেরোয়;— জরিমানা, গাধার পিঠে চড়ানো, ভোজ—খেলা নয় 'ভাতকা ভোজ',[2] আরও কত কী। ছোটবেলা থেকে ঢোঁড়াই এ সব কত দেখেছে।…পূরণ তাৎমাকে সেবার অর্ধেক মাথা নেড়া করে, অর্ধেক গোঁফ কামিয়ে একটা বড় রামছাগলের পিঠে বসানো হয়। ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে, সে, গুদর, আরও সব ছেলেরা কালকাসুন্দি আর ভাঁট গাছের ছড়ি নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে; এক! দু! তিন! সকলে রামছাগলটির উপর ছড়ি চালাচ্ছে, সপাসপ! বাবুলাল বলল, থাম তোরা একটু। চেরমেন সাহেবের হাওয়া গাড়ির 'পিট্রোল'[3] সে একটা শিশিতে করে রাখে, ব্যথায় মালিশ করার জন্য। সেই শিশি থেকে একটু পেট্রল দেয় রামছাগলটার পিঠের কাছে। ব্যা ব্যা করে পরিত্রাহি চিৎকার করছে রামছাগলটা। সেটা অনবরত ঘুরপাক খাওয়ার চেষ্টা করে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড! রামছাগলটা শেষকালে ছটফট করতে করতে শুয়ে পড়ে। সকলে মিলে জোর করে পূরণ তাৎমাকে সেটার উপর চেপে ধরে রাখবে; নে নে পূরণা, শখ মিটিয়ে নে, শুঁকে নে কেওড়ার গন্ধ। সে কথা ঢোঁড়াই কোনোদিন ভুলতে পারবে না।…

১ স্থানীয় ভাষায় কোনো বিষয় পঞ্চায়তে দেওয়া হয় না, 'পঞ্চায়তি'তে দেওয়া হয়।
২ ভাতের ভোজ; অন্য শুকনো জিনিসের ভোজে খরচ কম পড়ে।
৩ পেট্রল।

মহতো, নায়েব, ছড়িদার সকলেরই হাত নিশপিশ করছে—ঢোঁড়াইটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়।

ধন্থুয়া মহতো হুঁকোটায় কয়েকটা টান মেরে, তার উপরের নারটা মুছে লাছুর হাতে দেয়; তার মনের মতো ধোঁয়া এখনও বের হচ্ছে না।

সে লাছু তামাকটা টেনে ভাল করে ধরিয়ে দে! এখনও তোরা জোয়ান মরদ আছিস, বুকের জোর আছে; আমাদের মতো বুড়ো হয়ে যাসনি। তোদের মতো বয়সে আমাদের এককোশের মধ্যে দিয়ে কোনো মেয়েছেলে যেতে সাহস করত না।'

মহতোর রসিকতায় সকলে হাসে। মহতোর বয়সকালের অনেক কাণ্ড সকলের মনে আছে। মহতোগিন্নী আর তার পন্থু মেয়ে ফুলঝুরিয়া বাইরে আড়ি পেতে ছিল। মা গর্বপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—এমন এমন কথা বলবে যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে।

ধন্থুয়া মহতোর উচ্চ হাসি ব্যাঙের একঘেয়ে ডাকের মধ্যেও কানে বাজে। হঠাৎ সে উদ্‌গত হাসিটা ঢক করে গিলে ফেলে গম্ভীর আর সোজা হয়ে বসে। মহতোর পদের একটা মর্যাদা আছে তো। সকলেই বোঝে যে এইবার আসল কাজের কথা আরম্ভ হবে। বৈঠকের আবহাওয়া থমথমে হয়ে ওঠে।

'ছেলে বাপের হয় না; ছেলে হয় জাতের। তারপর ছেলের উপর দাবি হয় টোলার। এই জিরানের তালের খুঁটি লেগে গিয়েছে তো; এ এখন সমস্ত চালাটাকে শুদ্ধ ঠেলে নিয়ে উচুতে উঠবে। সেই রকমই ত্যাখো, এই বাবুলাল তাৎমা জাতটার ইজ্জৎ কত বাড়িয়েছে। হৈজার ডাক্তার[1] যখন তাৎমাটুলির 'ফৌজী কুয়ো'তে লাল রঙ[2] দিতে আসে, তখন আমার বুক, সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে দুরদুর করে। বাবুলাল দেখি যোচে তা দিতে দিতে তার সঙ্গে কথা বলে; তবে না ও তাৎমা জাতটাকে একা এতটা এগিয়ে দিতে পেরেছে।'

বাবুলাল, আত্মপ্রশংসা নিজের কানে শোনেনি এমনি একটা ভাব দেখায়।

'আর একদিন ত্যাখো, 'সারা বদমাইসির জড়'[3] এই ঢোঁড়াই।'

সকলে ঢোঁড়াইয়ের নামে সোজা হয়ে বসে। লাছু শব্দ করে থুথু ফেলে; বাসুয়া চিক্ করে একটা শব্দ করে। বাবুলাল বলে, ছি ছি ছি! তারপর গোঁফের একটা অবাধ্য চুলকে দাঁত দিয়ে কাটবার বৃথা চেষ্টা করে।

---

১ হৈজার ডাক্তার, শব্দার্থ কলেরার ডাক্তার, আসলে তারা অ্যাসিষ্ট্যান্ট স্যানিটারী ইন্সপেক্টর।

২ পারমাঙ্গ নেট অব পটাশ।

৩ যত নষ্টের গোড়া।

'সেই কুত্তার বাচ্চাটা কি না মাটি কাটার কাজ করবে, যা আমাদের সাত পুরুষে কেউ কোনোদিন করেনি! তাৎমা জাতের মুখে কালি দিল! এর থেকে মুসলমানের এঁটো খাওয়া ভাল ছিল। আর লোকসমাজে মুখ দেখানোর জো রাখল না তাৎমাদের। এখানে এল না পর্যন্ত সে নবাবপুত্তুর! কী ছেলেই মানুষ করেছে বৌকাবাওয়া! বাওয়ার মাই দিয়ে মাথায় চড়ানোর জন্যেই তো ও এত বাড় বেড়েছে। ছ্যাখো দেখি কাণ্ড! নোখে বেলদার, আর শনিচরা ধাঙড় তাৎমার সঙ্গে সমান হয়ে গেল। আরে, মাটি কেটেই যদি পয়সা রোজগার করতে হয়, তাহলে আমরা এতদিন ফুলে 'ভাতি' (হাপর) হয়ে যেতাম। আজ এই তিনকুড়ি বছর থেকে দেখছি এই 'পাক্কী' মেরামতের জন্য মাটি কাটার লোক, কত দূর দূরান্ত থেকে আসে। ধন্নুয়া মহতো আঙুল উঠোলে এখনই তিনশ তাৎমা রাস্তা মেরামতির কাজে দিতে পারে। বাপ ঠাকুরদার নাম হাসালি। এই চোখের পর্দাটুকুর জন্যেই তো ধাঙড়দের পোয়াবারো। রাতদিন পচই খেয়েও দুবেলা ভাত ডালের উপর আবার তরকারি খায়; আর আমাদের বরাতে মকাই মারুয়ার দানাও জোটে না। একখান দা কিনতে হলে অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে দু টাকা ধার করতে হয়, দু আনা করে রবিবারে তাকে সুদ দেব এই কড়ারে। এই ছ্যাখো না আমার দাখানা এই আঙুলের মতো পাতলা হয়ে গিয়েছে, ধার দেওয়ার জায়গা নেই। নারকেলের দড়িটা কাটা যায় না এ দিয়ে। পয়সা না থাক একটা ইজ্জৎ, প্রতিষ্ঠা আছে। একটা ছোঁড়ার বদ খেয়ালের জন্য আমাদের সেটাও খোয়াতে হবে?'

পঞ্চরা সকলে বেশ তেতে উঠেছে, এতক্ষণে।

'বন্ধ কর শালার হুকা পানি'[১]।

'তাড়াও ওটাকে গোঁসাইথান থেকে'।

'বাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া'।

'জাকে নখ অরু জটা বিশালা।

সেই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥'[২]

'নুটিশ দাও, বাওয়াকে।'

'চল সকলে। থানে। ছোঁড়ার ছাল ছিঁড়ে আজ হাড়মাস আলাদা করব।'

চল, চল।

১ একঘরে কর।

২ যার নখ আর জটা বড়, সেই কলিকালে প্রসিদ্ধ তপস্বী। (তুলসীদাস)

বাইরে তখন বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে।

'পড়তে দে জল,'—বলে হেঁপো রুগী তেতর বের হয়ে পড়ে ঘর থেকে আর কারও বৃষ্টির কথা খেয়ালই নেই।

'লাঠি নিয়েছিস তো?'

ঢুখিয়ার মার বিলাপ ও প্রার্থনা

আগে আগে চলেছে বড়রা—মহতো, নায়েব চারজন, আর ছড়িদার। এর পিছনে আছে ছেলে বুড়ো সকলে। এরা সব এতক্ষণ ছিল কোথায়! বোধ হয় মহতোর বাড়ির আশেপাশে সবাই জড়ো হয়েছিল সেই জলবৃষ্টির মধ্যেও আজকের পঞ্চয়তির জমজমাট 'তামাসা' দেখবার জন্য। জল কাদা ব্যাঙ কাঁটা মাড়িয়ে, অধোলঙ্গ বীরের দল নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে। তাদের জাত্যভিমানে আঘাত লেগেছে। অন্ধকারে সরু পথের উপর আন্দাজে পা ফেলে চলছে সকলে; পায়ের নিচের চটকানো কেঁচোগুলো থেকে আলোর আভাস ফুটে বেরুচ্ছে; গুগলি শামুক গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে খড়মড় করে। ক্ষ্যাপা শেয়ালের মতো তারা হন্তে হয়ে ছুটেছে; কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই তাদের এখন,—যেমন করে হোক তাদের জাতের এ অপমানের একটা প্রতিকার তারা করবে।

পাড়ার মেয়েরাও একে একে ধনুয়া মহতোর সদ্য খালি করা একচালাটিতে এসে জড়ো হয়। বাইরে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু সকলে ভিজে কাপড় নিঙড়োতে নিঙড়োতে বাইরে কী যেন দেখতে চেষ্টা করে। সকলেই এক সঙ্গে কথা বলতে চায়। মুখে কারও ভয় ডর মায়ামমতার ছায়াও নেই; আছে কেবল অভিযানের নিশ্চিত সাফল্যের জন্য উল্লাস, আর কয়েকটা অনিশ্চিত মজার খবরের জন্য কৌতূহল। ঐ একরত্তি ছোঁড়ার এই কাণ্ড! অসীম উৎসাহের সঙ্গে গুদরের মা আজকের পঞ্চায়তের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী, অন্য সকলকে বুঝোতে চেষ্টা করে। কুপীর আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কে তার কথা শুনছে? তাদের মধ্যে এত উত্তেজনা বোধ হয় এক কেবল ধাঙড়টুলিতে আগুন লাগার সময় ছাড়া আর কখনও হয়নি। বাসুয়া, লাল্লু, তেতর এই তিন নায়েবের স্ত্রীরাও মহতোগিন্নীর চেয়ে গৌরবের অংশীদার হিসাবে কম বলে মনে করে না নিজেদের। তারাও সমস্বরে চিৎকার করছে। পাবগুদলনে বীরেরা বেরিয়েছেন, বীরজায়ারা যাত্রার আগে কপালে জয়তিলক কেটে দিতে পারেননি; সেইটা পুষিয়ে নিচ্ছেন চেঁচামেচি গালাগালির মধ্যে দিয়ে।

কেবল দুখিয়ার মা এদের মধ্যে নেই। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। দুখিয়াটা চাটাইয়ের উপর একটা কচি বাতাবি লেবু নিয়ে খেলতে খেলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রান্নাবাড়ি করার মতো মনের অবস্থা দুখিয়ার মা'র নেই। সন্ধ্যায় বাবুলাল বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকেই, তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সে কান পেতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল—যদি কোনো চেঁচামেচি শোনা যায়; পঞ্চায়তি কখনও বিনা হট্টগোলে শেষ হয় না। কেন মরতে গিয়েছিল সে কাল তালের বরফি নিয়ে ছোঁড়াটার জন্য। সেই থেকেই তো এত কাণ্ড! কাল গোঁসাইথানে না গেলে আজ হয়তো ছেলেটা এ কাণ্ড করত না। চিরকাল বদরাগী ঢোঁড়াইটা—সেই যখন কোলে তখন থেকেই; কিন্তু রাগেরও তো একটা সীমা আছে! বলতে গেলাম ভাল কথা, রাওয়া আর ঢোঁড়াই দুজনেই মানে করে নিল উল্টো। মহতো নায়েবরা, বিশেষ করে চাপরাসী সাহেব, আজ আর ঐ একরত্তি ছেলেটাকে আস্ত রাখবে না। দেবে হাড়গোড় ভেঙে। চাপরাসী সাহেব কোনো দিন ছেলেটাকে দেখতে পারে না।—পঞ্চায়তির চেঁচামেচি মহতোর বাড়ি থেকে এতদূরে পৌঁছোয় না, কেবল বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ শোনা যায়।

টপ্ টপ্ করে চালের ছাঁচতলা থেকে জল পড়ছে তার সম্মুখে। জলের ফোঁটা পড়েই একটা একটা টুপির মতো হয়ে যাচ্ছে। একটা নেপালী 'ফৌজ' চাপরাসী সাহেবকে একটা টুপি দিয়েছিল। সে তার পেন্সনের টাকা তুলতে পারছিল না সরকারী অফিস থেকে। বাবুলাল টাকায় চার আনা করে নিয়ে টাকাটা তুলে দিতে সাহায্য করে। তাই সে বাবুলালকে দিয়েছিল পুরনো টুপিটা। দুখিয়ার মা আবার একদিন সেই টুপির মধ্যে বাবুলালের জন্যে কাঁঠাল ছাড়িয়ে রেখেছিল। কী মারই না মেরেছিল সেদিন বাবুলাল দুখিয়ার মাকে। আবার চাপরাসীর বৌ হতে শখ যায়; থাক তুই তাৎমানী।···

বাবুলালের উপর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে করে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নিচে জলের ফোঁটা পড়ে টুপি হচ্ছে কি না, সেদিকে আর খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকলেও ঝাপসা চোখে তখন দেখতে পেত না।

ঐ! এইবার একটা হট্টগোল শোনা যাচ্ছে! তারা বোধ হয় পঞ্চায়তিতে ঢোঁড়াইকে মারছে! রামজী! গোঁসাইজী, তোমার থানের ধুলোবালি মেখে ছেলেটা এত বড় হয়েছে। দোষ করে ফেলেছে বলে তাকে পায়ে ঠেলো না···ছোঁড়াটা হয়তো এখন চিৎকার করে কাঁদছে।···না কাঁদবে কেন? ঢোঁড়াইকে, তো কেউ কোনো দিন কাঁদতে দেখেনি।···হট্টগোল যেন দূরে

সয়ে যাচ্ছে, বোধ হয় গোঁসাইথানের দিকে। এ আবার 'পঞ্চ্'রা কি ফয়সলা করল? বাওয়াকে আবার কিছু করবে না তো? হয়তো ঢোঁড়াইকে এত মেরেছে যে তার চলবার ফিরবার ক্ষমতা নেই, নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে; তাই বোধ হয় সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে বৌকাবাওয়ার কাছে পৌছুতে যাচ্ছে।

চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়তে থাকে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই—না হলে হয়তো কথাবার্তা কিছুটা শোনা যেত। ঝাঁপের সম্মুখে কুপির আলো পড়ে বৃষ্টির ধারা সাদাটে রঙের দেখাচ্ছিল,—চোখের জলে তাও ঝাপসা হয়ে গেল। ...মাইয়া গে, তোর চুলে বাওয়ার জটার মতো গন্ধ নেই কেন?...দূরে থেকে আপিসফেরত বাবুলালকে দেখে, ধুলোকাদা মাখা ছেলেটা রাংচিতের বেড়ার মধ্যে দিয়ে পালাচ্ছে চোরের মতো।...

হঠাৎ পায়ের শব্দ হয়। ছপ্ ছপ্ করে কাদার মধ্যে দিয়ে কে যেন এদিকে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাবুলাল এসে ঘরে ঢোকে। সে যেন ধাক্কা দিয়ে ঢুখিয়ার মাকে দোরগড়া থেকে সরিয়ে দেয়। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জলের স্রোত বইছে। উনুনের পাড় থেকে কুপিটা উঠিয়ে, সে ঘরের কোণার দিকে এগিয়ে যায়। আর একটু হলেই ঘুমন্ত ঢুখিয়াকে মাড়িয়ে ফেলেছিল আর কী! সবুজ আর গোলাপী রঙে রাঙানো বেনাঘাসের কাঠাটির ভিতর থেকে বাবুলাল টেনে বের করে পেট্রোলের শিশিটা। যত্ন করে তুলে রাখা কাজললতাটা, কাঠা থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। বাইরের দমকা হাওয়ার মতো বাবুলাল আবার বেরিয়ে পড়ে জলের মধ্যে। ঢুখিয়ার মা সশঙ্ক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে, একবার শিশিটির দিকে একবার বাবুলালের মুখের দিকে তাকায়। দোর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাবুলাল বলে যায় 'শালা থানে নেই'...।

ঢুখিয়ার মা'র মনে হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তোমার পায়ের ধুলোর ইজ্জৎ রেখো, গোঁসাই। ঢোঁড়াইকে আমার, এই 'চামার'গুলোর হাত থেকে আজ বাঁচিও। বাওয়ার মতো 'ভকত' যাকে আগলে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা, তাকে এই বাবুলাল, তেতর, লাল্লু, বাসুয়া, কী করতে পারে? বিশ্বাস নেই বাবুলাল চাপরাসীকে। ও আগের জন্মের 'সুকৃতের'[1] ফলে, সব কাটিয়ে উঠতে পারে, এ বিশ্বাস ঢুখিয়ার মা'র আছে। তার উপর 'পঞ্চ্'-এর রায়, দশের ফয়সলা। তার 'তাকৎ' গোঁসাই আর রামজীর তাকতের সমান। 'পীপর'[2] গাছের আওতায় মানুষ হয়ে, ছেলেটা কী করে 'পঞ্চ্'-এর কথার খেলাপ যেতে পারল। ওর ঘাড়ে এখন শয়তান সওয়ার হয়েছে। নিশ্চয়ই

১ পুণ্য। ২ অশত্থগাছ।

ধাঙড়টুলির আকলুর মা, কিংবা লখী গোয়ারিনের মতো কোনো 'ডাইন'[1] জানা মেয়েমানুষ ওর উপর 'চক্কর'[2] দিয়েছে। তা নাহলে কি কখনও কেউ এমন করতে পারে। কত পাপই না আমি করেছি, গোঁসাই তোমার কাছে! …'পিট্রৌল'-এর শিশি নিয়ে বাবুলাল আবার এখন কী করতে গেল?…

ঢুখিয়ার মা কিছু ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না।…কী একটা পোড়া গন্ধ না? ঠিকই তো!…ধোঁয়ার গন্ধ; বর্ষার ধোঁয়া উঁচুতে ওঠে না; মেঝেতে পড়া কেরোসিন তেলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতেও ভয় হয়, কী জানি আবার কী দেখব। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঘন আঁধার ভেদ করে, থানের দিকে আকাশে উগ্র লাল আলোর ঝলক লেগেছে।

বাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা

ঢোঁড়াইকে গোঁসাইথানে না পাওয়ায় তাৎমা ফৌজের দল প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না।

শালা, এত রাতেও বাড়ি ফেরেনি। এই ঝড়বৃষ্টির দিনেও। শয়তানী করে নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলিতে বসে আছে, তাৎমাদের বেইজ্জৎ করার জন্য। ঐ ধাঙড়, আর মুসলমানদের বাড়ির ভাত খাওয়াটুকুই বাকি ছিল। তা সে শখটুকুও মিটিয়ে নে। খেয়ে নিস তার সঙ্গে মুরগীর আণ্ডা। ওটাকে হাতের কাছে এখন পেলে,—যেমন করে ধাঙড়রা শুয়োর মারে, এই তেমনি করে…

কয়েকজন বাওয়াকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে বার করে। সে কোনো বাধা দেয় না। বাওয়ার দোষী মন, এই রকমই একটা কিছুর আশা করছিল। কিন্তু এত উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও, বাওয়াকে মারপিট করতে তাদের সাহস হয় না। তাকে কাদার মধ্যে টেনে এনে ফেলা হয়। তারপর চলে জেরা— কোথায় আছে ঢোঁড়াই, বল্। কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিস? শুক্রা ধাঙড়ের বাড়ি? নোখে বেলদারের বাড়ি? কোথায় লুকিয়ে আছে বল্? 'পাক্কী'র গাছতলায়?

বাওয়ার ঘাড় নেড়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু সে নির্বিকারভাবে পিট্ পিট্ করে তাকায়; কিংবা কী ইশারা করে বলে, অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না।—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারো না, কোন দিকে গিয়েছে। দে ঐ

১ ডাকিনীবিদ্যা।
২ যাদুমন্ত্রের প্রক্রিয়াবিশেষ।

জটাটায় আগুন লাগিয়ে। হাঁ বলেছিস ঠিক ; মাথার চাঁদিতে একটু গরম লাগলেই পেটের কথা বেরুবে।

—এই যে বাবুলাল 'পিট্রৌলের' শিশি আর দেশলাই নিয়ে এসেছে।

বাওয়ার ভিজে চালাটিকে জ্বালাবার পর এই পাগলের দলের আক্রোশ একটু কমে আসে। মহতো নায়েবরা বুদ্ধিমান। তারা বুঝতে পারে যে যতটা করা উচিত ছিল, তার চাইতে একটু বেশি করা হয়ে গিয়েছে। বাবুলালের ভয় হয় যে সে-ই পেট্রোলের শিশি এনেছিল। এক এক করে তারা সরে পড়ে। বাকি সকলে গোঁসাইথানে নানা রকম গালগল্প আরম্ভ করে।

আলবৎ বটে 'পিট্রৌলের' ধক। তা না হলে কি আর এ দিয়ে হাওয়াগাড়ি চলে। মাদারঘাটের বুড়ি মুদিয়াইন সেবার শীতকালে গেঁটে বাতের ব্যথায় মর মর হয়েছিল। ডেরাইভার সাহেব তাকে দিয়েছিল একটু 'পিট্রৌল'। শীতে জুবুথুবু হয়ে, পায়ে পেট্রোল ঢেলে যেই 'ঘুর'-এর[১] আগুনের উপর পা তুলে ধরেছে, অমনি গিয়েছে পায়ে আগুন লেগে। চামড়া টামড়া ঝলসে একাকার।

তুই যে আবার সেই 'শাঁখড়েল'-এর[১] গল্প আরম্ভ করলি।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবি। আমি বলছি মিছে কথা। বাসুয়া নায়েবকে জিজ্ঞেস কর, 'মুদিয়াইন'-এর কথা সত্যি কিনা।

'এই বাসুয়া!'

বাসুয়াকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সকলে তাকিয়ে দেখে যে মহতো নায়েবরা নাই। বহুদূর থেকে হেঁপো ত্রেতরের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তাৎমাসুলভ ভয় ও নিজের প্রাণটা বাঁচানোর প্রয়াস সকলকে পেয়ে বসে। এক এক করে দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

প্রেতের দলের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজন থেকে যায়—রতিয়া 'ছড়িদার'[২]।

বাওয়া তার সম্মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ছাই আর আগুনের স্তূপের মধ্যে থেকে তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে। রতিয়া বাওয়ার কাছে ঘেঁষে বসে। হাতের লাঠিটা দিয়ে খানিকটা পোড়া খড় আর ছাই সরিয়ে দেয়। নিচে থেকে আধ পোড়া হাড়িকাঠটা বেরিয়ে আসে। এ কী! হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। কৃত পাপের ভার তার বুকের উপর চেপে বসে। সকলে চলে গেলেও সে থেকে গিয়েছিল, বাওয়ার কাছে একটা

১ এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম।

২ তার কাজ পঞ্চায়তের নোটিস, বাদী, বিবাদী, সাক্ষী, নায়েব সকলকে জানানো, জরিমানার টাকা আদায় করা, ইত্যাদি। আসলে কিন্তু সে মাতব্বরদের ঘুষের দালালী করে।

প্রস্তাব আনবার জন্য; ভিক্ষের জমানো পয়সা যদি কিছু থাকে তাই দিয়ে 'পঞ্চ'দের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা উচিত, এই সোজা কথাটা বাওয়ার মাথায় ঢুকানোর জন্য, সে কাছে ঘেঁষে বসেছিল। কিন্তু হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। পাপের গ্লানিতে আর রেবণগুণীর ভয়ে তার বুক দুর দুর করে। এই হাড়িকাঠের পাশেই সর্বাঙ্গে রক্তমাখা রেবণগুণীর উপর প্রতি বছর গোঁসাই ভর করেন। ভয়ে ছড়িদার ঘেমে ওঠে। বাওয়ার পা জড়িয়ে ধরতে পারলে হয়তো কিছুটা পাপের বোঝা কমত। ঝোঁকের মাথায় এ কী কাণ্ড করে বসেছে সকলে। রেবণগুণী তো সবই জানতে পারে। এই হাড়িকাঠ জ্বালানোর কথা সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গিয়েছে। এখন তার রাগ কার উপর পড়বে সেইটাই হল কথা…

আগুন আর ধোঁয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত পাখিগুলো অশথগাছের উপর এখনও শান্ত হতে পারে নি। অশথগাছের ঝলসানো পাতাগুলো ধোঁয়ায় কাঁপছে। এমন সময় দূরে চেঁচামেচি শোনা যায়। সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে কারা যেন আসছে।

কী হয়েছে রে? আগুন কিসের? বাওয়া কোথায়? ধাঙড়ের দল আগুন দেখে এসে পড়েছে।

ঢোঁড়াই দৌড়ে গিয়ে বাওয়ার পাশে বসে। সে সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ করে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। বাওয়ার কাদামাখা হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নেয়। কেউ কোনো কথা বলে না। বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঢোঁড়াইও জীবনে কাঁদেনি বলেই নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব ধাঙড়রা তাদের গোল হয়ে ঘিরে বসে। রতিয়া ছড়িদার পালাবার পথ পায় না।

শনিচরা উঠে তার দুহাত চেপে ধরেছে।

'বল কে কে ছিল? রগচটা বেড়াল রাগের জ্বালায় খুঁটি আঁচড়ায়। এ হয়েছে তাই। মুনিয়া পাখির মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করছিস কেন? বেশি নড়াচড়া করছিস কি দেব ফেলে ঐ আগুনের ভিতর।'

বিরসা বলে—'পঞ্চায়তির ভোজের ফয়সালা করতে এসেছিলে নাকি বাওয়ার কাছে। দেড় টাকা পেলেই তো ভাতের ভোজ মাপ করে দেবে এখুনি।'

এতোয়ারী বলে—'বাজে কথা যেতে দে। বল্ কে কে ছিল? আগুন লাগিয়েছে কে? বাওয়াকে মেরেছিস নাকি? বাওয়া তুমিই বল না।'

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে যে, না, কেউ তাকে মারেনি।

ঢোঁড়াই বাওয়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখে কোনো মারের দাগ আছে কি

না। সারা গা একেবারে ছড়ে গিয়েছে। 'চামার চণ্ডালের দল।' ঢোঁড়াইয়ের চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। তারই জন্য বাওয়াকে এই জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। শনিচরা রতিয়া ছড়িদারের চুলের গোছা ধরে বলে—'সব সত্যি কথা বল। তা না হলে তোকে আজকে এইখানে আধপোড়া হাড়িকাঠে বলি দেব। এখনও বললি না। দাঁড়া তোর 'ছড়িদার'গিরি ঘোচাচ্ছি।'

ছড়িদার ভয়ে ভয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলে। শনিচরা আর বিরসার রক্ত গরম হয়ে ওঠে সব শুনে। 'দাঁড়া, ধন্নুয়ার মহতোগিরি, আর বাবুলালের চাপরাসীগিরি বের করছি। চললাম থানায়।'

এতোয়ারী, আর শুক্রা তাদের থানায় যেতে বারণ করে। জানিস না দারোগা পুলিসের ব্যাপার। মাথা গরম করিস না, গর্ত খুঁড়ে সজারু বের করতে গিয়ে শেষকালে গোখরো সাপ বেরিয়ে যাবে। পালানোর পথ পাবি না তখন। বুড়ো হাতির কথা শোন। আমার বাবা আমাকে বলে গিয়েছিল কোনোদিন বুড়ো আঙুলের ছাপ দিস না। তার কথা মনে না রেখে সেবার কী বিপদেই পড়েছিলাম, সেই অনিরুধ মোক্তারের ব্যাপারটা মনে আছে না শুক্রা ভাই।

বিরসা বলে, বুড়োদের কোনো কথা চলবে না এখানে। সে সব শুনব নিজের টোলায়। চলরে শনিচরা।'

'কথা যখন রাখবি না, তখন যা ভাল বুঝিস তাই কর। বুড়োর কথা আর গুণীর কথা না রাখ ফল ভাল হবে না, ঠোকর খাবে।'

শুক্রা সায় দেয়—'যত আক্কেল ঘরের বেড়ার মধ্যে। পুল পার হলেই সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়্যতস ; রাহ চলতে বুদ্ধ পাঁচ ; কচহরী গয়ে তো একো ন সুঝে ; যে হাকিম কহে সো সচ।'[১]

সকলে হেসে ওঠে।

সত্যি হলও তাই।

বিরসা আর শনিচরা যখন পাঁচ মাইল দূরের সদর থানায় পৌঁছুল তখন বেশ রাত। দারোগাসাহেব দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বহু ডাকাডাকির পর ছোট দারোগাসাহেবের ঘুম ভাঙে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে তিনি কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করেন—কোন 'শ্বশুর' আবার এত রাতে জ্বালাতন করতে এসেছে। কেয়া হ্যায় কুলদীপ সিং? আবার এখন এই রাতে

১ বাড়িতে থাকলে বুদ্ধি থাকে পঁয়ত্রিশ ; পথে বেরুলে বুদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ ; কাছারী পৌঁছে একও দেখতে পায় না, যা হাকিম বলে তাই সত্যি মনে হয়।

'আউয়ল ইত্তলায়'[১] লিখতে হবে? কুলদীপ সিং বেশ করে 'সমুয়া'টাকে[২] একটু পেটো তো। বেটা মিছে কথা বলতে এসেছে নিশ্চয়।

শনিচরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বিরসা থানার কম্পাউণ্ডে ঢোকেইনি। থানা পর্যন্ত আসবার পর দারোগার নামে তার ভয় ভয় করে। শনিচরার হাজার টানাটানি সত্ত্বেও তার সাহসে কুলোয়নি। সে কম্পাউণ্ডের বাইরে বসেছিল। হঠাৎ শনিচরাকে পালাতে দেখে সেও প্রাণপণে দৌড়োয়—কী জানি আবার কী হল! শহরের কাঁকরভরা রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, প্রায় সেখানে গিয়ে তারা থামে। যে ঘিয়েভাজা খেঁকি কুকুর দুটো ডাকতে ডাকতে তাদের তাড়া করেছিল, সে দুটো আগেই থেমে গিয়েছিল! সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সারা ঘটনার হিসাব নিকাশ করে। তারপর গাঁয়ে ফেরে।

শুক্রা আর এতোয়ারী সারা বৃত্তান্ত শুনে বিশেষ কিছু বলে না। এই রকম যে একটা কিছু হবে, তা তারা আশাই করছিল। ধাঙড়ানীরা বলে যে, যাক্ দারোগার হাত থেকে যে বেঁচে এসেছিস সেই ঢের।

পুলিশের নামে ঢোঁড়াইয়ের পাপক্ষয়

এতোয়ারী পরের দিনও প্রত্যহের মতো জয়সোয়ালদের সোডা-লেমনেডের কারখানায় কাজ করতে যায়। সেখানে ম্যানেজার সাধুবাবুকে সব কথা বলে। পুলিশ সাহেবের গাড়ি, সোডা আর তার আনুষঙ্গিক পানীয়ের বোতলের জন্য জয়সোয়াল কোম্পানির দোকানে থামলে সাধুবাবু ইংরেজি মিশানো হিন্দীতে গত রাত্রের তাৎমাটুলির ঘটনাটির কথা তাঁকে বলেন। সাহেবের মাথা তখনও ঠিক ছিল; দিনের বেলা কোনো কোনো দিন থাকত।

'তাই নাকি। আমার চোখের উপর এই ব্যাপার! চ্যাপ্যাসী, কোটি পর বড়া ডারোগাকো সলাম ডেও।' আগাগোড়া পচ ধরে গিয়েছে সার্ভিসের নিচের অঙ্গগুলিতে। সব ঠিক করতে হচ্ছে।

সাহেবের রাগ দেখে কারখানার ঘরে এতোয়ারী ঘামতে থাকে।

সাধুবাবু এসে বলেন, 'এবার খাওয়াও এতোয়ারী, তোমার কাজ করে দিয়েছি।'

১ First Information Report।
২ সাধারণ গালি।

'আমার নাম বলেননি তো বাবু ?

'আরে না, না, সে আর আমায় বলতে হবে না। ও কী! বুরুশ না নিয়ে, এমনিই বোতল পরিষ্কার করছিস কেন ? বুড়ো হয়ে এতোয়ারী তোর কাজে ফাঁকি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।'

এতোয়ারী অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

সেই রাত্রেই বড় দারোগাসাহেব দুজন কনস্টেবল নিয়ে গোঁসাইথানে পৌছান। আলো দেখে বাওয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। চাটাইখানা বের করে পেতে দেয়। এত বড় হাকিমকে সে কী করে খাতির দেখাবে। চাটাইটার উপর দুই চাপড় মেরে ধূলা ঝাড়বার অছিলায় দারোগাসাহেবকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দেয়।

কনস্টেবল ঢোঁড়াইকে বলে—কী রে দারোগা সাহেবের জন্য একখানা খাটিয়াও যোগাড় করতে পারিস না ?

হাঁ, কপিল রাজার জামাইয়ের কাছ থেকে একখান আনতে পারি।

দারোগাসাহেব বারণ করেন—না না অত 'খাতিরদারি'র[১] দরকার নেই।

গাঁয়ের চৌকিদার লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ সাহেবের গালাগালির কথা, দারোগাবাবুর তখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে—সার্ভিসবুকে কালো দাগ পড়বার ভয় ;—সব এই নচ্ছার চৌকিদারটা খবর দেয়নি বলে খবর না দেওয়ার জন্যে চৌকিদারকে দুটি চড় মেরে দারোগাবাবু কাজ আরম্ভ করেন। আরম্ভ দেখেই সবাই বুঝতে পারে যে, আজ আর কারও রক্ষে নেই চৌকিদারের মতো 'অফসর'-এরই যদি এই হালৎ হয়, তাহলে সাধারণ লোকের কপালে আজ কী-যে আছে, তা গোঁসাই-ই জানেন।

চৌকিদার যায় ধাঙড়টুলি থেকে সকলকে ডাকতে, আর কনস্টেবলরা যায় তাৎমাটুলি থেকে আসামীদের ধরে আনতে। ঢোঁড়াই এত কাছ থেকে দারোগা-পুলিশকে কখনও দেখেনি। তার ভয় ভয় করে। তাই চৌকিদারের সঙ্গে সঙ্গে ধাঙড়টুলির পথ ধরে।

ধাঙড়টুলিতে হুলস্থূল পড়ে যায়। আজ আর কারও নিস্তার নেই। কাল রাতের ছোটা দারোগার মারের হুমকির কথা শনিচরা আর বিরসার মনে আছে। ছোটা দারোগাতেই ওই কাণ্ড। এ তো আবার বড়া দারোগা বাপরে বাপ! পালা, পালা ; চল সব গাঁ ছেড়ে পালাই। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো উর্দ্ধশ্বাসে অন্ধকারে পালাতে আরম্ভ করে ; কলের জঙ্গলে, পুলের নিচে

১ সম্মান দেখানোর।

বাঁশঝাড়ে। কেবল এতোয়ারী থেকে যায়, একজনও না গেলে দারোগা সাহেব চটবে। শুক্রা পালায় সবার শেষে। 'সনবেটা'কে ফেলে পালাতে শুক্রার মন সরে না—আসবি নাকি ঢোঁড়াই? ঢোঁড়াইয়েরও ধাঙড়দের সঙ্গে পালাতে ইচ্ছে করে। আবার ভাবে যে, না, বড় দারোগা আবার বাওয়াকে কী-না-কী করবে; বাড়িতে দারোগা। এই বিপদের সময় বাওয়াকে দারোগার হাতে একলা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর তার জন্যই তো এত কাণ্ড। না হলে এতে বাওয়ার আর কী দোষ ছিল।

যাওয়ার সময় শুক্রা চৌকিদারের হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে যায়। এতোয়ারী আর চৌকিদারের সঙ্গে ঢোঁড়াই ফিরে আসে। পথে এতোয়ারীর সঙ্গে চৌকিদারের ঠিক হয় যে, সে যেন দারোগা সাহেবকে বলে যে, ধাঙড়েরা সকলে আজ ভোজ খেতে নীলগঞ্জে গিয়েছে। কেবল এতোয়ারী ছিল পাড়া পাহারা দেবার জন্য। সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে চৌকিদার ঢোঁড়াইকে বলে, তুই আবার যেন অন্য কিছু বলেটলে দিস্ না ছোঁড়া, বুঝলি।

ধাঙড়দের উপর চৌকিদারের এই অভাবনীয় করুণায় ঢোঁড়াইয়ের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

সমবেত তাৎমার দল সদলে একবাক্যে বলে যে, তারা কেউ কিছু জানে না। বাবুলাল পিট্রৌল এনেছিল। সে, তেতর নায়েব আর ধনুয়া মহতো ঘরে আগুন লাগিয়েছে।

কনস্টেবলরা বাবুলাল, তেতর আর ধনুয়াকে গালাগালি দিতে দিতে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসে। কোথায় গিয়েছে তেতর নায়েবের কাল রাতের প্রতাপ, কোথায় গিয়েছে ধনুয়া মহতোর জিয়লগাছে হেলান দিয়ে বসা ন্যায়াধীশের গুরুগাম্ভীর্য, কোথায় গিয়েছে চাপরাসী সাহেবের পদগৌরব। দারোগা-পুলিশের হাতে বেইজ্জৎ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার, হাকিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার। বাবুলাল করুণ দৃষ্টিতে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়, মহতো দেখে বাওয়ার দিকে—ত্রস্ত চাউনির ভিতর থেকে মিনতি আর কৃপাভিক্ষা ফুটে বেরুচ্ছে। তেতর উদ্গত শ্লেষ্মা গিলে দারোগাসাহেবের সম্মুখে কাশি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় আর কাশি চাপবার উৎকট প্রয়াসে তার চোখে জল এসে গিয়েছে।

ঢোঁড়াইয়ের মনের ভিতর আগুন জ্বলছে; এইবার ঠেলা বোঝো! দেখে যা দুখিয়ার মা, যে চাপরাসী সাহেবের জন্যে তুই নিজেকে বাবুভাইয়াদের বাড়ির মাইজী মনে করিস, দেখে যা তার দশা। দেখিয়ে যা তালের বরফি দারোগা সাহেবকে, পিট্রৌলের শিশির মালকাইন।

হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়; বাওয়ার মনের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পায়। সে ঢোঁড়াইকে অনুরোধ করছে— আসামীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলো না—যা হবার হয়ে গিয়েছে, জাতের লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি জীইয়ে রাখা ঠিক নয়।···

দারোগাসাহেবের জেরা আর গালাগালির বিরাম নেই। সব কটাকে জেলে পাঠাব, সব কটার উপর 'চারশ ছত্তিস দফা'[১] চালাব। সমস্ত গাঁটাকে পিষে একেবারে ছাতু ছাতু করে দেব, মুনেসোয়ার সিং দারোগাকে চেনো না তাই। হিঁদু হয়ে থানের ইজ্জত রাখো না। মুসলমান হলেও না হয় কথা ছিল—তারা সব করতে পারে···

সব আসামীই বলে যে, তারা হুজুরের কাছে মিথ্যা বলবে না, হুজুর মা-বাপ। আকাশে চাঁদ আছেন, গোঁসাই আছেন। রামচন্দ্রজীর রাজ্য চলছে। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়—তাদের মধ্যে যে খারাপ লোক কেউ নেই, তা বলছে না; তবে সরকারের নিমক খেয়ে সরকারের কাছে মিথ্যে বললে তাদের গায়ে যেন কুষ্ঠ হয়। তারা আগুন লাগিয়েছিল ঠিক।···

কেন? শয়তানের বাচ্চা কোথাকার!

বাবুলাল সামলে নেয়। হুজুর বাওয়ার ঐ চালাটার উপর একটা শকুন বসেছিল। শকুনবসা ঘর রাখতে নেই, তাতে পাড়ার অমঙ্গল, থানের অমঙ্গল, আর যে ঐ ঘরে থাকবে, তার তো কথাই নেই। এখানে একটা চামড়ার গুদাম আছে হুজুর, সেইটাই আমাদের জেরবার করল, শকুন-টকুন পাড়ায় এনে।

সকলে প্রথমটায় অবাক হয়ে যায়। আসামী আর অন্য তাৎমাদের ধড়ে প্রাণ আসে। এখন সব নির্ভর করছে বাওয়া আর ঢোঁড়াইয়ের উপর—এই বুঝি তারা সব মিথ্যে ফাঁস করে দেয়।

দারোগাসাহেব বাওয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এরা যা বলছে তা সত্যি কি না।

বাওয়া উত্তর দেয় না। সে প্রথম থেকে দারোগাসাহেবের সম্মুখে একইরকম ভাবে বসে আছে। কোন কথায় সাড়া দেয়নি।

দারোগা ভাবেন লোকটা কেবল বোবা নয়, কালাও। আর সাধারণত তাই হয়। একবার যেন মনে হয়েছিল যে, সে শুনতে পাচ্ছে—তাই না খটকা লেগেছিল দারেগো সাহেবের মনে।

তুই বল ছোকরা।

---

১ ফৌজদারী আইনের চারশ ছত্রিশ ধারার মোকদ্দমা।

ঢোঁড়াইয়ের সব ঘুলিয়ে যায়। মুখ থেকে কথা বেরুতে চায় না। জিব যেন জড়িয়ে আসছে। এত বিপদেও কি লোকে পড়ে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কথা বলতে চেষ্টা করে।

জোরে বল্। ভয় করিস না। তুই এখানেই থাকিস নাকি? বাপকা নাম?—এক নিশ্বাসে দারোগাসাহেব বলে যান।

ঢোঁড়াই মাথা নেড়ে জানায় যে, হাঁ সে এখানেই থাকে।

'এরা যা বলছে তা কি সত্যি?

এতগুলো লোকের ভবিষ্যৎ এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তার জাতের সেরা লোকক'টির পঞ্চগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে, জেলের হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে, পুলিসকে দিয়ে মার খাইয়ে বেইজ্জৎ তো করাতেই পারে। তার মনও তাই চায়। এই পঞ্চায়েতের অত্যাচারের মাথাগুলোকে নিচু করাতে, এমন নিচু করাতে যাতে তারা আর কোনোদিন মাথা উঁচু করে বাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে না পারে—যাতে তারা ঢোঁড়াইকে আর তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখতে পারে।

কিন্তু বাওয়ার চাহনির আদেশ সে অমান্য করতে পারে না।···বাওয়া নীরবে তাকে বলছে যে, জেলে ধরে নিয়ে গেলে এদের এখন ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত খেতে হবে, কোথায় থাকবে তাৎমা জাতের গৌরব, কোথায় থাকবে 'কনৌজি তত্রিমা ছত্রিদের' সুযশের সৌরভ···

এতোয়ারী উস্‌খুস করে। বয়সের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে যে বাওয়া আর ঢোঁড়াই কেউই সত্যি কথা বলবে না। এতক্ষণ সে মনে মনে ভাবছিল, যে গোঁফমোটা জেলরবাবু রবিবারে রবিবারে আসেন জয়সোয়াল কোম্পানিতে, সওদা করতে, সাধুবাবুকে দিয়ে তাঁকে বলিয়ে বাবুলাল আর মহতোর হাতে বোনা একখানা সতরঞ্চি সে জেলখানা থেকে আনাবে; এনে একবার তার উপর বাওয়াকে বসাবে; তার জন্য যত খরচ হয় হোক। অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জও যদি নিতে হয়, তাও স্বীকার···কিন্তু সব 'চৌপট'[1] করে দিল ঐ ঢোঁড়াইটা।

সে বলে যে, হাঁ বাবুলালের কথা সত্যি।

'কবে বসেছিল শকুন?'

'কাল সকালে।'

'মদ্দা না মাদী।'

১ মাটি করে দিল।

ঢোঁড়াই ঢোঁক গেলে।

'ছুদিন পরে মোচ উঠবে এখনও শকুনের মদ্দা মাদী চেনো না—বদমাস ছোকরা। অশথগাছে না বসে চালার উপর বসল কেন শকুনটা—মিথ্যাবাদীর ঝাড় সব!'

ঢোঁড়াই এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে না। সে মনে মনে ভাবে, এইবার বোধহয় দারোগাসাহেব তাকে মারবার জন্য উঠবেন।

'আর কেউ কিছু জানিস, এ সম্বন্ধে। এই বুড্ঢা!'

এতোয়ারী সাদা ভুরুর নিচের ঝাপসা চোখজোড়া আর নির্বিকার মুখ দেখে, তার মনের কিছু বুঝবার উপায় নেই। সে ভেবেছিল তাৎমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে; কিন্তু থানা পুলিশের ভয়ে সব কথা চেপে যায়। ঢোঁড়াইয়ের সাক্ষ্যেই যদি এই 'চোট্টা'গুলিকে সায়েস্তা করা যেত, তাহলে, মাছও উঠত, ছিপও ভাঙত না। কিন্তু এমন সুযোগ পেয়েও এই নোংরা কুড়ের বাদশা, 'বিলকুল চোট্টা' পঞ্চগুলিকে ছেড়ে দিল ঢোঁড়াই। এ জাতটাকেই বিশ্বাস নেই। ও ছোঁড়ার শরীরেও তো এদেরই রক্ত।...কাল সাধুবাবুর কাছে মুখ দেখানো শক্ত হবে তার।

'না হুজুর, আমি থাকি ধাঙড়টুলিতে।'

দারোগাবাবু সাক্ষী না পেয়ে বকেঝকে চিৎকার করে উঠে পড়েন। চৌকিদারকে বলেন—এ শালাদের উপর ভাল করে নজর রাখবে। না হলে তোমার চাকরি থাকবে না।

চৌকিদার ঝুঁকে কুর্নিস করে। দারোগাসাহেব কপিল রাজার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, তারপর শহরে ফেরেন।

একজন কনস্টেবল কেবল থেকে যায়। সে ছড়িদারকে দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথাবার্তা বলে। ছড়িদার এসে মহতো নায়েবদের বলে যে সিপাহীজী জানে যে ঢোঁড়াই বাবুলালের স্ত্রীর ছেলে। সব খবর পুলিশ রাখে। সে এখনি গিয়ে দারোগা সাহেবকে বলে দেবে যে, এই জন্যেই ঢোঁড়াই বাবুলালের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। তারপরই সবকটাকে জেলে পুরবে।

'পঞ্চরা' চাঁদা করে কিছু কিছু দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলে, সিপাহীজীর সঙ্গে।

ঢোঁড়াই ভকতের মর্যাদা বৃদ্ধি

এই ঘটনার পর ঢোঁড়াইকে মহতো নায়েবরা আর কিছু বলতে পারে না। মনে মনে নিশ্চয়ই সেই আগেকার মতই বিরূপ তার উপর, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। আর রাগ না চাপলে উপায় কী, মোকদ্দমা আবার 'খুলে যেতে' কতক্ষণ। পুলিশকে খবর দিয়েছিল কে তা তাৎমারা বুঝতে পারে না। সে লোকটাকেও খুশি করে রাখতে হবে।

বাওয়ার চালাঘর তাৎমারাই আবার তুলে দেয়। বাওয়া কিন্তু তার মধ্যে আর কখনও শোয় না। কেবল বর্ষার সময় ঢোঁড়াই বাওয়াকে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়।

পাড়ার সকলে ঢোঁড়াইয়ের প্রশংসা করে। এতবড় বিপদের থেকে, এতবড় বেইজ্জতি থেকে, সে জাতটাকে বাঁচিয়েছে। তাকে আর কিছু হোক, তাচ্ছিল্য করা চলে না। পাড়ার ছেলেরা ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলে ধন্য হয়, মেয়েরা ডেকে কথা বলে। তার বয়সী অন্য ছেলেদের গাঁয়ের বয়স্ক বয়স্করা 'ওরে ছোঁড়া' বলে ডাকে, কিন্তু তাকে এখন ঢোঁড়াই ছাড়া আর অন্য কিছু বলে ডাকতে বাধে—দুখিয়ার মা'র পর্যন্ত। এতটা সম্মান বাওয়া আর ঢোঁড়াই নিজের পাড়ায় কখনও পায়নি।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মাটি কাটার কথাটা যেমন এই সূত্রে চাপা পড়ে যায়, তেমনি আবার একটা চার বছরের পুরনো কথা হঠাৎ বেরিয়ে আসে—ঐ 'চামড়াগুদামবালা' কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা। ওটা চাপা পড়ে গিয়েছিল সেবার গানহী বাওয়ার 'সুরাজ'এর[১] তামাসার হিড়িকে।

বাবুলাল যে সেদিন দারোগাসাহেবের কাছে চামড়াগুদামের কথাটা তুলেছিল সেটার মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়াও অন্য কথা ছিল। এমনিই তো সবাই ছিল 'চামড়াবালা মুসলমান'টার উপর চটা। তার উপর কিছুদিন থেকে সে জিরানিয়ার একজন মেথরানীকে বাড়িতে এনে রেখেছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে, তাকে মুসলমান করে বিয়ে করবে।

কী যে পছন্দ ও জাতটার বুঝি না। একটা বৌ থাকতে আবার ঐ মেথরানীকে বিয়ে করতে ইচ্ছেও হয়! বলিহারি প্রবৃত্তির! গা দিয়ে সেটার ভক ভক ভক ভক করে নিশ্চয় দুর্গন্ধ বেরোয়। এনে রেখেছিলি তাও না হয়

---

১ স্বরাজ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

বুঝেছিলাম; কিন্তু তাকে মুসলমান করে নিয়ে বিয়ে? কভ্‌ভী নহী!— হেঁপো রুগী ভেতর পর্যন্ত তাল ঠুকে বলে।

সেদিন দারোগাসাহেব রাতে ওর ওখানে গিয়ে কী বলেছেন, কী করেছেন জানতে পারা যায়নি! নিশ্চয়ই তাড়াটাড়া দিয়ে থাকবেন,—যা চটেছিলেন থানের থেকে যাওয়ার সময়।

এই মেথরানীর ব্যাপার নিয়ে গ্রামে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। এমনি তো থানা পুলিশের ভয় ছিলই, তার উপর আবার গোঁসাইথানে হয়ে গেল ঢোঁড়াইকে নিয়ে কাণ্ড; তাই কেউ আর কিছু করতে সাহস পায় না।

মেথরানীটাকে মুসলমান করে বিয়ে করা জিনিসটা, ধাঙড়রাও পছন্দ করে না। তারা নিজেরা হিঁদু কিনা, এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানো দরকার মনে করেনি; তবে তারা যে মুসলমান নয় এ কথা তারা জানত। এই মেথরানীর বিয়ের ব্যাপারটাতে তাদের কেন যেন মনে হয় যে, তাদের হিঁদু জাতের উপর জুলুম করা হচ্ছে। মেথরানীকে তারা ছোঁয় না ঠিক; তা হলেও সে তাদের মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে যাবে গরুখোরে? ছেলে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল; এ মেয়ের ব্যাপার; বিলকুল বেইজ্জতির কথা। আর যখন তা'র ব্যবসা ছিল, শিমুল গাছ কাটার কাজ ছিল, তখন না হয় কপিল রাজার সঙ্গে রোজগারের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই জামাইটা 'পরদেশী সুগা'[১]; আজ নিমফল খেতে বসেছে এখানকার নিমগাছে, কাল থাকবে না। করে চামড়ার ব্যবসা, যার সঙ্গে ধাঙড়দের রোজগারের কোনো সম্বন্ধই নেই। এটার সঙ্গে কিসের খাতির?

কিন্তু কী তাৎমাটুলির, কী ধাঙড়টুলির বড়রা কেউ থানা পুলিশের ভয়ে এবিষয়ে এগুতে রাজী নয়। ঢোঁড়াই এখন ছেলেদের মধ্যে একটু কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে। ধাঙড়টুলি তাৎমাটুলি দুই জায়গার ছেলেরাই তার কথা শোনে। 'পঞ্চ'রা ঢোঁড়াইকেই বলে চুপি চুপি—রাতে মধ্যে মধ্যে ঢিল ফেলিস চামড়াগুদামে। খুব সাবধানে; এসব ছেলেপিলের কাজ। তোদের বয়সে আমরাও অনেক করেছি।

'পঞ্চ'রা মনে মনে ভেবে রেখেছে যে, এ নিয়ে বিপদ আপদ কিছু হলে, ঢোঁড়াইটার উপর দিয়েই যাবে।

ঢোঁড়াইরা মুসলমানটাকে একটু জব্দ করুক বাওয়াও তাই চায়। শোনা যাচ্ছে যে, 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির' মোহন্তজীরও এতে সমর্থন আছে। টোলার

[১] বিদেশী টিয়াপাখি।

মহতো নায়েবদের কাছ থেকে, এত বড় দায়িত্ব আর বিশ্বাসের পদ পেয়ে ঢোঁড়াই বর্তে যায়। কিন্তু একাজ তাদের বেশিদিন করতে হয় না। হঠাৎ শোনা যায় গানহী বাওয়া জিরানিয়ায় আসছেন, 'সাভা'[১] করতে। তাঁকে কি কেউ জেলে ভরে রাখতে পারে। এক মন্তরে তালা পাঁচিল ভেঙে বাইরে চলে আসেন। গানহী বাওয়া মেথর মেথরানীদের খুব ভালবাসেন। তিনি এখানে এলে তাঁকেই বলা যাবে—এই জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।

বন্ধ করে দে এখন ঢিল ফেলার কাজ, ঢোঁড়াই। কদিন দেখই না।

ঝিকটিহার মাঠে গানহী বাওয়ার 'সাভা'য় পৌঁছে তারা দেখে কী ভিড়! কী ভিড়! বকড়হাট্টার মাঠে যত ঘাস, তত লোক; ই-ই-ই এখানে থেকে মরগাধায়ের চাইতেও দূর পর্যন্ত লোক হবে। গানহীবাবার 'রস্‌সি ভর'-এর[২] মধ্যেই তারা যেতে পারেনি, তার আবার তাঁর সঙ্গে কথা বলা। গানহীবাওয়ার কাছে বসেছিলেন মাস্টার সাব, আরও কত বড় বড় লোক সব। কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা না বলতে পারায়, তাৎমাদের দুঃখ হয় খুব। একবার বলতে পারলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু এই 'বেশুমার' লোকের সকলেরই হয়তো নিজের নিজের কিছু কিছু কাজের কথা বলার আছে। যাঁর ধর্ম তিনি নিজেই যদি রক্ষা না করেন তাহলে আমরা কী করতে পারি। যাক গানহী বাওয়ার 'দর্শন'টাতো হল। ঢোঁড়াই দেখে যে, তার চাইতেও বোধ হয় বেঁটে —কিন্তু কী নরম, ঠাণ্ডহা[৩] চেহারা—ঠিক মিসিরজীর মতো। ঢোঁড়াই শুনেছে যে ঘি খেলে নাকি অমনি চেহারা হয়। কিন্তু এ কিরকম 'সন্ত আদমী'[৪], দাড়ি নেই। ঢোঁড়াইদের সব চাইতে খারাপ লাগে, শৌখিন বাবুভাইদের মতো এই সন্ত আদমীর আবার চশমা পরার শখ। গানহী বাওয়ার চেলারা সকলকে বসতে বলে। দর্শন হয়ে গিয়েছে, আর তারা বসে। কেবল বৌকাবাওয়া বসে থাকে—দূর থেকে সে দেখে কম, তাই সাভা শেষ হলে একবার ভাল করে দর্শন করবে বলে।

কিন্তু আজব ব্যাপার! ঢোঁড়াইদের কাজ হাসিল হয়ে গেল এর দিন কয়েকের মধ্যে। চামড়া গুদামটা উঠে গেল ইস্টিশানের কাছে। আসল কথা ইস্টিশানের কাছে না গেলে চামড়া চালান দেবার সুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু তাৎমাটুলিতে ধাঙড়টুলিতে এর ব্যাখ্যা হল অন্য রকম। ঢোঁড়াইয়ের দলের

১ সভা, মিটিং।
২ একরশি অর্থাৎ সিক মাইল।
৩ নরম, ঠাণ্ডা। ৪ সন্ন্যাসী মানুষ।

টিকের জোর, গানহী বাওয়ার অদৃশ্য প্রভাব আর সেদিনের দারোগাসাহেবের হুমকি, তিনটে মিলে যে কপিলরাজার জামাইকে এখান থেকে ভাগিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কারও কোনো সন্দেহ নেই।

এই ঘটনার পর গাঁয়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়ে, তার আত্মপ্রত্যয় বাড়ে তার চাইতে অনেক বেশি। সে মনে মনে অনুভব করে যে রামজী আর গোঁসাই তার দিকে,—ঐ এমনি বোঝা যায় না, মনে হয় তাঁরা ঘুমুচ্ছেন, কিন্তু দেখছেন সব উপর থেকে; যিনি অন্যায় করেছেন তাঁকে ঘা খেতেই হবে।

রামজী ঢোঁড়াইয়ের তরফে; আর এখন সে কারো পরোয়া করে দুনিয়ায়?

তত্রিমাছত্রিদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ

ভাগলপুর জেলার সোনবর্গা থেকে মরগামায় এসেছিল মহগুদাস। তা বলে মরগামার মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের ওখানে নয়। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, তাদের 'ঝোটাহারা' মইয়ে চড়ে। তাদের ওখানে হেঁজিপেঁজি কনৌজী তাৎমাও জলস্পর্শ করে না; তাঁর আবার মহগুদাসের মতো লোক উঠবে সেখানে। তার বলে কত হাল বলদ জমি জিরেৎ তিন তিনটে সাদী[১], ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আঙিনা, 'জনানী'রা[২] বাড়ির বাইরে যায় না, ছেলেপিলে নাতিপুতি, বাড়বাড়ন্ত সংসার।

সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলারা মরগামায় একটা সাভা করেছিল। সেই কুর্মী গুরুভাইদের নিমন্ত্রণ করতে মহগুদাস এসেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের দর্শনটাও হয়ে যাবে, এটাও ছিল ইচ্ছা।

সেই সময় মহগুদাস কিছুক্ষণের জন্য এসেছিলেন তাৎমাটুলিতে। অত বড় একটা লোককে এরা 'খাতিরদারী' কী করে করবে, তাই তাকে এরা থাকতেও বলেনি। কেবল ডিষ্টিবোড অপিস থেকে ডেকে আনিয়েছিল বাবুলালকে। গাঁয়ের মধ্যে ভালা আদমির সঙ্গে কথা বলা লোক, বাবুলাল ছাড়া আর কে আছে। সেই সময় মহগুদাসই কথা পাড়ে, জাতের সম্বন্ধে—তাৎমারা যে সে জাত নয়। রামচরিতমানসে তুলসীদাসজী বলে গিয়েছেন যে, তারা তত্রিমাছত্রি, একেবারে ব্রাহ্মণ না হলেও ঠিক ব্রাহ্মণের পরেই। পশ্চিমে সব জায়গায় কনৌজী তাৎমারা এই নাম নিয়েছে, আর নিয়েছে 'জনৌ'[৩]। এই দেখো,

১ বিয়ে। ২। মেয়েছেলেরা।
৩ পৈতা।

বলে মহগুদাস তুলোর কুর্তার ফিতে খুলে বের করে দেখায় তার গলার পৈতেটা—আঙুলের মতো মোটা, সোনার মতো হলুদ রঙের।

মহগুদাস তো গেলেন চলে, কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন আগুন তাৎমাটুলিতে।

ঢোঁড়াই, রবিয়া, আরও অনেকে তখনই পৈতা নিতে চায় কিন্তু মহতো নায়েবরা রাজী না। এসব জিনিস হট্‌ করে করে ফেলা কিছু নয়। বুড়োরা ভয় পায়—'ধরম' নিয়ে ছেলেখেলা ঠিক নয়। পচ্ছিমে করছে, পচ্ছিমের লোক তোকে হাতের আঙুল কেটে দিতে বল্লে দিবি? পচ্ছিমে এক সের আটার রুটি হজম হয়, এখানে হয়? 'গোঁসাই'কে ঘাঁটাস না খবরদার!—যেমন আছেন তেমনি তাঁকে থাকতে দে; খুশী না হন, অন্তত তোর উপর চটবেন না।

তাৎমাদের পুরুত মিসিরজী, গত দুবছর থেকে প্রতি রবিবারে গোঁসাইথানে রামায়ণ পড়ে শুনিয়ে যান, আর এর জন্য এক আনা করে পয়সা দক্ষিণা পান পঞ্চায়েতের কাছ থেকে। তাঁরই কাছে 'পঞ্চ'রা জিজ্ঞাসা করে পৈতা নেওয়ার কথা। তিনি বলেন যে, মহগুদাস বাজে কথা বলেছে—রামায়ণে তন্ত্রিমাছত্রির কথা লেখা নেই। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করে না। ঢোঁড়াই পরিষ্কার তাঁর মুখের উপর বলে দেয় যে, তিনি অন্য জাতের নতুন করে পৈতা নেওয়া পছন্দ করেন না, সত্যি কথাটা চেপে যাচ্ছেন। তুমি খামকা ভয় পাচ্ছ মিসিরজী; তুমি এলে গায়ের কম্বল চারাপাট করে মুড়ে, ইয়াঃ 'গদ্দাদার'[1] আসন পেতে দেব বসতে—যেমন এখন পেয়েছ। চির-অ-কা-আল···

বাওয়া ঢোঁড়াইকে থামিয়ে দেয়।

'শুভ আচরণ কতহুঁ নেহি হোই
দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ।'[2]

বলে, মিসিরজী চটে শালুর খোলে রামায়ণটি বাঁধতে আরম্ভ করেন।

তারপর ঢোঁড়াইরা মরগামায় সিরিদার বাওয়ার কুর্মী চেলাদের সঙ্গে, এই পৈতা নেওয়া নিয়ে অনেকবার দেখাশুনো করেছে। তারাও পৈতা নিতে বারণ করে তাৎমাদের। ঢোঁড়াই চটে আগুন হয়ে যায়;—কুর্মী কুর্মছত্রি হতে পারে, কিন্তু আমরা পৈতা নিলেই পৃথিবী ফেটে জল বেরিয়ে যাবে; না?

আমাদের কথা পছন্দ না, তা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলি কেন?

তাৎমাটুলি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন ধন্নুয়া

১ গদিযুক্ত।

২ ভাল আচরণ আর কোথাও রইল না। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে কেউ আর মানে না। (তুলসীদাস)

মহতোর বাড়িতে এল তার শালা মুঙ্গীলাল, 'কুটমৈতি'[১] করতে। তাৎমাটুলির তাৎমাদের মধ্যে মহতোই প্রথম বিয়ে করেছিল নিজের গাঁয়ের বাইরে ভগরাহাতে, জিরানিয়া থেকে ন' মাইল দূরে। আজকাল 'কুটমৈতি'তে কেউ এলেই বাড়ির লোক বিরক্ত হয়। কুটুম এসেই বলবেন 'ভেটমুলাকাৎ'[২] করতে এলাম। কিন্তু বাড়ির লোক সবাই জানে যে, 'ভেটমুলাকাতে'র তখনই দরকার হয়, যখন নিজের বাড়িতে খাওয়া জোটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কুটুম এলেই দিতে হবে পা ধোয়ার জল, খড়ম থাকলে খড়ম, বসতে বলতে হবে বাইরের বাঁশের মাচাতে, নিজেরা খাও না খাও তাকে দুবেলা ভাত খাওয়াতেই হবে, পার আঁচানোর জল তার হাতে ঢেলে দিতেই হবে; কিন্তু এবার মুঙ্গীলালের খাতির বেশি, সে পৈতা নিয়েছে। পৈতাটা কানে জড়িয়েই, সে দিদির বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পা ধুয়েই সে পৈতার কথাটা পাড়ে। মহতোর ছেলে গুদর ডেকে নিয়ে আসে ঢোঁড়াইকে। পাড়াসুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুটুমের মাচার উপর। খাসা মানিয়েছে পৈতেটা কানে জড়িয়ে! আরে হবে না, এ যে আমাদের নিজেদের জাতের জিনিস। সেকালে আমাদের বাপঠাকুরদাদারা যখন কাপড় বুনত, তখন মাড় দিয়ে সুতো মাজবার সময় সবাই কানে জড়িয়ে রাখত এক এক গাছা সুতো। মাজতে গিয়ে সুতো ছিঁড়েছে কি কানের থেকে একগাছা খুলে নিয়ে ছেঁড়াটা জুড়ে দাও। পৈতা কি আর আমাদের নতুন জিনিস।

সেকালের তন্ত্রিমাছত্রিদের পূত-গৌরবের উত্তরাধিকারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পচ্ছিমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ জেলায় চার কোশ দূরের তাৎমারা পৈতে নিয়েও যখন মাথায় 'বজর'[৩] পড়েনি, তখন আমরা নেব না কেন? মুঙ্গীলালও এতে সায় দেয়। মহতো শালাকে কিছু বলতে পারে না। মনে মনে ভাবে যে, তাৎমাটুলির লোকেদের দলে ভিড়াতে না পারলে, ভগরাহার তাৎমাদের 'বিয়াসাদী কিরিয়াকরম'-এর অসুবিধা হবে, তাই মুঙ্গীলালটা এই সব ছোকরাদের নাচাচ্ছে।

খালি ছোকরাদের মধ্যে জিনিসটা সীমাবদ্ধ থাকলে না হয় মহতো তাড়া-তাড়া দিয়ে ব্যাপারটা সামলে নিতে পারত। লাড্ডু নায়েবও ছেলেদের দিকে হয়ে গেল, বাবুলালেরও নিমরাজি নিমরাজি ভাব, এই পৈতা নেওয়ার সম্বন্ধে। রেঁপো তেতর হাঁ না কিছুই বলে না। ঠিক হয় পৈতে নেওয়া হবে। তবে এটা 'কানফুকনেবালা গুরুগোঁসাই'[৪]-এর অনুমতিসাপেক্ষ।

১ কুটুম্বিতা। ২ দেখাসাক্ষাৎ।
৩ বজ্র। ৪ দীক্ষাগুরু।

তিনি থাকেন অযোধ্যাজীতে। সেই একবার এসেছিলেন তাৎমাটুলিতে, যেবার জিরানিয়ায় 'টুরমন'-এর তামাসা[1] হয়। সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল তাঁকে দেবার জন্য। অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কিছু কর্জও করতে হয়েছিল, তাঁর 'গদ্দীবালা কিলাসের টিকস'[2] কাটিয়ে দেবার জন্য; এগারো টাকা সাড়ে তিন আনা ভাড়া; না না মহতোর বোধহয় ভুল হচ্ছে, ন' টাকা সাড়ে তিন আনা, সে কি আজকের কথা; সাড়ে তিন আনাটা ঠিক মনে আছে, তবে টাকাটা এগার কি ন'···বাবুলাল তুমিই বল না. 'অফসর আদমী'—তোমরা···হিসেব টিসেব জানো···

বাবুলাল বলে, দশ টাকা সাড়ে তিন আনা। সকলেই জানত যে বাবুলাল দশ টাকাই বলবে; পরিমাণ, মাপ, সংখ্যা প্রভৃতি নিয়ে ঝগড়া উঠলে মাঝামাঝি একটা নির্ণয় দেওয়াই ভাল 'পঞ্চ'দের নিয়ম।···

হাঁ, যে কথা বলছিলাম—মহতো কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়—'গুরু-গোঁসাইকে একখানা 'পোসকার্ট'[3] লেখা যাক।

গ্রামে সাড়া পড়ে যায়—অযোধিয়াজীতে পোসকার্ট লেখা হবে। গাঁয়ে এর আগে কখনও চিঠি লেখা হয়নি। তবে মহতো নায়েবরা খবর রাখে যে, ডাকঘরের মুন্সীজী চিঠি লিখতে নেয় এক পয়সা। মিসিরজী লেখে ভাল। কিন্তু সে কি দু'পয়সার কম কাজ করবে। যেমন জায়গায় পুজো দিতে যাবে, তেমনি খরচ হবে। 'থানে' এক পয়সার গুড়ে পুজো হতে পারে, কিন্তু অযোধিয়াজীতে পুজো দেওয়া তো দূরের কথা, পৌঁছুতেই দশ টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মহতো পোসকার্টের দাম দিতে চায় না; বলে পঞ্চায়তের ত'বিলে 'খড়মহরা'ও[4] নেই।

ঢোঁড়াইয়ের দল জ্বলে ওঠে—'কী করেছ জরিমানার সব পয়সা?'

ছড়িদার পঞ্চদের বাঁচিয়ে দেয়—'পঞ্চরা তার হিসেব দেবে কি তোমাদের কাছে?'

'হ্যাঁ দিতে হবে হিসেব', 'কেন দেবে না?'

একটা বড় রকমের ঝগড়া আসন্ন হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই নিজের খাটুয়া থেকে একটা পয়সা বার করে দেয়—'এই আমি দিলাম পোসকার্টের দাম।' সকলে অবাক হয়ে যায়—ঢোঁড়াইটা পাগল হল

১ ডিষ্ট্রীক্ট টুর্ণামেণ্ট (১৯১৭), যুদ্ধে সাহাযাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

২ ইণ্টার ক্লাস টিকিট।

৩ পোষ্টকার্ড। ৪ কানাকড়ি।

নাকি! দশের কাজ, একজন দিয়ে দিচ্ছে কি? আর একটু অপেক্ষা করলে মহতো নিজেই দিয়ে দিত। বোকা কোথাকার!

বাবুলাল ঢোঁড়াইকে বলে 'আর এক পয়সা লাগবে পোসকার্টে' ডিষ্টিবোর্ডের অফিসার—পৃথিবীর সব খবর তার নখদর্পণে। ঢোঁড়াই আরও একটা পয়সা ফেলে দেয় সকলের মধ্যে।

মহতো বলে, বাবুলাল তুমিই তাহলে কিনো পোসকার্ট দেখেশুনে ঢোঁড়াই তুই মিসিরজীকে রবিবারে দোয়াত কলম আনতে বলে দিস।

রবিবারে মিসিরজী রামায়ণ পাঠের বদলে চিঠি লিখে দেন; আর মেয়ের পর্যন্ত রামায়ণ শুনতে এসেছে। কী জোর দিয়ে দিয়ে লেখে! এখানে পর্যন্ত খস্ খস করে শব্দ শোনা যাচ্ছে, দেখতে দেখতে কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে কলমে পৈতে নেওয়টা মিসিরজীর মনঃপূত নয়, কে জানে আবার ভুলটুল না লিখে দেয় পোসকার্টে...

ঠিক হয় বাবুলাল চিঠি ডাকে দেবে। সকলে ডাকঘর পর্যন্ত তার সঙ্গে যায়।

তারপর চলে কত জল্পনা-কল্পনা, ডাকপিয়নের জন্য প্রত্যহ প্রতীক্ষা। কী চিঠি মিসিরজী লিখে দিয়েছিল কে জানে। একমাস অপেক্ষা করেও চিঠির জবাব আসে না গুরুগোঁসাইয়ের কাছ থেকে।

ঢোঁড়াইদের আর ধৈর্য থাকে না। আবার গাঁয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে যায় এ নিয়ে।

ঢোঁড়াই বলে—'আর কেউ না নিক, আমি একাই পৈতা নেব। কালই যাব সোনবর্গা।'

অন্তরের থেকে সকলে এই জিনিসটাই চাইছিল। কেবল মনে মনে একটু ভয় ছিল,—কী জানি কী হয়; ডগরাহার তাৎমারা পৈতে নেওয়ার পর সেখানে অনেকগুলো গরুমোষ, দু' তিন দিনের অসুখে মারা গিয়েছে—গরুগুলো খায়ও না দায়ও না, দু' তিন দিন গোবরের সঙ্গে রক্ত পড়ে, তারপর মরে যায়।

যাক্, তাৎমাটুলির লোকদের চাষবাস গরুমোষের বালাই নেই। গুরুগোঁসাইয়ের নাম নিয়ে তারা পৈতা দেওয়ানোর জন্য বামুন ডেকে পাঠায় সোনবর্গা থেকে।

তারপর একদিন গাঁসুদ্ধ ছেলেবুড়ো একসঙ্গে মাথা নেড়া করে আগুনের ধারে বসে, গলায় কাছির মতো মোটা পৈতে নেয়। দুদিন গাঁয়ের মেয়ে পুরুষরা আলাদা থাকে; তারপর একসঙ্গে ভাতের ভোজ খেয়ে নিজের নিজের

বাড়ি বেয়ে। সেদিন থেকে ভাৎমায়া হয় 'দাস'—ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াইদাস।

মহতো বাবৈধরের বিরুদ্ধে পৈতা নেওয়ার দলের নেতৃত্ব কবে কী করে এসে পড়েছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। লোকে বোধ হয় বুঝেছিল যে মাটিকাটা নিয়ে তার দেওয়া আঘাত সমাজ সহ্য করে গিয়েছে। হিম্মৎ আছে ছোকরার। আর পৈতার ব্যাপারে ওটা মনে ঠিক সবার মনের কথাটা। তার একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেছে যে, যতই ঢোঁড়াই 'পঞ্চ'দের বিরুদ্ধে কথা বলুক, মহতো সেরকম কড়া হতে পারে না আর ঢোঁড়াইয়ের উপর। কেন যে, তা বোঝে কেবল মহতোগিন্নি আর মহতো—আর অল্প-স্বল্প আন্দাজ করে ঢোঁড়াই।

ঢোঁড়াইদাসের নূতন জীবিকা

ঢোঁড়াই 'পাক্কী'তে[১] কাজ করে। তার পাথরে কোঁদা হাতের পেশীগুলি গত বেড় দু বছরে আরও সবল হয়ে উঠেছে। গানের সময় গলার স্বর ভারি ভারি ঠেকে। রাস্তা মেরামতের কাজের সব রহস্যই এখন সে জেনে গিয়েছে। বর্ষার আগে 'ড্রিরেসিং'এ কী করে ফাঁকি দিতে হয়, কী করে কেবল উপরের ঘাস চেঁচে নিয়ে রাস্তার গর্তর উপর চাপা দিতে হয়, সড়কের ধারের চৌকোণা মাটিকাটা গর্তগুলির মাটি উপর উপর কেটে কী করে অফিসার ঠকাতে হয়, ভাঙা পাথরের স্তূপ মাপবার সময় কেমন করে কাঠি ধরলে মাপে বাড়ে, সব তার জানা হয়ে গিয়েছে। শেষের কাজটাতেই লাভ সবচেয়ে বেশী। এইসব কাজে 'ওরসিয়র' বাবু আর ঠিকেদার সাহেব তাদের বকশিশ করেন; কেবল শর্ত হচ্ছে যে এনজিনিয়র সাহেব কি চেরমেন সাহেব হঠাৎ এসে জেরা করতে আরম্ভ করলে, তাদের গুছিয়ে জবাব দিতে হবে। জেরায় মচকেছ কি গিয়েছ। তাহলেই 'জিলা-খারিজ'[২]। আর জেরায় উৎরে গেলেই পেট ভরে 'দহিচূড়া'র ভোজ;—চূড়াদহির নয় দহিচূড়ার,—দই বেশি, চিড়ে কম। নুন দিয়ে খাও, কাঁচালঙ্কা পাবে; মিঠা দিয়ে খেতে চাও গুড় পাবে—ইয়াঃ দানাদার গুড়, একেবারে লস্‌লস্‌ লস্‌লস্‌।

রাস্তার পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি গেলে শনিচরারা গাড়োয়ানদের ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করে। ঢোঁড়াই এ কাজ করতে পারে না, তার ভয়-ভয় করে,—গোঁসাই আর রামজী সব দেখতে পাচ্ছেন

১ কোশী-শিলিগুড়ি রোডে। ২ বরখাস্ত।

উপর থেকে। বয়ক একলা থাকলে গাড়োয়ানকে সাবধান করে দেয়। ঢোঁড়াই জানে যে গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া পাপ; ঠকাতে হয় সরকারকে ঠকাও, চেয়ারমেন সাহেবকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করো।

এই সেদিনও দুটো ছেলে গাড়ির রেস দিচ্ছিল। একজনের ছিল বলদের 'স্প্রিংনি'[১], আর একজনের খোলা গরুর গাড়ি। তুমুল উৎসাহের সঙ্গে তারা দুজনে পাল্লা দিচ্ছে, আর স্প্রিংনির গাড়োয়ানটা হাসতে হাসতে বলছে, 'এইও! যে গাড়ির স্প্রিং নেই সে গাড়ি মাটির উপর দিয়ে চালাও, পাকা রাস্তা থেকে নামো শীগগির।'

'ওরে আমার হাওয়াগাড়িওয়ালারে!'

'জলদি নিচে ভাগো, কাচ্চীতে[২]।'

'—দুটো চাকাতেই যে 'ফুলে কুপো'[৩]। চারটে চাকা থাকলে না জানি কী করতিস। একখান হাওয়া গাড়ি আসুক না পিছন থেকে; অমনি 'সটকৃদম' হয়ে যাবে। গুড় গুড় করে নেমে আসতে হবে এই 'নালায়েক'-এর[৪] পাশে।

ঢোঁড়াই তাদের দুজনকেই রাস্তার কাঁচা অংশটিতে নেমে আসতে বলে।

—'তুই কোন ডিস্ট্রিবোর্ডের নাতি যে আমাদের মানা করতে এসেছিস? প্রত্যেক বছর আমরা বলে জিরানিয়া বাজারে ফসল নিয়ে আসি বেচতে। তোদের সর্দারকে পয়সা দিয়ে এই আসছি, এখান থেকে কোশভরও হবে না; আর তুই কোন 'ক্ষেতের মূলো'[৫] লাল চোখ দেখাতে এসেছিস আমাদের উপর।'

ঢোঁড়াই তাদের বুঝোয়—আরে কথাটাই শোন আমার। খানিক আগেই রোডসরকার আছে; তালে মহলদারের নাম শুনেছিস। রোডসরকার আর সর্দারের মধ্যে সাট আছে। একজন পয়সা নিয়ে যেতে বলে দেয় 'পাক্কী'র উপর দিয়ে; আর একজন খানিক আগেই আবার ধরে পয়সা নেওয়ার জন্যে।'

'তাই নাকি!'

দু জোড়া সশঙ্ক চোখ আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'সত্যি?'

তোমার নাম কী ভাই?' 'আর তোমাদের?' 'ধূসর? সোনৈলী

---

১ দুই চাকার এক রকম গাড়ি। এই গাড়িগুলিতে সাধারণত লোহার স্প্রিং লাগানো থাকে।

২ কাঁচা রাস্তায়।

৩ 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'-এর স্থানীয় ভাষায় ইডিয়ম।

৪ অযোগ্য।

৫ সামান্য লোক। 'মশা বলে কত জল' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

থানায়?' গল্প জমে ওঠে। খয়নি বেরোয়। সেখানে রাজদ্বারভাঙ্গার তহশীল কাছারি আছে, প্রকাণ্ড গাঁ…গুরুজীর ইস্কুল আছে।

এদের গাড়ি চলে যায়। আবার অন্য গাড়ি এসে পড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করতে করতে, বলদের গলার ঘণ্টা বাজিয়ে, উড়ন্ত ধুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে।

ঢোঁড়াই গান বন্ধ করে আবার তাদের সঙ্গে কথা বলে। কত গাঁয়ের কত আজব আজব খবর শোনে। কোথা থেকে কোথায় চলে গিয়েছে রাস্তা। এ রাস্তার আরম্ভ কোথায়, আর শেষ কোথায় সে জানে না। কেউ জানে না বোধ হয়। কোনো গাড়ি আসছে ভুট্টা নিয়ে, কেউ গাড়িতে আসছে কাছারিতে মোকদ্দমা করতে, কেউ আসছে রুগী দেখাতে। দেশের বিরাটত্বের একটা আবছা ছায়া পড়ে তার মনের উপর; তার রাস্তা তোয়ের করার সঙ্গে এত লোকের এত গাড়ি আসা যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে মোটামুটিভাবে এ জিনিসটা সে বোঝে। 'পাক্কী'তে কাজ না করলে এ জিনিস বোঝা যায় না।

কিন্তু এসব কথা মনে হতে পারে ন'মাসে ছ'মাসে, এক আধ মুহূর্তের জন্য। এ সবের সময় কোথায়! তার গ্যাং-এর কেউ কেউ গাড়িতে মেয়েছেলে দেখে হয়তো ততক্ষণ রাজকন্যা সুরঙ্গা আর রাজপুত্র সদাবৃচের প্রেমের গান আরম্ভ করেছে। কেউবা হেসে ঢলে পড়ে, এ ওর গায়ে; খোয়ার টুকরো ছুঁড়ে মারবার ভান করে। ঢোঁড়াই সব বোঝে, দেখে মুচকে মুচকে হাসে। একটা রহস্যের কুয়াশায় ঘেরা এই মেয়ে জাতটা, তার জানতে ইচ্ছা করে, বুঝতে ইচ্ছা করে। সে মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে তার কৌতুহল চাপা দিতে চায়। আর মেয়েদের কথা ভাবতে গেলেই কোথা থেকে কখন যে এসে পড়ে যত নষ্টের গোড়া ঐ দুখিয়ার মা'টার কথা বুঝতেই পারে না। দুখিয়ার মা তার কোনো অনিষ্ট করেনি একথা ঠিক; কিন্তু তার উপর যে কোথাও অবিচার করা হয়েছে এ কথা বুঝবার মতো বুদ্ধি তার হয়েছে। আর মহতোগিন্নী, কিছুদিন থেকে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে খুব আলাপ জমাবার চেষ্টা করছেন; তিনি ঢোঁড়াইয়ের ছোট বেলার গল্প, বেশ রং চং দিয়ে, তাকে শুনিয়েছেন কয়েকদিন। বাপ মরা ছেলেটাকে গোঁসাইথানে ফেলে দিয়ে, মা গিয়েছিল পাটগটিয়ে 'সাগাই' করতে! তাই এতদিন পরে মহতোগিন্নীর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠেছে ঢোঁড়াইয়ের জন্য। পাকা কাঁঠালের ভিতরের বোঁটা দিয়ে তরকারী রেঁধে তিনি ঢোঁড়াইকে আদর করে খাওয়ান, আর ঐ সব পুরনো গল্প করেন। তাঁর হাতে-খড়ম-পরা পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়া দূরে বসে বসে সব শোনে।

দুখিয়ার মা না হয় বদ ; সে না হয় ঢোঁড়াইকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু মহতো নায়েবরা সে সময় কী করছিল ? তাৎমা জাতটা কী করছিল ? বাওয়া ছাড়া আর কেউ, তার কথা ভাবেনি কেন ? সকলের বিরুদ্ধেই তার অনেক কিছু বলার আছে। আর রামজী "বজরংবলী মহাবীরজী"[১] তাঁরা কি তখন ঘুমিয়ে -ছিলেন ? এদের উপরও অভিমান ঘনিয়ে ওঠে তার মনে।

সামুয়র সন্দর্শনে

রাস্তার কাজ করার সময়, ঢোঁড়াইয়ের রাজ্যের কথা মনে আসে। শনিচরারা মধ্যে মধ্যে বলে, কী রে ঢোঁড়াই স্বপ্ন দেখছিস নাকি ? তোর গোঁফের রেখা দেখা দিচ্ছে ; এবার একটা সাদী করে ফেল।

'ধেৎ !'

'ধেৎ আবার কি ! তবে মেয়ের বাপকে দেবার টাকার যোগাড় করাই শক্ত। কিরিস্তান হতিস, তো সামুয়রের মতো সাহেবের টাকা পেতিস।'

পাদরি সাহেব সামুয়রকে মলি সাহেবের বাগানের মালীর কাজে বাহাল করিয়ে দিয়েছিলেন। পুরনো নীলকর পরিবারের সব সাহেবই চলে যাচ্ছে একে একে জিরানিয়া থেকে। মলি সাহেবও কয়েক বছর থেকে যাব যাব করছে। জমি জিরেৎ বেচতে আরম্ভ করে দিয়েছে অনেকদিন থেকেই। জমির দাম নাকি শীগগিরই কমতে পারে এইজন্য এই বছরটায় সম্পত্তি বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছে সাহেবদের মধ্যে। মলি সাহেব, তাঁর চাকর-বাকর, ডাক্তার, উকিল, আত্মীয় অনাত্মীয় অনেককেই যাওয়ার আগে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যাবেন, এ খবর এই অঞ্চলের সকলেই জানে। অনেকের টাকা শোনা যায় পাদরি সাহেবের কাছে জমাও করে রেখে দিয়েছেন। এখন বিসারিয়া কুঠির সম্পত্তিটা সুবিধামতো দামে বিক্রি করে দিতে পারলেই মলি সাহেব চলে যেতে পারেন জিরানিয়া ছেড়ে। শনিচরা এই মলি সাহেবের টাকার কথাই বলছিল।

সামুয়রও এখন জোয়ান হয়ে উঠেছে। থাঁদা থাঁদা মুখটা, কিন্তু সাহেবের মতো টকটকে চেহারা হয়েছে তার। কুঠির সাইকেলে চড়ে ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখ দিয়ে, ডাকঘর থেকে সাহেবের ডাক নিয়ে আসে প্রত্যহ। আর শিস দিতে দিতে রোজ সন্ধ্যার সময় তাড়ি খেতে যায়।

১ বীর হনুমানের একটি নাম। বজ্রের মতো শক্তি যার।

'ঐ ভাখ সামুয়র আসছে। ওর গোঁফ উঠছে দেখেছিস ভুট্টার চুলের মতো।'

ঢোঁড়াই হেসে ফেলে। সত্যিই সাইকেলে সামুয়র আসছে। মাথায় একখান রুমাল বাঁধা।

'রুমাল বেঁধেছে ছাখ না—ঠিক ছুরিতালাবেচা ইরানী মেয়েদের মতো। নিশ্চয়ই ডাকঘর থেকে আসছে।'

'মোচের রেখাটা কামিয়ে নে সামুয়র' সকলে হেসে ওঠে। সামুয়র সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। এরা এক ডাকে সামুয়রকে আসমান থেকে জমিতে এনে ফেলেছে; কত কথা সে সাইকেলে ভাবতে ভাবতে আসছিল।···

নূতন আয়াটি দেখতে শুনতে বেশ। আলিজান বাবুর্চির সঙ্গেও তার আশনাই আছে, আবার সামুয়রের সঙ্গেও। গত বছর সাল শেষ হওয়ার রাতে গির্জার হলঘরের পাশের ছোট ঘরে,—যে ঘরটায় মতির মার্বেলে মেমসাহেবরা নিজের নিজের তকদীর দেখছিল[১]—সেই ঘরটায়—অর্ধেক রাত হবে তখন—বাইরে পোষের শীত, বরফের মতো ঠাণ্ডা—কিন্তু ঘরটার ভিতর কী গরম!—আয়ার গাউনটায় কী সুন্দর গন্ধ, মেমসাহেবের শিশি থেকে চুরি করা খোশবায়; অটো দিলবাহারের চাইতেও ভাল গন্ধ, তার সঙ্গে মিশেছে সিগারেট আর পিঁয়াজের গন্ধভরা আয়াটার নিশ্বাস,—সেদিনের নেশার ঘোরে সবই মধুর লেগেছিল। বাবুর্চি এক নম্বরের ঘুঘু—বাড়িতে তার দু দুটো বিবি।···

এদের ডাকে সামুয়র বিরক্ত হয়েই সাইকেল থেকে নামল। ভাল লাগে না এগুলোর সঙ্গে কথা বলতে। সবে সে সিগারেটটা ধরিয়েছে। ভাগ্যে সে কিরিস্তান, না হলে এ লোকগুলো তার মুখ থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়েই টান মারত। রাজার জাত হয়ে লাভ আছে। সেই জন্যেই না আলিজান বাবুর্চি মাংসটা খাওয়ায়; সাহেব তাকে টাকা দিয়ে যাবে বলে; আয়াটার সঙ্গে আলাপ জমাবার সুবিধে হয়।

ঢোঁড়াই ঠাট্টা করে বলে, 'সামুয়র, তোর সায়েব শুনছি যাবে না?'

সামুয়র বলে, 'ও না গেলেও আমার ভাল, আবার গেলেও ভাল। না গেলে এ আরামের কাজটা তো থাকবে। আর গেলে তো কথাই নেই—টাকা পাওয়া যাবে।' কথায় কেউ হারাতে পারবে না সামুয়রকে। দু-একটা আলগা আলগা কথা বলবার পর, সে চিঠি আর খবরের কাগজের তাড়া হাতে নিয়ে আবার সাইকেলে চড়ে।

১ Crystal gazing. ঐ ঘরে স্ফটিকের একটি গোলাকার পাত্রে খৃষ্টানদের পবিত্র জল রাখা থাকে।

'দেরি হলে সাহেব চটবে। কিছুদিন থেকে দেখছি সাহেবের মেজাজটা যেন ভাদ্রের কুকুরের মতো হয়ে রয়েছে।'

'তোরই তো মনিব ; আবার কেমন হবে ?'

সামুয়র সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপর ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে পা চালায়, এই গেঁয়োগুলোকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য।

'আরো জোরে চালা। আগের গরুর গাড়িতে লাল শাড়ি দেখেছে, ওকি আর আস্তে চালাতে পারে।'

বিরষা বলে—'বিলকুল লাখেড়া[1] হয়ে গিয়েছে। আমি দেখেছি কিরিস্তান হলেই এমনি হয়। সব বুদ্ধি ছেলেবেলাতেই খরচ হয়ে যায়।'

ফুলঝরিয়ার খেদ ও শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা

ঢোঁড়াইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে মহতোগিন্নী। তার আজকাল খাতির কত।

বাবুলাল নাকি মহতোগিন্নীর কাছে বলেছে যে, চেরমেন সাহেব সফরে যাওয়ার সময় হাওয়াগাড়ি থামিয়ে রাস্তায় ঢোঁড়াইকে জেরা করেছেন। ঢোঁড়াই জেরায় খুব ভাল জবাব দিয়েছে। বাবুলাল সঙ্গে ছিল সেই হাওয়া গাড়িতে। সেই কথাই মহতোগিন্নী শোনাচ্ছিলেন ঢোঁড়াইকে। ঢোঁড়াইয়েরও এ প্রসঙ্গে উৎসাহ কম নয়। মহতোগিন্নীর সম্মুখে তার ছিল একটা সংকোচ ভাব। কিছুক্ষণের জন্য ঢোঁড়াই এ ভাব ভুলে যায়। তাকে ধাঙড় পাওনি যে চেরমেন সাহেব জেরায় হারিয়ে দেবে! এতদিন তাহলে জাতের 'বুজুর্গ'দের[2] কাছ থেকে সে কি কেবল 'পাটকাঠি ভাঙতে' শিখেছে। দলের মধ্যে বয়স কম দেখে, তাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। এমন 'মুহ্‌তোড়'[3] জবাব দিয়েছে যে বাছাধনের চিরকাল মনে থাকবে।...আনন্দে গুদরের মা'র কাতলা মাছের মতো মুখ থেকে কালো দাঁত দুপাটি প্রায় বেরিয়ে আসে। হঠাৎ তাঁর ঢোঁড়াইকে নুন দেওয়ার কথা মনে পড়ে। ঢোঁড়াইয়ের পাতার পাশেই মাটির খুরিতে নুন রাখা হয়েছে।

'ওরে ফুলঝরিয়া ঢোঁড়াইকে একটু নুন দিয়ে যা।' ফুলঝরিয়া তাঁর মেয়ে।

[1] একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে।

[2] বড়দের, গুরুজনদের।

[3] মুখ ভাঙা ; কড়া আর উপযুক্ত উত্তর।

তার পায়ের দিকটা খুব সরু। হাতে খড়ম পরে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে-সে চলাফেরা করে।

থাক, থাক, আমি নিজেই নিচ্ছি—বলে ঢোঁড়াই খুরিটা থেকে নুন নেয়।

'নিজে নেবে কেন। কী যে বলে আমার 'বাচ্চা' তার ঠিক নেই! ফুলঝরিয়া কি আর এখন সেই ছোট আছে।' এই কথা বলে মহতোগিন্নী নিজের মেয়ের বয়স সম্বন্ধে মেয়ের সম্মুখেই এমন একটি নির্লজ্জ ইঙ্গিত করে যে ফুলঝরিয়া ও ঢোঁড়াই দুজনই লজ্জা পায়। খট্ খট্ করে উঠোনে খড়মের শব্দ হয়। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দটা—ফুলঝরিয়া বোধ হয় বাইরে গেল। তার শরীরের উপরের দিকটা অস্বাভাবিক রকমের পুষ্ট।

'ওরে ফুলঝরিয়া! কোথায় গেলি আবার। লজ্জা হয়েছে বুঝি। কোথা দিয়ে যে পরমাত্মা কী করেন, কী রকম যোগাযোগ ঘটান, বোঝা শক্ত। কাকে চালের খাপরা উল্টে দেয়, আর তার থেকে চলে ঘরামির রোজগার। তবে সব জিনিসের সময় আছে। তার খেলাপ হওয়ার জো নেই। জিয়লের ডাল বর্ষাকালে লাগাও, পচে যাবে; আর চোৎবোশেখে পোঁতো শুখনো ধুলোর মধ্যে তাও লেগে যাবে।' 'এ একটা কথার মত কথা বলেছ গুদরীমাই।' হঠাই মহতোর গলা শুনে ঢোঁড়াই চমকে ওঠে,—ও তাহলে উঠোনেই আছে। এতক্ষণ সাড়া দেয়নি। মহতোই নিশ্চয়ই তাহলে গুদরের মাকে দিয়ে এই সব করাচ্ছে। গুদরীমাই ডাকসাইটে মেয়েমানুষ ঠিক, কিন্তু এত খাওয়ানো-দাওয়ানো, এত সব, এ মহতোর মতো মাথাওয়ালা লোক পিছনে না থাকলে, একা গুদরীমায়ের দ্বারা সম্ভব হত না। বাবুলালও হয়তো আছে এর ভিতর। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। সেই জন্যই না চেরমেন সাহেবের জেরা করার গল্প করেছে। দুখিয়ার মা-টাও থাকতে পারে এর মধ্যে। তিনিও থাকেন সর্বঘটে। 'এ শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, ও শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, দুনিয়ার শিউজীর মাথায়, জল ঢালা' তার চাই-ই চাই[১]।

ঢোঁড়াই অনেক দিন আগেই মহতোগিন্নীর এত আদর যত্নের উদ্দেশ্য বুঝেছে। সে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না।

'আর চারটি ভাত নেবে না? ওকি ছাই খাওয়া হল? এই জোয়ান বয়সে ঐ চারটি ভাতে কী হবে? এই ফুলঝরিয়া আমলকির আচার দিয়ে যা! ও মেয়ের আবার বুঝি লজ্জা হয়েছে। সর্ষে দিয়ে নিজে হাতে আচার করেছে আমার মেয়ে। কোথায় গিয়ে সে মেয়ে বসে থাকল এখন কে জানে।

১ স্থানীয় ভাষার এর অর্থ—সর্বঘটে বিরাজমান থাকা। আবশ্যক অনাবশ্যক সব কাজেই হাত দেওয়া এবং কোনো কাজই ঠিক করে না করা।

নিজে আচার তৈরি করে, নিজেই দিতে ভুলে গেল। কী যে আমার কপালে ভগবান লিখেছেন কে জানে। শুনয়ের বাপ আবার সেদিন বলেছিল যে সরকার নতুন কানুন করছে—মেয়ের বিয়ে, তিন ছেলের মা হওয়ার বয়স না হওয়া পর্যন্ত, হতে দেবে না। দিলেই কালাপানির সাজা। ঘোর কলি! এও চোখে দেখতে হল, কানে শুনতে হল। রতিয়া, রবিয়া, বাসুয়া সবাই কোলের মেয়ের পর্যন্ত বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে। ভগরাহা থেকে আমার ভাই সেদিন এসেছিল; সে বলল যে সেখানে একজন মুসলমানের বাড়ি একটা বিয়ে হয়েছে, বরকনে দুজনেই এখনও পেটে।

মহতো উঠোন থেকেই ঠাট্টা করে, তোমার ভাইয়ের তো কথা।

আমার ভাই কি মিছে কথা বলেছে। সকলকে নিজেদের মতো মনে কোরো না।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার ভাই এত সত্যবাদী যে মুখ দিয়ে যে কথা বার করে, তা ফলে যায়। এখন ঐ পেটের দুটোই যদি মেয়ে হয়, কি দুটোই যদি ছেলে হয় তাহলে? তোমাদের গাঁয়ে ও রকম বিয়েও চলে নাকি?

মহতোগিন্নী ভাইয়ের কথা সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আচ্ছা ও কথা যেতে দাও, রবিয়া আর বাসুয়া কোলের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কিনা? এখন আমার বরাতে কী আছে জানি না। আমরা তো ধাঙড় না যে সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখব; আর যেসব গরীবগুলোর টাকার অভাবে কনে জোটে না, সেগুলো বদ নজর দেবে তার উপর।...

চোঁড়াই উঠে পড়ে। মহতো নিজে তার হাতে জল ঢেলে দেয়।[১]

'ফুলঝরিয়া! ও ফুলঝরিয়া সকড়ি কি তুলতে হবে না?'

ফুলঝরিয়া তখন বাড়ির পিছনের কলার ঝাড়ের পাশে বসে আকাশপাতাল ভাবছে।...কী পাপই না সে আগের জন্মে করেছিল। তারই উপর গোঁসাইয়ের যত আক্রোশ। কোন পাপ সে করেছিল জানে না। তবে কেন সে হাতে খড়ম প'রে থাকবে? কেন অন্য দশজনের মতো সে চলতে ফিরতে পারে না? তাৎমাটুলির অন্য মেয়েরা বলে যে সে রূপের গরবে গত জন্মে 'শিউজী'কে[২] লাথি মেরেছিল; তার বাবা বলে যে সে মরদকে দিয়ে নিশ্চয়ই পা টিপিয়েছিল আগের জন্মে। ছি ছি ছি ছি ছি! কেন তার দুর্মতি হয়েছিল। মরদে টিপবে ঝোটাহার পা! শিউজীর মাথায় সে মারতে গিয়েছিল লাথি!

১ আঁচানোর জল ঘটি থেকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিজে ঢেলে নেওয়া, বাড়ির লোককে অপমান করা বলে গণ্য হয়।

২ মহাদেব : শিবলিঙ্গ।

শাস্তিই তার হয়েছে। রেবণগুণী কিন্তু বলে অন্য কথা। সে বলে যে ঠিক যেখানটায় সে জন্মায় সেই জায়গাটায় মাটির নিচে নিশ্চয়ই কালো বিড়ালের হাড় আছে। জন্মানোর ছ'দিনের মধ্যে কাঁকড়াবিছে ভাজা সরষের তেল, ঐ পায়ে মালিশ করতে পারলে, তবে ঐ বিড়ালের হাড়ের দোষ কাটাতে পারত। তা সে সময় তো আর মা বাবা রেবণগুণীকে দেখায়নি। দেখায় ছ'মাস পরে। তখন আর দেখিয়ে কী হবে। তার বাবাকে ভাগলপুরবাহার বৈদজী[১] বলেছিল যে এখনও যদি সদ্য মরা ভূঁড়ো শিয়ালের পেট চিরে, তার গরম গরম নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসতে পারা যায়, তাহলে অনেকটা উপকার পাওয়া যেতে পারে। তা ফুলঝরিয়ার বাবা আজ পর্যন্ত একটাও শিয়াল ধরার ব্যবস্থা করতে পারল না। এতদিন ফুলঝরিয়ার মনে আশা ছিল যে পঙ্গু হলেও তার বিয়ে হয়েই যাবে। কেননা কে না জানে যে তাৎমাদের বিয়েতে মেয়ের বাপ টাকা পায়; আর এই টাকার জন্য কত গরীব তাৎমা বিয়ে করতে পারে না, বহুদিন পর্যন্ত। তার বাবা টাকা যদি না চায়, তাহলেই দুটো রাঁধা ভাত পাওয়ার লোভে, কত মরদ তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। কিন্তু এ কি 'সরাধ'-এর কানুনের[২] কথা শোনা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। মেয়ের বাপ হয়েও খোসামোদ করতে হবে ছেলের বাপকে? ছোট ছোট মেয়ের বাপরা তাৎমা হয়েও বরের বাপের দুয়োরে ধন্না দিচ্ছে। বোঝায় কথা, —টাকা পর্যন্ত দিতে তৈরি মেয়ের বাপ; টাকা! বুচকুনিয়ার বাপ তো তিন বছরের বুচকুনিয়াটার বিয়ের জন্তে অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জ করে ফেলল! তাকে দোষই বা দেওয়া যায় কী করে! সে বেচারা কালাপানি থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্ত ছেলের বাপকে টাকা দিয়েছে। এখন এই 'হাওয়ায়' কে আর ফুলঝরিয়াকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই 'সরাধ'-এর কানুন সত্যিই তারই 'সরাধ'-এর (শ্রাদ্ধর) জন্য হয়েছে। আজ যে রোগা, কাল সে মোটা হতে পারে; আজকের ছোট, কাল বড় হতে পারে; কিন্তু হাতে খড়ম পরা মেয়ে কোনোদিনই পায়ে চলতে পারবে না—হাজার শিয়ালের পেটে পা ঢুকিয়ে বসে থাকো। এখনও কি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? না হলে সরকার আবার তাকে শাস্তি দেবার জন্য এ 'সরাধ'-এর কানুন করছে কেন। সরকার তুমিও তো ভগবান। তোমারই দয়ায় রেলগাড়ি, হাওয়াগাড়ি চলে। মহাবীরজীর মতো তোমার তাকৎ; চেরমেন

১ হাতুড়ে ডাক্তার।

২ 'সর্দা' আইনের বিকৃত উচ্চারণ। 'সরাধ' কথাটির শব্দগত অর্থ শ্রাদ্ধ।

সাহেব তোমার 'খাজাস'[1]। অত ক্ষমতা যার, তার ফুলঝরিয়ার মতো সামান্য লোকের উপর রাগ কেন?

তার চোখে জল আসে…

'এ গে ফুলঝরিয়া! চেঁচিয়ে যে আমার গলা ফাটল, কথা কি কানেই যায় না। বিয়ের কথাতেই মাচার উপর পা উঠল নাকি?'

পা তুলবার ক্ষমতাও যদি তার থাকত,—ফুলঝরিয়ার দু চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছে। মাকে দেখে সে চোখ মুছে নেয়। দেখে ফেলল নাকি মা?

'এত মাকড়সার জাল এই কলা গাছের দিকে; দেখা যায় না অথচ চোখেমুখে লেগে যায়। আজ সকালেও ছিল না। মাকড়সার জাল নাকে লাগলে বড় নাক চুলকোয়; না মা?'

রামিয়া কাণ্ড

তাৎমাদের 'ধানকাটনী'র রাজ্যে যাত্রা

কার্তিক অঘ্রাণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। ঘরামির কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিষ্কার করার কাজ তখনও আরম্ভ হয় না। বোধ হয় সেই জন্যই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রানে যায় ধান কাটতে। তারা ফিরে আসে পৌষের শেষাশেষি। পুবেই যায় বেশি,—মারনী, আমৌর, রুৎবা থানাতে। ওদিকে রোজগার বেশি, 'বাঙাল মুলুকের' কাছে কিনা, সেই জন্য; কিন্তু রোজগার বেশি হলে কী হয়, 'পানি বড্ডা গরম আওর বড্ডা বুখার'[2]। তার উপর ওদিকে 'মিয়া' বেশি[3]। সব সময় 'জাতপাত' বাঁচিয়ে চলাও শক্ত, ঐ 'পাট আর পানির' দেশে। তাই অধিকাংশ বছরেই তাৎমা মেয়েরা যায় পচ্ছিমের কমলদাহা, বড়হড়ী, ধোকড়ধারা এই সব থানায়। এসব জায়গার জল ভাল 'আধাসের মাড়ু হজম করতে আধা ঘণ্টা।' বড় খিদে পায় এই যা মুশকিল। কিন্তু গেরস্তরা ভাল লোক। যে মজুরনী কম খায় তাকে তারা কাজে নিতে চায় না;—বলে যত 'পুরুবের বিমারী মিযারী লোগ'[4]; এরা হজম করতেই পারে না, তার কাজ করবে কী? তবে মজুরের চাহিদা পশ্চিমে কম; তাই গঙ্গাজী, কোশীজী পার হয়ে

[1] চাকর।
[2] জল বড় খারাপ আর ম্যালেরিয়া।
[3] মুসলমান বেশি।
[4] পূর্বের রুগ্ন লোক।

ঘুজের আর ভাগলপুর জেলায়, হাজারে হাজারে মজুর মজুরনী এদিকে আসে ধানকাটনী'র সময়। তাদের মতো পরিশ্রম করতে তাৎমানীরা পারে না।

এই ধান কাটার সময়, মহতোর পরিবারের মেয়েরা আর ঢুখিয়ার মা ছাড়া তাৎমাটুলিতে আর কোনো তাৎমা মেয়েই থাকে না। সেই জন্য অঘ্রান পোষ মাসে বাড়ির সব কাজই তাৎমা পুরুষরা নিজে হাতে করে। এই সময় পাড়ায় নেশা ভাঙের মাত্রা বেড়ে যায়। 'ধানকাটনী'র দল দেড় মাস পরে ফিরে এলে প্রতি বারই পুরুষদের এই সময়ের কৃতকর্মের ফিরিস্তি, মহতোগিন্নী, পাড়ার মেয়েদের শুনিয়ে দেন; 'ঝোটাহারা' তখন নতুন আনা ধানের মালিক; পুরুষকে সরা জ্ঞান করে। প্রতি সংসারে ঝগড়া-বিবাদ বেশ জমে ওঠে। বাড়ির কর্তাই নিচু হয়ে, এই দুমাস 'ঝোটাহা'দের খোসামোদ করে। তাই তাৎমাটুলির মেয়েরা বলে—'কখনও নৌকার উপর গাড়ি, কখনও গাড়ির উপর নৌকো। দশ মাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা।'

তাৎমাদের বছরখানেক থেকে দিন বড় খারাপ যাচ্ছে। কাজ পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার আনা তো মজুরি; তাই দিতেই আবার বাবুভাইয়াদের তম্বি কত! চাল, শুনতেই চার পয়সা সের; কিন্তু শস্তা জিনিসেরও দাম তো দিতে হবে। ঐ চারটে পয়সাই আসে কোথা থেকে, সে খবর কি বাবুভাইয়ারা রাখে। খেতে গেলে পরনের কাপড় নেই, পরনের কাপড় কিনতে গেলে উপোস করে থাকতে হয়। পাক্কীতে কাজ করার সময় চাঁভাইরা প্রত্যহ দেখে যে, পাট বোঝাই করা গরুর গাড়ির সার ফিরে চলেছে; জিরানিয়া বাজারের গোলাদাররা আর কিনতে চায় না। তাৎমাটুলিতে সাঝের পর বাবুভাইয়া আর বাজারের লোকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ধাঙড়রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, এবার দেখছি গোসাই থানে' বেলফুলের মালা বিক্রি হবে। 'ঝোটাহ'াদের ঝুঁটিতে তেল পড়ছে দেখিস না?

'পচ্ছিমের' ভর্সড় লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের 'গুরুজী' থাকে গ্রামের বাবুদের বাড়ি। সেখানেই বাবুদের ছেলে পড়ায়, খায়দায়, মোসাহেবি করে, ফাইফরমাশ খাটে, মোকদ্দমার তদ্বির করে, চিঠি লিখে দেয়। সে এসেছিল জিরানিয়ার চেরমেন সাহেবের কাছে, ভর্সড়ের বাবুকে সঙ্গে নিয়ে; তার বদলির হুকুম রদ করাতে। বাবু চেরমেন সাহেবের পুরনো মক্কেল। চেরমেন সাহেব জিরানিয়ায় ছিলেন না। বাবুলাল চাপরাসী তাদের নিয়ে যায় কেরানীবাবুর বাড়ি। ঘিয়ের ভাঁড় আর কলার কাঁদি উঠোনে রেখে সে কেরানী সাহেবকে ডাকে। এক মিনিটের মধ্যে গুরুজীর কাজ হয়ে যায়।

এর জন্য আবার রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, এই 'দেহাতী' ভুটো; বাবুলাল মনে মনে হেসেই বাঁচে না। ভর্সডের বাবুলাহেব বাবুলালের হাতেও একটা টাকা দেন। বাবুলাল বলে মোটে এক টাকা?

ধান ঘরে আসুক। বিক্রি করে তারপর টাকা দেব। এখন টাকা কোথায়, গেরস্তর কাছে?

বাবুলাল এসব শুনতে অভ্যস্ত; কাজ হওয়ার পর আবার কেউ টাকা দেয়?

'আচ্ছা 'ধানকাটনী'র লোক তোমরা নেও কোথা থেকে?'

'এবার আবার লোকের অভাব? কবে থেকে লোকেরা ঘোরাঘুরি করছে।'

'আমার টোলার লোক নাও না।'

গুরুজী 'চেয়মেন সাহেবের' চাপরাসীকে চটাতে রাজী নন—ভবিষ্যতে আবার এ শয়তানটার দরকার হতে পারে।

'তা, দিও, জন চল্লিশেক।'

তাৎমাটুলির বর্ধিষ্ণু লোক বাবুলাল। উর্দি পাগড়ি পরবার অধিকার পেয়েছে সে ভগবানের কৃপায়! সে নিজের জাতের জন্য এটুকুও করবে না? আজকের এ অভাব অনটনের দিনে, এ একরকম রামজীর ছাপ্পর ভেঙে দান বলতে হবে! কার্তিক মাস শেষ হতে চলল এখন পর্যন্ত তাৎমাটুলিতে ধানকাটনীর জন্য কোনো জায়গা থেকে ডাক আসেনি। এবার গেরস্তরা ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই রাখবে নাকি? এই হতাশার মধ্যে ভর্সডের খবরে, পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়! ধন্যি ধন্যি করে সকলে বাবুলালের; ঠেকারে দুখিয়ার মা'র মাটিতে পা পড়ে না। তার দেমাক আরও বেড়ে যায়, যখন সে দেখে যে, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে এবার মহতোর স্ত্রী আর খোঁড়া মেয়েও 'ধানকাটনী'তে যাচ্ছে।

যাওয়ার সময়, মহতোগিন্নীর মাথার উপরের উদুখলটিতে, দুখিয়ার মা কচুপাতায় মুড়ে খানিকটা তামাক দিয়ে বলে 'ভালয় ভালয় সব কটাকে ফিরিয়ে এনো গুদরের মা।'

মরমে মরে যায় মহতোগিন্নী। তবুও জবাব দেয় 'হাঁ, সেই জন্যেই তো যাচ্ছি এদের সঙ্গে।'

দূরে থেকে রতিয়া ছড়িদার চেঁচায়—'এসো না সকলে এখনও মেয়েদের এত কি গল্প তা বুঝি না।

যাওয়ার পথে সকলে গোঁসাইথানে প্রণাম করে যায়।

'ধানকাটনী'র সময় একেবারে মেলা বসে গিয়েছে ভর্সডের 'চাপ' এর মহ।

ধারে। সিরিপুর, ভর্মড়, সোনাদীপ, কেঁয়ে এই চার গাঁ জুড়ে এক চকে কিছু জমিতে ধানের ক্ষেত। ধান হয়েছেও তেমনি;—শীষের ভারে শুয়ে পড়েছে গাছগুলো; কোথাও আল দেখা যায় না। উঁচু জায়গাগুলিতে কাটা ধানের সোনালী পাহাড়। তারই আশেপাশে মানুষ ঢুকতে পারে এইরকম ছোট ছোট খড়ের টোপর খাড়া করা হয়েছে, সারির পর সারি। রাতে যা হিম পড়ে! পোয়ালের পাহাড়ের 'ঘুর'[1] জ্বালালেও কিছুতেই আর কান গরম হতে চায় না[2]।

ভর্মড়ের বাবুদের ধান কাটিতে এবার এসেছে দু'দল লোক; এক দল মুঙ্গের জেলার তারাপুর থেকে, আর একদল তাৎমাটুলি থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় সত্তর জন লোক,—পুরুষ মাত্র জন দশেক।

ভর্মড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই গান গাইতে গাইতে দোকান গলায় ঝুলিয়ে পানওয়ালা পৌঁছয়—'টিকিয়া, তামাকু, পান।' ধানকাটনীর অস্থায়ী গাঁগুলোয় এরা ঘুরে বেড়ায়, বিড়ি, খয়নি, তামাক, পান, সুপুরি, সাবান, আরও কত জিনিস বেচতে। এ ছাড়া অন্য পেশাও আছে এদের এই ধানকাটনীর মেয়েদের মধ্যে।

পানওয়ালারা গান গেয়ে লোক জমিয়ে তারপর সওদা বেচে। কিন্তু তাৎমারা এই তো সবে এসেছে; ধান কাটা আরম্ভ করবে, তবে না তাই দিয়ে জিনিস কিনবে। এখন সে এসেছে কেবল আলাপ পরিচয় করতে।

'অবকী সমৈয়া ধিরজা ধরেনি গে বেটী
নহী উপ্‌জল্‌ ছেই পাটুয়া ধান,
কি রুক কে করবৌ বীহা দান
অবকী সমৈয়া ধিরজা ধরেনি গে বেটী।'

(এবারটা ধৈর্য ধরে থাক মেয়ে। পাট ধান জন্মায়নি কেমন করে বিয়ের খরচ করব)।

তাৎমা মেয়েরা সকলে পানওয়ালাকে ঘিরে বসে। এমন গান যে গাইতে পারে তার সঙ্গে কি আলাপ জমাতে দেরি লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, এই ধানের রাজ্যের সব খবর পানওয়ালা তাদের জানিয়ে দেয়।

—ভর্মড়ের বাসিন্দে ধানকাটনীর লোকেরা নাকি সব চলে গিয়েছে এবার সিরিপুরে কাজ করতে। দু'একটা 'ডালার বেগুন'[3], কেবল ভর্মড়ে আছে—

---

১ আগুন পোয়াবার স্থান।

২ কানেই এদেশের লোকের ঠাণ্ডা লাগে সবচেয়ে বেশি। সেইজন্য শীতকালে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ঢাকা থাকুক বা না থাকুক, কানটি ঢাকা চাই-ই।

৩ হিন্দী প্রতিশব্দ—ডাগরেকা বৈগন'।

কখনও এদিক থেকে গড়িয়ে ওদিকে যায় সেগুলো, কখনও ওদিক থেকে গড়িয়ে এদিকে আসে। এবার ধান রোপার সময়, সিরিপুরের বাবুরা প্রত্যেক মজুর মজুরনীকে 'জলপান'-এর সঙ্গে হয় লঙ্কা, না হয় পেঁয়াজ দিত! তাই নিয়ে ভর্সড়, কেমৈ, আর সোনদীপের বড় গেরস্তরা মিটিং করে। কত বোঝায় সিরিপুরের বাবুকে, পেঁয়াজ লঙ্কা বন্ধ করবার জন্য—পরের পুরুষের লোকেরা তোমায় দোষ দেবে। গেরস্তরা মরে যাবে এতে, যা চলে আসছে তার বিরুদ্ধে যেও না, ওদের তো চেনো না—পেঁয়াজ লঙ্কা দেবার রেওয়াজ হয়ে যাবে। একবার যে গাছে বক বসে সে গাছকে খরচের খাতায় লিখে রেখে দাও।[1] কিন্তু সিরিপুরের বাবুও 'হিম্মৎওয়ালা' লোক—মরদের কথা আর হাতির দাঁত, টস্ থেকে মস্ হবার জো নেই সেখানে।[2] সেই সিরিপুরের বাবুর লঙ্কা-পিঁয়াজের উদারতার কথা মনে রেখে, কাছাকাছির যত মেয়েছেলে গিয়েছে সেখানে কাজ করতে। আরও কত খবর বিরজু পানওয়ালা শোনায়।

গুদরের মা বলে, 'তাই বলি! এই জন্যই ভর্সড়ের বাবু বাবুলাল চাপরাসীর কথা রেখেছে। শুনলে তো? আর তাই নিয়ে ঢুখিয়ার মা'র ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না।'

সব তাৎমানীরই নীরব সমর্থন আছে এই কথায়। বিরজু পানওয়ালা লোক চেনে। মহতোগিন্নীকে দিয়েই তার কাজ হবে।

ধান্যক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শন লাভ

অদ্ভুত এই 'ধানকাটনী'র রাজ্য। নতুন পোয়াল আর পচা পাঁকের গন্ধে ভরা দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের 'ঘুর'-এর ক্ষীণ আলোয়, কারো মুখ চেনবার উপায় নেই, অথচ কাটা ধানের পাহাড়ের উপর তাদের ছায়া নড়ে। সোনার পাহাড়গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোর ডাক হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না বলে ভুল হয়। খড়ের গাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জলের মধ্য দিয়ে 'পানডুব্বী' ভূত[3] রাতদুপুরে ছপ্ ছপ্ করে চলে বেড়ায়—সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দহের উপর 'রকস্' ভূত[4] আলো জ্বালিয়ে হাতছানি দেয়—

১ জিস গাছপর বগুলা বৈঠে, জিস দরবারমে-মৈথিল পৈঠে অর্থাৎ যে গাছে বক বসেছে, আর যে দরবারে মৈথিল ঢুকেছে, তা গেল বলে। ২ বিন্দুমাত্র নড়চড় হওয়ার জো নেই।

৩ জলে ডুবে মরলে এদেশে 'পানডুব্বী' ভূত হয়। এই ভূতেরা সারারাত জলের মধ্যে ছপ্ ছপ্ শব্দ করে হাঁটে।

৪ আলেয়া।

এই এখানে, তো পরের মুহূর্তে 'হুই-ই-ই' সাঁওতালটুলির ধারে চলে গিয়েছে। 'বর'-এর ধারে গল্প জমে ওঠে। সব তাৎমার অভিজ্ঞতা একই রকম,—রাতে যখন সে মাঠে গিয়েছিল, তখন তাকে একটা মেয়ে ইশারা করে সঙ্গে যেতে বলে। দেখেই বোঝা গিয়েছে যে মেয়েটা 'শাঁখচুন্নি'[১]। তার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় সে ঐ পুবের শিমুল গাছটায় উঠে গেল। সকলের গা ছম্‌ছম্‌ করে।

একে এই বিচিত্র পরিবেশের আবেদন, তার উপর মহতো নায়েবদের নাগালের বাইরের জায়গা এটা। 'ধানকাটনী'র দল তাই এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অন্য অন্যবার দলের গিন্নীপনা করত রতিয়া ছড়িদারের স্ত্রী। এবার মহতোগিন্নী এসে পড়ায় পদমর্যাদার দাবিতে তিনিই ধানকাটনীর গাঁয়ে সর্বেসর্বা হয়ে যান। বাইরের লোকের সঙ্গে দলের তরফ থেকে কথাবার্তা চালায় রতিয়া ছড়িদার।

এই এক মাসের শিবিরের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সবই তাৎমাটুলি থেকে ভিন্ন। সামাজিক বাধানিষেধ এখানে শিথিল; জাত-পাত-এর বিচার কম; যে বেশি ধান কাটতে পারে, সবাই তাকে হিংসা করে; যে মেয়ের যৌবন আছে তার রোজগারের অভাব নেই; যে পুরুষের বয়স আছে, মেয়েদের কাছে তার কদর আছে; এখানে তাব সাতখুন মাপ।

কোনো সংস্কারের বালাই থাকলে কি এত লোক থাকতে ঢোঁড়াইয়ের মা'র আলাপ হয় মুজের তারাপুর দলের রামিয়ার মা'র সঙ্গে। বেশ সুশ্রী চেহারা রামিয়ার; ভাল নাম রামপিয়ারী। তাদের দলের লোকের কাছ থেকে তাৎমাটুলির দল প্রথম কানাঘুষো খবর শোনে রামিয়ার মা'র সম্বন্ধে। সে ছিল বাজীর বাড়ির 'দাই'[২]—দাই কথাটার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে, মুখে হাসির ইঙ্গিত এনে তারা বলে। না হলে তাৎমানীরা আবার ঝিগিরি করে নাকি? তার স্বামী ছিল পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কয়েক বছর আগে মরেছে। গত বছর বাজীও মারা গিয়েছে।

'ধানকাটনী'র পরিবেশে এমন রসালো খবরও মোড়লগিন্নীর মনে উল্লাস জাগায় না। তার উপর 'রামিয়ামাই'টাও[৩] এত ভালমানুষ। সব সময় কুণ্ঠিত থাকে—একটু দোষী-দোষী ভাব, অথচ কোনো কথা লুকানোর চেষ্টা নেই। মহতোগিন্নীর মায়া হয় তার উপর। অন্য জায়গার সমাজের লোক সে; তার চালচলনের নাড়ীনক্ষত্র দিয়ে তাৎমাটুলির লোকের দরকার কি?

১ এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম। এরা পুরুষ দেখলে ডাকে।
২ ঝি। ৩ রামিয়ার মা।

তারাপুরের দল থাকে এখান থেকে 'রশি'-খানেক দূরে। রামিয়ামাইয়ের উথলিটা থাকে এখানে—তাৎমার দলের মধ্যে। রোজ রাত্তে উথলিতে ধান ভানতে রামিয়ামাই আর মহতোগিন্নীতে কত সুখদুঃখের কথা হয়। দুজনেরই আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে হয়েছে যত সমস্যা।

'আমার রামিয়ার পা খোঁড়া না হলে কী হয়; তার বিয়ে নিয়েও মুশকিলে পড়েছি। তুমি তো বহিন তোমার কপালকে দোষ দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছ, আমার তো সে উপায়ও নেই। আমার কপাল তো আমি নিজেই পুড়িয়েছি।'

বলেই রামিয়ামাই বুঝতে পারে যে ফুলঝরিয়ার খোঁড়া পায়ের কথাটা তোলা উচিত হয়নি দুজনেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আবার গল্প জমে উঠতে কিছুক্ষণ সময় লাগে।

ঐ পোড়ারমুখো পানওয়ালাটা এসে রামিয়ার কথা পেড়েছিল। ভর্দ্দরের বাবু বোধ হয় পাঠিয়েছিল তাকে। দিয়েছি তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। তারই জবাবে দাঁত বের করে বলে কিনা—সব কেচ্ছাই জানি তোমার, মেয়ের বেলায় এত সতীপনা কেন? হারামজাদা! ধোঁদলের বিচির মতো তার দাঁতগুলো ইচ্ছে করে এক থাবড়ায় ভেঙে দি।

মহতোগিন্নীর কাছে বিরজু পানওয়ালার স্বভাব অজ্ঞাত নয়। ঐ দালালটার কাছ থেকে সে প্রায় দু'টাকার জিনিস মাগনা পেয়েছে। অন্য অন্য বছর এই রোজগারটা করত ছড়িদারের বৌ। ঐ তো রবিয়ার বৌ আর হারিয়ার বৌ চলেছে দহের দিকে, এত রাতে। রামিয়ার মা-টা আবার বুঝতে পারল নাকি? বোঝে নিশ্চয়ই সব।

খড়ের গাদা থেকে রামিয়া আর ফুলঝরিয়ার হাসির স্বর ভেসে আসে দুই মায়ের কানে; একেবারে হেসে ফেটে পড়ছেন দুই সখীতে। যাক ফুলঝরিয়াও তাহলে হাসতে জানে।

শুনে ফেলেনি তো ওরা আমাদের কথা?

না, এতক্ষণ 'উথলি সামাট'-এর শব্দে নিজেরাই নিজেদের কথা প্রায় শুনতে পারছিলাম না, তার ওরা শুনবে।

ফুলঝরিয়ারও বেশ লাগে রামিয়াকে। কী পরিষ্কার-ঝরিষ্কার থাকে রামিয়াটা; কাপড়-চোপড় দুখিয়ার মা'র চাইতেও 'সাফসুৎরা'[১]। প্রত্যেক সপ্তাহে ওরা বিরজু পানওয়ালার কাছ থেকে আধ কাঠা ধানের কাপড়কাচা সাবান কেনে। ফুলঝরিয়া এর দেখাদেখি সাবান কেনার কথা তুললে, তা

১ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মা তাড়া দিয়ে ওঠে। 'রামিয়ার কাছ থেকে এই সব কিরিস্তানি শেখা হচ্ছে। তুই কি নাচওয়ালী নাকি যে কাপড় হপ্তায় হপ্তায় পরিষ্কার করতে হবে। কত ধান রোজ ক্ষেত থেকে খুঁটে তুলিস, সেইটা আগে হিসাব করিস, তারপর সাবান কেনার কথা ভাবিস। একটানা বসে ধান কাটবার তো মুরোদ নেই। কাটবার সময় 'সিপাহী'র[১] নজর এড়িয়ে, দু-চারটে করে ধানের গোছা তোর জন্যে আমরা ছেড়ে দি, তাই কুড়িয়ে তো চলে তোর পেট, আবার কাপড়ে সাবান দেবার শখ! কেউ ফিরেও তাকাবে না তোর দিকে, যতই কাপড়ে সাবান দিস না কেন'

ফুলঝরিয়া সকলের কথাতেই তার অঙ্গহীনতার প্রতি ইঙ্গিতের আভাস পায়। তার মা সুদ্ধ তাকে ছেড়ে কথা বলে না। তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। কিন্তু এই জলকাদা হিম কুয়াশার দেশে, কারও চোখের পাতা ভিজল কিনা, তা দেখবার সময় নেই তাদের।

তবু বেশ লাগে তার রামিয়াকে। চোখেমুখে কথা রামিয়াটার। কথা বলবার সময় হেসে ফেটে পড়ে। গান ছড়া সরস গল্প তার জিবের ডগায়! দুনিয়ার কারও তোয়াক্কা রাখে না। একটুও ভয়ডর নেই তার মনে। সব ভাল, তবু ফুলঝরিয়ার মনে হয়, রামিয়ার একটু যেন গায়ে-পড়া ভাব; ধানকাটনীর গায়ে এ জিনিস চলে, কিন্তু নিজের গাঁয়ে এ জিনিস চলবার নয়। হয়তো বা 'পশ্চিম'-এর গাঁয়ের শিক্ষাদীক্ষাই এই রকম। কত দূরে তারাপুরে তার বাড়ি, মুঙ্গের জেলায়। এত দূরের কোনো লোকের সঙ্গে, এর আগে ফুলঝরিয়ার কথা বলবার সুযোগ হয়নি। ওদের দেশের ভাষার টান আবার এমন যে শুনলেই হাসি আসে! কী রসিয়ে যে সে অন্যের নকল করতে পারে। 'মালিকের সিপাহী' রামনেওরা সিং লম্বা জুল্‌ফি চুলকোতে চুলকোতে কেমন করে চোখ-ইশারা করে, তারই নকল করছিল রামিয়া এখন; একেবারে হাসতে হাসতে 'নাখোদম'[২] হয়ে যেতে হয়।

সেই হাসির স্বরই গিয়ে পৌঁছেচে মায়েদের কানে।

'ওরে ও রামিয়া, আজ কি আর বাড়ি যেতে হবে না?'

'বাড়িই বটে', বলে রামিয়া বিদ্রূপ করে।

'আজ চাচী, ও এখানে থাকুক না।'

'না না না ফুলঝরিয়া, তা কি হয়?' রামিয়ার মা কারও উপর ভরসা পায় না।

১ জমির মালিকের চাকর। ২ প্রাণ বেরিয়ে যায়।

'কাল রাতে আবার এসো'—যাবার সময় মোড়লগিন্নী বলে দেন।

খড়ের গাদার মধ্যে পা ঢুকিয়ে শুয়ে ফুলঝরিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। বড় একা একা লাগে তার, এত লোকের মধ্যেও। ঢোঁড়াইটা কী যে মাটিকাটার কাজ পেয়েছে। ধানকাটনীতে এলে বাবুসাহেবের ইজ্জতে চোট লাগত। নিজের গোঁতেই গেলেন। যাক্ ভালই হয়েছে না এসে। যা একগুঁয়ে। হয়তো 'পাঁখড়েল' ডাকলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে শিমুল গাছের দিকে চলে যেত। ...এ কিসের শব্দ! কুকুর-টুকুর আঁচড়াচ্ছে নাকি খড়ের গাদা! চমকে উঠেছে ফুলঝরিয়া। না হাঁরিয়ার বৌ, পা টিপে টিপে এসে খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকেছে। তাই বলো!

রামিয়ার মাতার দেহান্ত

সেদিন রাতে মহতোগিন্নীকে ঘিরে বসে তাৎমাটুলির দল জটলা করছে : আজ কদিন হল রামিয়ার মা এখান থেকে চলে গিয়েছে দেড় ক্রোশ দূরের কেমৈ গ্রামে, সেখানকার রাজপুতদের 'কামাত'[১]-এ ধান কাটতে। তা না হলে রাত্তিরে মহতোগিন্নীকে কি আর পাওয়া যেত দলের মধ্যে। যাবার সময় রামিয়ার মা মহতোগিন্নীর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে গিয়েছিল—এ কটা দিন আর তোমাকে ছেড়ে যেতাম না বহিন; কিন্তু রামনেওরা সিং আর বিরজু পানওয়ালা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এখানে থাকলে মেয়েটাকে আর বাঁচাতে পারব না। কেমৈ-এর রাজপুতরা আর যাই হোক এদিক দিয়ে লোক ভাল শুনেছি।...

এ কথার পর মহতোগিন্নী আর রামিয়ার মাকে বারণ করতে ভরসা পায়নি। ধানকাটনী শেষ হলে, দুদিন পরে তো ছাড়াছাড়ি হতই।

...হাটের দিন দেখা কোরো বহিন।

তারপর রামিয়ার চিবুকে হাত দিয়ে বলেন, 'মন খারাপ হবে আমার ফুলঝরিয়ার।'...

তার পরদিন থেকে মহতোগিন্নী রোজ রাতে তাৎমাটুলির সকলকে নিয়ে আসর জমিয়ে বসেন।

গল্প জমে উঠেছে। কেমৈ-এর ওদিকে নাকি 'হৈজার বিমারী'[২] আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

---

১ খামার। ২ কলেরা।

'যা দেশ, লোকেরা ভয়-টয় পেয়েছিল বোধ হয় রাতে'[১]। ভয় না পেলে কখনও 'হৈজা' হয়?

সকলে মিলে ঠিক হয় রাতে কেউ ভয় পেতে পাবে না। ভয় পাব পাব হলেই সকলকে জাগিয়ে আগুনের ঘুরের ধারে বসতে হবে।

মহতোগিন্নী রামিয়ামাইটার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন—বেচারির কোথাও গিয়ে স্বস্তি নেই—কেমৈ গেল, সেখানেও আবার অসুখ আরম্ভ হল।

নতুন একটা ঝগড়া ওঠায় এ প্রসঙ্গ তখনকার মতো চাপা পড়ে যায়।··· একটা মাত্র কুপি জ্বালায় তাৎমাটুলির দলের লোকেরা। সবাই কুপিটাকে নিয়ে টানাটানি করে, কিন্তু মহতোগিন্নীই ওটাকে দখল করে থাকেন বেশি! এক একদিন এক একজনের তেল কিনবার কথা ধানের বদলে; আজ বিরজু পানওয়ালা তেলের দাম দেয়নি। আজ ছিল রবিয়ার বৌয়ের পালা। সে সোজা বলে দিয়েছে যে, কুপিটা থাকবে মহতোগিন্নীর কাছে, আর তেলের দাম দেবে সে? ওসব ফুটানি মহতোগিন্নী যেন তাৎমাটুলিতে ফিরে গিয়ে ছাঁটে—'বড় বাড় বেড়েছিল রবিয়ার বৌ। কার সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় জানিস না।'

মহতোগিন্নী বোঝে যে সকলের সহানুভূতি রবিয়ার বৌয়ের দিকেই। কাজেই সে আর কথা বাড়তে দেয় না···আচ্ছা, যেতে দাও না ফিরে তাৎমাটুলিতে, তারপর মজা টের পাওয়াব। কিছু বলি না সেখানে তাই।···

'আচ্ছা, তেলের দাম আমি দিয়ে দেব বিরজু।'

বিরজু পানওয়ালা হাসতে হাসতে চলে যায়।

পরদিন দুপুরে রামিয়া হঠাৎ একা এসে হাজির। তার চোখদুটি ফোলা ফোলা। আজ আর এসে হেসে ফেটে পড়ল না।

কী রে রামিয়া একা যে? তোর মা'র খবর কী?

রামিয়া হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তার মা'র 'হৈজা' হয়েছিল, রাতে মরে গিয়েছে। কেমৈ-এর ধান ক্ষেতে পড়ে আছে। ওখানকার দলের সকলে পালিয়েছে 'হৈজা'র ভয়ে। কাটা ধান পর্যন্ত নেয়নি কেউ। মারা যাবার আগে কী তেষ্টা! কী তেষ্টা! সারা রাত ঠায় একা! এতক্ষণে কাক শকুনে নিশ্চয়ই ঠুকরোচ্ছে। মা বলে গিয়েছিল ফুলঝরিয়ার মা'র কাছে আসতে···

তার কান্নার মধ্যে সব কথা বোঝাও যায় না।

তাৎমারা এ খবরে বিশেষ হৈ-চৈ করে না। মরাকে তারা মানুষের একটা

১ এদের বিশ্বাস রাত্রে ভয় পেলেই কলেরা হয়।

অতি সাধারণ বৃত্তি বলে মনে করে। কিন্তু জানোয়ার মরা, আর মানুষ মরা তফাৎ কী! কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গরু মরলে পাড়ার মধ্যে তা ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ মরলে ভোজ দিতে হবে; এই তফাত।

তাৎমার দল বিরক্ত হয়ে ওঠে মেয়েটার উপর। মড়ার ছোঁয়া কাপড় চোপড় পরে, ছিষ্টি ছুঁয়ে একাকার করবে মেয়েটা। যাক্ না ও মুঙ্গেরের দলে লোকদের কাছে। তা না গুদরের মা-ই হল বেশি আপনার লোক।

ভর্সড়ের বাবুর ছেলে, বিরজু পানওয়ালা, রামনেওরা সিং সকলেই খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে মেয়েটার উপর হঠাৎ। এই মেয়েটার দেওয়া রোগের খবরে আবা ধানকাটনীর দল ভয়ে না পালায়। তাহলে অর্ধেক ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই পা থাকবে। এমনিই তো কেমৈ-এর রাজপুতেরা হয়তো ডিস্টিবোর্ডে খবর দিয়ে এতক্ষণ। ডিস্টিবোর্ডের 'হৈজা'র ডাক্তার যদি এসে 'সুই'[1] দিতে চায়, তাহলে তো ধানকাটনীর দল সব পালাবে।...

ভর্সড়ের গুরুজীকে পাঠানো হয় ডিস্টিবোর্ড অফিসে, ঘোড়ার পিঠে। তিনি সেখানে লিখিয়ে দিয়ে আসবেন যে, কেমৈ-এ যারা মরেছে, তাদের হয়েছি ম্যালেরিয়া জ্বর। ভর্সড়ের বাবু কেমৈ-এর চৌকিদারটাকে বখশিশ করেন,- সে যেন থানায় রিপোর্ট করে যে লোকরা জ্বরে মরেছে। এখন ভালয় ভা ধানকটা ঘরে উঠলে বাঁচা যায়।

তাবাপুরের দলের লোকেরা রামিয়াকে সঙ্গে রাখতে রাজী নয়। এমনি রামিয়ার মা'র উপর কারও সহানুভূতি ছিল না। যতদিন ঝাজী বেঁচে ছি সবাকে সদা জ্ঞান করেছে; রুগ্ন স্বামীটার মুখে এক ফোঁটা জলও দেয় কোনোদিন।...তেমনি জ্বল জ্বল করে মরেছে নিজে...এলি দলের সঙ্গে এখানে তা মন বসল না। গেলেন পটের বিবি মেয়েকে সঙ্গে করে কেমৈ।...

শেষ পর্যন্ত রামিয়া তাৎমাটুলির দলের সঙ্গেই থেকে যায়।

'মা-বাপ মরা মেয়ে, সোমত্ত বয়স। আপনার জনে দূরে ঠেলেছে।'

মহতোগিন্নীর সমর্থনে রতিয়া ছড়িদারও মনে বল পায়। সে এই মেয়েট সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে। তারা রবিয়ার বৌকে বলে, তুই-ই র মেয়েটাকে তোর সঙ্গে। রবিয়ার বৌটা আবার একটু বোকা বোকা গোছের সে তার সাদা মনের কথাটা বলে ফেলে।

'রাখতে আমার আপত্তি নেই, মেয়েটার মায়ের 'কিরিয়া করমে' ও[2] (

১ কলেরার টিকা।

২ ক্রিয়াকর্ম।।

ড় বাগনর[১] কিনতে হবে। বামুনকে পয়সা দিতে হবে। সে আমি কা দেব কোথা থেকে। মেয়ে বলে না হয় মাথা মুড়ানোর পয়সাটা াগবে না।'

সকলেই এক এক মুঠো ধান দিলেই কাজ হয়ে যায়, কিন্তু কেউ রাজী না।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে রামিয়া। কার সাধ্যি সে মুখের সামনে াড়ায়।

'মা-বাপ মরা বলে আজ হেনস্তা করছ। যদি 'কিরিয়া করম'-এর অভাবে মামার মা 'শাঁখড়েল' পেত্নী হয়, তাহলে যেন এই সতী-লক্ষ্মীদের দলের কলের সঙ্গে রাতে দেখা করে। একটা দানা ধানের আমি কারও কাছ থেকে াই না। পুবের ভূত তোরা, 'ভুচ্চর'-এর দল[২] কোথাকার। এদের খপ্পরে তার মা তাকে ফেলে গিয়েছে। 'নরম পানি'র[৩] লোক এরা, এদের কলিজা[৪] মাসবে কোথা থেকে? এতটুকু সরু দিল্ এদের, সুপুরি হলে কেটে দেখিয়ে দিতাম—পচা পোকাড়ে, ভর্সড়ের বাবুদের আর সব বাবুভাইয়ার দিলের মতো। তাদের তবু পয়সা আছে, জামার বোতাম এঁটে 'দিল্' ঢেকে রাখে; আর এই নরম পানি'র জানোয়ারগুলোর বোতাম কেনবার পয়সা নেই, মেহনৎ করবার তাকৎ নেই, তাকৎ কাজে লাগানোর মগজ নেই। আমি এখানে থাকার সময়, রামদানার[৫] শীষ দহের ধার থেকে কেটে কেটে পুঁতে রেখেছিলাম। তাই দিয়ে আমি মায়ের 'কিরিয়া করমে' খরচ করব।'

অকথ্য গালি দিতে দিতে সে ছিটকে বেরিয়ে যায় দহের দিকে।···

তাৎমাদের ভাষায় অশ্লীল শ্লীলের মধ্যে বাছবিচার নেই। রসিকতা আর রাগের সময় বীভৎস অশ্লীল কথা না বললে তাদের ফিকে ফিকে মনে হয় আধাটা। যে ওষুধের ধক নেই, সে কি আবার একটা ওষুধ! তারাপুরের পাড়াকুঁদুলি মেয়েটা আজ এহেন তাৎমাদেরও চুপ করিয়ে দিয়েছে।

কেবল কে একজন যেন বলে ওঠে 'ফটফটিয়ে চলে গেলেন।'

মহতোগিন্নী বলেন, 'চল্ চল্ সকলে। মেয়েটাকে স্নানটাও তো করাতে হবে। ফুলঝরিয়া, সেই আচারের হাঁড়িজড়ানো নেকড়াটা আনিস তো। আবার শীতের দিনে মেয়েটা ভিজে কাপড়ে থাকবে।'

---

[১] কাঁচাকলাপাকা—এদের পূজার নৈবেদ্যে দরকার হয়। জিরানিয়া জেলার অতি প্রিয় ফল।

[২] একটি সাধারণ গালি—কথাটি ভুচর অর্থাৎ জানোয়ার।

[৩] যেখানে জল খারাপ। [৪] হৃদয়।

[৫] এর থেকে এক রকম খই হয়। জলো জমিতে এর গাছ হয়। ফল মাটির ভিতর পচিয়ে তারপর ওর ভিতর থেকে দানা বার করতে হয়।

পশ্চিম দিগ্‌বিজয়ের পর ধানকাটনীর দলের প্রত্যাবর্তন

ধাঙড়দের 'গ্যাং' রাস্তা মেরামত করছে মরগামার 'পখল'-এর কাছে[১] পাটনা থেকে একজন বড় হাকিম এসেছেন 'সার্কাস বাংলায়'[২]। প্রায় লা সাহেবের মতো বড় হাকিম; ইয়ার টুপির নিচে লাল টকটকে মুখ; সে মু থেকে আগুনের ঘুর-এর মতো ধোঁয়া ছাড়ে ফন ফন ফন ফন। কথা বা বাঘের মতো! কলস্টর সাহেব তো তাকে দেখে থর থর থর থর। সে সাহেব যাবেন শিকারে—রাজদ্বারভাঙ্গার কুশীর ধারের ভৌয়া জঙ্গ বনভঁয়সা[৩] মারতে। চেরমেন সাহেবের তো শুনেই 'সটক্‌-দম'[৪]। তা তাদের গ্যাংয়ের সকলকে আসতে হয়েছে। এমনি তো কোনো 'পুছ'[৫] নে তাদের; কাজ আটকালে এনজিনিয়র সাহেবের মনে পড়ে তাদের কথা এমনি যে রোজ সকালে ওরসিয়রবাবু সারা গ্যাংটাকে তাঁর বাগানে কা করান, সেটা এনজিনিয়র সাহেবের নজরে পড়বে না! তবে চোখে সোনা চশমা পরার দরকার কী? সময় নেই অসময় নেই, জোয়ালে জুতলেই হল?

ঢোঁড়াই সায় দিয়ে বলে—'হাঁ, বেয়াই মশায়ের বলদ পেয়েছিস[৬] হাতে যত পারিস জুতে নে।' তার মনটা খারাপ হয়েছে, যখন থেকে ওরসিয়রবা আজ মহরমের দিনেও তাদের পাক্কীতে কাজ করতে বলেছেন। তারা ঝু সিং-এর মহরমের দলের লোক। দল ভারি করতে না পারলে ওজীর মুন্সী দলের কাছে মাথা নিচু হয়ে যাবে। এখনও মহরমের ঢাকের শব্দ কা আসছে আর ওরসিয়রবাবুর উপর রাগে তার গা জ্বালা করছে। আজ ঝু সিংয়ের সঙ্গে দেখা হলেই সে বলবে, তাৎমারা চিরকাল একই রকম থে গেল। লাঠি 'গদকা' তোরা কোনো কালেই খেলিস না, আর সেজন্য তোদে ডাকিও না! খালি একটু সঙ্গে সঙ্গে থেকে সারা শহর ঘুরবি, বাবুভাইয়াদে কাছ থেকে বখশিশ আদায় করবার জন্য। দিনের বেলাতেই যতটা শে করতে পারা যায়, ততই ভাল; না হলে ঐ বখশিশের পাওয়া পয়সা থেকে রাতের মশালের তেলের খরচটা দিতে হবে। এক ঘণ্টা কলালীতেও[৭] যে যাবি সবাই। 'কলালী' আবার রাত নটায় বন্ধ হয়ে যায়…

---

১ পাথর, মাইলস্টোন।
২ সার্কিট হাউস।
৩ বুনোমোষ।
৪ আক্কেল গুড়ুম।
৫ কদর।
৬ একটি প্রচলিত প্রবাদ—'সমধিকা বয়েল'
৭ মদের দোকান।

কিন্তু সন্ধ্যার আগে কি আর এই রাস্তায় কাজ থেকে ছুটি হবে।

শালা ধান বোঝাই গরুর গাড়ির আর কামাই নেই। এ রাস্তা মেরামত কিসের জন্য। একটা জিরানিয়ার হাটের দিন গেলেই তো আবার যে কে সেই। এই যে কোদাল মেরে মেরে এনে মাটি ফেলছি, এই শীতের দিনেও গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, নবাবপুত্তুর গাড়োয়ানরা বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে হলালালালা করে একদিনে সাফ করে দিয়ে যাবে। চেরমেন সাহেবের এত তাকৎ; আর এই গরুর গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারে না!

এই বোকাগুলোর কথায় ঢোঁড়াই মনে মনে হাসে; আরে এটুকু বুঝিস না রাস্তা খারাপ না হলে তোদের রোজগার চলবে কী করে। আর এই গাড়িতেই তো ধান আসে জিরানিয়া বাজারে। ধান না এলে খেতিস কী? সত্যিই ধাঙড়গুলো বোকা। তবে এ কথা ঠিক যে চেরমেন সাহেব আর কলস্টর সাহেব ইচ্ছা করলে তাৎমা ধাঙড়দের অনেক কিছু ভাল করতে পারে। এই তো ধান চাল এত শস্তা করে দিয়েছে। এই সঙ্গে যদি বাবুভাইয়াদের উপর হুকুম করে দিত, তাৎমাদের রোজ ঘরামির কাজ দিতে, তাহলেই হত বেশ। কিন্তু রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।'[১]

তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে?...

'এই 'বহলমান'[২]। পাকীর উপর দিয়ে চালাচ্ছিস যে বড়। দিনের বেলা ঘুমুচ্ছে; ছুছুন্দর কোথাকার।'

গ্যাং-এর লোকের চেঁচামেচিতে ঢোঁড়াইয়ের নজর গিয়ে পড়ে ঐ গাড়ির দিকে। গাড়ি বোঝাই ধানের বস্তার উপর যে মেয়েটি বসে আছে, সে বস্তাগুলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে এসে গাড়োয়ানকে ধাক্কা দেয়—'এই! ওঠো না। সেই সিসিয়া থেকে শুয়েছে।

'শুয়েছি তো কার পাঁজরার উপর মুখ ডলেছি[৩]। তোমার নামবার জায়গা এসে পড়ে থাকে তো নেমে পড়ো না।'

'না, আর এক রশি আগে নামব। এখানে না।'

তুলসীদাস থেকে:
[১] সরলসবল প্রভু রঘুরাজ হারানো ধন ফিরিয়ে দেন আর গরীবকে পালন করেন।
[২] গরুর-গাড়ির গাড়োয়ান।
[৩] একটি চলিত কথা। পাকা ধানে মই দেওয়া এই অর্থে ব্যবহার হয়।

কে মেয়েটা? সবাই তাকিয়ে দেখে। মহতোর মেয়ে ফুলঝরিয়া একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসে—সবাই তার খোঁড়া পায়ের কথা ভাবছে না তো।

ঢোঁড়াই বলে, 'কি ধানকাটনী থেকে নাকি? কত ধান হল? আর সকলে কোথায়?'

'এই তারা এতক্ষণ চিথরিয়া পীরে হবে। গোঁসাই ডুববার আগেই এসে পড়বে।'

ফুলঝরিয়া ধানের বস্তার আড়ালে তার পায়ের দিকটা সরিয়ে নেয়, গায়ের কাপড় সামলায়, অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করে। ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে এলেই তার কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়।

ঢোঁড়াইয়েরও মায়া হয় মেয়েটাকে দেখে। হেসে বলে, 'যাক খুব পৌঁছেচো, মহরমের মেলার আগে। কালই ঢুলঢুল ঘোড়া বেরুবে।'

কৃতার্থ হয়ে যায় ফুলঝরিয়া।

ঢোঁড়াইদের ফেলা মাটির উপর দিয়ে গভীর রেখা এঁকে গাড়ির চাকা এগিয়ে যায় তাৎমাটুলির দিকে। গাড়োয়ানটা আপন মনে বকতে বকতে যায়—আর কদিন পরে গেরস্তরা সত্যিই আনবে না ধান হাটে। গাড়িতে আনার মজুরি পোষায় না। কিনবার লোক নেই; গত হাটের দিনও এই ধান ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এমন হলে তো নিলামেই বিকিয়ে যাবে জমি।...

না রামজী আছেন—ফুলঝরিয়া গাড়োয়ানকে সান্ত্বনা দেয়।...

আবার মাটি ফেলার কাজ আরম্ভ হয়। গোঁসাই ডোবার আগে ঢোঁড়াইদের আর ছুটি নেই। না হলে আবার কাল ঢুলঢুল ঘোড়ার মেলার দিনেও কাজ করতে হবে। আজ দক্ষিণ দিক থেকে তারা এগুবে বাড়ির দিকে।...

'ফুর্তিসে ভাইয়া!'[১] গোঁসাই ডুববার আর বেশি দেরি নেই।

দূরে দেখা যায়, একদল লোক এদিকেই আসছে। তাদের কোলাহলের স্বর শোনা যাচ্ছে! মহরমের দল নাকি? না ঝাণ্ডা কই? মাথায় কাঁধে জিনিসপত্রের বোঝা, তাই বলো। ঢোঁড়াই, তোর টোলার ধানকাটনীর দল ফিরছেন পচ্ছিম ফতে করে। রতিয়া ছড়িদার আবার মাথায় পাগড়ি বেঁধেছেন।

ধাঙড়ের দল নিবিষ্ট মনে রাস্তায় কাজ করবার ভাব দেখায়, যেন ধানকাটনীর

---

[১] তাড়াতাড়ি ভাই।

দলকে দেখতেই পায়নি। ঢোঁড়াই হেসে তাদের সংবর্ধনা জানায়। মহতোগিন্নী মুখে এক গাল হাসি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসেন।

'ফুলঝরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি খানিক আগে? পাড়ার খবর ভাল তো? আর আমাদের বুড়োর খবর? বাড়িতে এসো, নতুন ধানের চিড়ে খাওয়াব।'

যাবার সময় মহতোগিন্নী তাকে বলে যান সে যেন ঠিক আসে। অনেক দিনের জমানো কথা আছে 'বাচ্চা'র সঙ্গে। সব তাৎমামেয়েই ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে একটা-না-একটা রসিকতার কথা বলবার চেষ্টা করে। এতদিন পরে পাড়ার ছেলের সঙ্গে প্রথম দেখা; ধানকাটনীর লাওয়ার রেশ এখনও লেগে রয়েছে তাদের মনে। ঢোঁড়াই হেসে বলে, এখন বাড়ি গিয়ে কারও দেখা পাবে না, সব গিয়েছে ফুদী সিং-এর মহরমের দলে। রবিবার বৌয়ের পাশে ফরসা শাড়ি পরা মেয়েটাও খিলখিল করে হেসে ওঠে তাৎমানীদের রসিকতায়। এই তাহলে ঢোঁড়াই, যার গল্প রামিয়া ফুলঝরিয়ার কাছে শুনেছে।

মেয়েটিকে অচেনা অচেনা লাগে ঢোঁড়াইয়ের। পাড়ার তো নয়ই, অন্য কোথাও দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বেশ ছিমছাম, তখিয়ার মা'র চাইতেও। মরগামার মেয়েটেয়ে নাকি? হয়তো জিরানিয়ার বাজারে যাচ্ছে। না, ঐ তো এদের সঙ্গেই তাৎমাটুলির দিকে চলল? 'ইন্দারসন'এর পরীর[1] মতো দেখতে। কাঁচা কঞ্চির মতো 'লচক'[2] মেয়েটার দেহে। হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে যায়, সামুয়রের সাহেবের হাওয়াগাড়ির সম্মুখের একটা 'চাঁদির মুরতে'র কথা[3]। ঠিক সেই মেয়েটার মতো দেখতে এই নতুন মেয়েটাকে। একেবারে উড়ে যেতে চাইছে যেন, সেই রকম। ছুটো ধনেশ পাখি সম্মুখের বটগাছের কোটরে এসে ঢোকে, ডানা ফট্‌ফট করতে করতে। ছুটো বাদুড় লুইস সাহেবের পেয়ারা আর নারকুলী কুলের বাগানের দিকে উড়ে চলে যায়। তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলির আকাশ, দূরে জিরানিয়া শহরের গাছপালা সব রঙিন হয়ে উঠেছে—'গোঁসাই' ডুবছেন।

ভোঁ, ভোঁ, জিরানিয়া কুর্সেলা লাইনের সাঁঝের 'লৌরী'[4] ছাড়ল। রাস্তা খারাপ করার যম এই 'লৌরী'গুলো। ওরসিয়রবাবুর 'নানী মরে'[5], আর যদি ও আমাদের কাজ তদারক করতে আসে এর পরে। এক, দো, তিন! কাম খতম, পয়সা হজম! চলো চলো ঘর।

১ ইন্দ্রাসনের পরী। কোনো মেয়ে সুন্দরী হলেই তাৎমায়া বলে ইন্দ্রাসনের পরীর মতো দেখতে।

২ নমনীয়তা।

৩ রৌপ্যমূর্তি।

৪ মোটর বাস।

৫ 'নানী মরে' শব্দার্থে দিদিমা মারা যায়। 'কিছুতেই নয়' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ডুলডুল ঘোড়ার উৎসবে রামিয়ার যোগদান

নূতন মেয়েটা তাৎমাটুলিতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়, ছেলেদের মধ্যে! আজব আজব পশ্চিমের খবর শোনায়। 'পুরুবের নরম পানি'র লোকেদের সম্বন্ধে নাক সিঁটকে কথা বলে। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, থাক না আর কিছু দিন, তারপর 'নরম' কি কড়া বুঝবি।

তাৎমাটুলির ছেলেরা মহরমের দলে লাঠি খেলে শুনে, রামিয়া চোখ কপালে তুলে বলে, এখনও 'পুরুবের' হিঁদুরা ঐ গরুখোরদের পরবে লাঠি খেলে নাকি? আমাদের পচ্ছিমে তো চার 'সাল' থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কী বন্ধ হয়েছে? লাঠি খেলা?

হাঁ হিঁদুর লাঠি খেলা, মহরমে।

সত্যই তাৎমারা এ খবর কখনও শোনেনি এর আগে। দুখী সিংয়ের দল লাঠি খেলা বন্ধ করবে, এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। অদ্ভুত ঐ পচ্ছিমের লোকগুলো, কী করে, কী ভাবে, কিছুই বোঝা যায় না। তবে কপিলরাজার জামাইয়ের মতো বড়লোককে ঠাণ্ডা করতে হলে, ঐসব একটা কিছু করতে হয়। রবিয়ার বৌ একটু ভয়ে ভয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের দেশে কি ডুলডুল ঘোড়ার মেলাতেও যাওয়া বারণ নাকি?

যাক্, তবু নিশ্চিন্দি যে তোমাদের দেশে ডুলডুল ঘোড়ার মেলা হয় না, মহরমের পরদিন। ডুলডুল ঘোড়া কী জানো না, আর এই পচ্ছিমের এত বড়াই! অন্তত এই একটা বিষয়ে তাৎমানীরা রামিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর নষ্ট করার মতো সময় নেই তাদের। আজ মেলায় যাওয়ার দিন, আজ তাৎমানীদের স্নান করতে হবে, কাপড় শুখোতে হবে, এই একরত্তি মেয়েটার সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকলেই তাদের দিন চলবে না···

নরকটিয়াবাগে নবাব সাহেবদের পরিবারের 'কবরটা'১। ইমামবারা থেকে বেরিয়ে ডুল-ডুল ঘোড়ার মিছিল আসে ঐ 'কবরগা' পর্যন্ত। এই গোরস্থানের বাইরে পথের উপর বসে মেলা, আর 'কবরগা'র ভিতর বসবার জায়গা করা হয় সাহেব আর হাকিমহুকমদের।

ভোঁ, ভোঁ! ধুলো উড়িয়ে আমরদের হাওয়াগাড়ি গোরস্থানের পাশে এসে থামে। ঢোঁড়াইরা সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দেখে। সামুয়রের সাহেব

১ কবর দেবার জায়গা।

সিগারেট খেতে খেতে 'কবরগা'র ভিতর গিয়ে ঢোকেন। সাহেবের আরদালীর পোশাক পরে সামুয়রও এসেছে সঙ্গে হাওয়াগাড়িতে। ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েও হাওয়াগাড়ির সম্মুখের ডানাওয়ালা 'চাঁদির' মেয়েটাকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, তাৎমাটুলির মেয়েদের উপর। নূতন পচ্ছিমা মেয়েটাকে, খোঁড়া ফুলঝরিয়া কী যেন বোঝাচ্ছে, এই হাওয়াগাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে—বোধহয় সামুয়রের কথা। এক নজরেই বোঝা যায় যে, মেয়েটা অন্য সব তাৎমা মেয়েদের থেকে আলাদা ধরনের। একমাত্র তারই কাপড় 'হরশিঙ্গার'-এর ফুল[১] দিয়ে তাজা রঙানো; মেলায় এত লোকজনের মধ্যেও নজর গিয়ে পড়ে তারই উপর। হাওয়াগাড়ির মধ্যে বসে আছে সাহেবের ডেরাইভার, সাহেবের কুকুর, আর সামুয়র। আরদালী না চাই!

এতক্ষণে সামুয়র নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে সিগারেট ধরাবার আর লোকজন ভাল করে দেখবার অবকাশ পায়। পথের পুবে রেললাইনের দিকে দাঁড়িয়েছে তাৎমাটুলির দল, আর পশ্চিমে তেঁতুলগাছের তলাটায় দাঁড়িয়েছে ধাঙড়টুলির দল। মেলাতেও তারা দু'দল এক জায়গায় দাঁড়াবে না; কিন্তু নিজের পাড়ার সকলে একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে; কত রকমের লোক আসে মেলায়। এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েছেলে নিয়ে কাণ্ড; বলা তো যায় না। এ রকম গোলমাল বহুবার হয়েছে, এত সাবধানতা সত্ত্বেও। তার উপর ফিরবার সময় রাত হয়ে যায়। প্রতিবারই এক আধটি মেয়ে দল থেকে ছিটকে পড়ে; একটু রাত করে বাড়ি ফেরে; বলে তুলতুল ঘোড়া যাওয়ার সময় ভিড়ের চাপে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। মাতব্বররা বোঝে; বাড়ির লোকে দরকার বুঝলে প্রহারও দেয়।

ঢোঁড়াই শালা ধাঙড়টুলির দলের মধ্যেই বসেছে দেখছি। শনিচরায় বেটা আবার দেখছি পায়ে তিনগাছা করে 'সিলবরের পৈড়ী'[২] পরেছে। আবার এদিকে তাকানো হচ্ছে! বুদ্ধি তো ঘটে খুব! ঝমড় ঝমড় শব্দ হবে হাঁটবার সময়! যাক তাতে দুঃখ নেই সামুয়রের; আজ তাকে ফিরতে হবে সাহেবের গাড়িতেই; কোনো উপায় নেই। ঢোঁড়াইটা আবার ওদিকে হাঁ করে কী দেখছে। দাঁত উঁচু রহতোগিন্নী এখানেও দেখছি জমিয়ে বসেছে। তেল পড়েছে আজ মাথায়। তার খোঁড়া মেয়েটাও দেখছি ভালুকের মতো বসেছে। ওর পাশেই হলদে কাপড় পরে কে ওটা, একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ছে?

১ শিউলি ফুল। ২ জার্মান সিলভারের মল।

খাসা মেয়েটা! বাই গড বলছি, বেশ 'নিমকিন'[১] দেখতে। সিঁদুর আছে নাকি কপালে? এতদূর থেকে দেখাও যায়! সামুয়রের মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। একটানে সিগারেটটার গোড়া পর্যন্ত জালিয়ে সেটাকে ফেলে দেয়। তারপর আর কৌতূহল চাপতে না পেরে আগিয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের কাছে।

হাঁরে ঢোঁড়াই তুই ইদিকে বসেছিস যে বড়?

কেন ইদিক কি কারও বাপের কেনা নাকি?

অন্য সময় হলে এ কথা নিয়েই বেঁধে যেত কুরুক্ষেত্র…'তাৎমার বাচ্চা' বাপ তুলে কথা বলবে? কিন্তু এখন সামুয়রের মনের ভাব সেরকম নয়। সে চায় ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প জমাতে। ঢোঁড়াইকে সিগারেট বের করে দিতে দিতে সে বলে এবার মেলা জমেনি সেরকম; লোকের হাতে পয়সাই নেই, তার মেলা জমবে কী করে? ঢোঁড়াইও অন্যমনস্কভাবে সায় দেয় সামুয়রের কথায়। পথের ওধারে দুটো ছোকরা বৌকাবাওয়াকে দহিবড়ার ঠোঙা দেখিয়ে ঠাট্টা করছে। আর একটু বেশি বাড়াবাড়ি করলেই ঢোঁড়াইকে উঠতে হবে, ফাজিল ছোঁড়া দুটোকে ঠাণ্ডা করতে।

'ওটা কে রে ঢোঁড়াই? ঐ হলুদ রঙের শাড়ি পরে চলে পড়ছে ঢাঙা মেয়েটার গায়ে?'

'ওকে রবিয়ার বৌ এনেছে ধানকাটনীর থেকে।'

'বড় ফুরুৎ ফুরুৎ করছে রে মেয়েটা। রবিয়ার বৌয়ের আবার কে হয়? এখানে থাকবে নাকি এখন ঐ 'পাতলী কোমরওয়ালী' ছুঁড়িটা?'

ঢোঁড়াই এই সব প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না। এই খৃস্টানটার সঙ্গে ঐ নূতন মেয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে মন চায় না। এই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য সে বলে—এইবার এসে পড়ল দুলদুল ঘোড়া। ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না? হলদে শাড়িপরা মেয়েটার পাশ দিয়ে সামুয়র শিস দিতে গটগট করে, তাৎমাদের দলের ভিড়ের মধ্যে ঢোকে। রামিয়ার হাসি থেমে যায়। ফুলঝরিয়া ফিস করে, সাহেবের মতো রঙের সামুয়রের পরিচয় দিয়ে দেয়—সাহেবদের বাড়ি কাজ করে, 'ঢেরী আমদানী'র নৌকরি[২]; সাহেব অনেক টাকা দিয়ে যাচ্ছে ওকে, এখান থেকে যাওয়ার সময়…

দুলদুল ঘোড়ার মিছিল এসে পড়েছে। মেলার ছত্রভঙ্গ ভিড়, জমে চাপ বেঁধে যায় মুহূর্তের মধ্যে। বুড়ো নবাব সাহেব নিজে বুক চাপড়াতে দুলদুল

১ নোক্তা—সুন্দর আর লাবণ্যযুক্ত। কথাটি সম্মানজনক পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় না।

২ অনেক আয়ের চাকরি।

ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে আসছেন। সাদা রঙের ঘোড়াটা। চোখ দুটো ঠুলি দিয়ে ঢাকা। সোনার ঝালর দেওয়া জিন ঘোড়ার পিঠে।—মেহেদিপাতা দিয়ে রাঙানো নবাব সাহেবের দাড়ি। মখমলে ঢাকা আস্তাবলে বন্ধ করে রাখা হয় দুলদুল ঘোড়াটাকে সারা বছর। 'হাসান হোসান!' 'হাসান হোসান!' লাঠি আর বুক চাপড়ানোর শব্দে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। 'হায়রে-হায়!' 'জুলুস'[১] ঢুকছে 'কবরগা'র মাঠে, 'কারবালা' করতে।' মেলাসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ে 'কবরগা'র মাঠের দেওয়ালের চারিদিকে। ফুলঝরিয়া নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারেনি। রামিয়ার একটা কথা বারবার মনে হয়—ফুলঝরিয়া বলছিল যে দুলদুল ঘোড়াটা সারা বছর মখমলের উপর থাকে। মখমলটা নোংরা হয় না?···ভিড়ের চাপে, আর কৌতূহলের আতিশয্যে, সে কখন ফুলঝরিয়াকে ফেলে এগিয়ে এসেছে বুঝতেও পারে না। টের পায় যখন দহিবড়াওয়ালা গালাগালি দিয়ে ওঠে,—তার ঝুড়ির ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গিয়েছে রামিয়া, আরও অনেকে। কী কাণ্ড! দহিবড়াওয়ালাটা আর তাদের আস্ত রাখবে না। পুবের লোককেও রামিয়া ভয় পায় তাহলে।···'হায়-রে-হায়।'···হঠাৎ দেখে যে সাহেবের মতো রং আরদালীটা কখন যেন গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। সে রামিয়ার তরফ নিয়ে ঝগড়া করে দহিবড়াওয়ালাটার সঙ্গে। তার চেহারা আর পোশাক দেখেই দহিবড়াওয়ালা আর পালানোর পথ পায় না।···'হায়-রে-হায়!'···

ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন

ঢোঁড়াইয়ের খুব ভাল লাগে রামিয়াকে। মেয়েমানুষের উপর সে আগে ছিল একটু নিস্পৃহ গোছের; নিস্পৃহ কেন, বোধ হয় একটু বিরক্ত বিরক্তই—কোনো কথার ঠিক নেই নোংরা ঝোটাহাদের, বেটাছেলে দেখলে হেসে ঢলে পড়ে, কিন্তু এ মেয়েটা কেমন যেন অন্য রকম। কথা বলে যেন কত কালের চেনা। মেয়েটার গায়ের 'তাকৎ'ও[২] খুব; বেটাছেলেদেরও হার মানায়। তাৎমাটুলির ঝোটাহাদের মতো 'কমজোর'[৩] না। সেদিন কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাচ্ছিল রামিয়া। তিনটে ইয়া বড় বড় কলসী একসঙ্গে, মাথায় দুটো, কাঁখে একটা। এক ফোঁটা জল পড়েনি গায়ে। ঢোঁড়াই দেখেছিল পিছন

১ মিছিল।

২ জোর।

৩ দুর্বল।

দিক থেকে ; আলবৎ পচ্ছিমের পানির গুণ। বাঙালী মেয়েদের মতো চুল, 'জলের কুঁজোর মতো গলা', কোমরের নীচেটা জাঁতার মতো দেখতে[১]। ভারি ইচ্ছে করে মেয়েটার সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে। আবার একটু ভয় ভয়ও করে ওর সঙ্গে কথা বলার সময়। হাজার হলেও পচ্ছিমের মেয়ে, ওদের 'রসম রেওয়াজ' আলাদা, সংস্কার ভাল ; 'পুরুব'-এর লোক মুখে স্বীকার না করলেও প্রত্যেকেই মনে মনে একথা না মেনে নিয়ে পারে না। 'রহন সহন কিরিয়া করম'-এর[২] যা কিছু ভাল, সবই তো পচ্ছিম মুলুকের জিনিস : পুরুবে তো কেবল মিয়াদের 'কিচির-মিচির বুলি'[৩] ; আর বাঙালীদের আচার ব্যবহারের কথা ছেড়েই দাও, তাদের তো ও সবের বালাই-ই নেই।

রামিয়া নামটাও বেশ। হবে না! পচ্ছিমের লোক ; কোথায় সেই মুঙ্গের জেলা, 'গঙ্গা কিনার'[৪] ; কাঢ়াগোলার চাইতেও পচ্ছিমে! আমাদের মেয়েদের নামেরই বা কী ছিরি! বুধনী, জিবছী ; আর ওদের দেখ তো। রামিয়া—রামপিয়ারী। পচ্ছিমের মুলুকে মেয়েদের নাম বড় ভাল. আমাদের জিরানিয়ার বেটাছেলেদের নাম পর্যন্ত অত ভাল হয় না। ওদের মরদদের নামের তো কথাই নেই। ঐ তো পচ্ছিমের অচ্ছেবট সিং ডিষ্ট্রীবোডের কল মেরামতিতে কাজ করে। ঢোঁড়াই তার নামের সঙ্গে নিজের নাম মিলিয়ে মনে মনে লজ্জিত হয়—রামিয়া তার ঢোঁড়াই নাম শুনে নিশ্চয়ই হেসেছে। মেয়ের গড়ন দেখতে চাও,—পচ্ছিমের ; মরদ দেখতে চাও, পচ্ছিমের ; 'পানি'[৫] দেখতে চাও, পচ্ছিমের ; আদব কায়দা দেখতে চাও, পচ্ছিমের ; সব ভাল পচ্ছিমের। যাক, যাদের মুলুক যেমন, তাদের 'মুলুক'[৬] তেমন ; হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়?

মেয়েটা অত হাসিখুশি হলে কী হয়, দেখলেই ঢোঁড়াইয়ের মায়া লাগে, বোধ হয় ওর মা-বাপ নেই বলে। তার নিজেরও তো বলতে গেলে ঐ একই দশা।

মহতোগিন্নীর সঙ্গে গল্পে গল্পে বলেই ফেলল ঢোঁড়াই, এই কথাটা ফুলঝরিয়ার মা কীভাবে কথাটা নিল বোঝা গেল না।

১ এইগুলিই সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে গণ্য হয়।

২ আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম (রহন সহন কিরিয়া করম)।

৩ দুর্বোধ্য ভাষা।

৪ গঙ্গাতীর।

৫ জলবায়ু। ৬ দেশ।

'হাঁ, তোরও মা অবিশ্যি না থাকার মধ্যেই ; তবে তোর বাওয়া রয়েছে, আমরা রয়েছি। মনে করলে সবই আছে, না মনে করলে কিছুই নেই। কত কা যে ভাবে আমার 'বাচ্চা'। এ হল সেই মিল, সেই যে কথায় বলে না, তোর বেয়ানের উঠোনেও বাবলা গাছ আমার বেয়ানের উঠোনেও বাবলা গাছ, আমরা দুজনে আপনার লোক। তোর এ কথা হল তাই।...ও ফুলঝরিয়া, নতুন ধানের চিড়ে যে রাতে কুটলি, তাই চারটি ঢোঁড়াইকে খাওয়া মা। ঘটির জলটা ছেঁকে দিস তোর কাপড়ের আঁচল দিয়ে—বড় ময়লা হয়েছে জলে।'

রামিয়া 'থান'-এ এসেছিল গোঁসাইকে প্রণাম করতে। গোঁসাইয়ের মাথায় জল ঢালবার পর সে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে যে পুরুষের মুলুকে কি গোঁসাইয়ের বেদী রোজ লেপতে নেই নাকি ?

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে এসবের দেখাশুনো বাওয়াই করে।...

না, না, বেদী নিকোনোর কাজ বাওয়ার নয়। আমাদের পচ্ছিমে পাড়ার মেয়েরাই গোঁসাইয়ের বেদী লেপে।

'সে দেশের কথা হল আলাদা।' ঢোঁড়াই এই এক কথাতেই পচ্ছিম মুলুকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়ায় রামিয়ার মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই জানে যে, পচ্ছিমের লোকের ভাল লাগবে না তাদের তাৎমাটুলি ; তবু জিজ্ঞাসা করে 'কেমন লাগছে আমাদের টোলা ?' আর অন্য কোনো কথা সে চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না।

মেয়েটি বোধ হয় ঢোঁড়াইয়ের মন রাখবার জন্যই বলে, 'বেশ লাগছে, তোমাদের টোলা। বেশ, কোনো মুসলমান নেই, ডোম নেই, মুসহর[১] নেই। কিন্তু জমি বড় 'বালুবুর্জ'[২]। আর কেউ রামায়ণ পড়তে পারে না।'...

অদ্ভুত পচ্ছিমের লোকদের ভাববার ধরন। এইসব দিক দিয়ে যে তাদের টোলার বিচার কেউ করতে পারে, এ তার মাথায়ই আসেনি কখনও। তারা চাষবাস করে না, তাই জমি বালুবুর্জ না এঁটেল মাটির এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। কেবল এইটুকু জানে যে, এই 'বালুবুর্জ' জমিতে অল্প খুঁড়লেই কুয়োর জল ওঠে ; বালিতে কুয়ো বেশি দিন টেকে না ; পাক্কীতে তারা যে মাটি ফেলে, তা বালিভরা বলে এক পশলা বৃষ্টিতেই ধুয়ে যায়। মেয়েটা মুসলমান, ডোম, মুসহর, কী সব কথা বলে।

জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, মুসলমান থাকলে কী হত ?'

---

১ একটি অনুন্নত শ্রেণীর নাম ; এই অঞ্চলে সবচেয়ে নোংরা বলে অখ্যাতি আছে।

২ একেবারে বালিভরা মাটি।

'এ গোঁসাই থানে মুরগী চরত, আর কী হত !'

তাই তো, মেয়ে হয়েও রামিয়া বুদ্ধিতে বেশ দড় দেখছি। কথাটা ঠিক বলেছে। সত্যি, যদি সে রামায়ণ পড়তে পারত তাহলে, রামিয়ার চোখে সে কত বড় হয়ে উঠতে পারত আজ। পড়তে না পারুক, রামায়ণ সে জানে এই কথাটা রামিয়াকে জানিয়ে দেবার জন্য বলে, আমাদের কাছে তাৎমাটুলিই ভাল লাগে। 'জল পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি'[1], জলও দুধের মতো বিক্রি হয়, যেখানে ভালবাসা আছে। এখানে আগে কুশীনদী ছিল কিনা, তাই এত বালি। কৌশিকীমাই চলে যাচ্ছে পচ্ছিমে; ঘোমটার আড়াল পিদিপ জ্বালিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছে। ফেলে রেখে যাচ্ছে এই সব 'বালুবুর্জ' জমি। কৌশিকীমাইয়ের গল্প তুমি জানো না? খুব বড় গল্প রবিবারে শুনো মিসিরজীর কাছ থেকে, তিনি যখন এই থানে রামায়ণ শোনাতে আসবেন।' এই কথার মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াই চালাকি করে রামিয়াকে শুনিয়ে দিতে চায় যে, তাদের টোলাতেও নিয়মিত রামায়ণ পড়া হয়। যতটা বাজে জায়গা তাৎমাটুলিকে মনে করেছে, ততটা খারাপ জায়গা এটা নয়।

মেয়েটা কিন্তু এসব কথায় বিশেষ কান দিল বলে মনে হল না। তবে ঢোঁড়াইকে দেখে যা মনে হয়েছিল তার চাইতে অনেক চালাক-চতুর। তার কাঁধ আর হাতের ঢেউখেলানো মাংসর দলাগুলো—দেখলেই বোঝা যায়—পাথরের মতো শক্ত। ওর রোজগার ভাল হবে না তো কার হবে? এই কথাগুলোই থান থেকে ফিরবার পথে রামিয়ার মনে আনাগোনা করে

রেবণগুণীর ঢোঁড়াইকে বরাভয় দান

ঘরে ফিরে রামিয়ার কথা মনে পড়ে ঢোঁড়াইয়ের। অন্য কথা ভাবতেও ভাল লাগে না। রামিয়াকে একেবারে আপনার করে পাওয়া চাই, 'শাদি'[2] ছাড়া তো তা হতে পারে না। শাদির কথা অমনি বললেই হল নাকি; মাথার উপর বাওয়া রয়েছে; মেয়ের দিকের কোনো বেটাছেলের কাছে কথা পাড়তে হবে; সমাজ রয়েছে, মহতো আর নায়েবদের মঞ্জুরি নিতে হবে, টাকা দিতে হবে, ভোজ দিতে হবে, তার উপর এ তো আর এখানকার 'ঝোটাহার' বিয়ে নয়, পচ্ছিমে মেয়ের নিজেরও পছন্দ অপছন্দ আছে। রামায়ণ পড়তে শেখেনি সে, তাকে কি আর রামিয়ার পছন্দ হবে।

১ 'প্রীতির কি যথার্থ রীতি দেখ, জলও দুধের মতো বিক্রয় হয়।'—(তুলসীদাস)।

২ বিয়ে।

পরের দিন যখন রামিয়া সন্ধ্যাবেলায় থানে পিদিপ দিতে আসে, তখন ঢোঁড়াই তাকে এক কোঁচড় গলাকাটা সাহেবের বাড়ির কুল খেতে দিয়েছিল। এ রকম কুল পচ্ছিমে আছে, বড় যে পচ্ছিমের বড়াই করো? রামিয়া একটা খেয়েই বলেছিল 'বেটা মরে![1] এমন কুল জীবনে খাইনি, গুড়ের মতো মুখে দিলে মিলিয়ে যায়।'

আরে বেটা কোথায় তোমার; ছেলের দিব্যি দিচ্ছ?

'বেটা কোনো দিন হবে তো।'

বোকার মতো দুজনেই হেসে ওঠে; কে কী ভাবে কে জানে। চেরা শুচি আমের মতো রামিয়ার চোখদুটোর[2] দিকে চেয়েই ঢোঁড়াই বুঝতে পারে যে, রামিয়া তার উপর বিরক্ত নয়।

সেই রাতেই ঢোঁড়াই যায় রেবণগুণীর কাছে। গুণীকে রাতে ধরা শক্ত, সে নেশা করে রাতে নাকি শ্মশানে চলে যায়, সেখানে সারারাত ভূত নাচায়, মানুষের মাথা নিয়ে ভূতদের সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বরাত ভাল। বাড়িতেই রেবণগুণীর দেখা পেয়ে যায়। নেশা সে করেছিল ঠিক, কিন্তু তখনও শ্মশানে যায়নি। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঢোঁড়াই তার পায়ের কাছে আট আনা পয়সা রাখে, তার গাঁজার 'ভেট'-এর জন্য। সবাই জানে যে এ না দিলে গুণীর মুখ খোলে না। কুপিটা পর্যন্ত নেই, গুণীর মুখ দেখা যাবে কী করে?

'কে?'

মদের গন্ধ আর গলার স্বরে মুখটা কোথায় ঠাহর করা যাচ্ছে। তারপর আরম্ভ হয় কাজের কথা। গুণীকে যতটা রগচটা সবাই ভাবে, ততটা নয়, কাজের সংস্রবে তার কাছে এসে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে। নতুন 'পরদেশী সুগা'[3] রামিয়ার সম্বন্ধে রেবণগুণী বেশ ঔৎসুক্যই দেখায়, ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় দরকারের চাইতেও বেশি। সেও শুনেছে মেয়েটার কথা, কিন্তু এখনও দেখেনি। 'ডবকা' নাকি? তাকে শনিবার রাতে শ্মশানে পাঠাতে পারিস? না আমারই ভুল হচ্ছে, যদি শ্মশানেই পাঠাতে পারবি তবে আর আমার কাছে আসবি কেন? তার মায়ের 'কিরিয়া করম'-এর[4] কথা বলে পারিস না? তুই মরদ, না কী?···

১ মিথ্যা বললে যেন আমার ছেলে মরে যায়।

২ এদের গল্পে গানে, প্রিয়ার চোখ কাটা আমের ফালির মতো দেখতে হয়।

৩ বিদেশী টিয়া পাখি।

৪ শ্রাদ্ধ তর্পণ আদি ক্রিয়াকর্ম।

ঢোঁড়াই বলে, 'ভুল বুঝো না গুণী। আমি তাকে শাদি করতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে গুণীর গলার স্বর বদলে যায়। তাই বল! আচ্ছা তাহলে তার শ্মশানে না গেলেও চলবে। তুই চল এখনই আমার সঙ্গে চিথরিয়া পীর।

চিথরিয়া পীরের পাকুড় গাছটার নিচের বেদীটার কাছে এসে যখন ঢোঁড়াই দাঁড়ায়, তখন হাড়কাঁপুনি শীতের মধ্যেও সে ঘামতে আরম্ভ করেছে। হাত পা যেন স্থির রাখতে পারছে না। ইচ্ছা হয় বেদীটা ধরে বসে পড়তে। অন্ধকার নিঝুম রাত। শুকনো পাতার উপর দিয়ে চলার সময় যে শব্দটুকু হচ্ছে মনে হচ্ছে যে তাইতেই সারা গাঁয়ের লোক জেগে উঠবে। শীতের হাওয়ায় বিরাট গাছটার ডালে ডালে ঝোলানো অজস্র নেকড়ার ফালি দুলছে। 'কিচিন' পেত্নীগুলোর[১] শাড়ি দুলছে না তো? সেগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে নাকি? না সেগুলো বোধহয় কাপড় নেড়ে নেড়ে জোনাকপোকা তাড়াচ্ছে? খোকা-ভূতের চোখ নাকি ঐ জোনাকপোকাগুলো?...রেবণগুণী তাকে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে বসিয়ে দেয়। তারপর খানিকটা মাটি বেদীটার থেকে ভেঙে নিয়ে বলে 'যেই আমি মন্তর পড়ে গোঁসাই জাগাব, অমনি দেখবি যে তুই হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিস। একেবারে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ঠেকে যাবি, তবে থামবি। কারও বাপের সাধ্যি নেই তার আগে তোকে থামায়।'

গুণী মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে। হাঁটুর নিচের মাটি কেঁপে ওঠে—কিসে যেন ঢোঁড়াইকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—তার সম্বিত নেই, ভাববার ক্ষমতা নেই, কেবল তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তার মাথাটা গিয়ে গুঁড়িটায় লাগে, ঠিক যেখানটায় সিঁদুর লাগানো আছে। জ্ঞান হলে ঢোঁড়াই দেখে যে সে উবু হয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বেদীটার উপর।

'ওঠ্!'

ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়ায়। কেমন যেন দুর্বল দুর্বল লাগে, জ্বর ছাড়বার পরের মতো। মনে হচ্ছে হাঁটু দুটো দুমড়ে আসছে।

'এই মাটি রাখ খানিকটা। কোনো রকমে তার মাথার চুলে ছোঁয়াতে হবে।'

তাৎমাটুলির মোড়ে এসে, রবিয়ার বাড়ির দিকে মুখ করে গুণী পথের বালির উপর কী সব কতগুলো আঁকেজোখে। বলে 'চক্কর মেরে দিলাম[২], কাজ হবে। আমার বাকি পাওনা দিয়ে দিস পরের সপ্তাহে।'

১ কিচিন একশ্রেণীর পেত্নী। এরা যখন তখন গাছে পা ঝুলে বসে দোল খায়। অনেক সময় আমরা দেখি যে গাছের ডাল অকারণে দুলে উঠল তা কিচিনদের কাজ।

২ গুণীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে মন্ত্র পড়ে একটি বৃত্তাকার দাগ কাটে।

গুণীর কথার খেলাপ কেউ যেতে পারে না একথা সে জানে।

ঢোঁড়াই মাটিটুকু নিয়ে থানে ফিরে আসে প্রায় ভোর রাত্রে। বাকি রাতটুকুও অজস্র চিন্তায় জেগেই কেটে যায়। কী করে তার মাথায় দেওয়া যায় এক খাবলা মাটি? দেওয়ার সময় যদি জানতে পারে! 'তরিবৎবালী'[1]? পচ্ছিমের মেয়ে আবার কী জানি কী ভাবে নেবে জিনিসটাকে। মেয়েটাই আমাকে গুণ করেছে কিনা কে জানে। না হলে এমন তো কখনও হয়নি। বিড়ি না খেলেও এত মন আনচান করে না। মেয়েটা 'শাঁখডেল' নয়ত? দূর কী যে 'অটর পটর' ভাবি[2] তার ঠিক নেই।...

ঢোঁড়াই ঠিক করতে পারে না, বাওয়াকে তার এই শাদি করতে ইচ্ছার কথা বলবে কিনা। বাওয়া চেয়েছিল তাকে এই গোঁসাই থানের ভার দিতে। সেই জন্য তাকে 'ভকত' বানিয়েছিল। তার মাটিকাটার কাজ নেওয়ার পর থেকে বাওয়া বোধ হয় সে আশা ছেড়ে দিয়েছে; অন্তত তার পর থেকে আর কোনোদিন সে কথা বলেনি। তবুও লজ্জা লজ্জা করে বাওয়াকে এই শাদির কথা বলতে। বাওয়া যদি জিজ্ঞাসা করে টাকা পাবি কোথায়? তবে আজকাল বিয়ের খরচ একটু কমেছে মনে হচ্ছে কিছুদিন থেকে। রোজগার কমে গিয়েছে, অথচ 'সরাধ'-এর কানুনের[3] জন্য তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতেই হবে। লোকে খরচ করবে কোথা থেকে। অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে টাকায় রোজ এক পয়সা করে সুদে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যেতে পারে। শুক্রা আর এতোয়ারী ধাঙড়ও কিছু দিতে পারে। দুখিয়ার মা? তার এক পয়সা মরে গেলেও না; এর জন্য শাদি যদি নাও হয় তাও ভাল। বেঁচে থাকুক অনিরুধ মোক্তার। বিয়ে শ্রাদ্ধয় ধার করবে না তো করবে কখন? কিন্তু শাদির পর বৌ থাকবে কোথায়? গোঁসাই থানে তো মেয়েমানুষের থাকবার জায়গা হবে না। মাটি কাটার কাজ থাকলে পয়সার অভাব হবে না; আর বামিয়া নিজেও কামাবে খুব; যা তাকৎ ওর গায়ে, ও কোদারীর কাজ পর্যন্ত করতে পারে[4] দরকার হলে; এখানকার ঝোটাহাদের মতো খালি খুরপি দিয়ে মাটিতে সুড়সুড়ি দেওয়া নয়। মরদের মজুরি কামাবে।

সন্ধ্যাবেলা আবার ঢোঁড়াই গলাকাটা সাহেবের হাতা থেকে কুল পেড়ে

১ আদবকায়দা জানা স্ত্রীলোক।

২ ছাইভস্ম; যে চিন্তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

৩ সরদা আইন।

৪ কোদাল। জিরানিয়ার কাছাকাছি স্ত্রীলোকেরা কোদাল নিয়ে কাজ করতে পারে না সামাজিক বাধা অপেক্ষা শারীরিক অক্ষমতাই এর কারণ বলে বোধ হয়।

আনে। একেবারে গাছ ঝেড়ে পেড়ে নিয়ে যায় পাড়ার ছোঁড়াগুলো। আজকালকার ছেলেদের সাহস কি বেড়েছে। ঢোঁড়াইরা তো ছোটবেলায় গলাকাটা সাহেবের হাতার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত। সে কিছুতেই ভেবে কুলকিনারা পায় না—কী করে একটু মাটি সে রামিয়ার মাথার চুলে দেবে খানিকটা মাথায় মাখবার সরষের তেল রামিয়াকে দিলে হয়—তার সঙ্গে এই মাটি একটু মিশিয়ে। মাথায় মাখবার তেল দিলে নেবে না, এমন 'ঝোটাহা' ঢোঁড়াই জীবনে দেখেনি। তবে এ হচ্ছে পচ্ছিমের পাখি, কী জানি যদি না নেয়। থানের পিদিপের জন্য বলে খানিকটা তেল মেয়েটাকে নিশ্চয়ই দেওয়া যায়; তাতে সংকোচের কোনো কথা নেই। অমন ঢের পচ্ছিমবালি ঢোঁড়াই দেখেছে।

বাওয়ার তেলের শিশি থেকে একটু তেল নারকোলের মালায় ঢেলে নেয়। ঢোঁড়াই এতদিন বাওয়াকে ঠাট্টা করেছে, কেন সে নারকোলের মালা দেখলেই কুড়িয়ে রেখে দেয়! এখন সে বোঝে যে বাওয়া সত্যিই বুদ্ধিমান। পুজোর পিদিপের তেল বলে দিলেও একটু আধটু মাথায় মেখেই নেবে—কমসে কম তেলের হাতটা মুছবে মাথায়। ঢোঁড়াই ভেবে রাখে যে, এই তেলটুকু থানেই রেখে দিতে বলবে রামিয়াকে, রোজ রোজ এখানে এসে যেন পিদিপে ঢেলে নেয়। না হলে বাড়ি নিয়ে গেলে রবিয়ার ঐ হ্যাংলা সাতগুষ্টির ভাল্লুকের মতো চুলেই—বাস্ এক মিনিটেই সাফ্।···

পিদিপটা আঁচলের আড়াল করে রামিয়া আসে গোঁসাইথানে সন্ধ্যাবেলায়। এসেই বলে—আজ বড জলদি জলদি ফিরেছ কাজ থেকে। অথচ রামিয়া এইটাই আশা করেছিল। ঢোঁড়াই এখন না এলে একটু হতাশ হত। ঢোঁড়াইয়ের বুকের ভিতর তখন হাতুড়ি পিটছে, আবার ধরা পড়ে গেল না তো? একটু ঢোঁক গিলে সে রামিয়ার কথার জবাব দেয়—'হাঁ'।

থানে পিদিপ দেওয়ার আগে, আঁচলটা মাথায় দিতে দেখেই ঢোঁড়াইয়ের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে। কুল কটার সঙ্গে এক চিমটে মন্তরের মাটি মিলিয়ে রাখলে হয় না—পচ্ছিমের মেয়ের কখন কী মতিগতি কিছু বলা যায় না; কুল কটা নিশ্চয়ই আঁচলে বেঁধে নেবে; পরে আবার যখন আঁচলটা মাথায় তুলে দেবে, তখন কি মাটির একটা কণাও তাতে লেগে থাকবে না? হঠাৎ সে হড়বড় করে বলে ফেলে 'একটু তেল নেবে—'থান'এ দেওয়ার পিদিপে জ্বালানোর জন্যে?'

কচি আমের ফালির মতো চোখ দুটোতে আগুনের ঝলক খেলে যায়। 'তোমার দেওয়া তেল আমি 'থান'এ জ্বালাব কোন দুঃখে? আমি কি

রাজগার করে খেতে জানি না? রামজী কি আমায় হাত পা দেননি? তোমাদের 'ঝোটাহা'দের জানি না; আমাদের তারাপুরে এমন কথা মরদ বললে তার মোচ উপড়ে নিতাম!'

ঢোঁড়াই একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কী তেজ! কী দেমাক মেয়েটার! ফনফনিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। এই রামিয়া শোন্ শোন্।

মেয়েটা ফিরে দাঁড়ায়।

'পশ্চিমের রীত রেওয়াজ তো জানা নেই।'

রামিয়ার চাউনি আগেকার মতো নরম হয়ে গিয়েছে আবার।

'গলাকাটা সাহেবের বাড়ির ফুল নিতে তো মানা নেই তারাপুরের মেয়েদের?'

হেসে ফেটে পড়ে রামিয়া। এই চটে আবার এই হাসে, আজব পচ্ছিমের মেয়েদের 'চালচলন।'

'হাতে না। অনেক আছে। আঁচলটা ভাল করে পাত। ছোঁড়ারা কি ফুল থাকতে দেবে গাছে? দিনরাত গাছ ঠেঙাচ্ছে।'

রামিয়া চলে গেলে ঢোঁড়াই মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী। খুব সময়মতো মনে পড়েছিল ফুলের সঙ্গে মাটি মিলিয়ে রাখবার কথা। রামিয়াটা আবার রোজ স্নান করে; এখানকার ঝোটাহা'দের মতো না। কাল সকালে স্নানের আগে, এই আঁচলের ধুলোর কণা রামিয়ার চুলে লাগলে হয়। রামজী আর গোঁসাইয়ের উদ্দেশে সে প্রণাম করে, রামিয়ার মাথায় ঐ আঁচলের ধুলো একটুখানি লাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়।

কুক্কুরমেধ যজ্ঞের অপ্রত্যাশিত ফললাভ

জিরানিয়াতে আজ দুদিন থেকে একটা পাগলা কুকুরের উপদ্রব চলেছে। ...জন লোককে কুকুরটা এরই মধ্যে কামড়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের পোষা কুকুর বাড়িতে বেঁধে রাখেন। রাস্তায় যে কোনো কুকুরই থাক না কেন, তার গলায় চেন কিংবা বকলেস না থাকলে, তাকে মেরে ফেলা হবে। বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এই নিয়ে শহরে। মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা মোটা মোটা বাঁশ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কুকুর পিছু এক টাকা করে তারা পাবে; না কথাটায় একটু ভুল থাকল—এক জোড়া কুকুরের কান পিছু এক

টাকা করে পাবে মেথররা! সদ্যোমৃত কুকুরের কান দুটো কেটে নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখাতে হবে। এইটাই নিয়ম; তবে জ্যান্ত কুকুরের কান কেটে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারলেও কে আর ধরছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা মঞ্জুর, আর তাড়ির দোকানের সফেন আনন্দস্রোতের আবর্ত।

বিজনবাবুর বাড়ির সম্মুখের আমলকী গাছটার তলায় তাঁর আধ ডজন মেয়ের সিরিজ প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো 'এক্কাদোক্কা' খেলছে। তারা সকলেই একই ছিটের ছোট আঁটো ফ্রক পরে, একজন হাসলে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে, একজন লজেন্স চিবিয়ে খেলে আর কেউ চুষে খায় না নিজের লজেন্সটা; নতুন লোক দেখলে সকলে একসঙ্গে থামের আড়ালে গিয়ে খিক খিক করে হাসে, একজনের ফ্রকে ধুলো লাগলে সকলে নিজের নিজের জামা একবার ঝেড়ে নেয়। এদের মধ্যে সব চাইতে যে ছোট তাকে পাড়ার বখাটে ছেলেরা অলমতি বলে ডাকে।

অলমতি হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে—সে কুকুর দেখেছে, পাগলা কুকুর। অলমতির চিৎকারে শ্রীমতী চেঁচায়, সুমতি হাঁউমাউ করে ওঠে, বাকি তিনমতির ব্যাকুল কণ্ঠ সকলের স্বর ছাপিয়ে ওঠে।

বিজনবাবু তীব্রগতিতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠেন, গা-আলমারি থেকে বার করেন তাঁর বাবার আমলের পুরনো বন্দুকটা। লাইসেন্স রিনিউয়ালএর দিন ছাড়া, তিনি বছরে কেবল আর একদিন করে বন্দুকে হাত দেন। প্রতি বছরের কেনা এক ডজন কার্তুজ, তিনি বছরের শেষে, এক সন্ধ্যায় দোতলার ছাত থেকে উড়ন্ত বাদুড়ের ঝাঁকের মধ্যে নিশানা করে ছোঁড়েন। ঐ একদিন তাঁর মেয়ের দল সন্ধ্যাবেলায় 'বাদুড় বাদুড় পিত্তি'র কোরাস গান বন্ধ করে। ঐ একদিন শুক্রা ধাঙড় মরা বাদুড়ের লোভে[১] বসে থেকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। আজ পর্যন্ত কোনো বছর একটা বাদুড়ও বিজনবাবুর বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েনি।

এই উড়ন্ত বাদুড় মারতে অভ্যস্ত হাত, তাই পাগলা কুকুরটা মারবার সময় একটুও কাঁপেনি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার অন্যপারের বাকসের জঙ্গলটা যেখানে নড়ছিল, সেখান থেকে গোঙার কাতরানির শব্দ আসে। বিজন উকিল আর পাড়ার অন্য কয়েকজন মিলে খানিক পরে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসেন বৌকাবাওয়াকে। তার ডান পায়ের উরুতে বন্দুকের গুলি লেগেছে। সেখান থেকে রক্তের স্রোত বইছে। ময়লা কৌপীনটাতেও কি

১ ধাঙড়রা বাদুড়ের মাংস খুব পছন্দ করে…খেতে নাকি 'খাস্তা' মচ্‌মচে।

কিছু রক্ত জমে কালো হতে আরম্ভ হয়েছে। বিজনবাবুর বাড়ির দোতলায় বৌকাবাওয়ার জায়গা হয়। চুপি চুপি বিমল ডাক্তারকে তখনই খবর দিয়ে আনা হয়, বন্দুকের ছিটগুলি বের করে দেবার জন্য। এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য বিজনবাবুর স্ত্রী চিথরিয়া পীর-এ[1] সিন্নি মানত করেন। বৌকাবাওয়া সে রাতটা বিজনবাবুর দোতলাতেই থাকে। পরের দিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে আসবার সময় বিজনবাবুর স্ত্রী বলে দেন যে, রোজ তাঁদের বাড়িতে এসে যেন সে এক ঘটি করে দুধ খেয়ে যায়। ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে তা বিজনবাবুও ভাবেননি। তিনিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর। গোঁসাই থানে ফিরে গিয়ে বাওয়া সলাপরামর্শ করে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে। কী কথা হয় কে জানে। দুজনে মিলে আসে অনিরুধ মোক্তারের কাছে। কী মনে করে কী বিজনবাবু উকিল? চিড়িয়ার সামিল মনে করে তাৎমাদের। একটা বাদুড় মারার ক্ষমতা নেই আর বাওয়ার উপর বন্দুক দেগে দিল।

ফৌজদারী কাছারীতে বৌকাবাওয়াকে অনিরুধ মোক্তারের সঙ্গে ঘুরতে দেখে বিজনবাবুর মুখ শুকিয়ে যায়। মোকদ্দমায় কিছু হোক না হোক, বন্দুকের লাইসেন্সটাকে নিয়ে টানাটানি করবে কলেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দরকার কী হাঙ্গাম বাড়িয়ে। অনিরুদ্ধ মোক্তারকে ডেকে বিজনবাবু একান্তে কথাবার্তা বলেন। ব্যাপারটা যাতে বেশি দূর না গড়ায় তার জন্য বিজনবাবুর আর এখন টাকা খরচ করতে দ্বিধা নেই। বৌকাবাওয়াকে সাড়ে তিনশ টাকা দিতে তিনি তৈরি হয়ে যান।

বাওয়া ভয়ে কেঁপে মরে অত টাকার কথা শুনে। সতর কুড়ি টাকা। সে অনেক টাকা। এক কুড়ির চাইতেও বেশি। একটা চাঁদির পাহাড়। তা দিয়ে যা মন চায় করা যেতে পারে—রুপোর মন্দির করা যেতে পারে গোঁসাই থানে; পেট ভরে ঢোঁড়াই জিলাপী খেতে পারে; ঢোঁড়াইয়ের 'শাদি' আর থাকবার ঘর তুলবার খরচা ঐ টাকা দিয়ে হতে পারে; অযোধ্যাজী যাওয়ার রেলকিরায়ার[2] চাইতেও অনেক বেশি টাকা।

টাকাটা দেওয়ার সময় বিজনবাবু বলেন একটু দুধটুধ কিনে খাবেন এই দিয়ে, বাওয়া। বৌকাবাওয়া ভাবে আজ সকালেও বিজনবাবুর স্ত্রী উঠোন নিকিয়ে কম্বলের আসন পেতে তাকে ফল দুধ খাইয়েছিলেন; কিন্তু আজ থেকে এ বাড়ির ভিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। রামজী তার ভাল করলেন কি মন্দ করলেন

১ 'চিথরিয়া' মানে যেখানে ছেঁড়া নেকড়া টাঙানো হয় পীরের 'আস্তানে'।

২ রেল ভাড়া।

তা সে ঠিক বুঝতে পারে না। এই উত্তেজনার মধ্যে টাকাটা দেখে বাওয়ার মনটা দমে যায়—'চাঁদি' নয়, 'লোট'! অনিরুধ মোক্তার টাকাটা গুনে নিয়ে তার হাতে দেন—এই এত্তো লোট! এই একখানা 'লম্বরী'[১]। ওগুলো গুনে নাও—'পাঁচটাকিয়া দশটাকিয়া লোট'। বাওয়া দু তিনখানা গুনে হাল ছেড়ে দেয়। এত লোট! তার কপাল ঘেমে ওঠে। আর গোনাও কি সোজা কাজ। ছোট লোট তো বড লোট; একখানা থেকে আর একখানা আলাদাই হতে চায় না; হরফ, ছবি, রঙবেরঙের লেখা, তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে আরম্ভ করে। সে কোনো রকমে টাকাটা অনিরুধ মোক্তারের কাছে রেখে দিয়ে বাঁচে; পরে দরকার মতো নেবে।

অনিরুধ মোক্তার বলে, 'আমি খালি একখানা 'দশটাকিয়া' নেব।[২] তুমি ভকত আদমী! আমরাও হিঁদু, তোমার কাছ থেকে বেশি নিলে আমারই পাপ হবে, আহা-হা থাক থাক বাওয়া; আমার পায়ে হাত দিচ্ছ বাওয়া হয়েও? রামজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো। এ তো তিনিই করিয়েছেন আমাকে দিয়ে, আমার ধরমের কাজ।'…

বাওয়ার চোখ ফেটে জল আসে মোক্তার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। ইনিই তার বামরাজ্যের চাঁদির দুয়োর খুলে দিয়েছেন। ইচ্ছা হয় আরও খানকয়েক 'দশটাকিয়া' তাঁকে দিতে।…আচ্ছা সে পরে হবে। এখন সব টাকাই তো তাঁর কাছে থাকল।…

মহতোগিন্নীর সমাজশাসন

রামিয়া পাড়ার মহতো নায়েবদের সুনজরে পড়তে পারেনি। মহতোগিন্নীর সহানুভূতি না থাকলে প্রথমটায় এই পরদেশী মেয়েটার তাৎমাটুলিতে জায়গা পাওয়া শক্ত হত। প্রথম থেকেই মহতো ভাবে, মুঙ্গের জেলার মধ্যে তারাপুর ডাকঘাটে গাঁ—পচ্ছিমের পানি, বাড়বাড়ন্ত গড়ন; এ মেয়েকে সামলানো শক্ত হবে। মেয়েটা আবার একটু ছিনার[৩] গোছের। অন্য পাড়ার এমন মেয়ে হলে দেখতে বেশ, বলতে বেশ; যেমন ধাঙড়টোলার শনিচরার বৌ। কিন্তু নিজেদের বাড়িতে এ মেয়ে হলে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়। তাৎমাটুলিতে বিয়ের পর কোনো মেয়ে একটু আধটু বাবুভাইয়াদের নেকনজরে পড়লে, স্বামীরা জিনিসটা বিশেষ অপছন্দ করে না। এতে স্ত্রীরা একটু ফরস শাড়ি পরে, মাথায় তেল মাখতে পায়, 'পুরুখ'[৪] দিনে রোজগারে না বেরুলেও

১ একশ টাকার নোট। ২ দশ টাকার নোট।
৩ চটুলা। ৪ স্বামী।

তার 'ঝোটাহা' রাগারাগি করে না। কিন্তু কুমারী মেয়ের বেলায় এ নিয়ম খাটে না।

তা ছাড়া এই 'সরাধের কানুনের'[১] যুগে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে মিছামিছি পাড়ায় একটা পাত্র খরচ। কটা ছেলেই বা মোট আছে তাৎমাটুলিতে। কুমারী মেয়ে পাড়ায়, সমাজের চোখের সম্মুখে অনাছিষ্টি কাণ্ড করবে, তা আর ধন্নুয়া মহতো বেঁচে থাকতে হওয়ার উপায় নেই। মহতো ছড়িদারকে হাড়ে হাড়ে চেনে। তার আর রবিয়ার বৌয়ের এই মেয়েটার উপর হঠাৎ সহানুভূতি উছলে উঠল কেন তা সে আন্দাজ করতে পারে। একি 'নট্টিন'দের[২] গ্রাম পেয়েছে নাকি! এখানে ওসব চলবে না—লাভের বখরা দিলেও না। কিন্তু প্রথম কদিন হুঁকোতে জোরে জোরে টান মারা ছাড়া কিছু উপায় ছিল না; কেননা গুদরের মা মেয়েটার দিকে টেনে কথা বলত। ধানকাটনী থেকে ফিরবার পর ঝোটাহাদের একটু সমীহ করে চলতে হয়। সে জন্য মহতো তার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করেনি। রামিয়ার পারিবারিক ইতিহাস ধানকাটনীর দলের কাছ থেকে মুখে মুখে পাড়ার বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক একদিন মহতো দেখে যে হাওয়া গেছে বদলে। ভোরবেলা মহতো বসে 'কচর কচর' করে কাঁচা পেঁপে খাচ্ছে; মহতোগিন্নী এসে বলে, দাঁড়াও একটু নুন এনে দি।

মহতো অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কী? ধানকাটনীর পর কিছুদিন তো 'ঝোটাহা'দের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাওয়া যায় না।

গুদরের মা বলে, 'মেয়েটা বড় ঢঙ্গিলা'।[৩]

'কোন মেয়েটা?'

'আবার কে, ঐ তারাপুরবালী।'

'সব সময় ঐ একই মুখ দিয়ে কথা বল না কি। এই তো তারাপুরবালীর তারিফে জিভ দিয়ে জল পড়ত।'

মহতোগিন্নী এ অভিযোগ মাথা পেতে নেয়।

'খোসা দেখে কি সব সময় ধরা যায়, বেগুনের ভিতর পোকা আছে কিনা।'

'মেয়েদের বুদ্ধি।'

'সে তো একশবার।'

১ 'সরদা' আইন (বাল্যবিবাহ বন্ধ করবার)।

২ নাচ-গান করে যে জাতের মেয়েরা পয়সা রোজগার করে।

৩ চলানী।

তারপর আসল কথাটা প্রকাশ পায়। মেয়েটা নাকি ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে 'ঢলানি' আরম্ভ করেছে গোঁসাই থানে।

খবর শুনে মহতো চোখে অন্ধকার দেখে। তাদের পঙ্গু মেয়েটার একটা সুরাহা হয়ে যাবে, এ কথা নিয়ে তারা স্বামী স্ত্রী কতদিন কত জল্পনা কল্পনা করেছে আর তাতে বাদ সাধল কিনা ঐ বেজাত মেয়েটা। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে ওঠে।

লোকে শাক খাওয়ার জন্য তেল পায় না। ছটপরবের দিনও স্নানের আগে মাথায় এক খাবলা তেল দিতে পারে না, আর ইনি গোঁসাই থানে পিদিপ জ্বালান রোজ। আড়াই পয়সায় এক ছটাক তেল। রবিয়ার এত পয়সা আসে কোথা থেকে? এদিকে তার বাড়িঘর তো নিলামে চড়াচ্ছে জমিদার, বাকি খাজনার ডিক্রিতে।

মাঝে থেকে মুশকিল হল রতিয়া ছড়িদারের। রামিয়াকে তাৎমাটুলিতে আনবার সময়, সে যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে কিছু টাকা রোজগার করে নেবে মনে ভেবেছিল, এখন দেখে যে তা হবার নয়; একটা জায়গায় তার হিসাবে ভুল হয়েছে। সে ভেবেছিল লাভের 'হিস্সা'[১] দিয়ে মহতোকে হাত করবে। মহতোর সঙ্গে মিলে এ ধরনের কারবার সে অনেক করেছে। পঞ্চায়তের 'নায়েব'গুলোর মতামত সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। সেগুলো সব সুরদাস[২]; দিন আর রাতের তফাত বোঝে না। মহতোর চোখ দিয়েই তারা সব জিনিস দেখে; তার 'হাঁর সঙ্গে হাঁ মিলোয়'[৩]। টাকার লোভে মহতো গলে না, তা এই ছড়িদার জীবনে প্রথম দেখল। মহতোগিন্নীর সমর্থনের উপরও কিছুটা নির্ভর করেছিল। দিন কয়েকের মধ্যে তাকেও রামিয়ার উপর বিরূপ দেখে, সে মাথায় হাত দিয়ে বসে। সে চালাক লোক; সব জিনিস দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার কাছে; এতদিনে সে বোঝে যে মহতোগিন্নীর নজর ছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর। এ কী মুশকিলে পড়ল সে।

এসব ঝঞ্ঝাট একবার আরম্ভ হলে আর তার শেষ নেই। হলও তাই। পরদিন সকালেই ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর।

পরদিন ভোরে মহতোগিন্নী যাচ্ছিল জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ দেখে যে কুলের জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে, হলদে রঙের শাড়ি পরা একটি মেয়ে। কে মেয়েটা? ছাই, চোখে ভাল দেখিও না; তারাপুরের রাজকুমারী ছাড়া আর হলদে কাপড় এখানে কে পরবে? হাতে আবার দেখছি 'লোটা'! ব্যাপার

১ অংশ। ২ অন্ধ।
৩ 'হাঁ মে হাঁ মিলানা'—সায় দেওয়া

কী ? হয়তো মানতটানত করে থাকবে গোঁসাইথানে, তাই মরগামায় মোষের দুধ আনতে যাচ্ছে ! কিন্তু জঙ্গলের দিকে যাবে কেন ?

'ওরে ও রামিয়া, কোথায় চল্লি ?' একমুখ হাসি নিয়ে রামিয়া জবাব দেয় 'এই ময়দানে[১] !'

'বলে কী ছুঁড়িটা ? 'ময়দানে' যাচ্ছিস, ঘটি নিয়ে ?'

'কেন, তাতে কী হয়েছে ?'

'আবার জিজ্ঞাসা করছে, কেন। তুই কি মরদ 'লোটা' নিয়ে ময়দানে যাবি ?'

'কোনো মরদের বাপের লোটা তো নিইনি।'

দেখ কী কথার কী জবাব ! পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে মহতোগিন্নীর।

'বলি লজ্জা শরমের মাথা কি খেয়েছ ? লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাচ্ছ, বেটাছেলেরা দেখলে বলবে কী ? লোটা হাতে ঝোটাহা দেখলেই তো বেটাছেলেরা বুঝতে পারবে তুই কোথায় যাচ্ছিস, এই সোজা কথাটাও কি ঘটির মধ্যে গুলে গিলিয়ে দিতে হবে নাকি, তারাপুরের রাজকন্যাকে ? এসব 'কিরিস্তানি' আচার-ব্যাভার আমার পাড়ায় চালাতে এসেছিস ; একি 'নটিন'দের গ্রাম পেয়েছিস নাকি ?'

মাথায় খুন চড়ে যায় রামিয়ার।

'জল না নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়া আমাদের পচ্ছিমের মুলুকে নেই ; তা কোনো দিন শিখিওনি, পারবও না। জংলী মুলুকের নরম পানির লোক, তরিবৎ শেখাতে এসেছেন তারাপুরের লোককে !'

হাতের লোটাটা দড়াম করে মাটিতে রাখে। তারপর হাতের মুঠোর একটা মুদ্রা দেখিয়ে বলে 'এমনি করে ঠুসে ঠুসে তোমার মধ্যে তরিবৎ গুঁজে দিতে পারি দশ বচ্ছর ধরে। এই যদি তোমাদের জংলী 'ভূচ্চর'দের টোলার নিয়ম হয়, তাহলে আমি এই এক লাথি, দু-লাথি, তিন লাথি মারি সে নিয়মে।' ঘটিটি কাৎ হয়ে পড়ে। গালির স্রোত একটানা চলতে থাকে। রামিয়া না মহতোগিন্নী কার পারদর্শিতা এ শাস্ত্রে বেশি বলা যায় না। লোক জড় হয়ে যায় সেখানে। পাড়ার মেয়েরা মহতোগিন্নীকে ঠেলেঠুলে বাড়ির দিকে নিয়ে আসে। মহতো তখন সবে একটু রোদ পোয়াতে বসেছে।

'তুমি না এ গাঁয়ের মহতো ? তুমি থাকতে তোমার স্ত্রীকে, তোমার জাতকে, তোমার টোলাকে বেইজ্জৎ করে ঐ একরত্তি পরদেশী ছুঁড়িটা। কার

১ হিন্দীতে 'ময়দান মে যানা'র অর্থ পায়খানায় যাওয়া। জল নিয়ে পায়খানায় যাওয়া তাৎমা মেয়েদের বারণ। মেয়েদের পক্ষে এর চেয়ে চরম নির্লজ্জতা আর কিছু হতে পারে না।

সঙ্গে কেমন কথা বলতে হয় জানে না। 'অন্ধনগরী, চৌপটরাজা, টাকে সের ভাজি, টাকে সের খাজা'।[১] বয়সের গরবে আজ আমার যা অপমান করেছে ঐ মেয়ে, ওকে যদি আমি 'জল না খাইয়ে ছেড়েছি'[২] তবে আমি ডগরাহার মেয়ে না। আমাদেরও একদিন ছিল ঐ বয়স। কিন্তু তখনও কোনো দিন সমাজকে হেনস্তা করে লোটা নিয়ে ময়দানে যাওয়ার বেহায়াপনা করিনি। কী কুক্ষণেই এ মেয়েকে এনেছিলাম। এ যে 'ফুসকুড়ি খুঁটে ঘা করে তুললাম।'[৩] ও ছুঁড়ি লাথি তো আমাকে মারেনি, মেরেছে জাতের মহতো নায়েবদের। থাকো তোমার ঐ মহতোগিরি, মোচ, আর তোমাদের তন্ত্রিমাছত্রি না কি জাত বলে তারই গরবে।' ··

'কী! এতবড় আস্পদ্ধা ঐ 'একচিমটি' মেয়েটার।' লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে মহতো বাড়ির বাইরে। 'কোথায় রতিয়া ছড়িদার। বোলাও নায়েবদের।' দুজন নায়েব গাঁ থেকে অনুপস্থিত ছিল সেদিন, গিয়েছিল ভিনগাঁয়ে 'কুটমৈতি'[৪] করতে। 'আচ্ছা আসছে রবিবারে মেয়েটার বেহায়াপনার বিচার হবে, সাঁঝের বেলা; পঞ্চায়তে। লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাবে মেয়ে-মানুষে তাৎমাটুলিতে? আমরা বেঁচে থাকতে? কভভী নহী[৫]।' অকথ্য ভাষায় রামিয়ার উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে মহতো বাড়ি ফেরে।

রামিয়া তখন রবিয়ার উঠোনে আপন মনে বকে, বুক চাপড়ায়, মাটিতে মাথা কোটে, মরা মায়ের নাম করে কত কী বলে কাঁদে। পাড়ার ছেলেপিলেরা রবিয়ার আঙনে উঁকিঝুঁকি মারে। ফৌজী ইঁদারাটার চারিদিকে ঘোটাহারা জটলা করে।

বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা

তাৎমাটুলিতে শোরগোল পড়ে যায়। বাওয়া টাকা পেয়েছে। অনেক টাকা। এই এত্তো! টাকার পাহাড়, পুঁতে রাখতে গেলে ঘড়াতেই আঁটবে না তার লোটাতে কী বলছিস? কত আর বুদ্ধি হবে মেয়ে-মানুষের। হাঁড়ি নামিয়ে মহতোগিন্নী ছোটে; খুরপি হাতে নিয়ে রবিয়ার বৌ আসে; 'ফৌজী'

১ যেমন রাজা, তার তেমনি রাজ্য; এখানে শাকের দামও দুই পয়সা সের, খাজাও দুই পয়সা সের।

২ স্থানীয় ভাষায় 'পানি পিলা কর ছোড়না'র মানে নাকানি চুবানি খাওয়ানো।

৩ হিন্দী প্রবাদ।

৪ কুটুম্বিতা। ৫ কখনও নয়।

ইঁদারাটার চারিদিকে খালি, ভরা, কাৎ হয়ে পড়া, মাটির কলসীর সার যেমন-কে-তেমন পড়ে থাকে। হারিয়াদের দলের সাতজন ঘর ছাইছিল শহরে ; সেখান থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে আসে গোঁসাইথানের দিকে। ঝোটাহার দল পাড়ার অলিগলিতে মাচার পাশে গাছের নিচে জটলা করে। মরদরা থানে পৌঁছুনোর পর তারা যাবে থানে। সেখানে তারা পিছনে আলাদা থাকবে। মরদের সঙ্গে সভায় গা ঘেঁষাঘেষি করে বসা,—মাগো! সে করুকগে ঐ ঢলানী ধাঙড়ানীর দল, সেটি আর এখানে হওয়ার জো নেই।

গোঁসাইথানে লোক গিজ গিজ করছে। ধাঙডটুলি থেকে পর্যন্ত সকলে এসেছে, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে। বাওয়া বসেছে মাঝখানটায়। তাকে ঘিরে বসেছে মহতো ছড়িদার আর নায়েবদের দল। এক মুহূর্তের মধ্যে বাওয়ার স্থান 'টোলার' মধ্যে অনেক উঁচুতে হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াইয়েরও। বাবুলাল চাপরাসীর চাইতেও উঁচু কিনা তা এখনও ঠিক হয়নি। সময় লাগবে কথাটা বিবেচনা করতে।

মহতো বলে 'ঢোঁড়াইকে দেখছি না ; সে ছেলেটা আবার এখন গেল কোথায়।'

শনিচরা ঢোঁড়াইকে কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়। রতিয়া ছড়িদার বলে 'এদিকে এসে কাছে বস না কেন।'

'এক জায়গায় বসলেই হল!'

তাৎমারা সকলেই মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয় ; আজও কি ঐ ধাঙড়দের মধ্যে না বসলেই নয়। ঐ এক ধরনের ছেলে।

আদুরে ছেলের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবার উদারতা জেগেছে আজ সকলের মনে।

মহতো কাজের কথা পাড়ে। 'তা বাওয়া প্রসাদী তো চড়াতে হয়[1] থানে —পেঁড়ার প্রসাদী। থানের দয়াতেই তো তোমার সব কিছু।'

বাওয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

'আর একটা ভোজ।'

'একটা ভেড়া বলি।'

'থানের পাশে একটা ইঁদারা করে দিয়ে তার বিয়ে দিয়ে দাও[2], না হলে

---

১ পুজো দিতে হয়।

২ তাৎমাদের মধ্যে কুয়োর বিয়ে দেবার একটি প্রথা প্রচলিত। বিয়ের গান ইত্যাদি শুনলে বোঝা যায় এ কোনো এক 'কামলা'র সঙ্গে 'কোয়াল''র বিবাহ অনুষ্ঠান। তাৎমাদের বিয়ের সময় এইরূপ কুয়োর জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ফৌজি কুয়ো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের। সরকারী কুয়োয় ঐ সকল অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না সেইজন্য নূতন কুয়োর কথা উঠেছিল।

বড় অসুবিধা হয় আমাদের 'দশবিধ'-এ[১]।'

'থানের জন্য একখানা সীতা রামজীর রঙিন ছবিওয়ালা রামচরিতমানস কেনো।'

'টোলার ভজনের করতাল দুটো ভেঙে গিয়েছে; তাই একজোড়া কিনে দাও।'

কত রকমের ফরমাস আসে। বাওয়া কারও কথার জবাব দেয় না। ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে সলাপরামর্শ করে পরে যা করার তা করবে। এখন কেবল পেঁড়ার প্রসাদ সকলে পাবে।

মহতো নায়েবরা দুঃখিত হয়। সলাপরামর্শ করে বলার মানে সবাই জানে; ও তো কেবল কথা চাপা দেওয়ার ফন্দি। এই থানের মাটি এককুড়ি বছর গায়ে মেখে তবে তো যখের ধন পেয়েছে। এখানে একটা মন্দির করে দেবে, এর মধ্যে সলাপরামর্শ আবার কী! মন্দির করে দিলে নাম হবে তোমার না আমাদের! ভিক্ষে করে যার জীবন গিয়েছে সে ইজ্জতের কথা কী বুঝবে! 'নভ দুহি দুধ, চহত এ প্রাণী'[২]। এর কাছ থেকে থানের আর পাড়ার কোনো জিনিস আশা করা, আকাশ দুয়ে দুধ চাইবার মতোই অবাস্তব। তবে টাকাওয়ালা লোককে সমীহ করে চলতে হয়, তাদের সঙ্গে কথা বলবার আগে ভেবে বলতে হয়; আর সকলেরই মনে একটি ক্ষীণ আশা আছে যে আজকালকার মতো দুর্দিনে টাকা ধার করার জন্য হয়তো আর অনিরুধ মোক্তারের খোসামোদ করতে হবে না।

ঢোঁড়াইকে বাওয়া শহরের দিকে পাঠায় পেঁড়া কিনতে। বাবুলাল ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যই বলে 'ঢোঁড়াই লছমন হালুয়াই-এর দোকান থেকে নিয়ে আসিস।'

মহতোও সায় দেয় 'হাঁ লছমন হালুয়াই, পেঁড়াতে চিনি কম দিয়ে ঠকায় না।' কথার সুরে মনে হয় যেন সে রোজই লছমনের আর অন্য মিঠাইওয়ালাদের দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে থাকে।

এখন পয়সার আকাল এসেছে দেশে। টাকার দরকার তাৎমাদের সকলেরই। এরই মধ্যে টাকার আণ্ডিল পেল কিনা বাওয়া! ছেলে নেই, পিলে নেই, ঘর নেই, সংসার নেই, 'শাদি সরাধ'-এর কোনো ফিকির নেই[৩],

১ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান।

২ তুলসীদাস—আকাশ দুয়ে দুধ চায় লোক।

৩ বিয়ের শ্রাদ্ধর কোনো চিন্তা নেই।

খাওদাও ডুগডুগি বাজাও 'না আগে নাথ, না পিছে পগাহা'[1]। সেই বাওয়ারই খুলল 'তকদীর'![2]

তবে ঐ যে ধাঙড়গুলো বসে রয়েছে, ওগুলো বেশ করে বুঝুক যে ঢোঁড়াই ওদের সঙ্গে মাটি কাটে বলে, ওরা ঢোঁড়াইয়ের সমান হয়ে ওঠেনি।

অনেকরাতে ভজন শেষ হবার পর সকলে চলে গেলে বাওয়া ঢোঁড়াইকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের চাটাইয়ের উপর শোয়ায়—সেই ছোট বেলার মতো। আজ ক'বছর থেকে তারা আর এক চাটাইতে শোয় না। শীতকালে আগুনের 'ধুর'-এর এক দিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে বাওয়া—তা না হলে বড় শীত করে। বহুদিন পরে আজ আবার বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বাওয়ার জটার গন্ধে ঢোঁড়াইয়ের কত ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

'অনেক টাকা, না বাওয়া?'

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ।'

'অনেক কুড়ি—না?'

'হাঁ।'

তারপর ঢোঁড়াই একেবারে চুপ করে যায়। বাওয়া ভাবে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ছেলেটা।

হঠাৎ ঢোঁড়াই বলে, 'বাওয়া, আমি রামিয়াকে শাদি করব।' নিশ্বাস বন্ধ করে ঢোঁড়াই বাওয়ার উত্তরের প্রতীক্ষা করে। বাওয়া তার ভালবাসার অত্যাচার ছোটবেলা থেকে অনেক সয়েছে। কত সময় কত অন্যায় করেছে সে, কিন্তু বাওয়া সব সময় নিজের ব্যবহার দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার উপর অবিচার করার জুলুম করার দাবি আছে। এই দাবিই ঢোঁড়াইয়ের আসল পুঁজি। কিন্তু তবু আজ তার মনের মধ্যে খচখচ করে বেঁধে—'শাদি'র কথায় কোথায় যেন খানিকটা অন্যায্যতা আছে। বাওয়া চেয়েছিল তাকে 'ভকত' করতে; বিয়ের পর বাওয়ার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে; অথচ বাওয়া টাকা না দিলে রামিয়ার সঙ্গে শাদি হওয়া শক্ত। একটার পর একটা করে এই সব চিন্তা ঢোঁড়াইয়ের মনে আসে। তার মনে হয় বাওয়ার করস্পর্শ মুহূর্তের জন্য একটু যেন আলগা হয়ে আসে। রামিয়া, রামিয়াকে তার চাই-ই। কোনো বাধা সে মানবে না।

ঢোঁড়াই বোঝে যে বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আঙুল দিয়ে

১ হিন্দী প্রবাদ—যে লোকের আগেপিছে ভাববার দরকার নেই।
শব্দার্থ: (বলদের) না আছে নাকের দড়ি সম্মুখে, না আছে রাশের দড়ি পিছনে।

২ ভাগ্য।

ঢোঁড়াই তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বাওয়া তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই দিনটার অপেক্ষা বাওয়া অনেক দিন থেকে করছে—আর এ বিচ্ছেদকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। টাকার প্রশ্ন এর মধ্যে কেবল গৌণ নয়, এক রকম অবান্তর। ঢোঁড়াই বিয়ে করবে এ বাওয়া ক বছর আগে থেকেই ধরে নিয়েছে, আর বিয়ের পর তাৎমা ছেলেমেয়েদের মা-বাপ শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকার রেওয়াজ নেই।

ঢোঁড়াই জানে যে বাওয়া টাকা দিতে আপত্তি করবে না। আর বাওয়া মনে মনে ভাবে যে ঢোঁড়াইটা এখনও ছেলেমানুষ আছে, মোচ উঠলে কী হয়; না হলে আজ যে খানিক আগে সকলে টাকা খরচ করবার নানারকম রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন সে কারও কথার জবাব দেয়নি কেন। ওরে মুখ্য, এই সোজা কথাটুকু বুঝতে পারলি না। থানে মন্দির তৈরি করবার চাইতেও বেশি আনন্দ আমার তোকে সুখী দেখলে, একথাও কি মুখ ফুটে তোকে বলতে হবে নাকি? ছোটবেলায় যখনই তোকে কোলে নিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে যে বুড়ো রাজা দশরথ অযোধ্যাজীতে এমনি করেই একদিন তাঁর রামচন্দ্রজীকে কোলে নিয়েছিলেন।

'ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে।'[১]

আমার সেই ঢোঁড়াই কথাটা পাড়ল যেন ভিক্ষে চাইছে টাকা আমার কাছ থেকে! আশ্চর্য! কী চিনেছে সে আমাকে? আরে তোরই তো সব।

ঢোঁড়াইয়ের ঘর তুলে দিতে হবে। ভাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর ছেলেপিলে; বাড়বাড়ন্ত সংসার, ঝকঝকে নেপা উঠোন, বড় বড় কাঁচারাটির জালা দাওয়ার উপর; ঢোঁড়াইয়ের বৌ রঙিন কাপড় পরে কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করছে শুখিয়ে বিক্রি করবার জন্য, তেঁতুল গাছ জমা নিয়েছে পাঁচ টাকায়, আদা দিয়ে বড়ি দিচ্ছে উঠোনে আমলকী আর অশথের ডগার আচার শুখোতে দেওয়া হয়েছে;—সমৃদ্ধির রামায়ণের ছবিভরা পাতা, একখানার পর একখানা খুলে যাচ্ছে বাওয়ার বন্ধ চোখের সম্মুখে। তার ঢোঁড়াই, সেই একরত্তি ঢোঁড়াই, ভিক্ষের সাথী ঢোঁড়াই। কথা বলতে পারে না বাওয়া। কী করে সে ঢোঁড়াইকে বোঝাবে তার মনের এত অব্যক্ত কথা, ভিক্ষের চালের মতো একটি একটি করে জমানো, তার মনের কত অশ্রু বেদনা ভরা কথা। ঢোঁড়াইকে একদিনও দুবেলা ভাত খাওয়াতে পারেনি। কত

১ তুলসীদাস ধূলি ভরা ধূসর তনু (রামচন্দ্রের): রাজা হেসে তাঁকে কোলে তুলে নেন।
২ একে 'আদৌরী' বলে। অতি সুখাদ্য বলে গণ্য।

সাধ তার মনে। ঢোঁড়াইকে একদিন পেট ভরে আলুর তরকারি খাওয়াবে। তাকে একটা 'বিলিতি লণ্ঠন'[১] কিনে দেবে। সেই লণ্ঠনের আলোতে মিসিরজী রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছেন। কত লোক! এই এত দেশি চিনি, পাকা শসা খোসা সুদ্ধ চাকা চাকা করে কাটা, এত হলদে হলদে 'বাগনর',[২] রমরমা জমজমা সমৃদ্ধির পাহাড় ফুলে কেঁপে উঠছে। অশ্রুর ধারা তার এতকালের সঞ্চিত দুঃখের মালিন্য ধুয়ে নিয়ে যায়। রামজী! অদ্ভুত তোমার লীলা। রামায়ণপড়া লোকই কত সময় বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়, তা বাওয়া তো কোন ছার। ঢোঁড়াইয়ের মায়ায় সে কি ভরতরাজের মতো হয়ে যাবে নাকি। সামান্য কুকুরে কামড়ানোর ঘটনার মধ্যে দিয়ে রামজী তার সম্মুখে স্বর্গের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, পৃথিবীর স্বর্গ অযোধ্যাজীর দুয়ার, বাওয়ার চিরজীবনের স্বপ্ন, মানুষের সেরা তীর্থের দুয়ার। সে যদি 'নালায়েক'[৩] হয় তবেই সে রামজীর এই অদৃশ্য ইঙ্গিত মানবে না।···ঢোঁড়াইটা এখনও উসখুস করছে, চাটাইয়ের নিচে থেকে ঠাণ্ডা উঠছে বোধ হয়,···ঢোঁড়াইকে জীবনে একখানা কম্বল সে কিনে দিতে পারেনি।···ঢোঁড়াই সুখী হবে তো রামিয়াকে বিয়ে করে? মেয়েটা আবার শুনছি লোটা নিয়ে ময়দানে যায়!···

বাওয়ার হাতের স্পর্শের ভিতর দিয়ে ঢোঁড়াই তার সমস্ত মনের কথা বুঝতে পারে। জীবনে এই প্রথম ঢোঁড়াইয়ের চোখে জল আসে।···

ঢোঁড়াইয়ের বিবাহের আয়োজন

রোজগারের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হচ্ছে তাৎমাদের। ধানকাটনীর ধান আর কদিন চলবে। খাপড়ার বাড়ি আর নূতন করে বাবুভাইয়ারা করাচ্ছে না। ঐ যে এক ফঙ্গবেনে ঢেউখেলানো টিন হয়েছে, লোকে গোয়াল পর্যন্ত করতে আরম্ভ করেছে তাই দিয়ে; তা কাজ পাওয়া যাবে কোথা থেকে। এখনও অবিশ্যি পুরনো খাপড়ার বাড়িগুলো আছে; তাও কতক কতক লোকে বদলে টিন দিয়ে নেওয়া আরম্ভ করেছে, বছর বছর খাপড়া বদলানোর ঝক্কি আর খরচের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সুদখোর অনিরুধ মোক্তার আর সাওজীর তো টাকার অভাব নেই। তারা নতুন ভাড়া দেবার বাড়ি করাচ্ছিল সব ঐ ঢেউখেলানো টিনের। তাদের দুজন ভাড়াটের মাথায় গোঁসাই ভর করেছিলেন জৈঠ মাহিনার দুপুরে[৪]—আমাদের রুজি মারবার জন্য চটে।

---

১ ডিজ লণ্ঠন।
২ কাঁচকলা পাকা।
৩ অযোগ্য।
৪ জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে।

কাঁচা আমপোড়া খাইয়ে কোনো রকমে তো তারা সেরে উঠল, কিন্তু তারপর আর কেউ টিনের বাড়িতে থাকতে রাজী নয়। তাইতে এখন আবার সব বাড়ির টিনের উপর খাপড়া তো আর বছর বদলাতে হবে না। তবু মন্দের ভাল! এ হল কী দুনিয়ার। দিনে দিনে সব বদলে যাচ্ছে। আগে দেখেছি কদু কুমড়োর গাছে, বাবুভাইয়াদেব বাড়ির চাল ভরে থাকত; আর বাবু-ভাইয়াদের ছেলেরা চব্বিশ ঘণ্টা খাপড়াগুলো মট্‌মট্‌ করে গুঁড়ো করে কদু-কুমড়ো পাড়ত। আজ সে গাছ পোঁতাও নেই, সে ছেলেগুলোও বদলেছে। ছেলে তো ছেলে! দুনিয়াটাই বদলে যাচ্ছে! সে রকম বৃষ্টি কোথায় হয় আর, যেমন আগে হত; যতক্ষণ তাৎমারা গিয়ে চাল মেরামত না করে দিচ্ছে, ততক্ষণ বাবুভাইয়ারা সকলে খাটের তলায় বসে থাকত। সে রকম বড বড 'পাথল'ও[1] পড়ে না আজকাল—সে রকম খাপড়া গুঁড়ো করা 'পাথল'। আগে বারোমাস মরণাধারে জল থাকত; এখন বছরে ছ'মাসও থাকে না।

কুয়ো খোঁড়ানো, আর কুয়ো পরিষ্কার করার রোজগারেরও ঐ হালৎ। বাড়ি বাড়ি 'বম্‌মা'[2] বসছে আজকাল। বাবুভাইয়াদের বলতে গেলে বলে 'বম্‌মা' বসাতে খরচ, কুয়ো তৈরি করার খরচের চাইতে কম। বাবুভাইয়ারা সব তাদের বাপ-ঠাকুরদার চাইতেও বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। পয়সা আছে তোদের, যা বোঝাবি বুঝে যাব! কিন্তু বুঝলেই কি পেট ভরে?

রতিয়া ছড়িদারের দরকার টাকার। ওদিকে তো রোজগারের ঐ অবস্থা। তার উপর পঞ্চায়তেও কম মামলা আসছে। ভোজে খরচ করার পয়সা থাকলে তবে তো লোকে পঞ্চায়তিতে মামলা আনবে।

তাই ছড়িদার আসে রবিয়ার সঙ্গে গোটাকয়েক কাজের কথা বলতে। ঢোঁড়াইটার রামিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে পারলে কিছু রোজগার হতে পারে দুজনেরই।

'চলে এস আঠ আনা—আঠ আনা।'[3]

রবিয়া বলে 'তা কী করে হবে। এ কি অন্ধকে লণ্ঠন দেখাচ্ছ? আমি মেয়েটাকে এতদিন থেকে খাওয়াচ্ছি। দশ আনা—ছে আনা হলেই কাফি।'

'ধানকাটনীতে তোর বৌয়ের সঙ্গে মেয়েটাকে জুটিয়ে দিয়েছিল কে? পঞ্চদের মত করাতে পারবি, এই বিয়ের পক্ষে? সে সময় দরকার হবে ছড়িদারের। মহতো আবার যা বিগড়ে আছে মেয়েটার উপর! রবিবারে পঞ্চায়তি, মনে আছে তো?

[1] শিলাবৃষ্টি। [2] টিউবওয়েল। [3] আধাআধি বখরা।

রবিয়া জানে যে, কথায় ছড়িদারের সঙ্গে পারা শক্ত। সে ছড়িদারের [দ]ওয়া শর্তে রাজী হয়ে যায়।

টাকাওয়ালা লোকের বিরুদ্ধে 'পঞ্চ্'রা যেতে পারে না, একথা সবাই [জা]নে। রবিবারে পঞ্চায়তির ভিতর মহতো পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে [কি]ছু বলতে সাহস পায় না; কেবল ভোজের সম্বন্ধে কথা হয়। মহতোর [স]ম্মান রাখবার জন্য নায়েবরা ঠিক করে দেয় যে, রামিয়া এখনই গিয়ে [ম]হতোগিন্নীর 'গোড় লাগবে।'[1] লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাবার কথাটা কেউ [তো]লেই না। ভাবী 'পুতহু'র[2] নির্লজ্জতার কথা উঠিয়ে আজ আর তাবা [ব]াওয়ার মতো একজন লোকের মাথা হেঁট করাতে পারে না।

বাওয়া ভেবেছিল যে, আর দু'চার মাস যাক; কিন্তু রবিয়ার টাকার [দ]রকার এখনই। সে বলে, 'ভাদ্রতে দেবে নাকি বিয়ে—পুরুব মুলুকের বেঙ্গার শাদি'[3]। বাওয়া লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ে—'না না তা বলছি না। [ত]বে থাকবার ঘর তুলতে হবে তো।'

'সে আর কী? সাতদিনের মধ্যে সব হয়ে যাবে।' সত্যিই সাতদিনের [ম]ধ্যে সব তৈরি করে দেয়, ঢোঁড়াইয়ের তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলি দু' জায়গার বন্ধুরা মিলে। বাওয়ার ইচ্ছা উঠোনের মধ্যে একটি পাতকুয়া থাকুক···প্রত্যহ স্নান করার অভ্যাস রামিয়ার। ছড়িদার চটে যায়—'তার চাইতে বল না কেন, বাড়িতে পায়খানা তৈরি করবে, চেরমেন সাহেবের বাড়ির মতো।'

বাওয়া কিন্তু নিজের জিদ্ ছাড়ে না, 'কুয়ো এখন না করলে বর্ষাতে করা যাবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কুয়ো হয়ে যাবেখন'—বুড়ো এতোয়ারী ব্যাপারটির [ন]িষ্পত্তি করে দেয়।

ধাঙড়রা ঢোঁড়াইয়ের ঘর তুলতে সাহায্য করে। রবিয়া ঢোঁড়াইকে বলে 'আবার ওগুলোকে ডাকছিস কেন, ঢোঁড়াই?' দুদিনের মধ্যে রবিয়া তার শ্বশুরস্থানীয় হয়ে উঠেছে। ঐ মিচকে রবিয়াটা বাওয়ার বেয়াই হয়ে যাবে; হাসি পায় ঢোঁড়াইয়ের। বুড়ো এতোয়ারী সোডা কোম্পানি থেকে ছুটি নিয়ে ঢোঁড়াইয়ের বাড়ির বেড়া বাঁধতে বসে, আর বাওয়াকে মধ্যে রেখে, অন্য তাৎমাদের সঙ্গে গল্প জমায়। এ গল্প সে গল্প। —'চৌকিদারী খাজনা' আবার বাড়িয়েছে তশীলদার। তাৎমাটুলির ও ধাঙড়টুলির। বেইমানি

১ প্রণাম করবে। ২ পুত্রবধু।

৩ জিরানিয়ার পূর্বদিকের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির হিন্দুরাও ভাদ্র মাসে বিবাহাদি দেয়। [এ]ইজন্য জেলার পশ্চিমের লোকেরা এই বিবাহকে ব্যাঙের বিয়ে বলে ঠাট্টা করে।

করেছে। রবিয়াবও ধরেছে বারো আনা, আবার বাবুলাল চাপরাসীরও বারো আনা। রবিয়ার বারো আনা হলে বাবুলালের তিন টাকা হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই টাকা খেয়েছে তশীলদার। শনিচরার কী করেছে জান? লিখে দিয়েছে যে, বছরের শেষে খরচ-খরচার পর ওর পঞ্চাশ টাকা বাঁচে। ঝুঠ্‌ঠা[1] কোথাকার। এর কিছু প্রতিকার হওয়া দরকার।

রবিয়া বলে—ঠিক বলেছ এতোয়ারী। তশীলদারটা আমার পিছনে কেন লেগেছে জানি না। একটা বাকি খাজনার ডিগ্রিও করিয়েছে আমার খেলাপে। 'অত বড টাট বাঁধিস না ঢোঁডাই'; গল্পের মধ্যেও সবদিকে নজর আছে এতোয়ারীর। 'বীচেকলার গাছ পোঁতার জন্য পিছনে একটু জায়গা থাকবে,'—সকলের মনে পড়ে বাড়ির সঙ্গে একটু আবরুর দরকার হবে রামিয়ার।[2] ঢোঁড়াই নিজেই কুয়োর পাট বসায়, মাটি আনতে ছোটে। আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে; আর তর সইছে না তার। সে ভাবে বাড়ি তৈরি করার সময় একবার রামিয়াকে এনে দেখাতে পারলে হত। পচ্ছিমে মেয়ের পছন্দ অপছন্দ দরকার-অদরকারের খবর তাদের কারুরই জানা নেই। ঐ তো কলাগাছের আবরুর কথা কোনো তাৎমাবই মনে ছিল না—ভাগ্যে এতোয়ারী ছিল। বাওয়া সব বিষয়ে 'পঞ্চ'দের মতামত জিজ্ঞাসা করে, আর ঢোঁড়াইকেও তাই করতে বলে। 'এখন তোর সংসার হল; আর এখন 'পঞ্চ'কে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। যে সমাজে থাকবি তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে হবে।'

ঢোঁড়াই গম্ভীর হয়ে শোনে—মুখ দেখে মনে হয় যে, এ বিষয়ে তারও মত ঐ একই।

বাওয়ার ইচ্ছে করে ঢোঁডাইকে জিজ্ঞাসা করতে—'হ্যাঁরে ঢোঁড়াই, তোর কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে'—দূর একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে!

সুত মানহিঁ মাতু-পিতা তব লোঁ।
অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব লোঁ॥[3]

আর কি এখন ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার কথা ভাববার ফুরসত আছে? ভুলুক সে বাওয়াকে; কিন্তু রামচন্দ্রজী! সে নিজে যেন সুখী হয়। রবিয়ার বৌ ছুটতে ছুটতে আসে—রামিয়ার ইচ্ছে একটা তুলসীগাছের বেদী করার

১ মিথ্যাবাদী।
২ প্রতি বাড়ির পিছনে অন্তত এক ঝাড় কলাগাছ ধাঙড়েরা রাখে মেয়েদের আবরুর জন্য।
৩ ছেলে ততদিনই বাপমাকে মানে যতদিন তার চোখ স্ত্রীর উপর না পড়ে।—তুলসীদাস।

উঠোনে। সকলে লজ্জিত হয়ে যায়, দেখ তো কত বড ভুল হয়ে যাচ্ছিল। মরদদের কি অত মনে থাকে।

বাওয়ার মুখ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—পচ্ছিমের মেয়ে, সংস্কার ভাল। ঢোঁড়াই সুখী হবে; তার ঢোঁড়াই।

ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান

তাৎমাটুলির বিয়েতে যারা বরপক্ষ, তারাই কন্যাপক্ষ। ঐ মহতোগিন্নী, রতিয়া ছড়িদারের বৌ, দুখিয়ার মা, হারিয়ার বৌ, এরাই 'পানকা'ট্টীতে[1] যায় ফৌজী ইঁদারা তলায়; এরাই 'গোঁসাই জাগাবার গান' গায় বিয়ের আগের দিন; তাদেরই বাড়ির পুরুষরা বরযাত্রী হয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে 'দুয়ার লাগার'[2] আশ্লীল গান আরম্ভ করে। এ-বিয়েতে আবার ধাঙড়রাও বরযাত্রী এসেছে। বাওয়াকে দেখে আজ হুঁকো নামিয়ে রাখে রবিয়ার বৌ। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে বলে, হাতের ঐ চিমটে দিয়ে 'সমধী'[4] তোমার ছেলেটাকে কোথা থেকে টেনে বের করেছিলে? অঙ্গন-ভরা লোক হেসে ওঠে এই রসিকতায়।

দুখিয়ার মায়ের আজ খাতির কত! হঠাৎ দুখিয়ার মা ঢোঁড়াইয়ের মা হয়ে উঠেছে। কিছু কাজ করতে গেলেই সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে। চেলাকাঠ পেতে দিয়ে বলে, বসো 'সমধীন'[3]। মেয়ের বাড়িতে তুমি খাটবে, সে হয় না। এই নাও তামাক খাও। দেখো না তোমাকে আজ কী গালা-গালিটা দিই।

পাঁচ এয়োতে তেল, সিঁদুর গুলে মাটিতে পাঁচটা ফোঁটা দেয়। নাপিত ঢোঁড়াইয়ের আঙুল চিরে রক্ত বের করে দুটো পানের খিলিতে লাগিয়ে দেয়। এইবার নাপিত ধরেছে শক্ত করে রামিয়ার হাতখান, এই নরুন দিয়ে চিরে দিল! টপ টপ করে রক্ত পড়ছে পানের খিলির ভিতর! খুব শক্ত মেয়ে যাহোক। এ পর্যন্ত যত মেয়ের বিয়ে দেখেছে ঢোঁড়াই ছোটবেলায়, সকলেই এইসময় ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলে। রামিয়া একবার ভুরুটি পর্যন্ত কোঁচকাল না! আজবৎ হিম্মৎ বটে! রক্ত দেওয়া পানের খিলি ঢোঁড়াই খাওয়ায় রামিয়াকে। রামিয়া দিব্যি কচমচ করে চিবোয়। রবিয়ার বৌ ইশারা করে, অত হ্যাংলাপানা করে চিবুস না, লোকে বেহায়া বলবে। ঢোঁড়াইয়ের মুখে

১ 'জল সহা'র ন্যায় একটি স্ত্রী-আচার।
২ বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়ির দুয়ারে এলে আরম্ভ হয় 'দুয়ারলাগা'র গান।
৩ বেয়াই। ৪ বেয়ান।

পান দিয়ে দেয় রামিয়া। ঢোঁড়াই ভকতের রক্তের কথা ভেবেই গা ঘিনঘিন করে ; নোস্তা নোস্তা লাগে খেতে—সামুয়রটা আবার রামিয়াকে বলেছিল 'নোস্তা মেয়ে'। চমৎকার মানিয়েছে রামিয়াকে লাল শাড়িটিতে। কাপড়টা পছন্দ করেছে বাওয়া নিজে, লালের উপর হলদে ফুল। সিরুমলের দোকানের কাপড় ভারি টেকসই ; দামও নেয় 'পুরো'—নিয়েছে তিন টাকা বার আনা।

বর-কনে দুজনে মিলে উখলিতে ধান ভানে[১]। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনেই দুহাত দিয়ে 'সামাট'টাকে[২] ধরেছে। মহতোগিন্নী ঠাট্টা করেন—'সব দেখে যাচ্ছি ; বর কনেকে মেহনৎ করতে দিচ্ছে না।' দুখিয়ার মা বলে, 'তুমি থাম দিদি এখন।' হঠাৎ দুখিয়ার মা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে···'আজ ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে নাইরে।·· এসে ছাখো ছেলে আজ তোমার কত বড় লোক।' বাবুলাল চাপরাসী পর্যন্ত এতে বিরক্ত হয় না আজ !

মিসিরজী গুটিকয়েক চাল উখলি থেকে তুলে নিয়ে মনে মনে গুনতে আরম্ভ করেন। মেয়েপুরুষ সকলের নজর গিয়ে পড়েছে মিসিরজীর হাতের দিকে চাল সংখ্যায় বেজোড় হলেই এ বিয়ে সুখের হবে না। তবে সকলেই জানে যে, বেজোড় সংখ্যার চাল কখনও মিসিরজীর হাতে ওঠে না। আর পঞ্চায়তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এলেই মহতো নায়েবরা বলে যে ফৌজী ইঁদারার জল দিয়ে 'পানকাট্টি' করা হয়েছিল বলেই বিয়ের ফল এমন হয়েছে—ও ইঁদারাটার বিয়ে দেওয়া হয়নি তো।

পুরুতমশাই চাল গুনবার সময় রামিয়া ঢোঁড়াই দুইজনেরই বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। ঢোঁড়াই সঙ্গে সঙ্গে গুনে যায় মনে মনে—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়। ঢোঁড়াইয়ের ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়, 'মাড়োয়ার' চাটাইটা যেন পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে···মিসিরজী সকলকে বলেন যে চাল উঠেছে দশটা, জোড় সংখ্যা, এ-বিয়ে খুব সুখের হবে। ঢোঁড়াই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। যাক ! তার বোধ হয় গুনতে ভুলই হচ্ছিল ; রামায়ণ পড়া মিসিরজীর মতো তাড়াতাড়ি সে গুনতে পারবে কোথা থেকে। তাই একটা কম গুনেছিল সে।

এইবার মহতোর রামায়ণ থেকে ছড়া কাটবার কথা। কোথায় মহতো ? তার বলা শেষ না হলে তো মিসিরজী নিজের ছড়াটা বলতে পারেন না। চিরকালের এই নিয়ম। মহতো ঢুলছিল বসে। সে নেশার আমেজে আছে এখন। হঠাৎ চমকে উঠে হড়বড় করে বলে ফেলে—

১ উদুখল। ২ উদুখলের মুষল। ৩ মণ্ডপের।

'সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি সন্তত পিয়হি পিয়ারী॥'

সব সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের। এ চিরকাল 'পুরুখের' পিয়ারী থাকবে।

এইবার মিসিরজী বলেন—

'সদা অচল এহি কর অহিবাতা।
এহি তেঁ জসু পইহহিঁ পিতুমাতা॥'

এর এয়োতি অচল থাকবে; এর জন্য এর বাপ-মার নাম হবে।

বাওয়ার বুকের ভিতরটা টন টন করে ওঠে। বহু দিন পর আজ ঢুখিয়ার মাকে ঢোঁড়াইয়ের খুব ভাল লাগে; চোখের জল ফেলছে তার বাবার জন্য, যে বাপের কথা ঢোঁড়াই জীবনে একদিনও ভাবেনি। বাওয়াও ঢুখিয়ার মায়ের ছেলের উপর এই নতুন টান দেখে মনে মনে খুশি হয়; হাজার হলেও মা—যাক ঢোঁড়াইয়ের বৌটাকে একটা দেখবার লোক তবু হল।

নাপিত চিৎকার করে—কোথায় গেলে তুই 'সমধী'!

উখলির ধান বাওয়া একমুঠো দেয় রবিয়াকে; আর রবিয়া একমুঠো ধান দেয় বাওয়ার হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের একটানা গান আরম্ভ হয়ে যায় ঢুখিয়ার মাকে লক্ষ্য করে।

'বুজরুকি রাখ 'সমধীন',
বল ছেলের বাপটি কে
উর্দি-পরা চাপরাসী, না লেঙট-পরা সন্ন্যাসী?
না অন্য কোনো নাগর ছিল,
বলেই ফেল চাই?
'খুসুর ফুসুর খুসুর ফুসুর'
কর কেন?[১]
অন্য কোনো নাগর বুঝি
ভাঁটবনেতে লুকিয়ে আছে?

এ-গানে ঢুখিয়ার মা, বাওয়া, বাবুলাল, সকলেই আর দশজনের মতো হাসে। ঢোঁড়াইয়ের লজ্জা লজ্জা করে। রামিয়ার জন্মের ইতিহাসও সে শুনেছে। তবু মনে হয়, সে যেন রামিয়ার কাছে মর্যাদায় একটু ছোট হয়ে গেল। রামিয়ার গলার উপরটা নড়ছে, নিশ্চয় মনের আনন্দে পানের রস গিলছে।···

১ উসখুস।

মেয়েদের গানের লক্ষ্য গিয়ে পড়ে ধাঙড় বরযাত্রীদের উপর।…

কর্মাধর্মার চাঁদনি রাতে
পাটের ক্ষেত নড়ছে কেন?
এতোয়ারীর সাদা মাথায়
চাঁদের আলো পড়ছে কেন?…
বড্ড বেশি নড়ছে যেন…

মহতো বলে, 'এতোয়ারী শুনছ তো?'

তাৎমা-ধাঙড় সকলেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। এই বিয়ের হিড়িকে ধাঙড় তাৎমারা, দুই টোলার ইতিহাসে, এই প্রথমবার যেন একটু কাছে আসে। এই দুদিনের রোজগারের অসুবিধে, তহশীলদার সাহেবের বেইমানি, আরও অনেক জিনিস হয়তো এর মধ্যে আছে, কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বিয়েকে উপলক্ষ্য করেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ধাঙড়টুলির অভিসম্পাত

হাসিখুশি-ভরা ধাঙড়টুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শনিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে।

প্রথমটা কেউ লক্ষ্য করেনি। আকলুর মা বুড়ি কী করে ঝাপসা চোখে এর ঠাহর করল, কেউ ভেবে পায় না। সাধে কি আর লোকে যায় তার কাছে সলা-পরামর্শ করতে। সেবার বিরষার যখন 'বাই'-এর অসুখ হয়, তখন রেবণগুণী রুগীর বিছানার পাশে একুশটি পান সারি সারি সাজিয়ে যখন চোখ বুজে মন্ত্র পড়ছিল, তখন বুড়ি মিটমিট করে হাসছিল। তারপর কলার পাতায় তেল-সিঁদুর গুলে গুণীর সম্মুখে রেখে দেয়। গুণী চোখ খুলে সিঁদুরের কৌটা দেয় মাটিতে। যে রেবণগুণীকে সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেয়, সে আর বাঁশের ফুলের খবর পাবে না।

এত বড় অমঙ্গলের সূচনা ধাঙড়টুলিতে আর কখনও আসেনি। 'বাঙ্গাবাঙ্গী'র[1] নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি, সেখানে থেকো না—বারোবার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।

১ ধাঙড়দের দেবতা।

ধাঙড়টুলির পঞ্চায়েত বসে। এতোয়ারী মোড়ল। মেয়েদের মুখে পড়েছে শঙ্কার ছায়া, আর পুরুষদের মুখ বিষাদে ভরা। গাছ, বাঁশ, কুয়ো ফেলে যেতে হবে নাকি? আজ আর 'পচই'-এর উত্তেজনা নেই; পিড়িং পিড়িং মাদল বাজছে না; বাঁশি আর গানে কারও উৎসাহ নেই। কোনো বাড়িতে উনুনে আগুন পড়েনি। এতোয়ারী আর শুক্রা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে; আর সকলে নির্বাক।

অবশেষে এতোয়ারী এ সম্বন্ধে অন্তিম রায় দেয়। মোড়লের কাজ বড় কঠিন। কত অপ্রিয় কাজ 'বাঙ্গাবাঙ্গী' মোড়লকে দিয়ে করান; কিন্তু শেষকালে দেখবে এই কথা এখন খারাপ লাগলেও পরে ফল ভাল হয়। যার বাঁশঝাড়, তাকে ধাঙড়টুলি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শনিচরার বৌ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

আর যাদের যাদের বাড়ি থেকে ঐ বাঁশঝাড় দেখা যায়, তাদের কারও দানাপানি জুটবে না এ-গাঁয়ে বারো বছরের পর। কাঁদিস না শনিচরার বৌ, এখন তোরা যা তো। আমরাও পরে যাব।

এই তাৎমাগুলো থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। বুঝি তো তা কিন্তু নাড়ি যে বাঁধা এখানে। হয়ে ওঠে কই। তাৎমারা ঠিকই বলে— বাঁশঝাড় লাগাবে পাড়া থেকে দূরে; যে-বাড়ি থেকে ভোরবেলায় পুবে বাঁশঝাড় দেখা যায়, সে-বাড়ির উপর যমের নজর।

ঠিক হয় পঞ্চায়েতে যে ধাঙড়রা নূতন কলমের গাছ পোঁতা বন্ধ করবে। কুটীরের খুঁটিতে ঘুণ ধরলেও বদলাবার চেষ্টা করো না। যার যা জমে নগদ রাখবার চেষ্টা করবে। গরু-মোষ কিনতে খরচ করবে, মুরগী ছাগল বাড়াতে আরম্ভ করো; শনিচরা পশ্চিমে কোনো জায়গায় চলে যাক 'বটেদারী'র কাজে[১]; কুশীর দিকে। সেখানে জমি খুব ভাল। অড়র ক্ষেতে দাঁতওয়ালা হাতি ডুবে যায়, ধনে-মৌরির গাছ মানুষের সমান ডগা ছাড়ে, ভুট্টা-তামাকের তো কথাই নেই। ওদিকে পড়তি জমি আছে অনেক। নদীর জল খাস না খবরদার, গলগণ্ড হবে। শনিচরা চলে গেলে কর্মাধর্মার গান আর কি সেরকম জমবে?

'ধাহা খেলে বোঁচাবোঁচি চলু দেখে যাই'[২]। মাদলের সঙ্গে কী সুরই দেয় শনিচরা।

১ আধিয়ার, বর্গাদার।

২ যেখানে পুরুষ কুমির আর মেয়ে কুমির খেলা করছে, চল দেখতে যাই।

শনিচরা একটাও কথা বলে না। অনবরত নখ দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি কাটে। তার ছলছলে চোখের দিকে কেউ আর তাকাতে পারে না।

সে রাত্রে এতোয়ারীর ঘুম হয় না। সারারাত শনের গাছ দিয়ে তৈরী মাদুরখানার উপর এ-পাশ আর ও-পাশ করে। মোড়লের অপ্রিয় দায়িত্বের বোঝা, আর সে বইতে পারছে না। ধাঙড়টুলির মধ্যে সব চাইতে ফুর্তিবাজ লোক শনিচরা; হাসি, নাচ, গান, গল্পে চব্বিশ ঘণ্টা ধাঙড়টুলি মশগুল করে রাখে; সে কেন পড়ল বাঙ্গাবাঙ্গীর কোপদৃষ্টিতে? তহশীলদারেরও আক্রোশ দেখেছি তারই উপর বেশি। ওর বৌটার দোষ আছে ঠিকই—বড় 'ছমকী আওরৎ'[১]। বক যেরকম মাছের উপর নিশানা করে বসে থাকে, সামুয়রটাও সেইরকমই লেগেছিল শনিচরার বৌটার পিছনে। খালি সামুয়রকেই দোষ দিলে চলবে কেন, শনিচরার বৌটাও গায়েপড়া। কিছুদিন আগে সামুয়রটা ধরা পড়েছিল; সে ঐ বাঁশঝাড়টার মধ্যে ঢুকে, বাঁশের উপর বাড়ি মেরে একটা শব্দ করত রাতে আর শনিচরার বৌটা উঠে যেত বাঁশঝাড়ে। খুব ঠোকন খেয়েছিল সেদিন সামুয়রটা। তারপর থেকে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গাবাঙ্গী কি শনিচরার বৌকেই পাড়া থেকে সরাতে চান নাকি? কে জানে? সেইজন্যই কি ওঁর ঐ বাঁশঝাড়টার উপর রাগ?…এতোয়ারী ভেবে কূলকিনারা পায় না। দোষ করল শনিচরার বৌ; তাও সেসব গণ্ডগোল কবে মিটে গিয়েছে; আর সাজা পাবে কিনা শনিচরা!…

ঠক! ঠক। শব্দটা কানে আসছে কিছুক্ষণ থেকে। হাতুড়ি-ঠোকা পেঁচার ডাক নয়তো? না সেরকম তো মনে হচ্ছে না। শনিচরার বাড়ির দিক থেকেই আসছে…

ধড়মড় করে ওঠে এতোয়ারী। একখান লাঠি নেওয়া ভাল। ঠিকই শনিচরার বাঁশঝাড়টা থেকে আসছে শব্দ।

জোছনা উঠেছে শেষ রাত্রে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মেঠো পথ!… এতোয়ারী আস্তে আস্তে বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। একটা আওরৎও গিয়ে ঢোকে সেই বাঁশঝাড়ে। দূর থেকে এতোয়ারী দেখে—মেয়েমানুষ বলেই তো মনে হল। আজ আর সামুয়রের রক্ষা নেই।…পা টিপে টিপে ঢুকছে এতোয়ারী বাঁশঝাড়ের মধ্যে—হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। কিন্তু সে শব্দটা থামছে না—বাঁশ কাটার শব্দ বলে মনে হচ্ছে। হুড়মুড় করে শব্দ করে এতোয়ারীর কাছেই একটা বাঁশ মাটিতে পড়তে পড়তে কিসে যেন আটকে যায়—বোধ হয় অন্য একটা বাঁশে।

---

১ উড়ু উড়ু ভাবের স্ত্রীলোক।

'সবগুলোকে কাটো। সবগুলোকে। একটাও রেখো না'। পরিষ্কার শনিচরার বৌয়ের গলা। বাঁশের ঝাড়কে ঝাড় একেবারে নির্মূল করে কেটে ফেলে দেবে শনিচরা। আর কার উপর সে তার আক্রোশ, অভিমান দেখাবে? আগাছার মতো তার গাঁ থেকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে সকলে তাকে।...তাই রাতের আঁধারে স্বামী-স্ত্রী দুজনে এসেছে এখানে।

চোখের কোণে জল আসে বুড়ো এতোয়ারীর। সে আবার পা টিপে টিপে ফিরে আসে নিজের ঘরে, কোনো সাড়া না দিয়ে।

ঢোঁড়াইয়ের নিকট মহতোর আবেদন

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা রামিয়াকে রোজগার করতে না দেওয়া। দুখিয়ার মায়ের মতো। অন্য তাৎমানীদের মতো রামিয়া বাবু-ভাইয়াদের বাড়ি তাল, কুল, হেলেঞ্চার শাক বেচতে যাবে, সে ঢোঁড়াই পছন্দ করে না। সব সে বোঝে। সামুয়র-টামুয়রের মতো বদ লোকগুলোর চোখের দিকে এক-নজর তাকিয়েই সে বোঝে। তার রামিয়াকে সে বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না; কিন্তু মাটিকাটার রোজগার দিয়ে বৌকে বেডার ভিতরে রাখা চলে না। বাওয়াও সে কথা জানে।

কী করবি ঢোঁড়াই?

বাওয়ার ইচ্ছে ঢোঁড়াই একখান মুদীখানার দোকান খুলুক। কী, জবাব দিস না যে?

ঢোঁড়াইও একথা ভেবেছে। রামিয়ার সঙ্গে কত গল্প হয়েছে এ নিয়ে। রামিয়া পয়সা আর আনা জুড়ে সেদিন সরষের তেল, রিঠে আর খয়নির হিসেব করে দিল। দোকান চালানোয় রামিয়া 'মদদ'[1] করতে পারবে ঠিকই; কিন্তু আয়ওতের সাহায্য নিয়ে রোজগার।—তেমনি মরদ ঢোঁড়াইকে পাওনি। তার উপর এক কুড়ি লোক চব্বিশ ঘণ্টা তার দোকানে ফষ্টিনষ্টি করবে, ঐ সামুয়রটা পর্যন্ত—সেসব চলবে না।

পান-বিড়ির দোকান। তাহলে তো দোকান করতে হয় জিরানিয়াতে। বাওয়ারও হঠাৎ মনে পড়ে যে, সেদিন যখন সে অনিরুধ মোক্তারের সঙ্গে কাছারির 'মুন্সীখানায়' গিয়েছিল, সেখানে কে যেন বলাবলি করছিল মহাত্মাজীর কথা—আবার নাকি একটা 'হল্লা'[2] হতে পারে সেবারকার মতো।

১ সাহায্য।

২ গণ্ডগোল: আন্দোলন।

তাদের সব কথা বাবাজী বোঝেনি, তবে বুঝেছে যে, এবার 'তামাসা' জমবে আরও বেশি।...দরকার কী এই সব সময় পান-বিড়ির দোকান করে।

তাহলে ভাড়ার গরুরগাড়ি চালা ঢোঁড়াই। ভাড়ার মাল বোঝাই করে যখন ইচ্ছে যাও, যখন ইচ্ছে ফেরো। বাড়ির দুয়ারে বলদজোড়া বাঁধা থাকবে—ইয়াঃ তাজা তাগড়া শিঙে তেল লাগানো বলদ—'বটোহী'[1] রাস্তা থেকে তাকিয়ে দেখবে। পাড়ার লোক হিংসেয় ফেটে পড়বে, লোকে সমীহ করবে। পথের মাঝে গরুরগাড়ি আড়াআড়ি করে রেখে দাও, মরদরা পর্যন্ত গাড়ির নিচ দিয়ে যাবে; রাখুক তো দেখি কেউ গাড়িটা সরিয়ে একপাশে—কারও হিম্মৎ হবে না। বাড়ির সম্মুখে ঘুঁটের পাহাড় দেখে লোকের চোখ টাটাবে।

শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের গাড়ি-বলদ কেনাই ঠিক হয়—ভিখনাহাপট্টির মেলা থেকে।

পাড়া আবার সরগরম হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে হয়ে উঠল কী তাৎমাটুলি। বড় যখন হয় তখন এমনি করেই হয়। এবেলা-ওবেলা বাড়ে। একেবারে বাবুলালের সমান হয়ে গেল ঢোঁড়াই। দুখিয়ার মা নিত্যি এসে 'কনিয়ার'[2] সংসার তদারক করে যায়। দুখিয়াটা পর্যন্ত 'ভাবীর'[3] ফাই-ফরমাশ খাটে। রামিয়ার কাছে আসে না কেবল ফুলঝরিয়া। ডাকতে গিয়েছিল রামিয়া; তাও আসেনি। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছিল।

বিনা কাজে মহতোর কারও বাড়ি যাওয়া নিয়ম নয়—তার পদমর্যাদায় বাধে। সে সুদ্ধ একদিন ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে এল, নতুন বলদজোড়া দেখবার ছুতো করে। মহতো তার দুয়ারে; ঢোঁড়াই কী করবে ভেবে পায় না। রামিয়া তাকে উঠোনে নিয়ে গিয়ে বসায়। পাড়ার লোকেরা বাড়ির বাইরে জটলা করে—নিশ্চয়ই ফের ঢোঁড়াইটা কোথায় একটা কী কাণ্ড বাধিয়েছে; না হলে কি আর মহতো* এসেছে অঙ্গনে। পচ্ছিমে মেয়েটা আবার কিছু করেনি তো?

রামিয়া মহতোকে পা ধোবার জল দেয়। মশলা বাঁটবার জন্য দুখিয়ার মা যে দু টুকরো পাথর দিয়েছে, তাই দিয়ে সুপুরি ভেঙে দেয়। মহতো যতটা খুশি হয়, তার চেয়ে আশ্চর্য হয় বেশি। তাৎমাটুলির লোকেরা এসব পচ্ছিমে 'তরিবৎ'-এ অভ্যস্ত নয়। অথচ মহতো একথা প্রকাশ করতে চায় না। তাড়াতাড়ি পা ধোবার জলটা খেয়ে সুপুরি কয়টা মুখে ফেলে।

১ পথিক।

২ কনিয়া—কনে বৌ, পুত্রবধূ।

৩ ভ্রাতৃবধূ।

রামিয়া ফিক করে হেসে ফেলায় মহতো বলে, এই রকম হাসিই তো চাই ; কিন্তু অঙ্গনের বাইরে গিয়ে নয়। একি মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের সিঁড়িতে চড়া মেয়ে পেয়েছে। আমাদের কনৌজী তাৎমার ঝোটাহারা মদ তাড়ি পর্যন্ত আঙিনায় বসে খাবে—'কলালী'তে¹ নয়। এই আমার গুদরের বৌকে দেখ না। তাড়ি খাওয়ার পর একদিন কেউ তার চোখে জল দেখতে পেয়েছে? বাড়ির লোকেও না। কিন্তু বেচারি এখন মুশকিলে পড়েছে ভারি। জানই তো আজকালকার রোজগারের বাজার। আমি আর গুদরের মা তোমাকে তো নিজের বেটা বলেই মনে করি। তোমার ঐ গ্যাং-এর কাজটা গুদরকে পাইয়ে দাও। তুমি তো ছেড়েই দিলে।

ঢোঁড়াই এতক্ষণে বুঝতে পারে, কেন মহতো এসেছে তার বাড়িতে। আচ্ছা আমি এতোয়ারীকে বলে দেখব। ওই তো সব—নায়েব শনিচরার দল।

এতোয়ারীর কাছে কথাটা তুললেই সে বলে যে, তা কী করে হবে! পাওড়টুলির কথা তো তারা আগে ভাববে। আর একটা জায়গাও অবিশ্যি খালি হবে—শনিচরারটা; কিন্তু ক'জনকে ঢুকোতে হবে কাজে জান? ছোটা বিরষার চাকরি গিয়েছে, তার সাহেব চলে গিয়েছে বাড়ি বিক্রি করে। সামুয়রের খুড়তুতো ভাই মাসুয়র, যেটা গির্জায় ঘণ্টা বাজায়, সেটার চাকরিও টলমল। পাদরী সাহেবরা জিরানিয়া থেকে চলে যাচ্ছে ডুমকা জেলা। বাচ্চাদের একপোয়া করে যে দুধ দেয় গির্জা থেকে, সেটাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে। আরও গোটাকয়েক চাকরি যাওয়ার ফিরিস্তি দেয় এতোয়ারী। তাছাড়া সামুয়রের সাহেব তো এই গেল বলে—তার মালীটাকেও তো এক জায়গায় ঢুকোতে হবে।

এর উপর আর কথা চলে না। ঢোঁড়াই বোঝে যে মহতো চটবে, কিন্তু উপায় কী?

বৌকা বাওয়ার অন্তর্ধান

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের বিয়ের পর থেকে একটু বিমনা হয়ে পড়েছে। এতদিন তবু হাতের কাজ ছিল, বিয়ের যোগাড়, ঘর তুলবার বাঁশ-খড়ের যোগাড়, গাড়ি বলদ কেনা। এসব কাজে একরকম উৎসাহও এসে গিয়েছিল তার। তার ঢোঁড়াইয়ের সংসার সে নিজে হাতে পেতে দিয়েছে। রামজী তার

¹ মদের দোকান

মাথায় যে কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা বইতে ইতস্তত করেনি একদিনও। সে আর কী করেছে; যাঁর কাজ তিনিই করিয়েছেন। তবে এতদিন ঢোঁড়াই ছিল, একটা অবলম্বন ছিল। এখন বড় একলা লাগে; ভিক্ষা চাইতে ইচ্ছা করে না; রামজীর কথা পর্যন্ত মনে আসে না। তিনি সব দেখছেন উপর থেকে। আত্মগ্লানিতে ঘন ঘন মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করে; বেশিক্ষণ করে বসে রামায়ণ শুনতে। বার বার সেখানকার রামসীতা লছমনজী মহাবীরজীর 'মূরৎ'গুলিকে[১] প্রণাম করে। মোহান্তজী প্রসাদ করে কষ্টে তার হাতে দিলে অন্যমনস্ক হয়ে টান মারে; কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না। ঢোঁড়াই আর রামিয়া ধরেছিল তাদের বাড়িতে খাওয়ার জন্য। সে রাজী হয়নি। তাই নিয়ে রামিয়া চোখের জল ফেলেছিল, কিন্তু বাওয়ার মতের নড়চড় হয়নি। বাওয়া স্বপাক খেত চিরকাল। তবে ঢোঁড়াইয়ের ছোঁয়া খেতে তার কোনোদিন দ্বিধা হয়নি। রামচন্দ্রজী যাকে ছেলে বলে কোলে তুলে দিয়েছেন তার বেলায় কি ছোঁয়াছুঁয়ির কথা ওঠে; কিন্তু তাই বলে সে আর তার স্ত্রী এক নয়। ঢোঁড়াই এজন্য মনে মনে বেশ দুঃখিত হয়েছিল। বলেই ফেলল—তোমাকে মেয়ে বাছতে দিইনি বলে রাগ করেছ বাওয়া? দেখ অবুঝ ছেলের কথা—বোঝালেও বুঝতে চায় না। আরে না না, তা কি হয়? 'তবে কেন খাবে না বাওয়া?' ঢোঁড়াইয়ের সন্দেহের নিরসন হয় না। বাওয়া হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। অনুতাপ নয়, তবু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে সেও যদি বাওয়ার মতো সন্ন্যাসী হয়ে থাকত, তাহলে তার সঙ্গে গোঁসাইথানে থাকতে পারত। কিন্তু রামিয়া? তাহলে তার জীবনে রামিয়া তো আসত না। তাহলে তার আজ থাকত কী? এই কয়দিনের মধ্যেই সে রামিয়াকে বাদ দিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবতেই পারে না। একদিনও সে জীবনে রামিয়াকে ছেড়ে থাকবে না। যদি রামিয়া কোনদিন মরে যায়—সীতারাম! সীতারাম! কেবল বাজে কথা মনে পড়বে।

বাওয়ার মন অস্থির অস্থির করে; নিঃসঙ্গতায় সে পাগল হয়ে যাবে নাকি! সবই তো সেই আছে, সেই 'থান', সেই রামায়ণ পাঠ। কেবল তার ঢোঁড়াই আর তার নেই। আর একজন তাকে একেবারে আপন করে নিচ্ছে। এতে দুঃখ কিসের; এ তো আনন্দের কথা। তার ঢোঁড়াই সুখে থাকুক এই তো বাওয়া চেয়েছিল।···

চৈতী গানের সুর ভেসে আসছে। হরখুর মাতাল জামাইটা বোধ হয় মনের আনন্দে তান ধরেছে।

১ বিগ্রহ

·· চায়েৎ সুভা দিনোয়া রামা, হো রামা···

আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া[1]।

—চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে।—

পাড়ার সবাই গিয়েছে মরনাধারের পুলের কাছে, ঐ যেখানে আলো আর আগুন দেখা যাচ্ছে। কাল রাতেও এই সময় ওখানে তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির সকলে গিয়েছিল। মহাৎমাজীর চেলারা ঐ জায়গাটাকে বেছেছেন নিমক তৈরির মহলা দেবার জন্য।

'রংরেজ'-এর[2] নিমক খেলে, 'রংরেজের' খেলাপ যেতে পারবে না। 'রংরেজ' দারোগা কলস্টরের মালিক। গরীবদের 'হালতের সুধার'[3] করতে হলে নিমক তৈরি করতে হবে। নিমক তৈয়ার করবার সময় দারেগা এলে, কী করে সকলে মিলে নিমকের কড়াইখানাকে বাঁচাবে, তারই মহলা দিতে এসেছেন মাস্টারসাহেবের চেলারা। রামিয়া, মহতোগিন্নী, রবিয়ার বৌ আরও অনেক 'ঝোটাহা' সন্ধ্যাবেলায় মরনাধারের পুলের কাছে ঐ জায়গাটাতে পিদিপ দিয়ে এসেছে। কাল একদল এসেছিল মহলা দিতে, আজ আবার এসেছে নতুন আর একদল। এরাই সব আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চলে যাবে এর পর। কিন্তু মরনাধারের কাছে থেকে যাবে একটা নতুন 'থান'[4], মহাৎমাজীর থান, ঠিক যেখানটিতে আজ ঝোটাহারা সাঁঝে পিদিপ দিয়েছে সেইখানটায়। বাওয়া ভাবে যে সত্যি যদি ওখানে আর একটা 'থান' হয়ে যায়, তাহলে তাৎমাটুলিতে গোঁসাইথানের গুরুত্বতেও কিছুটা টান পড়তে পারে। কাল সে মরনাধারের কাছে মাস্টারসাহেবকে দেখেছে। বাওয়া চিমটে কমণ্ডলু নিয়েও ঢোঁড়াইয়ের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না, আর মহাৎমাজীর চেলারা কী করে নিজের ছেলেপিলে ছেড়ে জেলে থাকে। তাদের কি মন কেমন করে না? না, বজরঙ্গবলীর'র[5] শক্তি মহাৎমা আর তাঁর চেলাদের। রামচন্দ্রজীর আশীর্বাদ আছে তাঁদের উপর। কিন্তু একটা জিনিস বাওয়ার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। কয়েক 'সাল' আগের, সেই গানহী বাওয়ার তামাসা, আর হল্লার সময় আফিংখোর উকিলসাহেব আরও কত মুসলমান পিঁয়াজ ছেড়ে গানহীবাওয়ার চেলা হয়েছিল। ঐ মিয়াদের আবার বিশ্বাস!

১ তাৎমাটুলির একটি প্রচলিত চৈতীগান। চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে।

২ ইংরাজ।

৩ অবস্থার উন্নতি।

৪ পূজার স্থান।

৫ মহাবীরজী।

মিসিরজীর কাছ থেকে বাওয়া শুনেছে যে, অযোধ্যাজীতে রামচন্দ্রজীর মন্দিরটাকে মিয়ারা মসজিদ করে নিয়েছে। দেখ আস্পর্ধা! ঐ মিয়াদের সঙ্গে এত মাখামাখি মহাৎমাজীর চেলারা করেছিল; তবু রামচন্দ্রজী কেন মহাৎমাজীর চেলাদের উপর এত সদয়? মহাৎমাজীকে রাখুক তো দেখি সরকার জেলে? রামচন্দ্রজীর আশীর্বাদ তাঁর মাথায়, তাঁকে কি কলস্টর দারোগা জেলে পুরে রাখতে পারে। তুলসীদাসজীকে একবার এক নবাব জেলে রেখেছিল; লাখে লাখে বাঁদররা গিয়ে তাঁকে জেল থেকে বের করে এনেছিল। আর মহাৎমাজীকে রাখবে তালা দিয়ে! মা মরার সময় বলে গিয়েছিল অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস, সেখানে অনেক ভিখ পাওয়া যায়। হঠাৎ একথা মনে পড়ল কেন? রামজী বোধ হয় মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন আমার পথের কথা। তিনি আমার মাথার উপর থেকে সব ভার সরিয়ে নিয়েছেন, অযোধ্যাজী যাওয়ার রেলভাড়া জুটিয়ে দিয়েছেন; বলছেন, ভরতরাজার মতো তোর হল নাকি?

শুভদিন এসে গিয়েছে।

> —আবুহো বাভনমা, বৈঠোহো আঙনমা,
> গনি দেহ পিয়াকে গামনমা—
> হো রামা—[১]

এসো বামুনঠাকুর অঙ্গনে বসো, পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষণ দেখে দাও।

না না, আর পাঁজিপুঁথি দেখবার দরকার নেই। বাওয়া ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় মনের পরতে পরতে জমানো ঢোঁড়াইয়ের স্মৃতিগুলি। চৈতী গানের ইঙ্গিত, মরা মায়ের আদেশ, রামজীর অঙ্গুলিসংকেতকে তাচ্ছিল্য করতে পারে না। তাকে সব ছিঁড়ে বেরুতে হবে, না হলে তার দশা হবে ভরত রাজার মতো। এই জন্যই বোধ হয় তার মন এত অস্থির অস্থির লাগছিল। ঢোঁড়াইরা এখন সব গিয়েছে মরনাধারের কাছে মহাৎমাজীর চেলাদের তামাসা দেখতে। এখনই সময়টা ভাল—আর এক মুহূর্তও সে দেরি করবে না। চিমটে কমণ্ডলু নিয়ে সে ওঠে। থানের বেদীটিকে প্রণাম করে। চিমটের আংটাটার সঙ্গে ঢোঁড়াই ছোটবেলায় একটা আধলা ফুটো করে ঢুকিয়েছিল।

---

১ চৈতীগানের অপর এক লাইন।

> এস হে বামুন ঠাকুর, অঙ্গনে বস
> পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষণ দেখে দাও
> হে রাম!...

হঠাৎ সেটার উপর নজর পড়ায়, সেটাকে খুলে ফেলবার জন্য টানাটানি করে। না এত তাড়াতাড়ি খোলা সম্ভব নয় ওটা।

সময় নেই। সীতারাম! সীতারাম!

'চায়েৎ সুভা দিনোয়া রামা,
আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া—
হো রামা—'

শুভদিন এসে গিয়েছে। আর এক মুহূর্তও সময় নেই নষ্ট করবার—

চিমটের আংটার সঙ্গে আধলাটা লেগে যে শব্দ হচ্ছিল সেটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। তেল ফুরোনোয় থানের পিদিপটার বুক জ্বলছিল; সেটা দপ্ করে নিভে যায়।

গানহী বাওয়ার ভিন্ন মূর্তিতে পুনরাবির্ভাব

'সার্ভে' খাতাখতিয়ান অনুযায়ী, মরনাধার সমেত বকরহাট্টার মাঠ, তাৎমাটুলির জমিদারবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি। আসলে, তাৎমা ধাঙড়রা এখানে আসবার অনেককাল আগে থেকেই বকরহাট্টার মাঠ ছিল মরগামার লোকদের গরুচরানোর জায়গা। এ ছিল জনসাধারণের জমি[1]। ঢোঁড়াই জন্মাবার ছয় বছর আগে, যখন এখানে 'সার্ভে'[2] হয় তখন জমিদারবাবুর টাকা পয়সা খরচ করে, এটাকে তাঁর নিজের পড়তি[3] জমি বলে সার্ভে কাগজপত্রে লিখিয়ে নেন। তারপর থেকে লা'র জন্য কুলগাছ বিলি করতেন তিনিই; কপিলরাজার কাছে শিমুলগাছ বিক্রি করতেন তিনিই। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখন জমিদারবাবুর মাথায়, বকরহাট্টার মাঠ নিয়ে অনেক জিনিস খেলছে। এর মধ্যে যদি মহাৎমাজীর 'থান' হয়ে যায়, বকরহাট্টার মাঠের মধ্যে, কিংবা এই নিয়ে যদি থানা পুলিস মামলা মোকদ্দমা হয়, তা হলে হয়তো আবার নতুন করে, এত দিনের চাপা পড়া, জমির স্বত্বের কথা উঠবে। ওখানে পিদিপ দেওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এ খবরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছেন। রতিয়া ছড়িদার, পরসাদী নায়েব, রবিয়া, সকলের নামেই বাকি খাজনার ডিক্রি করানো আছে। তারা সবাই এখন তাঁর মুঠোর মধ্যে! তিনি সাঁঝেই তাদের ডেকে পাঠান।

১ রেকর্ড অব রাইট্স্-এ লেখা থাকে 'গৈর মজরুয়া আম'—সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

২ সরকারী Cadastral Survey.

৩ অনাবাদী।

পরের দিন ভোর না হতেই হৈ হৈ কাণ্ড তাৎমাটুলিতে। মোটরে করে 'লাইন' থেকে পুলিশ এসে হাজির, সঙ্গে আবার 'রংরেজী টুপি' পরা[1] হাকিম। তাঁরা মরনাধারের দিক থেকে ফিরছেন। মরনাধারের কাছে এখন কোনো লোক নেই, তবে রাত্রে সেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, শুকনো ঘাসের উপর তার চিহ্ন আছে। চৌকিদার, আর দফাদারের খবর যে, রাতে তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির ছেলেবুড়ো সকলে ভেঙে পড়েছিল মরনাধারের কাছে। তাই হাকিম এসেছেন তাৎমাটুলিতে। দেখা গেল যে পুলিশ সব খবরই জানে। হাকিম বললেন যে সব খবর আমরা রাখি। আজ কিছু বললাম না। যা করেছ করেছ, আর যেন ভবিষ্যতে না হয়। বাইরের লোক কেউ তোমাদের পাড়ায় এসে সরকারের খেলাপ কাজ করলেও, ধরব তোমাদের। তাৎমাটুলির একখানা ঘরও দাঁড়িয়ে থাকবে না তাহলে, বলে রাখলাম। রোজগার কর, খাও দাও থাক। না হলে ফল ভুগবে। তোমাদের কিছু বলার থাকে তো আমার কাছে যখন ইচ্ছা বলতে পার, কিন্তু কংগ্রেসের লোকদের পাল্লায় পড়েছ কি, তোমাদের সব কটাকে ধরে জেলে দেব।

সকলের মন ভয়ে কেঁপে ওঠে। মহাৎমাজীর চেলারা, মাস্টারসাহেবের চেলারা তাহলে 'কাংগ্রিস'-এর লোক। কিছুদিন থেকে মিসিরজীও রামায়ণ পাঠের সময় 'কাংগ্রিস কাংগ্রিস' কী সব বলে। এখন এস. ডি. ও. সাহেবও সেই কথা বলছেন। তাই বলো। বাবুভাইয়াদের কাংগ্রিস আর দারোগা হাকিমের সরকার! এদের মধ্যে লেগেছে 'টক্কর'[2]। হাকিম বোধ হয় ভুল বোঝাচ্ছে—মহাৎমাজীর নাম তো নিচ্ছে না একবারও।···

ঢোঁড়াই হাকিমকে সেলাম করে বলে হুজুর মা বাপ। আপনার কাছে আমাদের একটা 'আর্জি' আছে। আমাদের চৌকিদারি ট্যাক্স বসাতে তশীলদার সাহেব বেইমানি করেছে; রবিয়ারও বারো আনা, বাবুলাল চাপরাসীরও বারো আনা। তা কী করে হয়? সকলে অবাক হয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের সাহসে। হাকিমের সঙ্গে কথা বলছে; দারোগার সম্মুখে; আবার তশীলদার সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ! এই বুঝি হাকিম তাকে তাড়া দিয়ে ওঠেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করেন 'তশীলদার কে?'

'ফুদনলাল, মাহীটোলার হুজুর।'

বাবুলাল চাপরাসীর গলা শোনা যায়—'এ ছোকরা তো মাত্র কদিন হল ঘর তুলেছে। এ কী জানে 'চৌকিদারি'র[3] সম্বন্ধে?'

---

১ হ্যাট্। ২ সংঘর্ষ।

৩ স্থানীয় ভাষায় চৌকিদারির অর্থ চৌকিদারি ট্যাক্স।

হাকিম বাবুলালকে তাড়া দেন—'তোমাকে কে জিজ্ঞাসা করেছে?' তারপর ঢোঁড়াইকে বলেন, 'লিখে দরখাস্ত দিও আমার কাছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার, সরকারের খেলাপ কিছু দেখলে, তাৎমাটুলির একটা লোকও থাকবে না জেলের বাইরে।'

এস. ডি. ও. সাহেব হাতের ঘড়ি দেখেন। একপাল উলঙ্গ ছেলে, এতক্ষণে সাহসে ভর করে, পুলিশ ভ্যানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। টপ টপ করে মোটরের এঞ্জিন থেকে জল পড়ছে মাটিতে, ছেলেরা বলছে 'পিট্রৌল'[১] পড়ছে, দরদের ওষুধ।

গাড়ি চলে যায়। লু বাতাসে তার চাকায় উড়োনো ধুলো, মরনাধারের দিকে ছুটে যায়, বোধ হয় রাতের কলঙ্কের দাগ ঢাকবার জন্য।

লু বাতাসের মধ্যে দিনের বেলায় কারও বাড়ি রান্না হবে না—খড়ের ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে! তাৎমাটুলির কেউ আর সেদিন কাজে বেরোয় না। সারাদিন সকলে মিলে সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম আলোচনা করে। গানহী মহারাজ, পুরনো গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন। মাস্টারসাহেবের বেটা কাল এসে মরনাধারের কাছে বলে গিয়েছেন যে 'রংরেজ' সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল। দেখ কাণ্ডখানা একবার! তবে একটা সুবিধে বুড়ো আঙুল না থাকলে—কেউ আর জোর করে সাদা কাগজে আঙুলের ছাপ নিতে পারবে না; না অনিরুধ মোক্তার, না সাওজী, না জমিদারবাবু।···তারপর থেকেই তো তারা কাপড় বুনবার কাজ ভুলেছে।··কলিযুগে।

'নৃপ পাপপরায়ণ ধর্ম নহী।
করি দণ্ড বিডম্ব প্রজা নিতঁহী॥'[২]

সাধে কি আর মহাৎমাজী 'রংরেজ'-এর নিমক খেতে বারণ করেছেন। সব দেখতে পান তিনি। ঐ রংরেজ-এর নিমক ছিল বলেই না কপিলরাজার জামাইটা তাৎমাটুলির বুকের উপর বসে, গরুর চামড়ার কারবার করতে পেরেছিল।···

আচ্ছা, আচ্ছা ছাড় এখন এসব কথা। দেখছিস তো গাঁয়ের খবর দারোগার কাছে চলে যায়। আচ্ছা পরশু রাতের খবর কে পুলিশকে দিল বলতে পারিস? ধাঙড়টোলার কেউ নয়তো? রতিয়া ছড়িদার, আর বাবুয়া

১ পেট্রোল—ব্যথার ওষুধ।
২ রাজা পাপপরায়ণ, তার ধর্ম নেই: প্রজাদের দণ্ড দিয়ে বিড়ম্বনায় ফেলে।—তুলসীদাস

নায়েবকে হারিয়া দেখেছে 'দফাদারের' সঙ্গে জিরানিয়াতে! দফাদারের সঙ্গে আবার তাদের কী কাজ থাকতে পারে? সে দুটো গেল কোথায়? সত্যিই তাদের তো সকালবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে না।

হারিয়া বলে যে আমি কাল জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের। তারা বলে যে চৌকিদারি খাজনার কথা বলছিলাম।

এসব আবার কী গাঁয়ের মধ্যে! পঞ্চায়তিকে না জানিয়ে চৌকিদার দফাদারের সঙ্গে মেলামেশা! ঢোঁড়াইয়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে দফাদারকে খবর দেবে? হোক না সে নায়েব। এ মামলা নেবে কিনা বল, মহতো। 'সাফ সাফ' বল এ মামলা পঞ্চায়তিতে রাখবে কি না—'ঘসর ফসর'[১] কথা নয়। কেবল লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার পঞ্চায়তি করেন সব।

সকলেই ঢোঁড়াইকে সমর্থন করে। গ্রামের সকলের মুখচোখের ভাব, আর কথাবার্তার ধরন দেখে, ভয়ে মহতোর মুখ শুকিয়ে যায়। আর ঐ সেদিনের ভুঁইফোঁড় ছোকরা ঢোঁড়াই, সেই কি না গাঁয়ের লোকের 'মুখিয়া'[২] হয়ে আগিয়ে আসে! নতুন পয়সার গরমে ফুলে 'ভাঁথী'[৩] হয়েছে ছোঁড়াটা। বললাম গুদরকে একটা কাজ দিতে মাটিকাটার, সে বেলা পারলেন না। গুদরকে আমার পাঠাতে হল মুঙ্গেরিয়া তৎমাদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রীর মজুরি করতে। আমার 'পুতহু'[৪] ঐ 'মইয়েচড়া' মুঙ্গেরিয়াতাৎমা[৫] মেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে গেল। কনৌজী তন্ত্রিমাছত্রিদের ঘরের বৌ শহরে মইয়ে চড়তে আরম্ভ করেছে—এই রকম দুর্দিন পড়েছে। এর মধ্যে আবার থানা পুলিসের ঝঞ্ঝাট করবার দরকার কী।...সেবারের মতো আবার মহাৎমাজীর চেলারা তাড়ির দোকানে গোলমাল করবে নিশ্চয়। এই 'রুখা'র দিনে[৬] এ আবার আর এক ফ্যাসাদ!—যাকগে! লোকের হাতে পয়সা থাকলে তবে তো তাড়ির দোকান যাবে।...

১ বাজে কথা।

২ (মুখ্য শব্দ হইতে) প্রধান, প্রমুখ।

৩ হাপড়।

৪ পুত্রবধূ।

৫ তাৎমাটুলির তাৎমারা নিজেদের বলে কনৌজী, আর যে তাৎমারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তাদের বলে মুঙ্গেরিয়া। মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের মেয়েরা রাজমিস্ত্রীর কাজ করার সময় মইয়ে চড়ে বলে, তাৎমাটুলির ঝোটাহারা তাদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

৬ রুক্ষ শব্দ থেকে। শুকনো গরমের দিনে। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস যে, গরমের সময় তাড়ি খেলে শরীর ভাল থাকে।

ঢোঁড়াইয়ের সব থেকে বেশি আনন্দ যে সে আজ হাকিমের সঙ্গে কথা বলেছে। বলবার সময় সে একটুও ঘাবড়ায়নি। যা যা ভেবেছিল সব গুছিয়ে বলতে পেরেছে। হাকিম তার কথা শুনেছেন; আর বাবুলালটা কথা বলতে গিয়েছিল সেটাকে এক ধমক দিয়েছেন।…এখন ঢোঁড়াই যে কোনো হাকিম আসুন না, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে। আজ সে আবার লোকের চোখে বাবুলাল চাপরাসীর চাইতেও উঁচুতে হয়ে গিয়েছে। রামজীর কৃপায় তার জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হয়েছে। রতিয়া ছড়িদার আর বাসুয়া নায়েবের ব্যবহারে মনটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল ঢোঁড়াইয়ের। সেই সব কথাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে আসে; রামিয়ার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা হয়নি।

রামিয়া বলদের নাদায় জল ঢালছে। বাইরে এসে এসব কাজ করতে মানা করলেও সে শুনবে না।

ওটা কে? সামুয়র না!

এই যে বলদের মালিক এসে পড়েছেন। যাচ্ছিলাম বাড়ি। রাস্তা থেকে হঠাৎ বলদজোড়ার উপর নজর পড়ল।'

তারপর একথা সেকথা হয়।…তোমাদের পাড়ায় তো দেখি ভীষণ কাণ্ড। আগে জানলে আমি আজ সাহেবের কুঠিতেই থেকে যেতাম। আমার সাহেবও চলে যাচ্ছে আসছে সপ্তাহে। এই সব মহাৎমাজীর হল্লার জন্য না কি কে জানে।…

তা হলে অনেক টাকা পাচ্ছ, বলো?

সামুয়র বলে, শুনেছি তো সাতশো টাকা দেবে। ভারি খপসুরৎ তোমার বলদ জোড়া।…

তুমিও কেনো এই রকম গাড়ি-বলদ।…

'পাতলী কমরোয়া'র[১] গান গাইতে গাইতে সামুয়র ধাঙড়টুলির পথ ধরে।

অকারণ বিরক্তিতে ঢোঁড়াইয়ের মন তেতো হয়ে ওঠে।

রামিয়াই প্রথম কথা বলে। 'আজ বাওয়াকে দেখলাম না থানে।' রামিয়া জানে যে বাওয়ার কথায় ঢোঁড়াইয়ের মন সব সময়ই সাড়া দেয়। সত্যিই তো সারাদিনের হট্টগোলের মধ্যে বাওয়ার কথা একবারও ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়েনি। গেল কোথায়? পুলিশের গাড়ি দেখে ভোরেই কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এতক্ষণ তো ফেরা উচিত ছিল।

এখনই ফিরে আসবে;

১ 'সরু কোমর'টির গান।

বাওয়ার খোঁজে ঢোঁড়াই কয়েকবার থানে যায়। রামিয়ার সঙ্গে গল্প আজ ভাল জমে না! সন্ধ্যার পর পশ্চিমা বাতাস থামলে, কাঠ জেলে আগুন করে রাখে। 'মারুয়া'[1] ঠেসে 'লিট্টি'র লেচি পাকিয়ে রাখে। এই বাওয়া এল বলে! পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রামিয়া এসে ডাকে 'বাওয়া এখনও তো এল না। তুমি খেয়ে নাও না বাড়ি এসে।'

'ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি খুব?'

রামিয়া লজ্জিত হয়ে যায়।

গঙ্গাস্নানে যায় নাই তো? মিসিরজিঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য থেকে যায় নাই তো?

রামিয়ারই প্রথম নজর পড়ে, বাওয়ার কম্বলটা তো নাই। কম্বল নিয়ে কোথায় যাবে এই গরমের মধ্যে। নিশ্চয়ই কোথাও বাইরে গিয়েছে, দিন কয়েকের জন্য। তা যাওয়ার সময় বলে গেল না কেন?…

ঢোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন

বহুদিন প্রতীক্ষার পরও বাওয়া ফেরে না। কী জানি কেন, ঢোঁড়াই নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করে। কিন্তু সত্যিই কি সে দোষী? বাওয়ার উপর ভালবাসা তার একটুও শিথিল হয়নি; এক বিন্দুও না। বাওয়ার উপর কর্তব্যের ত্রুটি সে করেনি। তার বিয়ে করায় বাওয়ার আপত্তি ছিল না। তবু সে বোঝে যে বাওয়ার চলে যাওয়ার সঙ্গে তার বিয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এমন দোষ সে কী করেছে যে বাওয়া যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কোনো কথা বলে গেল না।

রামিয়া বলে—আমার জন্যই হয়তো বাওয়া চলে গেল। ঢোঁড়াই কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেয়। সত্যিই রামিয়াকে বাওয়া পছন্দ করতে পারেনি। না হলে হাতের ছোঁয়া খেল না কেন? কেন বিয়ের পর থেকে বাওয়া অন্যরকম হয়ে গেল। এই ধুলো রোদ্দুরের মধ্যে এখন কোথায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। সেই ছেলেবেলা থেকে, ঢোঁড়াই বাওয়াকে দেখেনি, এমন বোধহয় এর আগে একদিনও হয়নি! তা ছাড়া এখানে বাওয়া থাকলে, সে ছিল এক কথা; দেখা না হলেও মনের মধ্যে স্বস্তি ছিল যে,

[1] গরীবের খাদ্য এক প্রকার শস্য। লিট্টি—রুটির মতো খাদ্যদ্রব্য।

যখন ইচ্ছা দেখা করতে পারব। বাওয়া কিছু না করলেও ঢোঁড়াইয়ের মনে ভরসা ছিল যে, তার মাথার উপর একজন আছে। তার সংসারের বিপদ আপদের সময় বাওয়া নিশ্চয়ই এসে দাঁড়াত তার পাশে।—এইসব কথা ভাবলেই ঢোঁড়াইয়ের মন খারাপ হয়ে যায়।—চলে যাওয়ার দিন এসেছে, ঢোঁড়াইয়ের দুনিয়ায়। শনিচরাটা চলে গেল, ধাঙড়টুলি ছেড়ে; সেও যাওয়ার আগে দেখা করে গেল না। এতোয়ারীরা যেদিন এসেছিল, চৌকিদারি খাজনার দরখাস্তে মিসিরজীর কাছে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে, সে দিন তার কাছেই শুনেছে ঢোঁড়াই এ খবর। যাওয়ার আগে শনিচরা আর তার বৌয়ের কী কান্না! কী কান্না! বাড়ি ঘর দোর দেখে আর ডুকরে ডুকরে কাঁদে।... শনিচরার চলে যাওয়ার খবরেও সেদিন ঢোঁড়াইয়ের প্রাণের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল।... শনিচরা বলেই পেরেছে। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। বড় ভাল লোকটা ছিল; দিনের পর দিন তারা একসঙ্গে কাজ করেছে 'পাক্কী'র উপর। কাজের মধ্যে দিয়ে তারা আপনার হয়ে উঠেছিল। সে সম্বন্ধ কোনোদিন যাওয়ার নয়।... এতোয়ারীই সেদিন খবর দিয়েছিল যে, সামুয়র বলেছে যে সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা দিয়ে সে ভাড়ার টমটম কিনবে,—গরুর গাড়ি কিছুতেই নয়; ঢোঁড়াইয়ের থেকে তার বড় হওয়া চাই; তোর সঙ্গে তার কী এত রেষারেষি বুঝিও না। এখন কিনলে হয় ঘোড়া আর টমটম; তার আগেই আবার নেপালে জুয়ো খেলে টাকাটা উড়িয়ে দিয়ে না আসে; সব গুণই আছে সামুয়রটার। ঢোঁড়াই ভাবে যে সকলেই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পাড়ার মাতব্বরগুলো পর্যন্ত। সেদিন চৌকিদারি খাজনার কথাটা হাকিমকে বলার পর থেকে বাবুলাল আর দুখিয়ার মা তার বাড়িতে আসে না। মহতোর তো কথাই নাই। রতিয়া ছড়িদার, আর বাসুয়া নায়েব, সেই পুলিশ আসার দিন থেকে তার সঙ্গে কথা বলে না।...থাকার মধ্যে তার আছে রামিয়া—, রামপিয়ারী। রামিয়ার মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর সব কিছু, আয়নায় হঠাৎ আলো পড়ার মতো মধ্যে মধ্যে সেখানে ঝলক ফেলে, আবার তখনি কোথায় তলিয়ে যায়। রামিয়ার সব ভাল। হুঁকোটা ধরার মধ্যে, তামাকের ধোঁয়াটুকু ছাড়ার মধ্যেও তার অন্য তাৎমানীদের থেকে বিশেষত্ব আছে; ভারি সুন্দর লাগে ঢোঁড়াইয়ের। আর ঠাট্টা যা করতে পারে একেবারে হাসতে হাসতে 'নখোদম'[১] করিয়ে দেয়। ঢোঁড়াইয়ের কাছে সামুয়রকে বলে মর্কট। এমন

১ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মজার মজার কথা বলবে! মর্কটের সঙ্গে একটু নাকি তফাত করে দিয়েছেন ভগবান; অন্যমনস্কভাবে গড়তে গড়তে লাল রঙটা মুখেই পড়ে গিয়েছে ভুলে।··· দুজনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই এত হাসি, এটাই ঢোঁড়াইয়ের কেমন কেমন যেন লাগে। বলে রামিয়াকে বাড়িতে থাকতে; কিন্তু কে কার কথা শোনে! চব্বিশ ঘণ্টা ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে এখানে ওখানে; হাসিমস্করা 'ফৌজী' কুয়োতলায়; বেটাছেলে দেখলেও শরম নেই। কী রকম যেন! আর ঢোঁড়াই অন্য সব জায়গায় জোর দেখাতে পারে; রামিয়ার কাছে সে একটু নরম। 'পচ্ছিমবালী' মেয়ে; বুদ্ধিতে তার চাইতে বড়; কত জোর করা যায় তার উপর। কিন্তু তার মন রামিয়ার মধ্যে ডুবে থাকলেও তার দৃষ্টির প্রসার বাড়ছে আস্তে আস্তে; তার জগৎটা বড় হয়ে উঠেছে, গাড়ি বলদ কিনবার পর থেকে। পাক্কীতে কাজ করার সময় দূরের 'বাটোহী'র সঙ্গে দেখা হত তার পথের উপর। এখন সে নিজেই গাড়িতে মাল বোঝাই করে কত দূরে দূরে চলে যায়, পাঁচ কোশ, সাত কোশ, পুরুবে, পচ্ছিমে, কারহাগোলাব গঙ্গাস্নানে, মবৈলী, কুর্বাঘাটের মেলায়। জাত পাঁত'[১] আলাদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত্ একই রকম। তবে পচ্ছিমের গাঁগুলোতে মহাৎমাজীর 'হল্লা' আর পুলিশের হল্লাটা অন্য জায়গার চাইতে বেশি এই যা। মাতব্বররা ছাড়া, পাড়ার অন্য সকলে এইসব দূর-দূরান্তরের গ্রামের খবর শুনবার জন্য আসে তার কাছে, যখনি সে গাড়ি নিয়ে ফেরে।···

মহতোর বিলাপ

কিছুদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশি তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত লাগছে তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে। জিনিসটা আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ, কবে থেকে তা ঠিক মহতোর মনে নেই; এই 'এক সাল দেড় সাল' হবে আর কী। লোকের মনে কিসের যে আগুন লেগেছে, কিসের যে স্রোত এসেছে চারিদিকে, মহতো তা বুঝতেই পারে না, তো তার সঙ্গে তাল রাখবে কী করে?

রোজ শহর থেকে নতুন খবর শুনে আসছে তাৎমারা কাজে গিয়ে।··· 'বলোচী'[২] ঘোড়সওয়ার শহরের রাস্তায় টহল দিচ্ছে। পাদরীসাহেবরা চলে

১ জাত। ২ বেলুচি।

যাচ্ছে ; এখন খালি একজন দেশী পাদরা থাকবে জিরানিয়াতে। কিরিস্তান ধাঙড়গুলোর বিনা পয়সার দুধ বন্ধ হয়ে যাবে রে ; পাদরী সাহেবগুলো ছিল তোদের গরু, দুধ দিত। ভেউ ভেউ করে কেঁদে নে, তোদের গরু চলে যাচ্ছে। …'কালোঝাব্বাবালী' পাদরী মেমদের[1] হাসপাতাল একেবারে 'সন্নাটা'[2] দেখলাম আজ। ধাঙড়টোলার ছয়ঘর কিরিস্তান আবার হিন্দু হয়ে গিয়েছে ; বলেছে আর গির্জায় যাবে না ; পাদরীসাহেবরা চাকরি জুটিয়ে দেবে না, দুধ দেবে না, তবে খৃস্টান থাকব কিসের জন্য।…সামুয়রটাও হিন্দু হয়েছে ; মিসিরজী প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন তার ; ভাগলপুর থেকে একজন টুপিওয়ালা সাধুবাবা এসেছেন এই কাজ করতে। প্রায় সব সাহেব চলে গেল ; এইবার ধাঙড আর কিরিস্তানগুলো মজা বুঝবে ; বাঁধ এখন বাড়িতে বসে বসে বঙবেরঙের 'খুশবুদার' ফুলের তোড়া। সামুয়রের 'শাম্পনী'টার[3] রঙ কিন্তু চোখে ঝিকমিক ঝিকমিক করে লাগে। তশীলদার সাহেব বলতে এসেছিল যে, এবার আবার বাড়িতে বাড়িতে 'লমর'[4] লিখতে হবে, লোক গোনার জন্য ; সেবার তো লোক গোনবার পর গাঁয়ের আধখানা উজাড় হয়ে গিয়েছিল অসুখে ; তবু মন্দের ভাল যে, বেশির ভাগই মরেছিল মুসলমান ; এবারে ছাখ কী হয়। লোক গোনবার সময় কেউ কিছু বলিস না তশীলদারকে ; করুকগে শালা যা করতে পারে ; এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে তো ওর বিরুদ্ধে 'চৌকিদারী'র[5] দরখাস্ত দেওয়াই আছে। কী যে হল সে দরখাস্তের তা বুঝি না। কেন, এখন যাক না ঢোঁড়াই তার পেয়ারের হাকেমের কাছে ; এ কথা বললেই অনিরুধ মোক্তার বলে যে, মহাৎমাজীর হল্লার মধ্যে হাকিমের সময় নেই এসব দেখবার ; যেমন সরকার তেমনি হাকিম, ঠিকই বলে মহাৎমাজীর চেলারা।…সমাজে কেউ কথা মানবে না ; কারও কথা কেউ শুনবে না, কী করে সমাজ চলে ? ঢোঁড়াইয়ের দল বলে—কার কথা শুনব ? ঐ রতিয়া ছড়িদারের আর বাসুয়া নায়েবের ? দুটোই তো দফাদারের 'খুফিয়া'।[6] ছড়িদার আর বাসুয়া শুনছি আবার মাস্টারসাহেবের বেটার খেলাপে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে। মাস্টারসাহেবের বেটা নাকি কলালীতে কার মাথায় মদের বোতল দিয়ে মেরেছে ; ওরা নাকি তাই স্বচক্ষে দেখেছে। ঢোঁড়াইয়ের

১ কালো-ঘাগরা-পরা পাদরী মেম।

২ খালি, চুপচাপ।

৩ জিরানিয়ার ভাড়া গাড়ির নাম।

৪ নম্বর (আদমশুমারির)।

৫ চৌকিদারী ট্যাক্সের।

৬ গুপ্তচর।

দল তাই তাদের উপর ক্ষেপে আছে! আরে রতিয়া ছড়িদার তো কোন ছার! আমি মহতো, আমারই হাতের তেলের শিশি আসবার সময় তারা শুঁকে দেখল; বলে যে গুদরের মায়ের জন্য তেলের শিশিতে তুমি রোজ সাঁঝে কী কিনে নিয়ে আস সবাই জানে। এই হল সমাজের ব্যবহার তাদের মহতোর সঙ্গে। আমার সঙ্গে আসিস 'ফুটানি ছাঁটাতে'; কর দেখি দফাদার-সাহেবের সঙ্গে লড়াই তবে না বুঝি হিম্মৎ! দেওয়া দেখি ডিস্টিবোডের ফৌজী ইঁদারাটার বিয়ে, তবে বুঝব বুকের পাটা।...এই সেদিন বাবুভাইয়াদের কাছে কী অপ্রস্তুতই হতে হল পাড়ার লোকদের জন্য! এবার 'দশারায়'[১], ভগবত্তির মুরতের ঘরে তাৎমা ধাঙড় চামার দুসাদ সকলকেই যেতে দিয়েছিল; বাবুভাইয়াদের ছেলেরা ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সকলকে; কেবল ছত্তিসবাবুর বুড়হিয়া মাই যখন 'পূজো চডাচ্ছিলেন', তখন 'ছত্তিসবাবুর বেওয়া বহন'[২] একখানা ইয়া মোটা সজনের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—যতক্ষণ বুডি মাইজীর পুজো না হয়, ততক্ষণ তাৎমা ধাঙড় দুসাদ কেউ এসেছ কি পিঠে ভাঙব এই ডাল। ঢোঁড়াইরা দল বেঁধে চলে এসেছিল সেখান থেকে। বাবুভাইয়াদের ছেলেরা পরে তাৎমাটুলিতে খোশামোদ করতে এসেছিল। তাদের আবার 'নেওতা'[৩] দিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। আমি কত বোঝালাম, বাবুভাইয়ারা বলছে সকলে! কখনও তো উঠতে পেতিস না 'ভগবত্তি থানে'[৪] এবার উঠতে পেয়েছিস। কোন মাইজি 'পান চিরে দু টুকরো করেছে'[৫] আর অমনি অনর্থ বাধিয়ে তুললি। আরে ঢোঁড়াই, তুই রাজী হলেই তোর এই 'হাঁ তে হাঁ মিলানেবোলা'[৬] শাগরেদগুলো এখনই রাজী হয়। এই কথায় ফোঁস করে উঠলো সবগুলো। আচ্ছা বাবা যা ভাল বুঝিস তাই কর। বাবুভাইয়াদের কাছে তোদের টোলার ইজ্জত খুব রাখলি বটে! আবার আমাকে শোনানো হল যে, রতিয়া ছড়িদার মহাৎমাজীর চেলার খেলাপে সাক্ষী দেবে, তাতে টোলার ইজ্জত বাড়বে? সেটা বন্ধ করার মহতো তুমি না, আর বাবুভাইয়াদের পা চাটাবার মহতো তুমি।

১ দশহরা বা দুর্গাপূজায়।

২ সতীশবাবুর বিধবা ভগ্নী।

৩ নিমন্ত্রণ।

৪ বাঙালীদের দুর্গামণ্ডপ।

৫ স্থানীয় ভাষায় 'পান চিরে দু টুকরো করা'—বাঙলার 'পান থেকে চুন খসা' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৬ যারা সব কথায় সায় দেয়।

—না, না, মহতোগিরিতে না আছে আগেকার মতো পয়সা, না আছে সম্মান, না আছে এক মুহূর্তের শান্তি।—নায়েব ছড়িদারদের পর্যন্ত কিছু ঠিকঠিকানা নেই। তাদের মধ্যে কে যে কখন কোন দিকে বোঝা দায়। রামিয়ার সেই লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার ব্যাপারে সবাই চলে গিয়েছিল মহতোর বিরুদ্ধে; সেইজন্যই মহতো সে কথাটাই পাড়েনি পঞ্চায়েতে। চৌকিদারী ট্যাক্সের ব্যাপারে সব নায়েবই বাবুলালের বিরুদ্ধে। মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সব নায়েবই ছড়িদার আর বাসুয়ার বিরুদ্ধে।—এখন কাকে হাতে রাখব? কাকে সঙ্গে নিয়ে চলব?—আর সমস্যা কি একটা? তাৎমাটুলি থেকে লোক চলে যাচ্ছে। বতুয়ার বোনটা মুসলমানের সঙ্গে চলে গেল। হারিয়া মেয়েটার বিয়ে দিয়ে এসেছে, মালদা জেলায়, টাকার লোভে। আর বলছে যে সেইখানেই চলে যাবে চাষবাসের কাজ করতে। আমার নিজের ছেলে গুদর, সে আজ আরম্ভ করেছে মুঙ্গেরিয়াতাৎমা রাজমিস্ত্রিদের যোগান দেওয়ার কাজ। সেই হয়তো চলে যাবে মুঙ্গেরিয়াতাৎমাদের গাঁ মারগামায়।—মুঠো থেকে সব পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাকে সে আটকাবে? এই ছ্যাখো-না ঢোঁড়াইয়ের দল তো আবার এক নতুন গণ্ডগোল বাধিয়েছে। এই যে হরখুর বাপটা—যেটা ধেঁাদলের ফুলে ভরা মাচাটার পাশে, তেল মেখে ল্যাংটা হয়ে পড়ে থাকত সারাদিন, তাকে গোঁসাই টেনে নিয়েছেন ক'দিন হল। বড় ভাল হয়েছে—তাৎমাটুলির বুড়ো-বুড়িরা তো মরতে জানে না। ডাইনের জোর ছোট ছেলেপিলেদের উপরই খাটে কি না! পৈতা নেওয়ার পর থেকেই ঢোঁড়াইয়ের দল চেঁচামেচি করছে যে, 'তেরহমা' করবে, 'তিরসা' নয়[১]। বুড়ো লোক না মরলে গাঁ-সুদ্ধ লোক মাথা নেড়া করার সুযোগ পায় না। এতদিনের মধ্যে এক কেবল মরেছিল বুড়ো মহাবীরা, তা সে সাপের কামড়ে। তাই তার 'কিরিয়া করম' কিছু দরকার হয়নি। এইবার এই ঢোঁড়াই শয়তানটার দল গোলমাল পাকাবে তেরো দিনের দিন। সেটি হতে দিচ্ছি না। কিসে থেকে কী হয় তার খবর রাখিস, এদিকে তো খুব ফরফর ফরফর করিস তোরা। পিতৃপুরুষের 'জল চড়ানোতে' একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি উদ্বাস্তু হয়ে যাবি সকলে, ঘরবাড়িতে বিনা আগুনে আগুন লেগে

১ শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্মাদি মৃত্যুর তেরো দিনের দিন করবে না ত্রিশ দিনের দিন, তাই নিয়ে পৈতা নেওয়ার পর তাৎমা সমাজে বেশ মতদ্বৈধ হয়। এতদিন থেকে ত্রিশ দিনের দিন কাজ করাই চলে আসছিল। নতুন দ্বিজ হবার পর স্থানীয় সকল জাতের মধ্যেই এই বিষয় নিয়ে দলাদলি, মারামারি, থানা-পুলিশ পর্যন্ত হয়েছে। নতুনের দল তেরো দিনেই কাজ করতে চায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত।

যাবে, কালো টিকের মতো দাগ হবে প্রথমে চালে, তারপর দেখবি সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে; তাঁদের ঘাঁটাস না। আগে লেজ তুলে ছাখ এঁড়ে কি বকনা, তবে না কিনবি। মহতো থই পায় না; এক বছরের মধ্যে সে এত বুড়ো হয়ে পড়ল নাকি?—যাকগে, মরুকগে, যা হবার তা হবেই। 'তুমহসন মিটহি কি বিধি কে অঙ্কা'[১]। তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে?—পঞ্চায়তির জরিমানার টাকার হিসাব চায় গাঁয়ের লোকে! আশ্চর্য! রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তাৎমাটুলি। মরনাধারের বালির মধ্যে যেন তার পা ধসে যাচ্ছে।…

হঠাৎ রতিয়া ছড়িদারের বৌ চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করে। মহতো উঠে দাঁড়ায়। মহতোর দুদণ্ড নিশ্চিন্দি হয়ে বসবার জো নেই আজকাল। নিশ্চয় ছড়িদার বৌকে মারছে, আগুন-টাগুন লাগলে তো দেখাই যেত।

সকলে দৌড়ে যায় রতিয়া ছড়িদারের বাড়ি। তার বৌ কুপী ধরে সকলকে দেখায় যে ছড়িদারের ভুরুর উপর খানিকটা কেটে গিয়েছে। এখনও অল্প অল্প রক্ত পড়ছে। একটা বাঁশে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে শহর থেকে ফিরছিল; একটু বেশি রাত করেই সে আজকাল ফেরে। যেই শহরের বাইরে কপিলদেওবাবুর আমবাগানটায় পৌছেছে, অমনি অজস্র ঢিল তার উপর এসে পড়তে আরম্ভ করে।—ছড়িদার কোনো লোককে দেখতেই পায়নি, তা চিনবে কী? তবে পায়ের শব্দ সে শুনেছে।

—মহাৎমাজীর চেলারা মাছমাংস পিঁয়াজ রসুন খায় না। তারা কি কখনও কারও গায়ে হাত তুলতে পারে?—এই আবার এক নতুন কাণ্ড হল পাড়ার মধ্যে! দেখিস ছড়িদার, তুই আবার দফাদারকে এসব বলিস না যেন।—থানা-পুলিশের কথা ভাবলেই মহতোর বুক শুকিয়ে যায় ভয়ে—নিশ্চয়ই ঢোঁড়াইয়ের দলের কাণ্ড এটা। কিন্তু ঢোঁড়াই-টোঁড়াই সকলকেই তো দেখছি এখানে।—ছড়িদারের বৌ তখনও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে—হারামীর দলের সব কটাকে হাতে হাতকড়া পরাব।—বাইরে ঠুনঠুন করে ঘোড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সামুয়রটা গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছে; এই তাৎমাটুলির পথ দিয়েই সে রোজ ফেরে, মদের দোকান বন্ধ হওয়ার পর। ওঃ! তাহলে অনেক রাত হল। চল্ চল্ সকলে। ছড়িদারকে ঘুমুতে দে। শ্যাওড়া গাছের দুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কাটাটার উপর; কালই শুকিয়ে যাবে ঘা।

১ তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে।

তাৎমাটুলিতে ডাকপিয়নের দৌত্য

হিন্দু হওয়ার পর থেকে সামুয়রের সম্মান বেড়েছে তাৎমাটুলিতে, নাহলে ঘোড়ার গাড়ির মালিক হলেও কিরিস্তানকে কে পৌঁছে। মহতো আর নায়েবরাও জল্পনাকল্পনা করে, একসময় তো হিন্দু ছিলই ওরা। জাত কি কারও যাওয়ার জিনিস। 'সোন অ নহী জরইছে',[১] সোনা জ্বালালে পরিষ্কারই হয় আগের চেয়ে। লোকটাকে যত খারাপ মনে করত সকলে আগে, আসলে সে তত খারাপ নয়। সে সকালে যখন গাড়ি নিয়ে শহরে যায়, তখন মহতো, নায়েব, ছড়িদার, যার সঙ্গেই দেখা হয় পথে, তাকে গাড়িতে চড়িয়ে নেয়। এর আগে তাৎমাটুলির কেউ কোনোদিন জীবনে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছিল? তাৎমা ছেলেমেয়েরাও গাড়ি চড়ার জন্য পাগল। কিরিস্তান সামুয়রটা আজকাল সকলের 'সামুয়রভাই'[২] হয়ে উঠেছে। মহতোগিন্নি পর্যন্ত একদিন তাকে আমলকির আচার খাইয়েছে। গাড়ি নিয়ে শহরে যাওয়ার আর ফিরবার সময় সে তাৎমাটুলি হয়েই যায়; আর সকলের সঙ্গে খুব আলাপ জমাতে চায় সে আজকাল। পাদরীসাহেবের সম্বন্ধে এমন সব রসের গল্প করে যে, সকলে হেসে ফেটে পড়ে।

'না, তুই বানিয়ে গল্প করছিস সামুয়র।'

'তবে শোন্ আর একটা' এই বলে সে ঢাকো-ঘাঘরা-পরা মেম-পাদরীদের নিয়ে আরও একটা অবিশ্বাস্য গল্প বলে।

সে যখনি গাড়ি নিয়ে এ-পথ দিয়ে যায়, একবার হেঁকে যায়-- 'ঢোঁড়াই বাড়ি আছিস নাকি?'

রামিয়া ভিতর থেকে জবাব দেয়, 'না, সে গরুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে সেই সকালে; এখনও ফিরবার নাম নেই।'

ঢোঁড়াই কাজে বেরিয়েছে কিনা, তা বাড়ির বাইরে গাড়ি-বলদ আছে কি নেই, দেখলেই বোঝা যায়। তবু তার একবার জিজ্ঞাসা করা চাই-ই চাই। জিনিসটা মহতোগিন্নির চোখেও কেমন কেমন যেন ঠেকেছে!

সামুয়রের এত মাখামাখি ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। মজার মজার গল্প বলে সামুয়র যেরকম রামিয়াকে হাসাতে পারে, তেমনিটি ঢোঁড়াই পারে না। এ কথা ঢোঁড়াই বোঝে, আর মনে মনে সংকুচিত হয়ে যায় এর জন্য।

১ 'সোনা জ্বলে না'—সোনা জ্বালালে আরও পরিষ্কার হয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২ সামুয়র দাদা।

তার গল্প শুনে রামিয়া হেসেছে বলে ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে না; অথচ সামুয়রটা এমন করে গল্প বলে যে, রামিয়া শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এতটা বাড়াবাড়ি ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। সামুয়রটা ছোটবেলা থেকে সাহেবদের ওখানে কত 'আণ্ডা চিড়িয়া উড়িয়েছে'[1] বোধ হয়। সে কথা মনে করলেই ঢোঁড়াইয়ের গা ঘিনঘিন করে। রসুন হজম হওয়ার পরও ঢেকুরে রসুনের গন্ধ থাকে, আর ঐ সামুয়রটা কত অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে আগে; তার কি আর কিছু ওর শরীরে এখনও নেই। আর সেটাকে নিয়ে এখন এত মাখামাখি।

রামিয়াটা আবার একা-একা রয়েছে।

ছড়িদারের বাড়ি থেকে ঢোঁড়াই কত কী ভাবতে ভাবতে আসে।

বাড়ির দুয়ারে সামুয়র গাড়ি থামিয়েছে। তাই হঠাৎ ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছিল না।

রামিয়াই প্রথম কথা বলে, 'এই শোনো এর কাছ থেকে; ডাকপিয়ন তোমাকে খুঁজছিল।'

ডাকপিয়ন, কেন?'

সামুয়র বলে, ডাকপিয়ন তাকে ঢোঁড়াইদাসের কথা জিজ্ঞাসা করছিল শহরে। তোমার নামে 'মানি-আটার'[2] আছে।

'মানি-আটার?'

'হাঁ, হাঁ, টাকা।'

ডাকপিয়নে আবার টাকা দেয় নাকি? ঢোঁড়াই কী করবে ভেবে পায় না। টাকা কে পাঠাবে? কত টাকা, তাও সামুয়র বলতে পারে না। কেবল ডাকপিয়ন জিজ্ঞাসা করছিল তাই বলতে পারি।

সামুয়র চলে গেলে রামিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'বাওয়া পাঠায়নি তো?'

সকলেরই সে কথা মনে হয়েছে, ঢোঁড়াই আর সামুয়রেরও। টাকার কথা উঠলে ঢোঁড়াইয়ের অন্য নাম কি মনে পড়তে পারে? ঢোঁড়াই কেন, সব তাৎমাই জানে যে, রোজগার করে হয় আনা—টাকা নয়। আর টাকা আসে লোকের দৈবাৎ—রামজীর কৃপাদৃষ্টি হলে। বাওয়া পাঠিয়েছে; নিশ্চয় বাওয়া এখনও তাকে মনে রেখেছে তাহলে!

তাৎমাটুলিতে সাড়া পড়ে যায়—'মানি-আটার' মানি-আটার!' মহতো

১ মুরগীর ডিম আর মাংস খয়েছে

২ মনি-অর্ডার।

নায়েবদের বুকের ভিতর করকর করে—ঢোঁড়াইটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বুঝি এবার। 'ডাকিয়া'[1] আনাল ঢোঁড়াই পাড়ার ভিতর।

উঠোন-ভরা ঝোটাহার দল সসম্ভ্রমে রামিয়ার গল্প শোনে। সে রাত্রে রামিয়া কি ঢোঁড়াই, কেউই ঘুমুতে পারে না। সারারাত তারা টাকার কথা, আর বাওয়ার কথা বলে কাটিয়ে দেয়।

দিনকয়েক পরে ডাকপিয়ন আসে সেই সন্ধ্যাবেলায়। মিসিরজী তখন পিয়নের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ফিরবার যোগাড় করছেন। বাবুলালের বাড়ি থেকে কাজললতা আসে। পিয়ন তিনটি টাকা থলির ভিতর থেকে বের করে দেয়, আর 'মানি-আটার' ছিঁড়ে একটুকরো কাগজ দেয়।

'ওলায়তী লণ্ঠনের'[2] জন্য বাওয়া তিন টাকা পাঠিয়েছে অযোধ্যাজী থেকে। আর কিছু লেখা নেই কাগজে। বাওয়ার হাতের ছোঁয়া চিঠি—ঢোঁড়াই কত রকমে উলটে-পালটে দেখে। কত ছোটবেলার কথা তার মনে হয়। রামিয়ার অলক্ষ্যে কাগজখানা শুঁকে দেখে—বাওয়ার জটার গন্ধ পাওয়া যায় কিনা তাতে। তারপর সযত্নে সেখানা রামিয়ার তৈরি বেনাঘাসের কাঠাতে রেখে দেয়।

মহতো বলে, 'বড় খরচার রাস্তা—অর্থাৎ লণ্ঠন জ্বালতে বড় খরচ। বাওয়া তোর ভাল করল কি মন্দ করল বলা শক্ত।'

ছড়িদার সায় দেয়, 'যাকে জেরবার করতে হবে, তাকে নাচিয়ে দিয়ে জমিদারবাবুরা। তারপর সামলাও তার খরচা।'

হারিয়ার ছেলে বলে, হাঁ এসব হচ্ছে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কিনে রাখবার জিনিস। তাহলে দশের কাজে-কর্মে একটু উপকার হয়। ফোঁস করে ওঠে ছেলে ছোকরার দল। 'আরে রাখ্। পঞ্চায়তের সতরঞ্চি কিনবার কথা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, তা আজ পর্যন্ত কেনা হল না। আর 'ওয়ায়তী লান্টেম' জ্বালিয়ে—'যুগীরা আর বলবাহী'[3] নাচ নাচবে পঞ্চরা। এত টাকা জরিমানা ওঠে, কী হয় সে সব?'

মহতো এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়।

'ঢোঁড়াই, তাহলে একটা ভাল করে দেখেশুনে লণ্ঠন কিনিস। কাঁচটা বাজিয়ে নিবি—ঠনন্। ঠনন্।'

১ ডাকপিয়ন।

২ বিলাতী লণ্ঠন (ডিজ লণ্ঠন)।

৩ যুগীরা আর বলবাহী দুইরকম পল্লীনৃত্যের নাম।

'আমি কি অত শত চিনি? তা তোমরাই চল না কেন মহতো নায়েবরা, কাল সকালে বিলিত্তি লণ্ঠনের সওদা করে দিতে।'

রতিয়া ছড়িদার তার ফ্যাটা-বাঁধা ভুরুর নিচের চোখটা দিয়ে মহতোকে কী যেন ইশারা করে।

'না না, কাল সুবিধে হবে না আমাদের। একটা কাজ আছে।'...

—আরে ফটফট করিসনা, তোরা আমার হাঁটুর বয়সী। আমার মাথার চুলটা রোদ্দুরে পাকেনি। আমাদের সরাতে চাচ্ছিস কাল সকালে হরখুর বাপের 'তেরহাঁ'[1] করার মতলবে; সেটুকু আর বুঝি না?...

'ঢোঁড়াই, তুই-ই বরঞ্চ যাস সামুয়রের গাড়িতে, কাল ভোরে ও যখন কাজে যাবে। ও সাহেবদের বাড়িতে কত ওলায়তী লাণ্টেম জ্বালিয়েছে আর ভক্তিসবাবুর দোকানে গাড়িতে করে গেলে জিনিসটা দেবে মজবুত।'

তেরহাঁ তিরসার দ্বন্দ্ব

মহতোর কথামতো ঢোঁড়াই সামুয়রের সঙ্গে লণ্ঠন কিনতে যায় বটে; কিন্তু সকালে নয়, বিকেলের দিকে। সকাল বেলা কি ঢোঁড়াই যেতে পারে? বুড়োরা নিজেদের যতই চালাক ভাবুক, তারা 'আঙুল উঠোলেই'[2] ঢোঁড়াইয়ের দল তাদের মতলব বুঝতে পারে।

যাস না ঢোঁড়াই খবরদার সকালের দিকে। তাহলে পাঁচ-পাঁচটা বুনো মোষের তাল সামলানো—পাঁচটা কেন, ছড়িদারকেও ধর, ছটা—সে আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পরের দিন সকালে ঝগড়া-ঝাঁটি, গালাগালির মধ্যে মাথা নেড়া করবার পর্ব শেষ হয়। তাৎমাদের 'কিরিয়াকরম' এর নাপিত পুরণকে মহতো নায়েবরা বারণ করে দিয়েছিল, হরখুর বাপের 'তেরহাঁ'তে কারও মাথা নেড়া করতে। ঢোঁড়াই ধরে নিয়ে আসে মরগামার নাপিতের ছেলেটাকে।

—সে ছোকরা নাপিতটা কি ঢোঁড়াই না থাকলে আর কারও কথা শুনত!—ঢোঁড়াই গাড়িবোঝাই মাল নিয়ে গিয়েছিল কুশীস্নানের মেলায়। মেলায় দেখা এই নাপিতের ছেলেটার সঙ্গে। তার মেলাতে কেনা 'চাক্কী'[3]

১ মৃত্যুর তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধাদি করার নাম 'তেরহা'।

২ তারা কথা বলবার আগেই ঢোঁড়াইয়া তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারে—এইরূপ অর্থে স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৩ জাঁতা।

ঢোঁড়াই গাড়িতে করে এনে পৌঁছে দিয়েছিল তার বাড়িতে, ভাড়া না নিয়ে। সেই নাপিত কি এখন ঢোঁড়াইয়ের কথা না রেখে পারে ?

মরগামার মুঙ্গেরিয়াতাৎমাদের পুরুতকেও ঢোঁড়াই ঠিক করে রেখেছিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দরকার হয়নি। মিসিরজীই রাজী হয়ে গিয়েছিল পুজো করাতে। রতিয়া ছড়িদার মিসিরজীকে ভয় দেখিয়েছিল যে থানে রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিয়ে দেবে। ঢোঁড়াই জবাবে বলেছিল, দফাদারকে বলে বন্ধ করাবে নাকি রামায়ণ পাঠ, ছড়িদার ? সকলে হেসে ওঠায় ছড়িদার আর ভাল করে কথাটার উত্তর দিতে পারেনি।

ভাগ্যে সামুয়রের সঙ্গে গিয়েছিল লণ্ঠন কিনতে ঢোঁড়াই। না হলে তো ঠকেই মরেছিল—সামুয়র সঙ্গে ছিল বলেই না, সে বলে দেয় যে পলতেটাতে বড় ঠকায় দোকানদারেরা ; নীল 'কোর'[১] ওয়ালা পলতে নিবি। সেই রাতে সামুয়র বিলাতী লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে দেয় ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে। ভিড় বেশি হয়নি। মহতো নায়েবের দল চটে আছে ; তারা ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে আসতেই পারে না। আর ঢোঁড়াইয়ের দল ছিল হরখুর বাড়ি, 'তেরহী'র ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত।

রামিয়া বলে, 'একেবারে দিনের মতো আলো হয়েছে, না ?'

সামুয়র ঢোঁড়াইকে বলে—'এমন আলো কিনলি ঢোঁড়াই একেবারে দোকানের আলো। এবার খুলে দে একটা দোকান। তোর বৌ হবে মুদিয়ানী ; সওদা ওজন করবে, রামে রাম, রাম ; রামে-দো দো ; তুয়ে তিন তিন—'

রামিয়া হেসে লুটিয়ে পড়ে।

সামুয়রের এসব রসিকতা ঢোঁড়াইয়ের একটুও ভাল লাগে না। কিছু বলতেও পারে না ; এত কষ্ট স্বীকার করে লণ্ঠন পছন্দ করে দিয়েছে। বাওয়ার কথা ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ছে। তারই দেওয়া বিলাতি লণ্ঠন ঢোঁড়াইয়ের আঙিনা আলো হয়ে গিয়েছে। তারই দেওয়া তো সব—বাড়ি, ঘর, গাড়ি, বলদ, রামিয়া, ঢোঁড়াইয়ের আপন বলতে যা-কিছু আছে এ দুনিয়াতে। রামজীর রাজ্যে গিয়েও বাওয়া তাকে ভুলতে পারেনি। আর সে বাওয়ার কথা ক'দিন ভেবেছে ? এই সামুয়রের কথায় খিলখিল করে হাসা মেয়েটার জন্য, গেল এক মাসের মধ্যে, তার একবার গোঁসাই থানে যাওয়ার কথাও মনে পড়েনি।

১ বর্ডার ; নীল বর্ডারযুক্ত।

—আগে দেখেছি, এ মেয়ের থানে পিদিম দেওয়ায় সে কী ধুম। এখন সে কথা মনেও পড়ে না। না, না, মিছিমিছি সে রামিয়ার উপর দোষ দিচ্ছে; উঠোনের তুলসীতলায় তো সে রোজই পিদিম দেয়। বাড়ির বাইরে যেতে তো সে-ই মানা করে রামিয়াকে।

সামুয়র কী যেন একটা মজার গল্প করছে; রামিয়াটা হাঁ করে গিলছে কথাগুলো। ঢোঁড়াই যদি অমন গল্প করতে পারত।

হঠাৎ সে আলো নিয়ে ওঠে।

'যাই বাওয়ার থানে একবার আলোটা দেখিয়ে, তারপর ওটা নিয়ে যেতে হবে হরখুর বাড়ির ভোজে। বাওয়ার দেওয়া জিনিসটা দশজনের কাজে লাগুক।'

—পাড়ার লোককে নিজের বিলাতী লণ্ঠন দেখানোর ইচ্ছার কথাটা সে মনে মনেই রাখে।

অনেক লোক এসেছে হরখুর বাড়ির ভোজে। আট 'বাঁশের বাত্তি'[১] লোক খেতে বসেছে। আরও জনকয়েক পরের দলে খাবে। মহতো নায়েবদের এরকম পরাজয়ের কথা ঢোঁড়াইরা কল্পনাও করতে পারেনি। ঢোঁড়াইয়েরই জয়জয়কার। তারই নাম সকলের মুখে। তারই আনা নাপিত, তারই বিলাতী লণ্ঠন, স-ই তো সব, বাকি লোকেরা তো 'পাহাড়ের আড়ালে' আছে।···সকলের মুখে তার প্রশংসা শুনতে শুনতে ঢোঁড়াইয়ের নিজেকে মহতোর সমান বড় মনে হচ্ছে। চোখের সম্মুখে স্বপ্নরাজ্যের ছবি ভিড় করে আসছে—মহতো মারা যাওয়ার পর পাড়ার লোকরা তাকেই মহতো করেছে; সে জরিমানার পয়সা দিয়ে তাৎমাটুলির জন্য সতরঞ্চি কিনেছে; ভজনের দলের জন্য ঢোলক কিনেছে; ভোজের জন্য প্রকাণ্ড কড়াই কিনেছে; রতিয়া ছড়িদারকে বরখাস্ত করে হরখুকে ছড়িদার করেছে; বাওয়া এসে দেখবে যে তার ঢোঁড়াই গাঁয়ের মহতো হয়েছে; রামিয়াটাকে আবার সকলে ডাকবে মহতোগিন্নি বলে; সত্যিই গিন্নি হয়ে উঠেছে সে আজকাল।···

হঠাৎ মনে পড়ে যে, সে বেচারি একা রয়েছে ঘরে। তার মন উসখুস করে।

আঁচানোর পর ঢোঁড়াই বলে, 'আলোটা থাক এখন এখানে। পরের দলের খাওয়ার সময় লাগবে।'

'ঢোঁড়াইয়ের আর তর সইছে না'—সকলে হেসে ওঠে।

১ সামাজিক ভোজের পঙক্তিভোজনের সময় একখানি করে সরু বাঁশের পাতা দেওয়া হয়। এর উপর পা রেখে সকলে উবু হয়ে বসে।

'তেরহাঁ' যজ্ঞের কুলপতির স্ত্রী-নিগ্রহ

ঢোঁড়াই হনহন করে বাড়ির দিকে আসছে। ভোজবাড়ির চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে অল্প অল্প। বেশ কুয়াশা হয়েছে চারিদিকে। কার্তিক মাস শেষ হয়ে গিয়েছে; পরশু বুঝি 'ছট্' পুজো[1]। রামিয়া হয়তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে; একা একা কতক্ষণ আর জেগে বসে থাকে। পায়ের নিচে বালি বেশ ঠাণ্ডা; শিশির পড়ে পথের ঘাস ভিজে উঠেছে। গা শিরাশির করছে ঠাণ্ডায়। হাতে তার ভোজবাড়ির 'মুখশুধ'[2]। ঘুমন্ত রামিয়ার মুখের মধ্যে সে এক টুকরো দিয়ে তারপর তাকে জাগাবে। ওটা কী সম্মুখে! হাতির মতো প্রকাণ্ড! তাই বল! গাড়ি, সামুয়রের! ঘোড়াটা খুলে রেখেছে; পথের ধারে চরছে। সামুয়র তাহলে যায়নি। এত রাতেও এখানে! তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সেই সন্ধ্যায় এসেছে, এখনও গল্প করছে? একটু চক্ষুলজ্জাও তো থাকা উচিত। এত বুদ্ধি, আর এটুকু খেয়াল নেই রামিয়ার? পাড়ার লোকে কী বলবে; সামুয়রের মতো 'লাখেড়া'র[3] সঙ্গে একা গল্প করা এত রাত পর্যন্ত! দোরগোড়া থেকে দেখে যে উঠোনে কেউ নেই। তাদের গল্প শোনা যাচ্ছে। কথার একবিন্দুও বোঝা যায় না। রামিয়ার হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই খিলখিল করে হাসি। ঢোঁড়াইকে নিয়েই হয়তো হাসাহাসি করছে।

বাড়ির ভিতর ঢুকে ঢোঁড়াই দেখে যে তারা দাওয়ার উপর বসে গল্প করছে। তুলসীতলার পিদিপের ঝাপসা আলোতে তাদের পরিষ্কার দেখা যায় না। ঢোঁড়াই ঢুকতেই সামুয়র উঠে দাঁড়ায়। 'তোর বৌকে পাহারা দিচ্ছিলাম। এই আসে তো এই আসছে। তোর জন্য অপেক্ষা করছি কি এখন থেকে। বিলাতী লণ্ঠনটা যে রেখে এলি দেখছি?'

ঢোঁড়াই তার কথার জবাব দেয় না। গম্ভীর ভাবে মাটির কলসী থেকে জল নিয়ে পা ধুতে বসে।

'আচ্ছা, আমি যাই তাহলে এখন। অনেক রাত হয়েছে।'

ঢোঁড়াই বা রামিয়া কেউ উত্তর দেয় না।

সামুয়রের সঙ্গে গল্প করলে ঢোঁড়াই চটে, এ কথা রামিয়া ভালভাবেই জানে। কতদিন এ সম্বন্ধে ঢোঁড়াই তাকে বলেছে। রামিয়া সে সব কথা

১ ষষ্ঠি এবং সূর্যের পুজা।

২ মুখশুদ্ধি; সুপারি কিংবা পান।

৩ লক্ষীছাড়া।

গায়েও মাখেনি। আজ কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের ভাব একটু যেন বেশি গম্ভীর গম্ভীর লাগে রামিয়ার। রামিয়া মনে মনে হাসে। শোবার পর একটু ভাল করে গল্প করলেই রাগ পড়ে যাবে বাবুর।

সামুয়র চলে যাওয়া মাত্র ঢোঁড়াই গট্‌গট্ করে ঘরে ঢোকে।

'রামিয়া!'

গলার স্বরেই রামিয়া বোঝে যে তার আন্দাজ থেকে আজ রাগটা একটু বেশি; 'তেরহাঁ'র লড়াই জিতে এসেছে কি না তাই।

'ফের যদি সামুয়রের সঙ্গে কথা বলতে কোনোদিন দেখি, তাহলে 'খাল'[১] ছিঁড়ে নেব।'

'কেন?'

'আবার বলা—'কেন!' ঢোঁড়াইয়ের সর্বাঙ্গে আগুন লেগে যায়। রামিয়ার চুলের ঝুঁটি ধরে তার মুখে মাথায় কয়েকটি চড়চাপড় মারে। 'পচ্ছিমা মিসিরজীর মতো কথা, আর তাৎমাটুলির ঝোটাহার মতো চালচলন। মুখে মুখে জবাব! গরুর চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। উঠোনে শানাল না; দাওয়ায় উঠে ঢলাঢলি করছিলেন এতক্ষণ!'

রামিয়া প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ঢোঁড়াই যে তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে, সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। 'আমাকে তোমাদের এখানকার 'ভুচ্চর'[২] তাৎমাদের খুরপিধরা, কমজোর ঝোটাহা ভেবো না। বাওয়ার পয়সায় ফুলে 'ভাথি'[৩]! 'ভিখমাঙ্গার'[৪] পয়সা হয়েছে, আর বাবুভাইয়াদের মতো বৌকে বন্ধ রাখতে সাধ গিয়েছে। তা করতে গেলে বাবুভাইয়াদের মতো ব্যবহার শিখতে হয়'...গালি দিতে দিতে রামিয়া বাড়ির বাহির হয়ে যায়। 'এমন মরদের ঘর করতে বাপ-মা শেখায়নি'...

'তোর মা-বাপের কথা ঢের জানা আছে! থাকগে যা না সামুয়রের সঙ্গে। খানিক পরেই তো আবার 'কুত্তী'র[৫] মতো ফিরে আসবি জানি।'...

গুটিগুটি পাড়ার লোক জমতে আরম্ভ করে। তাৎমাটুলিতে সব বাড়িতেই এমন হয়। বিশেষ করে ধানকাটনীর আগে 'ঝোটাহা'দের উপর মারধরটা একটু বেশি বাড়ে। পাড়ার লোকজন এসে দুজনকে থামিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই দিব্যি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু

১ চামড়া।
২ জানোয়ার।
৩ হাপড়।
৪ ভিখারী।
৫ কুকুর।

ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে মারধর এই প্রথম, তাই প্রতিবেশীদের মধ্যে কৌতূহল বেশি। কারও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঢোঁড়াই শুয়ে পড়ে। পাড়ার লোকের কথাবার্তা থেকে জানতে পারে যে, রামিয়া রবিয়ার বাড়ি গিয়ে খুব চেঁচামেচি করছে। কিছুক্ষণ পরই ঢোঁড়াইয়ের আঙিনা খালি হয়ে যায়।

কুয়াশা আরও ঘন হয়ে তাৎমাটুলির বুকে চেপে বসে।

অগ্নিপরীক্ষা

পরদিন সকালেও রামিয়া এল না দেখে শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়িতে যায়। অনুশোচনায় তখন তার মন ভরে গিয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কী কাণ্ডই সে করে ফেলেছে রাতে! কাল আবার ছটপরব। আজ রামিয়ার উপোস। রাত্রে রামিয়া খেয়েছিল তো? খেল আবার কখন, সন্ধ্যা থেকেই তো সামুয়র বাড়িতে বসে।

রবিয়ার বৌ বলে যে, রামিয়াকে নিয়ে রবিয়া গিয়েছে মহতোর কাছে সেই ভোরবেলায়; রামিয়া পঞ্চায়তি করাবে। রবিয়ার বৌয়ের কথা বলবার সময় নেই; ছটপরবের যোগাড়যাগাড়ের ছিষ্টিকাজ তার পড়ে রয়েছে; নিশ্বাস ফেলবার বলে সে সময় করে উঠতে পারছে না, তার আবার সে এখন ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প করতে বসবে।

ঢোঁড়াইয়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে—কেবল আত্মমর্যাদায় নয়, আত্মবিশ্বাসেও।

কী আক্কেল রামিয়ার! তাদের ঘরোয়া কথা নিয়ে গিয়েছে মহতো নায়েবদের কাছে! সামান্য জিনিসকে এত বাড়ানোর কী দরকার ছিল? কালকে ছটপরব তা কি রামিয়া ভুলে গিয়েছে? তাদের নতুন সংসারের প্রথম ছটপরব এইটা। কী কী জিনিষ আনতে হবে তা কি ঢোঁড়াই অতশত জানে। 'সোহাগিন'[১] থাকল ছটপরবের সময় বাড়ির বাইরে—ঢোঁড়াইয়েরই বিরুদ্ধে নালিশের তদ্‌বিরে। তার রঙিন জগৎ আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

ঢোঁড়াই সেদিন গাড়ি নিয়ে কাজে বেরোয় না, রামিয়া আবার যদি বাড়ি ফিরে তাকে দেখতে না পায়! বাড়িতে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে সে রামিয়ার কাছে মাপ চাইবে। ঠোঁটের কোণে হাসি এনে রামিয়া বসবে উনুনে আগুন দিতে, ঢোঁড়াইয়ের জন্য ভাত রাঁধতে। না না আজ আবার ভাত রান্না কী?

---

১ এয়ো।

স্নান করে রামিয়া বসবে গম ধুতে, ছটপরবের 'ঠেকুয়ার'[1] জন্য। ঢোঁড়াই ধাঙড়টুলি থেকে নিয়ে আসবে বাতাপিলেবু, আখ, সাওজীর দোকান থেকে আনবে গুড় আর 'ঠেকুয়া' ভাজবার তেল।···

উঠোনে বসে ঢোঁড়াই আকাশপাতাল ভাবে। সময় কাটতে চায় না। বড় একা একা লাগে। রামিয়া। বেনাঘাসের কাঠা, গোবর মাটি দিয়ে ল্যাপা তুলসীতলা, ঝকঝকে করে নিকানো উনুন, বাড়ির প্রতিটি জিনিসে রামিয়া মেশানো।

বাইরে বলদের ডাক কানে আসে। ওঃ তাই তো আজ বলদদুটোকে জল আর জাব দেওয়া হয়নি তো। একদম ভুলে গিয়েছি সে কথা।

ঢোঁড়াই ধড়মড় করে ওঠে।

বলদদুটোকে খেতে দেওয়ার সময় রতিয়া ছড়িদার খবর দিয়ে যায় যে, রাতে মহতোর বাড়িতে রামিয়ার নালিশের পঞ্চায়তি হবে; সে যেন যায়।

'তেরহঁা'র মতো দশজনের ব্যাপার হলে ঢোঁড়াই মহতো নায়েবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে; কিন্তু এ নালিশ যে রামিয়ার আনা। ঢোঁড়াই দোষ করেছে; সে পঞ্চায়তের সম্মুখে সব দোষ স্বীকার করে নেবে। খালি বাড়িতে তার মন এরই মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছে। কাল শেষরাত্রে যখন রামিয়া মরনাধারে 'ছট'-এর পিদিপ[2] ভাসাতে যাবে, তখন সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঢুলী আনবে ঢোঁড়াই মরগামা থেকে, যেমন বাবুভাইয়াদের 'ছট'-এর পিদিপের সঙ্গে যায়। তার জন্য আট আনা দশ আনা যত খরচই হোক না কেন! পচ্ছিমের মেয়ের 'ছট'-এর ঘটা দেখুক তাৎমাটুলির 'ঝোটাহা'-রা। রামিয়াটা পঞ্চায়তের থেকে বাড়ি এসে কখন কোন্ কাজ করবে। সাজিমাটি পড়ে রয়েছে, তাই দিয়ে কাপড় কাচবে, গোবর দিয়ে ঘর আর উঠোন লেপবে, গম পিষবে, কত কাজ ছট-পরবের। রামিয়ার কাজ আগিয়ে রাখবার জন্য সে নিজেই উঠোন নিকোতে বসে গোবরমাটি দিয়ে। রামিয়া বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে যাবে। দাওয়া লেপবার সময় মনে পড়ে যে রাতে এইখানটাতেই রামিয়া বসে ছিল। যেখানটায় সামুয়র বসেছিল সেখানে একটু বেশি করে গোবর দিয়ে দেয়; ঐ শালাই তো যত নষ্টের গোড়া। তার কথা ঢোঁড়াই ভুলতে চায়।

---

১ আটা ও গুড় দিয়ে তৈরি একরকম শুকনো পিঠে: ছটপুজোয় লাগে।

২ ছটপরবের পরদিন ভোর রাত্রে মেয়েরা নদীতে কিংবা পুকুরে ষষ্ঠীঠাকরুন আর সূর্যদেবের নামে পিদিম জ্বেলে ভাসিয়ে দেয়। প্রত্যেক বাড়ির মেয়েরা এই উপলক্ষে নদীর ধারে যাবার সময় সংগতি অনুযায়ী জাঁকজমক করে।

সাঁঝের আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে ঢোঁড়াইয়ের নিজ হাতে নিকানো ঝকঝকে আঙিনা। তুলসীতলায় অনভ্যস্ত হাতে পিদিপ জ্বালিয়ে দেয়। ভরে তেল দেয় তাতে, রামিয়া ফিরবার সময় পর্যন্ত যাতে সেটা জ্বলে। একটু তেল শিশিতে রেখে দেয়; বিনা তেলে রামিয়াটা একদিনও স্নান করতে পারে না।...

তারপর রামজীর নাম নিয়ে ঢোঁড়াই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। মহতোর বাড়ি পৌঁছে দেখে যে মহতো নায়েব সকলে এসে গিয়েছে। সে ভেবেছিল রামিয়াকেও সেখানে দেখবে; কিন্তু রামিয়া নেই সেখানে। বোধ হয় মহতোর বাড়ির ভিতর ফুলঝরিয়ার সঙ্গে গল্প করছে। ঢোঁড়াইয়ের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে সামুয়রকে সেখানে দেখে। ঐ হাড়খৃস্টান বদমাইশটা, মহতো নায়েবদের পাশে চুপটি করে 'বগুলা ভগৎ'[১]-এর মতো বসে আছে কেন? রামিয়া কি সামুয়রকে সাক্ষী মেনেছে না কি? তা হলে তো সামুয়রকে নিয়েই যে কালকে রাতের ঝগড়া সে কথা নিশ্চয়ই সবাই জেনে গিয়েছে। লজ্জায় ঢোঁড়াইয়ের মাথা কাটা যায়।

'বস ঢোঁড়াই।' ছড়িদার জায়গা দেখিয়ে দেয়। 'তাড়াতাড়ি পঞ্চায়তের কাজ শেষ করতে হবে, বুঝলি ঢোঁড়াই। কাল 'ছট'। রামিয়া কোথায়?'

বাইরে থেকে জবাব দেয় রবিয়ার বৌ। 'সারাদিন ছটের উপোস করে শরীরটা খারাপ হয়েছে তার। কাল সাঁঝেও খায়নি তার উপর 'পা-ভারি'[২]। আমরা বললাম তোর আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই, আমরা তো থাকবই। মহতো নায়েবদের তো সব কথা সকালেই বলে এসেছিস। বাড়িতে বসে পরবের আটাগুড় ফলমূল পাহারা দে। সুরুজ মহারাজের জিনিস, ওগুলো তো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি না[৩]।'

আচ্ছা, আচ্ছা। হয়েছে।

তারপর ঢোঁড়াইয়ের বিচার আরম্ভ হয়। 'পা-ভারি'! ঢোঁড়াইয়ের আশ্চর্য লাগে। ঢোঁড়াই স্বীকার করে যে সে মেরেছে রামিয়াকে রাগের মাথায়।

'চব্বিশ ঘণ্টা আমার মেয়েকে গঞ্জনা দেয়। বাড়ির বাইরে যেতে দেয়

১ বক-ধার্মিকের মতো। ২ সন্তানসম্ভবা।

৩ ছট কথাটি ষষ্ঠি শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু পুজো কেবল ষষ্ঠীর করা হয় না, সূর্যদেবেরও সঙ্গে সঙ্গে পুজো হয়। সাধারণ লোকেরা সূর্যদেবের পুজোকেই আসল ছটপুজো মনে করে। এ পুজোর জিনিসপত্র অতি শুদ্ধাচারে রা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শুদ্ধাচারের অবহেলা হলে তাৎমারা জানে যে, সূর্যদেব তাদের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত করে দেবেন।

না। কোনো বেটাছেলের সঙ্গে কথা বললে মারধর করে, 'পা-ভারি'র উপরও। তোমরা পঞ্চ, জাতের মালিক। ওর পড়ে পাওয়া পয়সার গরমাই ঠাণ্ডা করে দাও।'—বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয় রবিয়ার বৌ।

মহতো নায়েবরা সকলেই তার বিরুদ্ধে, এ কথা ঢোঁড়াইয়ের চাইতে কেউ ভাল করে জানে না। প্রত্যেকের তার উপর রাগের আসল কারণ সে জানে। তবু পঞ্চরা তাকে যে সাজা দেবে তা সে মাথা পেতে নিতে তৈরি আছে। এবার থেকে সে চেষ্টা করবে রামিয়ার উপর সন্দেহ না করবার। তাকে সব জায়গায় যেতে দেবে। তার 'ভারি-পা'; এ কথা ঢোঁড়াইয়ের আগে খেয়ালই হয়নি।

বাবুলাল কথার মোড় ঘুরোবার জন্য বলে, 'পা-ভারি, তবু পচ্ছিমে মেয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ সারে না।'

হেঁপো তেতর কাশতে কাশতে বলে, 'ওই শুনতেই পচ্ছিমের মেয়ে; আমাদের ঝোটাহাদেরও অধম।'

বাইরের ঝোটাহাদের চেঁচামেচি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। মহতো বলবে এবার কথা। চুপ! চুপ কর্ সকলে।

'আমরা তোমার ভালই চাই ঢোঁড়াই।' সকলেই মহতোর এই কথায় সায় দেয়—আরে ঢোঁড়াই তো আমাদেরই ছেলে।

ঢোঁড়াই অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকায়। মহতো নায়েবদের কথার এই সুর সে জীবনে শোনেনি; আর তার নিজের ক্ষেত্রে কোনো সহানুভূতিও তাদের কাছ থেকে আশা করেনি। সে কিছুই বুঝতে পারে না। বাবুলালের মুখের দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নেয়। সব হিসাবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ঢোঁড়াইয়ের।

'পচ্ছিমের মেয়ে 'পচানো'[১] আমাদের কম্ম না।'

বাইরে থেকে মহতোগিন্নির গলা শোনা যায়। সেবার লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার ব্যাপারটা তো একেবারে হজমই করে গিয়েছিল নায়েবরা। জোয়ান মেয়ে দেখে ঢোঁড়াই না হয় তখন উন্মত্ত; তোমরা কী করে জাতের বেইজ্জত গুলে গুলে খাচ্ছিলে তখন?

'তোকে কে পঞ্চায়তিতে কথা বলতে বলেছে? ছড়িদার, সরিয়ে দাও সকলকে এখান থেকে।' রবিয়ার বৌ চিৎকার করে—আমাদের মেয়ে নিয়ে মামলা; আর, আমরা শুনব না?

---

১ হজম করা।

আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ থাক্।

হাঁ দেখলি তো ঢোঁড়াই, বিয়ের আগেই আমরা মানা করেছিলাম। হাতির মতো জোয়ান মেয়ে পচ্ছিমের পানির। 'কা ন করই অবলা প্রবল'[১]...মহতোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাবুলাল পাদপূরণ করে দেয়—'কে হি জগ কালু ন খাই'[২]। বাবুলাল সকলকে জানাতে চায়, সেও রামায়ণের সব জানে।

হেঁপো তেতরও রামায়ণের জ্ঞানে কারও থেকে পেছিয়ে নেই। সেও ছড়া কাটে—

'নিজ প্রতিবিম্ব্ বরুকু গহি জাঈ।
জানি ন জাই নারি গতি ভাই॥'[৩]

আরশির উপর নিজের ছায়া যদি-বা ধরে রাখা সম্ভব হয়, তবু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।

ঢোঁড়াই কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। মহতো নায়েবরা কী করতে চায়? কেউ ঢোঁড়াইয়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলছে না কেন? সকলেই দেখছি রামিয়ার খেলাপেই বলছে। পঞ্চায়তের লোকরা এত শান্ত কেন? কেউ তাকে গালাগালি দিচ্ছে না কেন?...'রামিয়া নিজে এসে আমাদের বলে দিয়েছে, যে সে আর কিছুতেই তোমার ঘর করবে না।' পঞ্চায়তের লোকজনের চেহারা ঢোঁড়াইয়ের চোখের সম্মুখ থেকে মুছে যায়। ঢোঁড়াই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে। ভারি মাথাটা নিয়ে আর সে সোজা হয়ে বসতে পারছে না। একটা গমপেষা জাঁতার চাকা ঘুরছে, তারই উপর যেন সে বসে আছে। জাঁতার শব্দের মধ্যে দিয়েও কানে পৌঁছুচ্ছে রবিয়ার বৌয়ের কান্না-মেশানো কথার স্রোত।

'যা জুলুম করে ঢোঁড়াই আমার মেয়ের উপর। এক মিনিট 'দম্' নিতে দেয় না। বাইবে আসতে দেয় না, ফৌজীকুয়োতলাতে পর্যন্ত না; হাসতে দেয় না। আমার মেয়ে কি টিয়াপাখি নাকি যে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখবে? রোজ মেয়ে আমার কাছে কান্নাকাটি করত। অনেক লাথিঝাঁটা সয়েছে ঐ ভিখিরির বেটা বড়মানুষের। বাবুভাইয়াদের মাইজীরা মহাৎমাজীর নিমক বেচে, জিরানিয়ার রাস্তায়; আর ইনি আমার মেয়েকে বাড়িতে বন্ধ

১ মেয়েমানুষ প্রবল হলে কী না করে।—তুলসীদাস।
২ কাল পৃথিবীর কোন্ জিনিসকে না নষ্ট করে। তুলসীদাসের সম্পূর্ণ লাইনটি এইরকম—'কা ন করই অবলা প্রবল কে হি জগ কালু ন খাঈ।
৩ আরশির উপরের নিজের ছায়া যদিই বা ধরে রাখা সম্ভব হয় তবুও মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।—তুলসীদাস।

করে রাখবেন। সাতকাল গেল ভিক্ষে করে, আজ আমাদের বিলাতী লণ্ঠন দেখাতে আসে। চুপ করব কেন? আমার 'পা-ভারি' মেয়ের হাড় গুঁড়ো করছে ও মেরে, আর আমি চুপ করব। তোমরা পঞ্চ, আমাদের দেবতা। ওই 'পাখণ্ডী'টার[1] ঘরে আর আর আমার মেয়েকে ফিরে যেতে বোলো না। বিয়ে নিক ও ফিরিয়ে, বিয়েতে ও মেয়েকে যত টাকা দিয়েছিল।' কান্নার শব্দে রবিয়ার বৌয়ের তারপরের কথাগুলি আর বোঝা যায় না।

টাকার কথায় ঢোঁড়াই চমকে ওঠে। কানের ভিতরের জাঁতার শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে ঘুরুনিটাও। বলে কী! রবিয়ার বৌ দেবে টাকা! জমিদারের ডিক্রি ঝুলছে তার মাথার উপর! বিয়ের সময় মিসিরজী যে চাল গনেছিলেন তা সংখ্যায় বেজোড় ছিল; সে সময় ঢোঁড়াই ঠিকই দেখেছিল। আর কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

বাবুলাল এতক্ষণে কথা বলে। 'বলছ যে সে মেয়ে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু জোয়ান মেয়ে থাকবে কার সঙ্গে। এখন না-হয় ধানকাটনী আসছে; তারপর?'

রবিয়ার বৌ ঘোমটার মধ্যে থেকে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয়, 'সে মেয়ে কিছুতেই ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে না, মরে গেলেও না। এখন তোমরা অন্য কারও সঙ্গে ওর 'সাগাই'[2] ঠিক করে দাও।'

এইবার মহতো কেশে গলা সাফ করে নেয়,—

—'কথা যখন উঠেছে, তখন পরিষ্কার কথাই বলি। তাৎমাটুলির মধ্যে ঐ মেয়ের সাগাই-টাগাই আর আমরা করাচ্ছি না! একবার 'কমজোরী'[3] দেখিয়ে ঠকেছি।'…

ঢোঁড়াইয়ের মাথাটার মধ্যে যেন একখানা পাথর ঢুকে আছে—কোনো কথা ঢুকবার আর জায়গা নেই সেখানে। নিজেকে দুর্বল দুর্বল লাগছে। বিয়ের সময় ফৌজীকুয়োর জল দিয়ে কাজ সারা হয়েছিল, ও কুয়োটার বিয়ে দেওয়া নেই। কেন সে সেই সময় আপত্তি করেনি?

'আর এই পা-ভারি মেয়ে। এর অন্য জায়গায় সাগাই হওয়াও শক্ত। আমাদের জাতের মধ্যে না-হয় এরকম সাগাই চলে। কিন্তু বাইরের লোকের মধ্যে তো তাৎমাটুলির পঞ্চদের কথা খাটবে না…'

ঢোঁড়াই ঘেমে উঠেছে। মাথার মধ্যেটা ঠাণ্ডা—ঝিম্‌ঝিম্ করছে। সাগাই…রামিয়া…কথাগুলোর মানে যেন সে ঠিক বুঝতে পারছে না।…

১ পাষণ্ড। ২ সাঙ্গা; নিকা। ৩ দুর্বলতা।

তার উপর ঢোঁড়াই বিয়েতে টাকাও খরচ করেছে, সেটাও ফিরে না পেলে চলবে কেন। ওরও তো তাহলে আবার 'শাদি' করার দরকার হবে।'

'হাঁ, এটা একটা 'ইনসাফ'এর[1] কথা বলেছ মহতো।'

এই সব কথাবার্তার মধ্যে সামুয়র এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। এক কোণে বসে সে একটা ঘাস দিয়ে দাঁত খুঁটছিল, আর মধ্যে মধ্যে থুতু ফেলছিল। সে ঢোক গিলে বলে, 'তোমাদের যদি মত হয় তো আমি ঢোঁড়াইয়ের টাকা দিয়ে দিতে রাজী আছি।' ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে ওঠে। রামিয়াকে বিয়ে করতে রাজী আছি এ কথা পরিষ্কার না বললেও সামুয়রের কথার অর্থ সুস্পষ্ট।···

দপ করে জ্বলে ওঠে ঢোঁড়াই। 'কী বললি? জিব টেনে ছিঁড়ে নেব। শরীরের সবকটা শিরা ঢিলে করে দেব[2] পিটিয়ে।' ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে। আগুন বেরুচ্ছে তার চোখ দিয়ে।

মহতো একটু ভয় পেয়েছে। 'বোসো ঢোঁড়াই ঠাণ্ডা হয়ে। সামুয়র, তুই রাজী হলেই তো হল না। আবার রামিয়া রাজী আছে কিনা তাও তো জানতে হবে।'···

রবিয়া সামুয়রের হয়ে জবাব দেয়—'আজ সাঁঝেই তো ছড়িদারের সম্মুখে বলেছে রামিয়া যে সে রাজী আছে।'

ঢোঁড়াইয়ের কাঁধ আর হাতের পেশীগুলি শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। এই বুঝি বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পঞ্চদের উপর।···

'টাকা খেয়ে সাজশ করছে, শালা চোট্টার দল!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে ঢোঁড়াই। তার হিংস্র চোখের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে পড়ছে অজস্র বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। 'বজরঙ্গবলী'[3] মহাবীরজীর অসীম শক্তি এসে গিয়েছে তার দেহে আর বাহুতে। অনেক বড় দেখাচ্ছে তাকে। সম্মুখের এই 'হফৎরঙ্গী'[4] পাঁপড়েগুলোকে সে ফুঁ দিয়ে ছত্রাকার করে দিতে পারে মুহূর্তের মধ্যে; টেনে ফেলে দিতে পারে দূরে যেখানে ইচ্ছে; ঝড়ের মুখে বকরহাট্টার মাঠের শিমুলতুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে এক নিশ্বাসে; পড়পড় করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে ঐ কুত্তা সামুয়রটাকে; যেদিকেই সবুজ দেখে সে দিকেই চরতে যায় এই পঞ্চায়তির ছাগলের দল; কিন্তু এইসব উকুন

---

১ ন্যায়বিচার।

২ স্থানীয় ভাষায়—'মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব'—এই ধরনের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩ বজ্রের মতো অঙ্গ ও বলশালী মহাবীরজীকে বলা হয়।

৪ যারা সপ্তাহে সপ্তাহে রং বদলায়; যাদের মতের স্থিরতা নেই।

মারবার তার সময় কোথায় এখন।··· রামিয়া···আগে রামিয়া সেই পচ্ছিমা বাজারের আওরৎ রামিয়া[১] ;—সামুয়রকে বিয়ে করতে চায় রামিয়া।··· এতদিন থেকে তাকে ঠকিয়ে আসছে।···বলেছিল মর্কটের মতো দেখতে সামুয়রকে। পঞ্চায়ৎঘরের সকলে ভয়ে তার জন্য পথ ছেড়ে দেয়। কী করে, কখন সে মহতোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, তা সে নিজেই জানতে পারে না। সারা পৃথিবী তার চোখের সম্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে পচ্ছিমা সাপটাকে সে পুষেছিল সেটা এতদিনে ছোবল মেরেছে। তার কাছে রামিয়া সামুয়রকে নিয়ে ঠাট্টা করে কটাচোখে 'বিলাড়'[২] বলে। কিছু জানতে পারিনি এতদিন !···পৃথিবীতে আগুন লেগে গিয়েছে—কাঁপছে ঘুরপাক খাচ্ছে, ধসে যাচ্ছে পায়ের নিচের মাটি।···যাক, কিন্তু কারও শক্তি নেই সেই সাপটার কাছে যাবার পথে তাকে বাধা দেয়, মহাবীরজাও না, গোঁসাইও না, খোদ রামচন্দ্রজী এলেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাওয়া শান্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রতিটি স্নায়ুর উদ্দণ্ড আলোড়ন দেখে। তার হাত মুঠো হয়ে আসছে ; প্রচণ্ড শক্তিতে পৃথিবীকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে এখনই ; এর প্রতিটি অণুপরমাণু তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে সারাজীবন।···মিষ্টিকে তেতো বিস্বাদ করে দিয়েছে।···

রবিয়ার বাড়ির কুকুরটা কেঁউ করে ডেকে ভয়ে পালায়।

পিদিপ জলছে দাওয়ায়। রামিয়া বাঁশে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। সারাদিন উপোসের পর 'ছট' পুজোর জিনিসগুলো পাহারা দিতে তার ঢুলুনি এসে গিয়েছে।···

ঝুঠঠী ![৩]···বাজারের আওরৎ। পচ্ছিমের কুত্তী ![৪]·· তার মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করার মতো ভাষা নেই ঢোঁড়াইয়ের। দরকার বা কী ?··· লাথি···কিলঘুঁষি···চড়···এই নে !···এই নে। এখানে।···এখানে···এখানে ···মাথায়, মুখে, পিঠে,···সর্বাঙ্গে···ছটপরবের আখটা মট্ করে ভেঙে যায়।

থেঁতলে, কুটে, পিষে, চটকে, ছেঁচে ফেলতে ইচ্ছে করে, হারামজাদীর দেহটাকে—পা দিয়ে নড়ালেও নড়ে না···

রবিয়ার বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছে ঢোঁড়াই অন্ধকারের মধ্যে। যে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে গিয়েছে, সম্পর্ক কী তার দুনিয়ার সঙ্গে। রবিয়ার বাড়ির কুকুরটা ডাকছে পিছনে ; থানের দিকে আলো নড়ছে। তারই বিলাতী লণ্ঠনটা নিয়ে বোধ হয় সকলে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।···রামিয়ার

১ অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক। ২ বিড়াল।
৩ মিথ্যাবাদী। ৪ পশ্চিমের কুকুর।

কপালের খানিকটা কেটে গিয়েছিল···তার 'পাক্কীর' উপর দিয়ে ঢোঁড়াই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। টিম্‌টিম্ করে আলো জ্বলছে দূরে রেবনগুণীর বাড়িতে। সেই—সেই রাতে রেবনগুণী বলেছিল তার পাওনাটা দিয়ে দিতে শীগগিরই; হঠাৎ মনে পড়ল সেকথা। আর কারও ধার ধারে না সে! কোমরে গোঁজা এক আনা পয়সা রেবনগুণীর নাম করে সে অন্ধকারে ফেলে দেয়। 'পাক্কীর' পাথরের উপর কেবল একটু খুট্ করে শব্দ হয়। কাছের ঝিঁঝি পোকাটা পর্যন্ত সে শব্দ শুনে এক মুহূর্তের জন্য তার একঘেয়ে ডাক থামায় না।

ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্! তাৎমাটুলিতে একটানা হাতুড়ি পিটে চলেছে কামার পাখি।[১]

১ এক শ্রেণীর পেঁচা; এদের ডাক দূর থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দের মতো মনে হয়।

ঢোঁড়াই চরিতমানস

দ্বিতীয় চরণ

সাগিয়া কাণ্ড

ঢোঁড়াইয়ের জমি ও জাতের রাজ্যে আগমন

কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাবে, ঢোঁড়াই সে কথা ভেবে আসেনি। দুনিয়ার সব জায়গাই এখন সমান তার কাছে। তবে সে চলেছিল 'পাক্কী' ধরে, বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই। বিকারের ঘোরটা কিছুক্ষণ পরে কেটে এলেও, মনের জ্বর যাবার নয়। তাৎমাটুলি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা, চোখ-আঁধার-করা আঁধির প্রচণ্ডতা কমে এসেছে, কিন্তু আকাশের আঁধার হয়তো কোনো দিনও কাটবে না। দুনিয়ার কাউকে সে আর বিশ্বাস করবে না, সব বেইমান। জ্বরো জিভে সব বিস্বাদ লাগে।···সেই একবার বকরহাট্টার মাঠের সব চেয়ে উঁচু শিমুলগাছটার উপর আঁধির সময় বাজ পড়েছিল। গাছের মাথাটা যেন এক কোপে একেবারে পুঁচিয়ে কেটে নিয়ে গিয়েছিল। কন্ধকাটা গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।···দমকা রাগের আঁধির মধ্যে নিজের অপমানের কথাটা এতক্ষণ ভাল করে ভাববার সময়ই পায়নি। তার রামিয় হয়ে গেল অন্য লোকের! নিজে ইচ্ছা করে! 'ভিতরঘুন্না'[১] হারামজাদী কোথাকার! 'ঢোল, গঁবার, শুদ্র, পশু, নারী'[২] এদের সব সময় মারের উপর রাখতে বলেছে রামায়ণে। প্রথম থেকে যদি এ কথা সে মনে রাখত! কী ভুলই করেছে সে রামায়ণের কথা না মেনে। তার বলদজোড়ার চাইতেও সে অনেক বেশি ভালবাসত রামিয়াকে। বলদজোড়া কেন, বৌকাবাওয়ার চাইতেও। রামিয়ার জন্য সে বৌকাবাওয়াকেও ছেড়েছিল। ভাত খাওয়ার সময় আর একটু ডাল নিতে ইচ্ছে করলেও সে কোনোদিন চায়নি, পাছে রামিয়ার কমে যায় সেই ভেবে। রামিয়া জোর করে দিতে এলেও নেয়নি। এত ভালবাসত সে রামিয়াকে। তার গাড়ির চাকার জন্য রেড়ির তেল, সে একবার না কিনে, সেই পয়সা দিয়ে রামিয়ার জন্য নারকেল তেল এনে

---

১ ভিতরে ঘুণধরা ; যার মনের কুটিলতার কথা বাইর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই।

২ তুলসীদাস থেকে : ঢোল, গ্রাম্য অর্থাৎ দুর্বিনীত লোক, শূদ্র, পশু, নারী।

দিয়েছিল। সব কি এইজন্য? আপন থেকে পর ভাল, পর থেকে জঙ্গল ভাল। কুকুর আপনার হয়, কিন্তু মেয়েমানুষ আপনার হয় না, যতই তাকে কাপড় কাচবার জন্য সাবান কিনে দাও না কেন। দুনিয়াটা আগাগোড়াই যে 'ভিতরঘুন্না'। ভাল কিছু নেই। তাই না ভাল লোকেরা সব চলে যায় অযোধ্যাজীতে। সে হাড়ে হাড়ে চিনেছে মেয়েমানুষ জাতটাকে। দুখিয়ার মা, রামিয়া, যে-কোনো মেয়ের সম্পর্কে সে এসেছে, সব ঐ একরকম। মুখে এক আর মনে এক। তাৎমাজাতের মধ্যে বাওয়াই এক শাদি করেনি। সেইজন্যই সে বেঁচে গিয়েছে, অযোধ্যাজীতে যেতে পেরেছে। অযোধ্যাজীতে এখন বাওয়ার কাছে যেতে পারলে একটু মনে শান্তি পেত। বাওয়া আবার তাকে ছোটবেলার মতো কাছে টেনে নিত। 'সর্বন'[১]-এর পাতার গন্ধের চাইতেও তার ভাল লাগে বাওয়ার জটার গন্ধটা, ঘুঁটের ছাইয়ের চাইতেও ভাল গন্ধ, হাওয়াগাড়ির ধোঁয়ার গন্ধটার চাইতেও ভাল। কতদূর এখান থেকে অযোধ্যাজী; সেই মুঙ্গের জেলার কাছে। একটাও পয়সা নেই সঙ্গে, না হলে টিকিট কাটত সে অযোধ্যাজীর। তাৎমাটুলিতে তার বাড়ি গাড়ি বলদ জিনিসপত্র রয়েছে। কত টাকা পেতে পারে তা বেচে। কিন্তু এ মুখ আর সে তাৎমাটুলিতে দেখাতে পারে না। খাক সাতভূতে তার সম্পত্তি লুটেপুটে। 'পঞ্চরা' যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিক। বলদবেচা পয়সা দিয়ে খেলে আসুক সামুয়রটা জুয়ো নেপালে। তার গাড়ি বিক্রির পয়সা দিয়ে মাখুক রামিয়া জবজবে করে নারকেল তেল, ঐ কটা মর্কটটার বুকে চলে পড়বার আগে। ঢোঁড়াই তার থেকে এক পয়সাও চায় না। কী কুক্ষণেই যে বাওয়া উকিলবাবুর কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল। ঐ টাকাটাই হল ঢোঁড়াইয়ের কাল। ওটা ছিল বাওয়ার হকের টাকা। তাই না সে ঐ টাকা দিয়ে অযোধ্যাজীতে যেতে পারল। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের ঐ টাকার উপর কোন হক ছিল না। সেই জন্যই না ঐ টাকা দিয়ে কেনা একটা আওরৎ তার জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারল। এই রকমই হয় দুনিয়ায়। সব জিনিসের ফলাফল সকলের উপর কখনও কি একই রকম হয়? খাক তো দেখি তাৎমারা মুসলমানদের মতো মুরগীর আণ্ডা! কুষ্ঠ বেরিয়ে যাবে গায়ে। ...আবার সে ঐ পয়সার উপর লোভ করবে। লাথি মারে সে অমন পয়সায়!—বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা জ্বালা করছে। হয়তো কেটে গিয়ে থাকবে পাথরে ঠোকর লেগে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি।...

না না, কাছে পয়সা থাকলেও সে যেত না অযোধ্যাজীতে। বাওয়ার

১ একপ্রকার সুগন্ধ ঘাস; Lemon Grass.

কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে। বাওয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিয়েছিল এ বিয়েতে, তার জিদ দেখে। কেবল বাওয়া কেন, কোনো চেনা লোকের সঙ্গে সে আর জীবনে দেখা করবে না। কী করে সে মুখ দেখাবে। একটা পিঁপড়ের সমান মেয়েকে সে সামলাতে পারেনি এমনি মরদ সে। একটা বিড়ালচোখা বীটপালং-এর কাছে সে হেরে গিয়েছে। যে এ কথা শুনবে সেই মুখ টিপে টিপে হাসবে তাকে দেখে। সে রুগ্ন নয়, 'কমজোর' নয়। গায়ের জোরে পারবে তার সঙ্গে সামুয়র ? মরদের বাচ্চা হলে সে আসত ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে লড়তে। পিষে শেষ করে দিতে পারে সে সামুয়রকে ; আঙুলের মধ্যে টিপে মেরে ফেলে দিতে পারে ছারপোকার মতো। আর উঠতি জোয়ানীর মুখে তারই সঙ্গে গেল হেরে ! কারও কাছে হার মানবার ছেলে সে নয়। কিন্তু রামজীর সঙ্গে লড়াই করা চলে না। তাই সে হার মেনেছে তাৎমাটুলির সমাজের কাছে, পরাজয় স্বীকার করেছে সামুয়রের কাছে। সেইজন্যই না সে পালিয়ে এসেছে তাৎমাটুলি থেকে। যে সমাজের মাথাদের সে একদিনও নিশ্বাস নেওয়ার ফুরসত দেয়নি, সেগুলো সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ডালের মধ্যে মাছি পড়লে যেমন করে তুলে ফেলে দেয়। আঙুলে করে তেমনি করে তারা দূরে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে। সিঁদুর আর গাঁটের টাকা দিয়ে কেনা বৌ কি পাক্কীর ধারের গাছের পাকা আম, যে যার ইচ্ছা পেড়ে নেবে ? তার দোরগোড়া থেকে গরুর গাড়িখানা দিয়ে দিতে পারত 'পঞ্চ'রা সামুয়রকে ? হয়ে যেত তাহলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড তাৎমাটুলিতে। কিন্তু এখানে যে ছিল গোড়ায় গলদ ; আমটাই যে ছিল পচা পোকাড়ে।

...খালি বুড়ো আঙুলটা নয়, পায়ের তলাটাও জ্বলতে আরম্ভ করেছে। দাবিয়ে রাখতে না পারলে রাস্তার পাথরগুলো পর্যন্ত দাঁত দেখায়, তার আবার মেয়েমানুষ !...

তাকত দিয়েছেন রামজী তার শরীরে। একটা চনমনে আওরৎকে সামলাতে পারেনি সে শরীরের তাকত সত্ত্বেও। কিন্তু একটা পেট সে যেখানেই থাকুক হেসে খেলে চালিয়ে নেবে। একেবারে একা সে দুনিয়ায়। তার মন চেয়েছিল বাঁধা পড়তে। কিন্তু তার কপালই আলাদা, ছোটবেলা থেকে সে দেখে আসছে। নইলে তার মা তাকে পর করে দিয়েছিল ! নইলে 'ভারী গা'[১] স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যেতে চায় !...'ভারী গা'...। সেই যেটা

১ সন্তানসম্ভবা।

আসবে, তার উপর পর্যন্ত কোনো অধিকার তার থাকল না। তার মন বলছে যে সেটা নিশ্চয়ই হবে ছেলে। সেটা সুদ্ধ হয়ে যাবে সামুয়রের। 'জল চড়াবে'[২] ঢোঁড়াইয়ের বাপঠাকুরদাকে নয়, কতকগুলো ধাঙড়কে, হয়তো বা গলকট্টা সাহেবের 'পিরেত'কে। এ জন্ম তো গিয়েইছে, পরের জন্মও তার অন্ধকার। বিনা দোষে তাকে নরকে পচে মরতে হবে, আর জল পেয়ে যাবে আজন্ম কিরিস্তান সামুয়রটা।

নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসটুকু কাল রাতে শিকড়সুদ্ধ নাড়া খেয়েছে। তাই আক্রোশে বিষিয়ে উঠেছে তার মন, জাতের উপর, সমাজের উপর, দুনিয়ার উপর। ক্ষমতা থাকলে সে এখনি চুরচুর করে ফেলে দিত এটাকে। রামজী কি জেনে শুনেও লোকের উপর অবিচার করেন! ছি ছি! একি ভাবছে সে, সীত্তারাম! সীত্তারাম!···সারা রাত একবারও বসেনি সে। রোদ্দুরটাও আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। পা আর চলতে চায় না। তাৎমাটুলি থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চায় সে, যত দূরে পারে। রোদ্দুরে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। জলতেষ্টাও পেয়েছে। নিজের মনকে সে বুঝোয়, বোধ হয় অনেক দূর চলে এসেছি তাৎমাটুলি থেকে।

দূরে, পাক্কী থেকে কোশখানেক পচ্ছিমে একখান গাঁ দেখা যাচ্ছে। এক সার ডালছাঁটা শিশুগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশ ফুঁড়ে। বর্শার মতো দেখতে লাগছে। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা চিলেকোটার দেওয়ালের ছাতলাধরা সাদা রঙ। পাকা দালান থাকলেই ইঁদারা থাকবে কাছে। তাই সে ঐ বাড়ি লক্ষ্য করে পাক্কী থেকে নামে; অন্তত খানিকটা জিরিয়েও তো নেওয়া যাবে। ঐ বাড়িটা পর্যন্ত যেতে হয়নি। তার আগেই গাঁয়ে আর একটা কুয়ো দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কুয়োর পাশে একটা কঞ্চির বেড়া। বেড়াটা পলতার লতায় ঢাকা। পাশের বাড়ির সম্মুখটা ঝকঝকে নিকানো। চালার উপরটা লকলকে লাউডগায় ঢেকে গিয়েছে। একসার গাঁদাফুলের গাছ আলো করে রেখেছে উঠোনখানাকে। উঠোনের মধ্যেখানে দোতলার সমান উঁচু একটা মাচাতে বীজের জন্য রাখা ভুট্টার মালা ঝোলানো। ঢোঁড়াই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তার বুকের ধুকধুকুনিটা ঠেলে, গলা বেয়ে উঠে আসতে চায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। ঢোঁক গিলে ঠোঁট চেপে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। তার দুঃখ তার নিজের জিনিস, অন্য কারও কাছে বলবার নয়।

২ তর্পণ করবে।

পাশের তামাক-ক্ষেত থেকে একটা ছুঁচলোমুখো লোক এসে কুয়োতলায় হাতমুখ ধুচ্ছিল। ঢোঁড়াই গিয়ে দাঁড়াল জল খাবার জন্য।

'ঘর কোথায়? পুরুষ? পাক্কী থেকে কত দূরে? কী জাত?'

'তন্ত্রিমাছত্রি।'

'আরে, তাৎমা বল্; তাৎমা বল্।'

জল খাওয়ার পর আরও অনেক কথা হয় লোকটির সঙ্গে।

কোথায় যাবি? রোজগারের জন্য যদি হয়, তাহলে এ গাঁয়েও থেকে যেতে পারিস। আমিই কাজ দিতে পারি। এখনই। এই সমুখের তামাক-ক্ষেতে। গাঁয়ের লোক রাখতে চাই না। কী আর কাজ? তামাক-ক্ষেতের কাজ জানিস না? পুরুবের লোক, জানবি কোথা থেকে। মিয়ার দেশের লোক তোরা; তোরা বুঝিস পিঁয়াজের ক্ষেতি! বুদ্ধি যদি কিছু থাকে তাহলে দুদিনে শিখে যাবি তামাকের ডগা ছিঁড়তে। পিঁয়াজের চাষেও পয়সা আছে বটে।…ঢোঁড়াই চাষবাসের কাজ কোনো দিন করেনি। যদি না পারে, যদি মন না লাগে। আরও দূরে গেলে হত। লোকটার হাবভাবে রতিয়া ছড়িদারের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে। ঢোঁড়াইয়ের ধারণা ছুঁচলো মুখের লোকগুলো হয় অতি বদ।

'কী রে? গরু মরেছে নাকি রে তোদের বাড়িতে? কথা বলিস না কেন? খুব গরজ ভাবলি বুঝি আমাদের?'

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে।

শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই এখানেই থেকে যায়। যখন ইচ্ছা চলে গেলেই হবে। সেটা তো নিজের হাতে। গেঁদাফুলে ভরা বাড়িটার গোয়ালঘরের মাচায় ঢোঁড়াই জায়গা পেয়ে যায়।

লোকটি যাওয়ার সময় ঢোঁড়াইকে শুনিয়ে যায়, এ গাঁয়ের বাবুসাহেবের দেড়শ গরু আছে। তাঁর রাখাল পায় মাসে চার আনা করে, আর বছরে একজোড়া কাপড়, শীতে একটা কুর্তা।…

ঢোঁড়াইয়ের তখন পাওনা নিয়ে দর কষাকষি করবার মতো মনের অবস্থা নয়। কোনো রকমে একটা মাথা গুঁজবার আস্তানা আর দুটি খাওয়ার সংস্থান হলেই তার দিন চলে যাবে। সেইজন্য সে, ঐ লোকটি আরও কী সব বলছিল সে সব কথা ভাল করে শোনেওনি।

বিল্টা আদির সহিত কথোপকথন

গাঁয়ের নাম বিসকান্ধা। কাজেই যে ভাঙা বাড়িটার উপর অশত্থ গাছ উঠেছে সেখানে সাঁঝের পর ঢোলকের বোল উঠলে ঢোঁড়াইও সেখানে পৌঁছোয়। লোভটা অবিশ্যি খয়নি তামাকের! কালকে থেকে খাওয়া হয়নি। হঠাৎ কিছুক্ষণ থেকে এই অভাবটাই সবচেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছিল। তাই ঢোলের আওয়াজের ঢালাও আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি। লোক তখনও বেশি জোটেনি। ঢোঁড়াইয়ের হঠাৎ মনে পড়ে এরা জিজ্ঞাসা করবে এখনই যে তার বাড়ি কোথায়। মহতোগিন্নির বাপের বাড়ি মলহরিয়াতে। এ ছাড়া আর অন্য কোনো গাঁয়ের নাম মনে আসছে না। তাৎমাটুলির কথা সে চেপে যাবে একেবারে। সকলে অপাঙ্গে তার দিকে তাকায়। কে? কোথায় বাড়ি? এদিকে কুটুম্বিতা নেই তো? তবে এদিকে কি রোজগারের জন্য? ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়, দু-একজনের মুখে একটু কাঠিন্যের রেখা পড়ে। তারা তার পৈতার দিকে তাকাচ্ছে।

জাত? তন্ত্রিমাছত্রি? তবু ভাল যে রাজপুত ছত্রি-টত্রি নও।

আমরা কুশবাহাছত্রি[১]।

'এই নাও' বলে লোকটা হুঁকো থেকে কলকেটা ঢোঁড়াইয়ের হাতে দেয়।

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট,—তন্ত্রিমাছত্রি জাতটা কুশবাহাছত্রি জাতের চাইতে অনেক নিচু।

রাত থেকে তার মনটা বিষিয়ে আছে নিজের জাতের উপর। পারলে সে ভুলে যেতে চায় নিজের জাতের কথা। কিন্তু কারও জাত কি গায়ের ময়লা যে, ডলে ফেলে দেবে। তাই জাতের অপমান এখনও তার গায়ে গিয়ে বেঁধে। ইচ্ছে হয় বলে যে, কোয়েরী আবার কুশবাহাছত্রি হল কবে থেকে?

চিরকাল গেল লোকের বাড়ি বাসন মেজে, আর বাবুভাইয়াদের পাতের এঁটো কুড়িয়ে, আজ এসেছেন হুঁকো থেকে ছিলিম নামিয়ে দিতে। না, প্রথম দিন এসেই সে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে পারে না।

'না, না, তামাক আমি খাই না।'

তকলিফের পরোয়া করে না সে।

১ এই জাতের নাম কোয়েরী। আজকাল এই জাতের লোকেরা নিজেদের কুশবাহাছত্রি বলে।

এতক্ষণে সকলে তার দিকে ফিরে বসে। বলে কী লোকটা! পয়সার অভাবে তামাক কিনতে পারে না এমন লোক তারা বহু দেখেছে; কিন্তু মাঙনার তামাক একজন সুস্থ শরীরের লোক খায় না, এমন জীব এর আগে তাদের চোখে পড়েনি।

'খয়নি?'

'না, খয়নিও না।'

এই আত্মনিগ্রহের মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াইয়ের মন অপমানের প্রতিবাদ জানায়।

গিরিদাস বাবাজি পর্যন্ত খয়নি তামাক খান, আর এ লোকটা খায় না!

'বিবি আছে?'

'না।'

এই 'সরাধ'-এর কানুনের[১] যুগেও। মোচ উঠে গিয়েছে তবুও। এরকম পরদেশীর সঙ্গে গল্প না করে তাচ্ছিল্য দেখানো চলে না। সকলে পাল্লা দিয়ে ঢোঁড়াইকে গাঁয়ের কথা শোনাতে আরম্ভ করে। কত খবর!

…যে লোকটির সঙ্গে ইঁদারাতলায় দেখা হয়েছিল, সে কি নাম বলেছিল নিজের? গিরিধারী মণ্ডল? ছুঁচলো মুখ, শিয়ালের মতো? ওকে আমরা বলি গিধর[২] মণ্ডল। ওর ওখানেই কাজ নিয়েছ বুঝি। তবে যে বললে কুয়োর ধারের তামাক ক্ষেতের কথা? সে তো মোসম্মতের[৩]। গিধরটা মিছে কথা বলেছে। আমাদের জাতের মোড়ল হলে কী হবে, ও পরিবারটাই হাড়-বজ্জাতের ঝাড। এক কুড়ি দু'কুড়ি সালের কথা হল—এই যে বুড়হাদাদাকে দেখছ এর তখনও কোমরে নেংটি ওঠেনি। তাই না বুড়হাদাদা? সেই সময় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে একটা ভারি হল্লা হয়, একেবারে তুলকালাম ব্যাপার। বিলসন সাহেবের কাটা মাথা পাওয়া যায় থানার বারান্দায়। সেই সময় সব গাঁয়ে হিঁদু কিসানরা[৪] মন্দিরে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর মুসলমান কিসানরা মসজিদে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তাদের মধ্যে যে নীলকর সাহেবদের দিকে যাবে সে গরু শুয়োর খাবে। তখন গিধর মণ্ডলের ঠাকুর্দা গিয়েছিল নীলকর সাহেবদের দিকে। সেই থেকে গিধর মণ্ডলের পরিবারটার নাম হয় গরুখোর পরিবার।…হ্যাক থুঃ! থুঃ! জয় মহাবীরজী!

---

১ সর্দা আইন। (শব্দার্থ) শ্রাদ্ধের আইন।

২ গিধর শব্দের অর্থ শিয়াল।

৩ বিধবা।

৪ জিরানিয়া জেলায় কিসান শব্দের অর্থ ধনী কৃষক।

তখনও গাঁয়ের 'বাবুসাহেব' বচ্চন সিং যায় রাজপারভাঙার সেপাইগিরি করে বোধ হয়। ঐ গরুখোর পরিবারটাই তখন গাঁয়ের মধ্যে বড়লোক। শিকারে, কি মোকদ্দমার তদন্তে দারোগা হাকিম এলে ঐ গরুখোরদের আঙিনাতেই তাঁর ঘোড়া বাঁধা হত।…

ঐ তামাক ক্ষেতটা তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার সময় গিধরটা বলেছিল নাকি যে ক্ষেতটা তার? ও তাই বলো, তুমি হাবভাবে ভেবে নিয়েছিলে যে, ওটা তারই। গিধর বললেও খুব মিছে বলত না। মোসম্মতের বিধবা মেয়ে আছে সাগিয়া। সেই মেয়ের দেওর ঐ গিধর মণ্ডল। বক যে রকম মাছের উপর তাক করে বসে থাকে, তেমনি করে গরুখোরটা ক'বছর ধরে লেগে আছে মোসম্মতের মেয়েটাকে 'চুমৌনা'[১] করবে বলে। বেশ জমিজিরেত আছে মোসম্মতের, ত্রিশ চল্লিশ বিঘা হবে বৈকি। আরে ওরই উপর তো নজর গিধর মণ্ডলের। সোজা জমি নয়তো। চল্লিশ বিঘা। এদিকে আবার সাড়ে-ছ' হাতের লগার বিঘা। আর জমি কী! মাঘের শেষেও কালো হয়ে থাকে। বসলে পাছার কাপড় ভিজে ওঠে।…না না, ও বুড়িকে কেউ সাগিয়ার মা বলে ডাকে না গাঁয়ে। কেন তা জানি না। সবাই বলে মোসম্মত।

তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলে—এ গাঁয়ের গুণীর সর্দার ছিল কানোয়া মুসহর। সে দেহ রেখেছে অনেকদিন হল। কিন্তু কোনো চেলা রেখে যায়নি। তাই না সাপে কামড়ালে, দাঁতের পোকা ঝাড়তে হলে, কিংবা পায়ে ঘা হয়ে গরু মোষ মরতে আরম্ভ করলে যেতে হয় আজকাল রহুয়ার গুণীর কাছে।

…হাঁ, যে কথাটা বলছিলাম ‥ঐ কানোয়া মুসহরটা এ কালে মোসম্মতের জমি চাষ করত। নামকরা গুণী হওয়ার পরও, পুরনো মনিবের বাড়ি তার আসা যাওয়া ছিল; আর মোসম্মতকে বলত বৌমা। কানোয়া মুসহর, ডাকিনী বিদ্যা কিছু কিছু শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে ঐ বুড়িটাকে…

যে লোকটিকে সকলে বুড়হাদাদা বলে ডাকছিল, সে এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করবার জন্য সোজা হয়ে বসে।

…তুমি আবার গিয়ে এসব গল্প করো না যেন মোসম্মতের কাছে।…ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য! আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। 'বিধিগতি বাম সদা সব কাহু'[২]। ভগবান সব সময় সকলের উপর নারাজ!… দেখা যাক ধানটা পাকলে যদি কিছু হালত বদলায়।…

১ নিকা, সাঙ্গা প্রভৃতির ন্যায় একপ্রকার বিবাহ ব্যবস্থা।

২ ভগবান সবসময় সকলের উপর বিরূপ—তুলসীদাস।

যে ছেলেটি ঢোলক নিয়ে বসেছিল সে ঢোঁড়াইয়েরই বয়সী। দুষ্টুমিতে ভরা মুখ। সে বলে এই আরম্ভ হল বুড়হাদাদার নাকি কান্না। সন্ধ্যাবেলা একটু হাসিতামাশা ভজন কীর্তন হবে, তাও এই বুড়োর জন্য হওয়ার জো নেই।

চুপ কর বলছি বিণ্টা। পরদেশী লোকের সম্মুখে অমন লবড় লবড় কথা বলবি না বলছি।

ঢোঁড়াই অবাক হয়, এখানে পঞ্চায়ত আর বুড়োদের তাকত এত কম দেখে।...বিণ্টা বুড়হাদাদার কথা বন্ধ করবার জন্য দমাদ্দম ঢোলক বাজাতে আরম্ভ করে, তারপর গানের কলি আরম্ভ করে। বাকি সকলে ধুয়ো ধরে।

> জমিদারের সেপাই এসেছে খাজনা নিতে, রে বিদেশিয়া
> সকাল বেলা ধরে নিয়ে গিয়েছে ভাসুরকে, রে বিদেশিয়া,
> বেঁধে রেখেছে তাকে কুঠি খুঁটিতে, রে বিদেশিয়া,
> থালা বাটি নিয়ে যা সেপাই, বাকি খাজনার দাবিতে,
> তা নয়, সেপাই আসে, রাতের বেলায় জ্বালাতে।
>
> রে বিদেশিয়া...

মহাবীরজীকে প্রণাম করে গান শেষ হয়। ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা করে বিণ্টার সঙ্গে আলাপ জমাতে।

বলে, 'আমাদের ওদিকে মহাবীরজীর চাইতে রামচন্দ্রজীর নামই বেশি চলে।'

'তোদের কলিজা বোধ হয় আমাদের চাইতেও ছোট। তাই বোধ হয় মহাবীরজীর মালিক না হলে মানায় না তোদের।'

হেসে গড়িয়ে পড়ে সকলে। বিণ্টার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না। বিণ্টা কিন্তু ঢোঁড়াইকে অপ্রস্তুত হওয়ার অবকাশ দেয় না। জিজ্ঞাসা করে, তুমি গান জানো না? লজ্জা পাচ্ছ কেন? একার গান বলছি না; একলা কি আবার গান হয় নাকি? সে তো যারা মোষ চরায় তারা ভোর রাত্রে শীতের জ্বালায় গায়; রাতদুপুরে পথিক ভয় ভাঙানোর জন্য গায়। সে কি গান নাকি। আমি বলছি এই সবাই মিলে গান গাইবার কথা। গানের সময় তোমাকে চুপ করে দেখলাম কিনা তাই বলছি।

ঢোঁড়াই স্বীকার করে যে, 'বিদেশিয়ার গান' সেও জানে। তবে সে মহাত্মাজীর নিমক তৈরির বিদেশিয়ার গান।

বিণ্টাও সে গান জানে। সকলেই জানে। কিন্তু খবদ্দার না! মহাত্মাজীর বিদেশিয়া এখানে গাওয়া বারণ। গাইলেই দারোগা সাহেব হাল বলদ ক্রোক

করবে। ঐ শালা হাড়ীর বাচ্চা লচুয়া চৌকিদার আছে, সে গিয়ে সব খবর দিয়ে দেয় দারোগা সাহেবের কাছে।

আরও কত কথা হয়। বেশ লাগে তার বিল্টাকে।

রাতে যখন সে বাড়ি ফেরে তখনও সাগিয়া আর সাগিয়ার মা তার জন্য জেগে বসে রয়েছে।

'আমরা মা বেটিতে বলাবলি করছিলাম যে, পরদেশী লোকটা না বলেই পালাল নাকি। মেয়ে আবার বলল যে, না; চেহারা দেখে না বলে পালানোর মতো বলে তো মনে হয় না। নিশ্চয়ই ভজনের ওখানে গিয়েছে!

গোয়ালঘরের মাচার উপর পাতবার জন্য সাগিয়া একখানা কম্বল দিয়ে যায়।

'লোটা থাকল মাচার নিচে।

অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে, ভেবে ভেবেও ডাইনীর কোনো লক্ষণ ঢোঁড়াই মোসম্মতের মধ্যে খুঁজে পায় না। রাতে শুয়ে পাশ থেকে নারকেল তেলের গন্ধ পাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তার, গত এক বছরের মধ্যে। তামাকেরই মতো, না পেলে মন খুঁত খুঁত করে। মনে না পড়ছে যতক্ষণ, ততক্ষণ বেশ। এখন ঘুম এলে হয়।

মোসম্মতের খেদ

গাঁয়ের প্রাণ গাঁয়ের দলাদলি। দিন কয়েকের মধ্যে গাঁয়ের ঝগড়াঝাঁটির নাড়ীনক্ষত্র ঢোঁড়াই জেনে গেল। বড় গ্রাম, অনেক দল, অনেক রকম স্বার্থ। বড়র নিচে মেজ, মেজর নিচে সেজ। এখানকার ব্যাপারটা তাই, তাৎমাটুলি থেকে অনেক বেশি জটিল। সকলেরই নজর মাটির উপর, জমির উপর। মাটির রস মরলে তাকায় উপরের দিকে, তারপর চোখ বুঁজে তাকায় আটপৌরে মহাবীরজীর দিকে।

তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না। জমিদারের গল্প করত কালভদ্রে। কিন্তু এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। এখানকার হাসিকান্না গল্পরস তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে। অর্ধেক কথার সূক্ষ্ম মারপেঁচ ঢোঁড়াই ধরতেই পারে না।

এ পাড়াটার নাম কোয়েরীটোলা; এখানে সব জাতে কোয়েরী। এদের অধিকাংশই রাজপুতদের 'আধিয়ার'। রাজপুতরা থাকে, এই কাছেই রাজপুতটোলায়। জমিজিরেতের মালিক তারাই। কোয়রীদের বাড়ির

মেয়েপুরুষ অনেকে বংশানুক্রমে তাদের বাড়ি ঝি-চাকরের কাজ করে। কোয়েরীদের মধ্যে কেবল দু'চার ঘর লোকের নিজের জমি আছে।

আইনত এ অঞ্চলের জমিদার রাজপারভাঙা। সরসৌনিতে, যেখানে সেকালে উইলসন সাহেবের নীলকুঠি ছিল, সেইখানেই জমিদারের 'সার্কেল' কাছারি। লোকে বলে 'সাকিল'। গাঁয়ে কাউকে তেল মাখতে দেখলে, বুড়োরা শ্লেষ করে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রে আজ সাকিলে যেতে হবে নাকি ?' আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে ঢোঁড়াই এই সব কথাগুলো শোনে। মনে রাখবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক জায়গার নিজস্ব কথাবার্তা রীতরেওয়াজ না জানলে সেখানকার লোকেরা কাউকে আমলই দিতে চায় না।

আইনের চোখে যাই হোক, আসলে কিন্তু গাঁয়ের জমিদার বচ্চন সিং— গাঁয়ের 'বাবুসাহেব'। জোত আর রায়তি জমি মিলিয়ে এঁর জমি হবে প্রায় তিন হাজার বিঘা। কিন্তু ইনি নিজেকে বলেন 'কিসান'! আজকাল নিজেকে 'কিসান' বললে লাভ আছে। বাবুসাহেবের জমি এখনও বাড়ছে। ও যে বাড়তেই হবে। জমি যে মানুষের পরিবারের মতো। ছেলেপিলে হয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলে, না হয় মরে হেজে ছোট হয়ে আসে। একই রকম কখনও থাকে না। এই তো বাবুসাহেবকেই দেখ না। একখানা বাঁশের লাঠি নিয়ে বালিয়া জেলা থেকে এদিকে এসেছিলেন, 'পুরুব'-এ পয়সা শস্তা বলে। 'সাকিলে' অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে 'মজকুরী সেপাই'-এর পদে বাহাল হন। মজকুরী সেপাইরা এক পয়সাও মাইনে পায় না। পায় কেবল পিতলের তকমাআঁটা একটা চাপরাস, একটা পাগড়ি; আর সার্কেলের খরচে তার লাঠির উপর পিতল দিয়ে, নিচেটা লোহা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। কড়া হুকুম আছে লাঠি যেন কিছুতেই এস্টেট থেকে দেওয়া না হয়। বিয়ে করা স্ত্রী আর লাঠি একই রকম জিনিস। যে লোকটা পরের লাঠি দিয়ে কাজ চালাতে চায়, খবদ্দার বিশ্বাস করো না তাকে। আরা, ছাপরা আর বালিয়া জেলার রাজপুত ছাড়া, আর সকলের দরখাস্ত খাস্তা খাতায় ফেলে দিও।

সেই মজকুরী সেপাই কেমন করে আস্তে আস্তে এখানকার বাবুসাহেব হয়ে গেলেন, সেটা এদিককার প্রতি গ্রামের গতানুগতিক ইতিহাস। তার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই।

যে ভাঙা বাড়িটার উপর অশথ গাছ উঠেছে, ঐ যে যার সম্মুখের মাঠে সাঁজের ভজন হয়, সেটা ছিল 'ভক্তাই'দের'[১] মঠ। মঠের জমি-জিরেত বেশ

১ ভক্তাইরা কবীরপন্থীদের একটা শাখা। সাধারণ লোকের ধারণা এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতরে পার্থক্য কেবল তিলকের আকারপ্রকার নিয়ে।

ছিল। এর আগের মোহন্ত একটি মুসলমানের মেয়েকে রেখেছিলেন মঠে এনে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে চলে যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে। আজকাল ভক্তাইদের ছেলেরাও আর নিজেদের ভক্তাই বলে পরিচয় দিতে চায় না। তাই আজ মঠের এই অবস্থা। যার লাঠি তার মোষ। স্বাভাবিক নিয়মেই এই সব জমি চলে যাচ্ছে বাবুসাহেবের পেটে।

এমনি করেই জমি বাড়ে। জলে জল আনে। কোথা থেকে কেমন করে যে জমি বাবুসাহেবের হাতে চলে যায়, তা আগে থেকে লোকে টেরও পায় না। গাঁয়ের ডাইনীবুড়ি পর্যন্ত তাঁর হাত থেকে নিজের জমিটুকু বাঁচাতে পারবে বলে ভরসা পায় না। হাজার হলেও মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষে পারে পেটে ছেলে ধরতে। সে কৃপাটুকুও করেনি রামজী! এমনি আমার বরাত! দেওয়ার মধ্যে দিয়েছিলে তো কেবল ঐ সাগিয়াকে। কাছে রাখব বলে গাঁয়ে ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম। বিয়ের পরে পাঁচ বছরও সিঁদুর থাকল না কপালে মেয়েটার। নিজের ভাতার পুত অনেক কাল আগেই খেয়ে বসেছিলাম। তারপর খেলাম জামাইটাকে, তারপর সাগিয়ার একচিমটি ছেলেটাকে পর্যন্ত। সাত মুল্লুকে আমার সম্পর্কের কোনো মরদ টেঁকে না রে ঢোঁড়াই।

এখানে আসবার তিন-চারদিনের মধ্যেই মোসম্মত ডুকরে কেঁদে এই সব কথা ঢোঁড়াইয়ের কাছে বলেছিল। আরও কী কী যেন সব বলেছিল। কখনও বলে জামাইটা ছিল চিররুগ্ন। মেয়েকে কাছে পাব বলেই জেনেশুনেও তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম। আর ভেবেছিলাম, জামাই আমার জমিটমি-গুলোর দেখাশুনো করতে পারবে। আমার মনের পাপ রামচন্দ্রজী সবই দেখেছিলেন, তাই বোধ হয় আমাকে এমন করে শাস্তি দিলেন। কখনও বলে, সরসৌনির বৈদজীই আমার নাতিটাকে মারল; ঐ যদি তখন জিরানিয়ায় নিয়ে যাই ডাক্তারের কাছে, তাহলে কি আমার কপাল এমনি করে পোড়ে! জিরানিয়ার ডাক্তারের ওষুধের ধক বড় বেশি। অতটুকু ছেলে তা কি সহ্য করতে পারত? তুই-ই বল না। সেবার একটা কোমরের ব্যথার ওষুধ আনিয়েছিলাম জিরানিয়া থেকে। বেনাঘাসের কাঠাটার মধ্যে করে রোদ্দুরে দিয়েছিলাম শিশিটাকে। ছিটকে ছিপি বেরিয়ে গিয়ে লেগেছিল বারান্দার খুঁটিতে। এখনও সে গন্ধটা লেগে আছে কাঠাটাতে।

মোসম্মত ঢোঁড়াইকে নিয়ে গিয়ে কাঠাটা শোঁকায়। কোনো গন্ধ না পেলেও ঢোঁড়াই বলে, বাপরে! বড্ডো ধক্! এ কি বাচ্চারা সহ্য করতে পারে! সাগিয়া পাটের দড়ি পাকাচ্ছিল দূরে বসে। হঠাৎ তার

উপর নজর পড়ে ঢোঁড়াইয়ের। তার মুখের কোণের হাসি দেখে ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে সে তার মিথ্যে কথাটা ধরে ফেলেছে। তবে তার জন্য বিরক্ত হয়নি। তার চোখ বলছে, আহা বুড়ি-মানুষ ওর কি কথার ঠিক আছে। যা বলেছে বলুক। তুই হ্যাঁতে হ্যাঁ মেরে যা[1]।...বাচ্চাটার কথা না বললেই হত। সাগিয়া শুনছে জানলে সে কিছুতেই বলত না।...জিরানিয়ার দাবাখানার[2] ওষুধের শিশিটার সঙ্গেও তার কোথায় যেন আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি করে সে ডাক্তারবাবুর মাল এনে দিয়েছিল একবার।...বেনার কাঠাটাও আর একটা বেনার কাঠার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে ছিল একখানি কাঠের চিরুনি, একখানা ছোট টিনে-মোড়া আয়না, রঙ-বেরঙের ফোঁটা দেওয়া দেওয়া।...সাগিয়া ঢোঁড়াইয়ের চাইতে পাঁচ-সাত বছরের বড় নিশ্চয়ই হবে।...

আবার বিল্টার কাছ থেকে ঢোঁড়াই শোনে ঐ হাড়কঞ্জুস গিধর মণ্ডলটার বৌ ছেলেপিলে সব আছে তবু চুমৌনা করতে চায় সাগিয়াকে, জমির লোভে। মোসম্মতেরও আপত্তি নেই তাতে। গিধরটাই ভাই মারা যাবার পথ থেকে মোসম্মতের জমির দেখা-শুনা করে কি না; কিন্তু সাগিয়া হাড়ে চটা দেওরের উপর। ও হারামজাদাটা আবার পাশের টোলার কানী মুসহরনীর[3] ওখানে যায় রোজ। সাঁঝের পর একদিনও গিধরটাকে টোলার মধ্যে খুঁজে বার করিস তো, তবে বুঝব।

গাঁয়ের চৌকিদার লচুয়া হাড়ী, ঢোঁড়াইয়ের খোঁজ-খবর নিতে এসে গল্প করে যায়, কোয়েরীটোলার মেয়েদের কথা। কার কার নাম যেন করে; ঐ শুনতেই বাবুদের বাড়ির ঝি। আর দিনকয়েক থাক না, সবই জানতে পারবি। এই জন্যই তো এদের আধিয়াদার রাখে রাজপুতরা। না হলে, ঐ সাঁওতাল-টুলিতে গিয়ে দেখে আসিস; তাদের চাষ, আর এদের চাষ!

এই পরিবেশের মধ্যে ঢোঁড়াই এসে পড়েছে।

সাগিয়ার নিকট নূতন শাস্ত্র শিক্ষা

সাগিয়া আর সাগিয়ার মা দুজনেই লোক ভাল। পরকে আপনার করে নিতে জানে। কিন্তু বুড়িটা বড় বাজে বকে। এক মিনিটও জিভের কামাই

---

১ সায় দেওয়া।

২ ডিস্‌পেন্‌সারি।

৩ একচক্ষুহীন মুসহর স্ত্রীলোক। মুসহরেরা এই অঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীব। এরা সাধারণত ক্ষেতমজুরের কাজ করে।

নেই। ঢোঁড়াইকে তামাক ক্ষেতের কাজ শিখিয়ে দেয়। এই, এমনি করে উপরের পাতা আলগোছে হালকা হাতে ছিঁড়বি। জঙ্গল নিড়িয়ে এইখানে জড় করবি। একটি মুথোর ডগা গজালে পাশের পাতা নষ্ট হয়ে যায়, এমনি আদুরে দুলাল গাছ তামাকের। আগে মুথো ছিল না ক্ষেতে। গত বছর যখন কুশীস্নানে গিয়েছিলুম, তখন হাড়ীর বাচ্চাগুলো শুয়োর চরিয়েছিল ক্ষেতে। আর যাবে কোথায়! সেই থেকে মুথোয় ভরে গিয়েছে ক্ষেত[২]। ও বেলা একবার আমাদের আধিয়াদারগুলো কী করছে না করছে দেখে আসিস …তোর ছেলে-পিলে কী?

একটা মিথ্যা কথা ঢাকতে অজস্র মিথ্যা কথা বলতে হয়। তাৎমাটুলির বাইরের জীবনে এত মুশকিলও থাকতে পারে তা ঢোঁড়াই আগে কল্পনাও করতে পারেনি।

এ জীবন ভাল না লাগলেও আস্তে আস্তে সয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের। তামাকের ক্ষেতটা ক্রমেই আপন-আপন মনে হয়। তামাকের নধর পাতাগুলো তার চোখের সামনে পুরু হয়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে, আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলছে তারি হাতে নিড়ানো জমিটুকু, ছুঁতে চাচ্ছে পাশের গাছকে ;…

পৌষ মাসে একদিন শিলাবৃষ্টি হয়ে অর্ধেক পাতা ছিঁড়ে চিরুনির মতো দেখতে হয়েছিল। সেদিন সাগিয়া আর সাগিয়ার মা'র সঙ্গে ঢোঁড়াইও এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল ভিজে ঠাণ্ডা ক্ষেতের মধ্যে। মন বদলাচ্ছে তার, বিসকান্ধার জিনিসের উপর মায়া বসছে। অথচ এই সেদিন তাৎমাটুলিতে শিলাবৃষ্টি হলে, তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে ; ভাঙ্ মট্‌মট্ করে ভাঙ্ খাপড়া বাবুভাইয়াদের বাড়ির। সাগিয়াদের মুখের দিকে ঢোঁড়াই তাকাতে পারেনি সেদিন সংকোচে। সাগিয়াই প্রথম কথা বলে। 'বাড়িতে ব্যবহারের তামাক হবে'খন ঐ ছেঁড়া পাতাগুলো দিয়ে।' সাগিয়াই উলটে ঢোঁড়াইকে সান্ত্বনা দিতে চায়। ঢোঁড়াইয়েরও এটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

তবু কি পুরনো জীবন মুছে ফেলা যায় ন্যাতা দিয়ে। ও লেগে থাকে মনের গায়ে এঁটুলির মতো। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে কখন আপনা থেকে ঝরে পড়বে, টেরও পাবে না।

ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। যার উপর রাগ তাকে পর্যন্ত না। এখানে গরুকে জাবনা দেওয়ার সময় তাৎমাটুলির বলদজোড়ার কথা মনে পড়ে। কেই বা তাদের খেতে দিচ্ছে এখন? হয়তো নাদাতে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ছে না। যে লোকটা আজীবন অখাদ্য মাংস খেয়েছে, সেটা

২ এ জেলার চাষীদের ধারণা যে শুয়োর চরলে ক্ষেতে মুথাঘাস হয়।

আজ হিঁদু হয়েছে বলে কি আর গরুর যত্ন করতে পারবে।...চারিদিকে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে ঢোঁড়াই হালের বলদটার গলা জড়িয়ে ধরে। ..আবার গা ঝাড়ছে! বলদটাও বোধ হয় বোঝে যে, সে তার মালিক না। অধিকারের সম্বন্ধটুকুই বুঝিস। তোকে আর কি দোষ দিই। মানুষে সেটুকু পর্যন্ত মনে রাখে না।

ভারী ঠাণ্ডা স্বভাব সাগিয়ার; বিরক্ত হয় না কিছুতেই। আনাড়ী ঢোঁড়াই কোনো কাজ ঠিক করে করতে না পারলে বলে, 'ও শিখে যাবি দু'দিনেই। ওর মধ্যে কী আছে।' কেবল আশ্বাসের স্বর না। তার সঙ্গে আরও কী যেন মেশানো, যা ঢোঁড়াইকে কুণ্ঠিত হওয়ার অবকাশ পর্যন্ত দেয় না। ঢোঁড়াই যেদিন প্রথম 'ভকত' হয়ে নিজে হাতে তিলক কেটেছিল কপালে, সেদিন বাওয়ার ঠোঁটের কোণে এই রকমই শান্ত হাসির ছাপ দেখেছিল। ঠিক এই রকম। 'পারবি রে ঢোঁড়াই, পারবি। খাসা মানিয়েছে নতুন ভকতকে।' বাওয়ার কাছে যে রকম অপ্রস্তুত হওয়ার কথাই উঠত না, এখানেও সেই রকম।

তামাকের পাতা মজলে, সাগিয়া ঢোঁড়াইকে বুঝিয়ে দেয় কী করে আঙিনার দড়িতে বেঁধে পাতাগুলোকে টেনে বড় আর লম্বা করতে হবে। তবে না ব্যাপারীরা গাঁয়ে তামাক কিনতে এলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। দেখিস ঢোঁড়াই, শাগরেদের নামেই গুরুর নাম! মংটুমলের লোক পরশুই আসবে গাঁয়ে।

মজা পাতায় এত ঝাঁঝ হতে পারে তা ঢোঁড়াইয়ের জানা ছিল না। বিকাল বেলাটায় তার গা বমি-বমি করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাগিয়া বলেছে, আজকে এই বোঝা শেষ করতে। শেষ সে করবেই করবে। 'তাকতে' সে কারও চাইতে কম নয়। সন্ধ্যার সময় মাথাটা ঘুরে ওঠে। শরীরটা একটু আনচান করে। জ্বর আসবে নাকি? তামাকের বোঝাটা সুদ্ধ তার পিছনে লেগেছে, উঠে পড়ে লেগেছে তাকে হারাবার জন্য, অন্যর চোখে তাকে ছোট দেখাবার জন্য।...দড়ির ফাঁসের মধ্যে তামাক পাতার ডাঁটাটা আর সে ঢুকোতে পারছে না। কেমন ফসকে যাচ্ছে।...তারপর বাড়ি ঘর উঠোন, তামাক সব অস্পষ্ট হয়ে আসে তার কাছে।

সে রাত্রে সাগিয়া খুব খেটেছিল তার জন্য। সারা রাত মাথায় বাতাস করেছিল। বলেছিল, তার দোষেই অমন হল; সে আগে সাবধান করে দেয়নি। গা বমি বমি আরম্ভ হলে তখনই তামাকপাতা বড় করবার কাজ ছেড়ে দিতে হয়। তখনই গুড় আর এক লোটা জল খেয়ে শুয়ে পড়তে হয়।

তুমি পুরুষের লোক এসব জানা নেই, তা খেয়ালই হয়নি; মাথায় লাউয়ের বীচির তেল দিয়ে তার রস দুটো সাগিয়া টিপে দিয়েছিল বহুক্ষণ।

…সকলেরই তাহলে এ কাজ করতে গেলে কখনও কখনও এমন হতে পারে।… হবেই যে এমন কোনো কথা নেই।…

এর মধ্যে হেরে যাওয়ার অপমান আছে কি নেই ঢোঁড়াই বুঝবার চেষ্টা করে। ভাববে কী! সব ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে, কানে যে খসখসানি শব্দটা আসছে সেইটার জন্য। মাথা টিপবার সময় এই শব্দটা হচ্ছে। বেশ লাগে সাগিয়ার এই দরদটুকু। এখানে ও তাহলে মরলে কুকুর-শিয়ালে টেনে নিয়ে যাবে না। এখানেও দুটো মিষ্ট কথা বলবার লোক তাহলে আছে।

মেয়েদের উপর রাগটা ঢোঁড়াইয়ের মনের একটা খোলস। তার স্নেহবুভুক্ষু মন নিজেকে ফাঁকি দেবার জন্য ঐ আবরণের আড়ালে যেতে চায়।

তাই কথার ধুকড়ি মোসম্মত রাতে তামাক খেতে উঠে সাগিয়ার কাছ থেকে যখন তার খোঁজ নিয়ে যায়, তখন তার স্নেহকাঙাল মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

ভূস্বামীর যশোকীর্তন

বাবুসাহেবের মনটা আজ খুব খারাপ আছে। আজ তাঁর আর একটা দাঁত পড়েছে। মাত্র তিন-চারটে তো অবশিষ্ট ছিল। তাও পড়ল কিনা পাপড়ভাজা খাওয়ার সময়! তাঁর বয়স হয়ে আসছে। মরবার কথাটা মনে করতে ভয় ভয় করে। কত লোক একশ বছরও তো বাঁচে। হাতের শিরগুলো বেরুলে কী হয়, এখনও যথেষ্ট 'তাকত' আছে তাঁর শরীরে। লোকে ভাবে যে, তাঁর লাঠির জোর কমেছে। সে বুঝেছে হাড়ীর ব্যাটা লচুয়া চৌকিদার সেদিন। 'কিছু মানেই লাগাতে চায় না'[১] গাঁয়ের চৌকিদার হয়েছে বলে। এখান থেকে বসেই তিনি সেদিন দেখেন কী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে হাড়ীর ব্যাটা যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে, রাজপুত্তুর বিজাসিংয়ের মতো। রামজীর কৃপায় বাবুসাহেবের চোখের তেজ এখনও কমেনি। তাই না এই দোতলা থেকেও দেখতে পেয়েছিলেন। বলে কিনা দারোগাসাহেব খুব জলদি যেতে বলেছিল বলে গাঁয়ের মধ্যে ঘোড়ায় চড়েছিলাম। শুধু আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিল বাবুসাহেবের। তিনি

১ তাচ্ছিল্য করে।

আজকাল ভজনপূজন নিয়েই বেশি থাকেন। সংসারের কাজকর্ম দেখেন বড় ছেলে অনোখীবাবু[১]। তবু তিনি থাকতে পারেননি। গুনে পঁচিশ জুতো মেরেছিল অনোখীবাবু লচুয়া চৌকিদারকে। আর এক টাকা জরিমানা। ভেবেছিস কী? 'পচা তেলী, নয়শ আধুলী'। এখনও। বুঝলি? সরকার আমার উপর নারাজ থাকলেও। আমার ছোট ছেলে লাডলীবাবু 'নেংটা'-গুলোর সঙ্গে জেলে গেলেও বুঝলি?

জরিমানার টাকাটা অবিশ্যি তিনি নিজে নেননি। তিনি আর আজকাল ঐ সব টাকা-পয়সার ব্যাপারে থাকেন না। তাঁর নিজের কামানো পয়সা থেকে ছেলেরা চারটি চারটি খেতে দেয়, তাইতেই তিনি খুশী, জরিমানার টাকাটা নিয়েছিল তাঁর বড় নাতি। তাঁর নিজের ছেলে দুটো তো অপগণ্ড। বড় অনোখীবাবু ভাং খেয়ে ঘুমোয়, আর ছোট লাডলীবাবু নেংটাগুলোর সঙ্গে জেলে ছত্রিশ জাতের এঁটো খায়। মহাৎমাজীর কাজ না ছাই! নাতিটার তবু বিষয়বুদ্ধি আছে, এই বয়সেই। গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে জরিমানার পয়সা তুলে, তাই দিয়ে আসাসোটা, মকমলের বিছানা-টিছানা আনিয়েছে। আশ-পাশের গাঁয়ের বিয়ের মাইফেলের সময় ভাড়া দেয়। শরীরটাও ভাল। রাজপুতী ঠাট রাখতে পারবে। ঐ তো নিচে মোষের নাদার কাছে বসে রয়েছে। মোষের বাচ্চাগুলোর শিঙ গজাবার সঙ্গে সঙ্গেই ও রোজ সেগুলোকে নেড়ে নেড়ে দেয়, স্নানের আগে এক ঘণ্টা। তবে না ওগুলো মারকুটে হবে; গোপাষ্টমীর দিন শুয়ারের পেট ফুঁড়বে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে।[২] রাজপুতের ছেলের এই তো চাই! এ নাতিটা তাঁর গুণ পেয়েছে; বাপকাকার মতো নয়। তাই এটাকে তিনি এত ভালবাসেন। একে তিনি নিজের মনের মতো করে তৈরি করে যাবেন। এর মনের মধ্যে গেঁথে দিয়ে যাবেন, দুনিয়াদারির অ আ ক খ। বাড়িয়ে যাও হাত যতদূর পৌঁছায়, ঐ লাঠিসমেত হাত। হাত গুটিয়ে বসে থেকো না কখনও। আলের মাটি কেটে এগিয়ে যাও একটু একটু করে। কচার ডালের খুঁটি নতুন করে সরিয়ে পোঁতো। জমির সীমানার বেড়া ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাও রাস্তার দিকে, নইলে পরে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা পাবে না। আগে নেবে 'পবলিস'-এর[৩] জমি। আস্তে আস্তে

১ জিরানিয়া জেলায় যেসব পরিবার নিজেদের অভিজাত শ্রেণীর বলে মনে করেন, সেই স পরিবারের বয়স্থ লোকেরাও ছেলে এবং নাতিকে পর্যন্ত 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলেন সম্বোধনের সময় প্রত্যেক নামের শেষে বাবু শব্দটি যোগ করে দেন।

২ প্রচলিত উৎসব।

৩ পাবলিক।

এগুবে যাতে কার নজরে না পড়ে প্রথমটায়। তবুও যদি পিঁপড়েগুলো কামড়ায়, তাহলে বুঝিয়ে দিও যে, তুমি রাজপুত। মঠের জমি ; নিকাশের জমি ; কুশীর ধারের জমি ; এক দিনে নয়, আস্তে আস্তে। নদীর ধারে প্রথমে খেসারি কুথি ফেলতে আরম্ভ করো। প্রথম দু'এক বছর গরু চরবে সেই জায়গায়। তারপর আস্তে আস্তে অন্যের গরু সেদিকে যাওয়া বন্ধ করে দাও। লাঠি নিয়ে দাঁড়াও। জমি হচ্ছে কদুর গাছের মতো। লাঠির ঠেকনা পেলে তবে লকলকে হয়ে লতিয়ে ওঠে। বাকি সব পরে আসবে। আপনা থেকে আসবে। রসিদ, আঙুলের ছাপ, ফৌজদারী আদালত, দারোগা হাকিম কোনোটা ফেলনা নয়। যাক এখন ছেলেদের সংসার। তারা জিজ্ঞাসা করলে সলাপরামর্শ না দিয়ে পারেন না, তাই একেবারে সব ছাড়তে পারেননি। কেউ কেঁদেকেটে এসে পড়লে, অবিশ্যি বলেন, ছেলেদের কাছে যেতে, তারাই মালিক।...

একটা মাত্র তাঁর বাসনা আছে, রামজী পূর্ণ করবেন কিনা জানি না। এরকম ইচ্ছাগুলো যখন আসে তখন আর স্থির হতে দেয় না এক দণ্ডও। অন্য সব খুচরো আটপৌরে ইচ্ছাগুলোকে ডুবিয়ে, মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি লেগেই থাকে, মাথা রুক্ষ থাকলে মাথার মধ্যেটা যেমন করে, তেমনি। এর আগে যখনই তাঁর এইরকম একটা কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, তখনই রামজী তাঁর উপর কৃপাদৃষ্টি করেছেন। জজসাহেবের পাশে কুর্শিতে বসবার বাসনা[১] তাঁর রামজী পুরণ করেছিলেন ; রান্নাঘর বাড়ির বাইরে আনবার আকাঙ্ক্ষা[২] রামজী পূরণ করেছিলেন। সে-বিশ্বাস তাঁর নিজের উপর আর রামজীর উপর ছিল। এবারে একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছেন রামজীর দেরি দেখে। 'লোচন সহস ন সুঝ সুমেরু।'[৩] হাজারটা চোখ থাকতেও কি তুমি সুমেরু পর্বতটা পর্যন্ত দেখতে পাও না? ঐ যে এখান থেকে চোখের সম্মুখে সবুজ কালো রেখাটা দেখা যাচ্ছে আকাশের নিচে, ওটা পাক্কীর ধারের বট অশথের সার। কোশখানেক দূরে হবে। এখান থেকে ঐ রাস্তা পর্যন্ত এটুকুনি তিনি এক 'চক'-এ[৪] দেখে যেতে চান। নিজের দোরগোড়া থেকে পাক্কীতে যেতে হলে যেন অন্যের জমির মধ্যে পা না

---

১ দায়রা কোর্টের 'অ্যাসেসর'।

২ গ্রামে এটা আভিজাত্যের একটি লক্ষণ বলে গণ্য হয়। বাহির থেকে রেঁধে পাচকেরা মেয়েদের জন্য ভিতরে খাবার পৌঁছে দেয়।

৩ তুলসীদাস থেকে।

৪ এক টুকরোতে, এক Plot-এ।

দিতে হয়। নিজের জমির মধ্যে দিয়ে তাঁর বলদের খ্যাম্পনিটা[১] চলেছে তে চলেইছে, পথ শেষ হয়ই না, হয়ই না; কারও খোসামোদ করবার, মুখে দিকে তাকাবার দরকার নেই, দু'পাশের ক্ষেত থেকে নিজের 'আধিয়াদার'র হালচালানো থামিয়ে 'বন্দেগী' করছে। একথা ভাবতেও আনন্দ।

রামজী তাঁর ইচ্ছা প্রায় পূরণ করে এনেছেন। এখন মধ্যে পড়ছে কেবল দু'চার টুকরো ছিটেফোঁটা খুচরো জমি। তারই মধ্যে আছে মোসম্মতের জমি। এগুলোকে দেখতে বড় খারাপ লাগে। তেতো হয়ে ওঠে মনটা তাঁর সেই আগেকার যুগ হলে ভাববার কিছুই ছিল না। চারিপাশের বিরাট সমুদ্র ও দু' ফোঁটা গণ্ডুষের জলকে হুস করে টেনে নিত পেটের ভিতর আজকাল দিনকাল হয়ে আসছে অন্যরকম। সত্যি কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে কষ্ট নেই,—লাঠির জোরও কমেছে। তাঁর ছেলেরা বড়লোকের ছেলে তাঁর মতো লাঠিসম্বল গরীবের ছেলে নয়তো। তার উপর নরম পানিতে জন্ম। পারবে কোথা থেকে?···তবে এই বুড়ো বয়সে চোখে ছানি পড়বার আগে এইটুকু আমায় দেখিয়ে দাও রামজী!

তবে অনোখীবাবুকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, এ কথা তিনি জানেন। কাল বলতে এসেছিল যে, লাডলীবাবুর যে তিন শ টাকা জরিমানা হয়েছে তাইতে হাকিম আমাদের গরুর গাড়ি ক্রোক করবার হুকুম দিয়েছে। মুখ্যু কোথাকার! কী করে চালাবি এত বড় সম্পত্তি। এজমালি সম্পত্তি একজনের জরিমানা উশুল করবার জন্য ক্রোক করলেই হল! এই তো ঘটে বুদ্ধি!···

সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অনোখীবাবু বোধ হয় আসছে, আবার আর একটা কিছু জিজ্ঞাসা করতে।···ও! না, 'ঘরবালী'[২]। উঙ্কিতে ভরা হাতটা প্রথমে নজরে পড়ে। আবার কী মতলবে! বয়স হওয়ার পর আজকাল কিছুদিন থেকে বাবুসাহেব ঘরবালীকে একটু শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। বোধ হয়, পুত্রবধূদের সঙ্গে তার তুলনা করে। ঘরবালী চিরকালের অভ্যাসমতে প্রত্যহ স্নানের আগে বাবুসাহেবের পুরনো লাঠিখানাতে তেল দিয়ে রাখে। সে জানে যে, লাঠি তার সতিন; কিন্তু ও সতিনে কোঁদল করে না। লাঠি তো নয়, লক্ষ্মী আটকে রাখবার হুড়কো। ও একা হাতে একদিন সব করেছে; আর আজকাল ওর ছেলের বৌরা নিজের পানটা পর্যন্ত সেজে খায় না। রান্নাবাড়ির কথা ছেড়েই দাও। ওসব পাট তো বাড়ির বাইরেই চলে গিয়েছে আজকাল।

১ লোহার স্প্রিংওয়ালা গরুরগাড়ি।
২ গিন্নী।

…এলাচ লবঙ্গ চাইতে নয় তো? কালই আটটা এলাচ দিয়েছি।…

বাড়ির মেয়েদের হাতে যাতে এক পয়সাও না যায়—সে বিষয়ে এ অঞ্চলের গেরস্তদের সজাগ দৃষ্টি আছে। এলাচ-লবঙ্গটা পর্যন্ত বাড়ির কর্তা বৈঠকখানায় তালাবদ্ধ রাখেন।

বাবুসাহেব ঠিকই ভেবেছেন। গিন্নী এসেছেন আবার এলাচ চাইতে। ইচ্ছে হয়, জিজ্ঞাসা করেন, কালকের অতগুলো এলাচের কী হল।…না ওর নিজেরই এটা খেয়াল হওয়া উচিত। তা যখন হয়নি তখন আর এসব নিয়ে খিচখিচ করতে ভাল লাগে না। একটা প্রশান্ত উদারতার ভাব দেখিয়ে তিনি খড়ম জোড়া পায়ে দেন। বৈঠকখানার গা-আলমারির চাবি খুলে এলাচ বার করে এনে দিতে হবে। বেশি দিলেও একদিন চলে, আবার কম দিলেও ঐ একদিন চলে। চিরকাল তিনি এই দেখে আসছেন। তবে, বেশি দেওয়ার দরকার কী! আর যখনই বলবে, তখনই চাই। একেবারে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে। এক মিনিট দেরি হলে চলবে না।…এর থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আবার সাওজীর দোকানে বিক্রি হচ্ছে না তো? গত বছর খুব বার করেছিল নাতিটা তার ঠাকুমার বালিশ কেটে সতরটা টাকা। কোথা থেকে কী করে যে লুকিয়ে গোলার ধান বেচে দেয় মেয়েরা, বুঝবার জো নেই।…

গিধরের উপদ্রব

এই বুড়ো শকুনের নজর থেকে নিজের জমিটুকু বাঁচানোর জন্যই মোসম্মতের দরকার ছিল একজন বেটাছেলের। সেইজন্যই সে এতদিন ঝুঁকেছিল গিধর মণ্ডলের দিকে। সাগিয়া কিন্তু দেওরের সঙ্গে সাঙা করতে রাজী নয়, রাজী হয়ই বা কী করে। একপাল নেণ্ডিগেণ্ডিওয়ালা সতিনের ঘর কে আর সাধ করে করতে চায়। আর যখন তার বাড়িতে দুমুঠো খাওয়ার সংস্থান আছে।

মেয়েমানুষের স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধিতে মোসম্মত বোঝে যে, ঢোঁড়াই লোকটা খাঁটি। বিশ্বাস করা যায় ওকে। পয়সার খাঁই নেই একেবারে। হাতে করে কিছু দিলে খাবে, না দিলে খাবে না। গিধর মণ্ডলের মতো রামায়ণ পড়তে না জানুক, তাহলেও রামায়ণ বেশ মুখস্থ। আপন করে রাখতে পারলে টিকবে। কথাবার্তায় মনে হয়, 'তীরথ' করবার দিকে ঝোঁক, আবার পালিয়ে-টালিয়ে না যায়। তার নিজেরও ইচ্ছে, একবার অযোধ্যাজী সেরে আসে। আর কত দিনই বা বাঁচবে। আর এই পোড়াকপালী মেয়েটাকেও একবার গয়াজীতে নিয়ে যাওয়া দরকার; মরা জামাইটার একটা

সদ্‌গতি করাতে হবে। তার জন্য এক আধ বিঘা জমি যদি বিক্রিও করতে হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। গতবার এ কথা গিধর মণ্ডলের কাছে তুলতেই সে চটে লাল। বলে কী না, 'মেয়ের দেওয়া পিণ্ডি তুমিই নিও হাত পেতে গয়াজীতে।' জমি বিক্রি করার কথাটা তার মনঃপূত হয়নি। লজ্জায় ঘেন্নায় মাথাকাটা গিয়েছিল মোসম্মতের। মেয়েকে সাঙা করার আগেই এই !...

আর একটু শিখলেই ঢোঁড়াইটা পারবে মোসম্মতের জমি-জিরেত ভাল করে দেখতে। এবার 'আধিয়াদার'দের কাছ থেকে ফসল ভালই পেয়েছে মোসম্মত। পাবে না? এতদিন গিধর মণ্ডলই ছিল মালিক। মোসম্মত জানে যে, গিধরের হাতের তেলোয় আঠা মাখানো। টাকাকড়ি ফসল তার হাত দিয়ে যা-কিছু যায় আসে, কিছুটা অংশ তার হাতেই লেগে থাকে। দু'-দশ বোঝা ধান কোন্ বছর না পৌছত তার বাড়িতে, সাঁঝের আঁধারের পর? বাঙালী ব্যাপারীদের কাছে থেকে পাওয়া, তামাকবেচা টাকাটাও গিধরের হাত দিয়েই আসত।

রাগে গিধর মণ্ডলের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা হয়। বেশি সাবধান হতে গিয়ে সে গাঁয়ের বাইরের লোককে এনে ঢুকিয়েছিল, মোসম্মতের বাড়ির চাকরিতে। দেখতে হাবাগবা বলেই মনে হয়েছিল তখন। ভাবতেই পারেনি যে, ওটার পেটে পেটে এত শয়তানি। দু' দুটো 'আওরত'কে তিন মাসের মধ্যে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিল! কোথাকার না কোথাকার একটা পরদেশী ছোঁড়া! মোসম্মত আর তাকে আগের মতো আমলই দিতে চায় না আজকাল। গিয়ে পড়লে 'এসেছ? বেশ। বসেছ? তাও বেশ' এমনি একটা ভাব দেখায়। এ কী খাল কেটে কুমীর আনল সে। এর একটা কিছু বিহিত করতেই হয়।

সেদিন ভোরে মোসম্মতের বাড়ির সম্মুখে ঢোঁড়াই, মোসম্মত, সাগিয়া, আরও দু' একজন প্রতিবেশী আগুন পোয়াচ্ছে। পাশের বাড়ির নেংটা ছেলেটা আগুনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তবু ঠক ঠক করে কাঁপছে। ছেলেটা আগুনে একটা রাঙা আলু দিয়েছে পোড়াতে। ঢোঁড়াই তাকে ক্ষেপাচ্ছে, 'ওরে তোর দিদিমার মাথায় ধবল হয়েছে'; আর সাগিয়া, সাগিয়ার মা সকলে হেসে উঠছে ছেলেটার রাগ দেখে।

'কি? কার দিদিমার ধবল হয়েছে?' গিধর মণ্ডলের গলা না? এত ভোরে?

মোসম্মত আগুনের ধারের একটি ঘাসের বিঁড়ে চাপড় মেরে পরিষ্কার করে দেয়, গিধরের বসবার জন্য। 'কোথা থেকে?'

'কোথা থেকে আবার। ক্ষেত থেকে। 'নিত্য ক্ষেতী দুসরে গাই'। ক্ষেত দেখতে হয় রোজ, আর গরু একদিন অন্তর একদিন।'

কথাগুলো শুনতে কিছুই না। কিন্তু সবাই বোঝে, রোজ কথাটার উপর জোরটা। গিধর মণ্ডল খোঁচা দিয়ে বলতে চায় যে, তোমাদের ক্ষেতখামারের দেখাশুনো ঠিক হচ্ছে না। অথচ কেউই ধরা পড়তে চায় না গিধরের কাছে। মোসম্মত ভাবে ঢোঁড়াই বোধ হয় বুঝতে পারেনি। সাগিয়াও ঢোঁড়াইয়ের ব্যঞ্জনাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, জানিয়ে দিতে চায়, 'আরে বলতে দে। বললেই তো আর তোর গায়ে ফোসকা পড়ছে না।'

তার কথার খোঁচাটা কেউ গায়ে মাখল না দেখে গিধর একটু ক্ষুব্ধ হয়। ঢোঁড়াই তখন খুব মনোযোগ দিয়ে 'ঘুরের' ছাই সরাচ্ছে একটা কাঠি দিয়ে। ধোঁয়ার জন্য চোখদুটো বুজে এসেছে তার। সেদিকে দেখে বুঝবার উপায় নেই, কী ভাবছে।

হঠাৎ ঢোঁড়াইকে এক তাড়া দিয়ে ওঠে গিধর মণ্ডল। 'ঘুরের আগুনের ছাই নিচে থেকে উপরের দিকে ওঠাচ্ছিস কেন দিনের বেলায়? বেকুব কোথাকার! মোচ উঠেছে, আর এটুকু জানিস না যে, ঘুরের ছাই সাঁঝের পর নিচ থেকে উঁচুতে ঠেলে তুলতে হয়, আর সকালে উপর থেকে নিচে নামাতে হয়।[১]

—তারপর ছোট ন্যাংটা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুই জানিস না এ কথা?'

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে জানায় যে হ্যাঁ সে জানে এ কথা।

'এখানকার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত যে কথা জানে, পুরুবের জানোয়ারগুলো তা জানে না। আমরা এসব বাপ ঠাকুর্দার কোলে বসে শিখেছিলাম।'

ঢোঁড়াই কিছুতেই চটবে না। যতই বলো। সত্যিই তো সে এখানকার আচার-ব্যবহার জানে না কিছুই। সে আগুন সরিয়ে রাঙা আলুটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা দেখে। মোসম্মত কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে বলে, 'শিখে যাবে সব। ছেলেমানুষ। নতুন এসেছে এদেশে।'

দেওরের ব্যবহারে অপ্রস্তুত হয়ে যায় সাগিয়া। ভোরবেলা কোথায় সীতাজী, রামজী, মহাবীরজীর নাম নেবে, তা নয় এ কী আরম্ভ হল বাড়িতে। বয়সে বড় দেওর। কিছু বলাও যায় না মুখের উপর। ঠিক যেসব কথাগুলো

---

১ সন্ধ্যায় সকলের লক্ষ্য থাকে যাতে আগুনটি সারা রাত জ্বলে। আর সকালে সকলে চায় যে রোদ উঠবার পর আগুনটি নিবে যাক। এই জন্যই বোধ হয় গ্রামাঞ্চলে এই নিয়ম প্রচলিত।

ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে বলা উচিত না, অনবরত কি সেই কথাগুলাই ওর মুখে আসবে। এই তো আবার মাকে বলল, 'ঢোঁড়াইয়ের মাইনে দেওয়া হয়েছে তো? চার আনা করে মাইনে আমি ঠিক করে দিয়েছিলাম!' আমি, আমি, আমি। কে বলছে যে তুমি বহাল করোনি ঢোঁড়াইকে। ঢোঁড়াই তো বলছে না যে, সে চাকর নয়। কী দরকার তাকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার।

মোসম্মতেরও মাইনের কথাটাতে লজ্জা লজ্জা করে। সব ফসল, টাকা-পয়সা ঢোঁড়াইয়ের হাত দিয়েই আসে। ওর হাতে কি চার আনা পয়সা মাইনে বলে তুলে দেওয়া যায়। এ কথা সে গিধরকেও জানাতে চায় না। বলে, 'সে হবেখন।'

'এবার শুনলাম—তোমাদের ঢোঁড়াই ফসল ভাগ করেছেন আধিয়াদারের বাড়িতে।[১] একেও পরদেশী ছেলেমানুষের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দাও। গাঁ-সুদ্ধ সব গেরস্তর বিরুদ্ধে যাওয়া! ছেলেমানুষ তো ওর মুখে তেল মাখিয়ে দিয়ে তার উপর বসে বসে হাত নাড়ো। যাতে একটাও মাছি না বসতে পারে।'

'এবার আধিয়াদারের বাড়িতে ভাগ করে ফসল তো অন্যবারের চাইতে কম পাইনি আমি।'

গিধর মণ্ডলের মনে হয় তার সততাকে লক্ষ্য করেই মোসম্মত কথাটা বলল। সে চটে ওঠে।

'তোমার একার কথা ভাবলেই তো দুনিয়া চলবে না। গাঁয়ের অন্য সকলের কথাও ভাবতে হবে।'

কথার ঝাঁঝে মোসম্মত একটু মিইয়ে পড়ে। বলে, 'তা তো হবেই।'

আর ঢোঁড়াই থাকতে পারে না। অনেকক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে সে লড়েছে।

'গাঁয়ের লোকের ক্ষতিটা কোথায় হয়েছে শুনি। তোমার সেপাই ওজন করলে 'কিয়ালি'[২] কেটে নিতে, আধিয়াদার ওজন করেছে কিয়ালি না নিয়ে। তোমার বাড়ির গুরু পুরুতের অংশ ভাগ হওয়ার আগে কেটে রাখতে, সেইটা পাবে না। নিজের অংশ থেকে খাওয়াক না রাজপুতরা তাদের পুরুতকে চার আঙুল সরের দই। চারপাট করা কম্বলের আসনে বসাক না তাদের বামুন ঠাকুরকে। আধিয়াদাররা নিজের অংশ থেকে তা দেবে কেন? সে বামুন কি আধিয়াদারদের বাড়ি পুজো করে?'

---

১ যে স্থানে ফসল কেটে জড় করা হয়, তাকে বলে 'খলিহান'। ভাগ-চাষীদের ফসল ভূস্বামীর খলিহানে জড় করাই প্রথা। কিন্তু এতে জমিদার যথেচ্ছ ফসল ভাগ করার সুবিধা পেয়ে যায়।

২ ওজন করবার পারিশ্রমিক বা'দ একটি ফসলের অংশ।

মোসম্মত ঢোঁড়াইকে চুপ করতে বলে। একরকম ধমক দিয়েই ওঠে। 'কথা হচ্ছে আমার সঙ্গে গিধরের, তার মধ্যে তুই কথা বলতে আসিস কেন, ঢোঁড়াই ?'

গিধর ঢোঁড়াইয়ের কথার উপযুক্ত জবাব খুঁজে পায় না। হাতের একটা মুদ্রা দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বলে, 'তুমি নিজের বটুয়া ভ'রো না যেন, ম্যানেজারসাহেব।'

'কী! কী বললি ?' ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে।

সাগিয়া আর মোসম্মত তাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দুয়ারে গিধরের অপমান হলে লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। না না তুই থাম ঢোঁড়াই।

'আমি কি ওর ক্ষেতের মুসহরনী[১] যে ও আমাকে গালাগালি করবে, আমি হেসে আদর করব ? আমি কি ওর টাকা কর্জ খেয়েছি ? ওই গরুখোরটার ?'

গিধর মণ্ডল আর কথা বাড়ায় না। এরকমটা সে ঠিক আশা করেনি। ঢোঁড়াইটা যে মুসহরনীর কথা বলল, সেটা কানী মুসহরনীকে লক্ষ্য করে না তো ? এখনই হয়তো সাগিয়া আর মোসম্মতের সম্মুখে সেই কথা নিয়ে আরও চিৎকার আরম্ভ করে দেবে। সাগিয়ার আশা অর্থাৎ সাগিয়ার মা'র জমির আশা সে এখনও ছাড়েনি।

'যাই, রোদ উঠে গেল' বলে সে গুটি-গুটি বেরিয়ে যায়। দূর থেকে বলে যায়, 'ছাখ, ছোট মুখে বড় কথা ভাল নয়।'

ঢোঁড়াই এ কথার জবাব দেয় না। গিধর চলে গেলে সে মোসম্মত সাগিয়া কারও সঙ্গে কথা বলে না।...মোসম্মত কিনা বলে, আমাদের কথার মধ্যে কথা বলিস না। যাদের জন্য করি এত, তারাই এই বলে! এই নিমকহারাম, স্বার্থপর মেয়েমানুষের বাড়ি তার দানাপানি নেই। রামজীর সৃষ্টি সারা দুনিয়া তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। হাতদুটো আছে, দুমুঠো খাওয়া জুটেই যাবে। কোনো জিনিস সে এখানে আসবার সময় আনেওনি, এখান থেকে যাওয়ার সময় নিয়েও যেতে চায় না। মেয়েমানুষ দুজনের কারও দিকে না তাকিয়ে সে বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

সাগিয়া তাকে লক্ষ্য করছে মায়ের সেই কথাটার পর থেকে।

'মা বুড়ি মানুষ। তার কথার কি কিছু ঠিক আছে। তার কথায় রাগ কোরো না ঢোঁড়াই।

[১] মুসহর জাতের স্ত্রীলোক। এরা ক্ষেতমজুরের কাজ করে।

যা ভাবা যায় সব কি করা যায়! আর সাগিয়ার চোখের জল দেখবার পরও।

মোসম্মত পর্যন্ত 'বেটা' বলে তার কাছে এসে দাঁড়ায়।

'বড় বোকা তুই। এই পরদেশী 'বেটা'কে নিয়ে আচ্ছা মুশকিলে পড়লাম দেখি। বোস। দাঁতন কর। আমি ততক্ষণ ভুট্টার খই ভেজে আনি।'

সাগিয়া মনে করিয়ে দেয় মাকে, 'দেখো, খই আবার বেশি ফুটে না যায়।'

সে আর বলতে হবে না বুড়িকে।

আসলে ঢোঁড়াইয়ের রাগের থেকে অভিমানটা হয়েছিল বেশি। রাগ তো সব লোকের উপরই হতে পারে। এখানে ঢোঁড়াইয়ের অভিমান করবার দাবি জন্মেছে এরই মধ্যে। নইলে ঢোঁড়াইয়ের রাগ কি অত তাড়াতাড়ি থামে; না অত নিঃশব্দে আসে যায়।

জমি-জাতির রাজ্যে শনির দৃষ্টি

খালি বিসকান্ধায় কেন, সারা জিরানিয়া জেলা জুড়েই আকাল এসেছে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে আসছিল ক'বছর ধরেই। পয়সার আকাল। বড় 'কিষানদের' বাড়ি ধান আছে। এতদিন ঘুমিয়ে ছিল না কেউ; কিন্তু কী করতে হবে কারও জানা ছিল না। বচ্চন সিংয়ের পর্যন্ত না। সবাই নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। পুরনো ধানে বাবুসাহেবের আটটা পাঁচশমনী গোলা ভরা। না চাইলেও যে ধানটা আসবে, সেইটা রাখবার জায়গা করাই শক্ত। গতবার পাট পচেছিল মাচার উপর। জলের দরে বিক্রি করতে হয়েছিল মংটুরামের আড়তে। তাই আবার কত খোসামোদ। বলে যে তার গুদামে জায়গা নেই। পাট তো তাও বিক্রি হয়েছিল, ধান মকাই বিক্রিই করতে পারেননি অনোখীবাবু। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মকাইতে পোকা ধরে। তাই গাঁয়ের মধ্যে 'খয়রাত' করতে হয়েছিল। না চাইতে ফসল দেওয়ার নামই খয়রাত। একটা লম্বা খাতায় টিপসই দিয়ে নিতে হয়। শীতের শেষে এর দেড়গুণ ওজনের রবির ফসলে শোধ দিতে হবে। এবারে শস্তা রেটে খয়রাত ছেড়েছিলেন; অন্য অন্য বার লাগত দ্বিগুণ। তবে তিনি দেওয়ার সময় 'সাফ সাফ' বলে রেখেছেন; বাজে কথা নেই তাঁর কাছে; অন্য কিষানদের মতো তিনি লুকিয়ে কিছু করতে চান না, বাটের ওজনে নিতে হবে, ফেরত দিতে হবে আশির ওজনে, যা এখানে চলে। এ রেট খাওয়ার জন্য মকাই নিলে। বীজের জন্য নিলে তার রেট আর বেশি।

এই পোকাড়ে ভুট্টার দানাগুলো বীজের জন্য কেউ নেয়ওনি। এ দিয়ে কেবল খাওয়া চলে।

পয়সার আকালটা এবার কী করে ধানের আকালে বদলে গেল তা কেউ বুঝতে পারেনি। রবির ফসলের পর লাঠির জোরেও এবার বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না, তা সব 'কিষানই' জানত। তাই এবার বহু জমি অনাবাদী রেখেছিলেন বাবুসাহেব। বিক্রি না করতে পারলে ফসলে লাভ কী। গোলায় আর কত আঁটবে! ফসল যদিই বা বিক্রি হয় তো যা দাম পাওয়া যায় তাতে খরচে পোষায় না।

এই আকালেব গল্পই হয় আজকাল প্রত্যহ, মঠের সম্মুখের ভজনের আসরে। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু ধান রুইবার মতো জল হল কই। ইন্দ্রাসনে আগুন লেগেছে এবার। আমটা ভাল ফললেও না হয় তলা কুড়িয়ে[১] কিছু দিন চলত। মেয়েরা যে পূর্ণিমার রাতে জাট-জাট্টিনের গান গাইল[২] ক্ষেতের মধ্যে, তবু বৃষ্টি হল কই? খায় কী লোকে? জাম ফুরিয়েছে; বুনো পেয়ারার 'যাগ' চলছে; ময়নার ফল আর তাল পাকতে এখনও অনেক দেরি। যখন টোলার উপর কুদৃষ্টি পড়ে তখন এমনি করেই পড়ে। শীত যেমন গায়ে বেঁধে ছেঁড়া কাঁথার মধ্য দিয়ে। এদিক দিয়ে সামলাতে যাও ওদিক দিয়ে ঢুকবে। পিঁপড়ের সার মুখে করে ডিম নিয়ে গেলেও জল হয় না আজকাল!

বৃষ্টি না হলে মন শক্ শক্ করে; আবার জল হলে যে কী হবে সে কথা ভাবতেও মন খারাপ হয়ে যায়। বীজের ধানটা পর্যন্ত কারও কাছে ছিল না যে চারা করে। হলেও বিপদ, না হলেও বিপদ। এদিকে বাপে কুত্তা খায়, ওদিকে মায়ের পরান যায়। গল্পটা জানিস তো? বাপ মাংস রাঁধতে বলে গিয়েছে। মা রেঁধে রেখেছে একটা কুকুরের বাচ্চা মেরে। এখন ছেলে যদি বাপকে বলে দেয় একথা তাহলে মায়ের পরান যায়, আর না বললে বাপকে কুত্তার মাংস খেতে হয়। এ হয়েছে তাই বুড়হাদাদা!

বুড়হাদাদা অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করে দেখতে চেষ্টা করে, বিণ্টাটা আবার ঠাট্টা করছে না তো। যা ফাজিল ছোঁড়াটা! মনে তো হচ্ছে না যে ফাজলামি করছে এখন।

---

১ স্থানীয় প্রথানুযায়ী গাছ থেকে পড়া আম যে পায় তার; গাছের মালিকের নয়।

২ বৃষ্টি না হলে গ্রামের মেয়েরা মিলে কোনো মাঠে রাত্রে জাটজাট্টিনের পালা অভিনয় করে। পুরুষদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের কোনো সম্বন্ধ নেই। গ্রামের পুরুষরা ভাব দেখায় যে তারা এই অভিনয়ের সম্বন্ধে যেন কিছু জানেই না।

'বুঝলি বিল্‌টু ! বাবুসাহেবের এ পাপের পয়সা থাকবে না। এই আমি বলে রাখলাম দেখে নিস। না হলে আমার নামে কুকুর পুষিস। যত এর আগের জন্মের রোজগার করা পুণ্যি থাকুক না কেন !'

মনের গহীনের একই দুঃখে, টোলার সব লোকের মন সাড়া দিয়েছে। তাই বিন্টাকে বিল্‌টু বলে ডাকছে বুড়হাদাদা।

রামচন্দ্রজীর রাজ্যের নিয়মকানুন সব বদলে গেল নাকি ?

'অউর করই অপরাধ

কোউ আউর পাব ফল ভোগূ'।[১]

একজন দোষ করে, আর একজন তার ফল পায় ! আশ্চর্য !

সেই রাতেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। কলিযুগে লোকের মনে পাপ ঢুকেছে। তাই 'জাট-জাট্টিন'-এর গানের ফল ধরতে একটু দেরি হয়। বৃষ্টির সময় গাঁ-সুদ্ধ সকলে জেগে উঠেছিল। সব বাড়িতেই মেয়েপুরুষ সকলে বলাবলি করে যে, এ জল এখুনি থেমে যাবে। এ এক আঁজলা জলে আর কী হবে ! কেবল কুশের শিকড়গুলো গুণস্থচের মতো ডগা ছাড়বে, হাল চালানের সময় পায়ে বিঁধবার জন্য। তবে ধুলোটা মরবে।

আকাশ ভেঙে জল পড়ছে। সকলে দেখছে যে, ছাঁচতলার নিচে দিয়ে জলের স্রোত বইছে। তবু কেউ নিজের কাছে, নিজের বাড়ির লোকের কাছে, সত্যি কথাটা বলবে না।

বৃষ্টি থামবার পর সবে গাঁখানা একটু ঝিমিয়ে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ হট্টগোল শোনা যায়। দূরে, পশ্চিমের দিক থেকে।

নিশ্চয়ই চোরটোর কিছু হবে ! নিজের ঘরে চুরি হবার মতো কোনো জিনিস না থাকলেও সকলেই ছোটে, লাঠি, বাঁশ, সজনের ডাল যার হাতের কাছে যা জোটে তাই নিয়ে। বিসকান্ধায় ভাঙা মঠের কল্যাণে ইটপাটকেলের অভাব নেই এ কথা গনোরীর মনে পড়ে, পায়ে ইটের ঠোকর খেয়ে। কোঁচড় ভরে ইট নেয় সে। আওয়াজটা ততক্ষণে বাবুসাহেবের বাড়ির দিকে পৌঁছে গিয়েছে।

রাতে বাবুসাহেবের বাড়ির চারিদিকে গান গেয়ে গেয়ে না হয় বাঁশি বাজাতে বাজাতে পাহারা দেয়, একজন বজ্রবাঁটুল সাঁওতাল। তার হাতে থাকে তীরধনুক আর বল্লম। কাছেই সাঁওতালটুলিতে তার বাড়ি। সারাদিন সেখানে ঘুমোয়, আর রাতে বাবুসাহেবের দেওয়া খেনো খেয়ে ডিউটি দেয়।

১ তুলসীদাস থেকে।

সেই লোকটা বাবুসাহেবের পশ্চিমের ক্ষেতের দিকে, একটা ছপ্ ছপ্ শব্দ পেয়ে ভেবেছিল বুনোশুয়ার কি নীলগাইটাই হবে। আলের পাশ দিয়ে দিয়ে সে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে গিয়েছিল। তার পর ভাল করে চোখ মুছে নেয়। নিজের হাতের আঙুল তো ঠিকই গুনতে পারছে! ভাগ্যে সে তীর ছোঁড়েনি। তারপর সে চিৎকার করে লোক জাগিয়েছিল।

কোয়েরীটোলার দল বাবুসাহেবের বাড়ি পৌঁছে দেখে তাজ্জব ব্যাপার! বাবুসাহেবের ছেলে অনোখীবাবু খড়ম দিয়ে পিটছে বুড়হাদাদাকে। পাশে রাখা রয়েছে এক বোঝা ধানের চারা। বুড়হাদাদা কাঁদছে আর মাথা কুটছে অনোখীবাবুর পায়ে। 'আর কখনও এ কাজ করব না ছোটামালিক।'

সাঁওতালটা বলে, 'বাঁশি থামলেই উপর থেকে বাবুসাহেব যে চিৎকার করে, আমি ঢুলছি বলে। দেখো, আমি জেগে থাকি কিনা।'

তারপর সাঁওতালটা এগিয়ে আসে কোয়েরীটোলার লোকদের কাছে, সারা ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। বুঝোবার দরকার ছিল না।

সাঁওতালটা হেসেই কুটিকুটি। ছোট মালিককে নিচে থেকে ডেকেছে, ঘুম ভাঙানোর জন্য। ঘুম কি ভাঙে! ভাং-এর ঘুম! বৃষ্টির পর! ঘুম ভাঙলে পর আমার উপর রেগে টং। আমি যেন কালো গাইটার বাছুর হচ্ছে বলে ডাকছি।

টোলার লোকদের উপর নজর পড়ায়, হঠাৎ বুড়হাদাদার কান্না থেমে যায়। লজ্জায় সে এদিকে তাকাতে পারে না।

অনোখীবাবুর নজর পড়ে এই দিকে। 'ভাগো ভাগো সালা সব। চোট্টার দল। চোরকে সাহায্য করতে এসেছে। মাঝি![1] এ লোকটাকে ধরে রেখে দাও আজ। সকালে ওটাকে হাজতে পাঠাব।'

বুড়হাদাদা আবার হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

মধুবনের শান্তিভঙ্গ

বাবুসাহেবের বাড়ি থেকে, কোয়েরীটোলার সকলে এসে বসে বিল্টার বাড়ির সম্মুখের মাচায়। কাজটা বুড়হাদাদা করেছে অন্যায়! চুরি করা কি ভাল মানুষের কাজ? ছি ছি! একি দুর্মতি হয়েছিল বুড়োর। তিনদিন পরে মরবি, এখনও কি 'পরমাৎমা'কে ভয় করে না? অভাব তোর বুঝলাম।

১ এখানে সাঁওতালদের মাঝি বলে সকলে ডাকে।

সে তো সবারই আছে। কিন্তু বেশি খিদে পেলে কি লোকে দু হাত দিয়ে ভাত খায় নাকি? অসম্ভব কাণ্ড!

কিন্তু বুড়হাদাদার এই বিপদের সময় নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোন তো যায় না। একটা কিছু করতে হয়। তবু তো এখনও বাবুসাহেব ওঠেননি। রাত থাকতেই ওঠেন বাবুসাহেব। খবর তো রাখিস ছাই! কেবল বাজে ফট্‌ফট্ করিস তুই গনৌরী। এতক্ষণে বাবুসাহেব উঠে 'ধ্যানে বসেছে।'

লছমনিয়ার নানী বাবুসাহেবের বাড়িতে কাজ করে। সে বলে যে 'ধিয়ান' করবার সময় বাবুসাহেবের ঘরে একেবারে হাওয়াগাড়ির মতো শব্দ হয়। তারপর গলার মধ্যে দিয়ে তিনি দড়ি ঢুকোন পেটে। বাবুসাহেবের 'ঘরবালী' বলেছেন যে, এ করলে জোয়ানী ফিরে আসে; বুড়োরও আবার দাঁত গজায়। তারপর তিনি রাখালদের ডেকে দেন, মোষ চরাতে নিয়ে যাবার জন্য।

অনোখীবাবুই তো খড়মের সঙ্গে বুড়হাদাদার মাথার চুল তুলে নিয়েছে। দেখো আবার বাবুসাহেব কী করে। গুড়ের মাছি না চুষে ফেলে না ও চামারটা। লচুয়া চৌকিদারকে ছেড়ে কথা বলে না, ও আবার ছাড়বে বুড়হাদাদাকে! এ কথাটা থানায় গিয়ে বলবার পর্যন্ত হিম্মত হয়নি হাড়ীর বেটার, আর ঘোড়ায় চড়বার শখ আছে!

বড় নিরীহ লোকটা বুড়হাদাদা!

হ্যাঁ, তা লচুয়া হাড়ীর কথাই যদি তুললি তবে বলি। তার কাছ থেকেই শুনেছি যে, থানায় আজকাল বাবুসাহেবের 'টিয়াপাখি কথা বলে না।'[১] সে-ই বলেছে যে, দারোগাসাহেব আর বাবুসাহেবের দিকে হতেই পারে না। 'মোটারকম' পান খাওয়ালেও না। বাবুসাহেব কাছারীতে মোকদ্দমা লড়ে দারোগাসাহেবের হাত থেকে গরুরগাড়ি ছাড়িয়ে এনেছে।

তাই দারোগাসাহেব বেইজ্জত হয়েছে উপরওয়ালাদের কাছে।

দেখিসনি সেদিন বিল্টা, সেই যে হাকিমের হাওয়াগাড়ি খারাপ হয়েছিল পাক্কীর উপর, গাঁয়ে লোক ডাকতে এল, গিধর মণ্ডলের দাওয়ার উপর খাটিয়াতে বসল; কিন্তু বাবুসাহেবের বাড়ির চৌহদ্দি মাড়াল না। ঠিকই বলে লচুয়া চৌকিদার। কলস্টর হাকিমরা এখন সবাই বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে ওর ছেলে লাডলীবাবু মহাৎমাজীতে নাম লিখিয়েছে বলে।

দারেগোসাহেব হাতের লোক না হলে কি কেউ সাধ করে থানার হাতায় ঢোকে। এ দারোগা যতদিন বদলি না হচ্ছে ততদিন বাবুসাহেবরা থানার পথ মাড়াবে না; এই আমি মাটিতে লোহার দাগ কেটে বলে রাখলাম।

১ দিন গিয়েছে।

সকলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। যাক, বুড়হাদাদাকে তাহলে সরকারের পিচুড়ি খেতে হবে না। দু-চার ঘা মারের উপর দিয়েই যাবে।

এতক্ষণ সবাই অস্পষ্টভাবে বোঝে যে, যদিও তারা এখানে বসেছিল বড়হাদাদার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে, মনের তলায় গোপনে আনাগোনা করছিল অন্য জিনিস। মুখে বলেছে বটে যে, রামচন্দ্রজী বুড়হাদাদাকে ধরা পড়িয়ে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, বলছেন, ভেবো না যে আমি ঘুমচ্ছি। অভ্যাসের বশে বলেছে এ কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে যে, কথাটার মধ্যে কোথাও একটি অসংগতি আছে। 'মনের মাখন গলানো' কথা, আর ময়নার কথার তফাত শুনলেই বোঝা যায়। সেই জন্যই না এক-একজনের পণ্ডিতজীর রামায়ণ পাঠ শুনলেই চোখে জল আসে, আর এক-একজনের শুনলে আসে ঢুলুনি।

ভিজে মাটির গন্ধে কারও মনকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। কেউ কথাটা তুললে আর সকলে বাঁচে। সকলেরই মনে পড়ছে নিজের নিজের অক্ষমতার কথা, দুরদৃষ্টের কথা। ইচ্ছা করে নিজের জমিটা একবার দেখে আসি এই রাত্রেই। কিন্তু তারপর? বুড়হাদাদার ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু মনের ভিতরের প্রশ্নের কি কোনো জবাবই নেই? অমন মিষ্টি গন্ধভরা ভিজে ক্ষেত কি অমনিই থেকে যাবে রামচন্দ্রজী? নিজেদের কাছেও যে কথা বলা না যায়, সে কথা বলা যায় তাঁর কাছে।

ভোরের আলোয় দেখা যায় যে এতগুলো চোখের আয়নাতে ভিজে ক্ষেতের ছোপ পড়েছে।

কেশে গলা সাফ করে নেয় ঢোঁড়াই। নিজের কথাগুলোর ওজন বাড়ানোর জন্য উবু হয়ে বসে।

দারোগা, হাকিম, চৌকিদার যখন বাবুসাহেবের খেলাপে তখন আর ভয়ের কী আছে?

এ আবার কী বলে ঢোঁড়াইটা? ভাবলাম বুঝি কাজের কথা পাড়বে, যে কথাটা মনের মধ্যে কিরকির করছে সকলের, বৃষ্টির পর থেকে। এ বোধ হয় আরম্ভ করল আবার বুড়হাদাদার কথা নতুন করে। বুড়হাদাদা ওকে একটু ভালবাসে কিনা তাই। বুড়হাদাদার একটানা বাজে গল্প, যে বসে শোনে তাকেই বুড়ো ভালবাসে।...না, ঢোঁড়াইটার চোখে মুখে যে একটা হাসির ঝলক দেখছি; দুষ্টুমিভরা হাসির! একটা কিছু মতলব নিয়ে বলেছে নিশ্চয়ই কথা। আরে বললি তো পরিষ্কার করেই বল না কথাটা। পেয়েছিস দু-দুটো মোসম্মতকে হাতের মধ্যে, নিজের বলতে কিছু নেই এখানে, তোর এখন হাসি

আসবে না তো কার আসবে? হাজার হলেও পরদেশী লোক। গাঁয়ের লোকের জন্য মনের ভিতর থেকে দরদ আসবে কেমন করে! মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল বলে এখন আমরা। এর মধ্যে আর হাসিমশকরা করিস না রে ঢোঁড়াই। ওসব করিস গিয়ে তোর মলহরিয়াতে, বুঝেছিস ছোঁড়া। সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। 'খিরা, সবেরে হীরা'[১]। শশাটা পর্যন্ত খাওয়ার সময় আছে।

ঢোঁড়াই চটে যায়, 'আরে, আরে আমার কথাটা শুনবি তো আগে। তারপর না বলবি। পরদেশী লোকের কথা শুনলেও কি কানে পোকা পড়বে? সবাই মিলে দল বেঁধে চল বাবুসাহেবের ওখানে।'

তারপর ঢোঁড়াই পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিজের কথাটা বলে সকলের কাছে।

'…কেবল মুখের কথায় মালপোয়া ভাজলে কিছু হবে না'; এই বলে ঢোঁডাই নিজের কথা শেষ করে।

দুই-একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়। 'বন্দুকটাই না হয় সরকার দিনকয়েক আগে কেড়ে নিয়েছে। তাহলেও বাবুসাহেব বাবুসাহেবই। দারোগার হাত থেকে গাড়ি বলদ ছিনিয়ে আনবার হিম্মত রাখে এখনও। থাকবে না? অ্যাসেসর যে ও'!

রেগে গজগজ করে ঢোঁড়াই; এবার থেকে রোজ জল হবে দেখিস। জলভরা ক্ষেতের ধারে বসে বসে তোবা দাদ চুলকুবি নাকি? আর রামজী এসে তোদের বালবাচ্চার মুখে দলা গুঁজে দিয়ে যাবেন?

'বেঁটে সাঁওতালটা কিন্তু মারকুটে মোষের মতো তাড়া করে আসবে তীরধনুক নিয়ে।'

'আরে না না, ওটা তো সুয্যি উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিউটি সেরে বাড়ি চলে যায়।' শেষ পর্যন্ত যেন এই সাঁওতালটার বাড়ি যাওয়ার উপর তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ভর করছিল। তবু কি বুকের ঢিপঢিপুনি থামে? বোধ হয় সেটাকে ভুলবার জন্যই সকলে বিল্টার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে চেঁচায় 'বজরংবলী মহাবীরজী-কি জয়!'

ভোরের আলোর আগুন লেগেছে তখন বিসকান্ধার আকাশে, মঠের উপরের বটগাছে, ঢোঁড়াইদের চোখে।…

বাবুসাহেব ধানের চারা চুরির ব্যাপারটা রাতেই জানতে পেরেছিলেন।

---

১ শশা সকালে হীরা।

কিন্তু সে সময় তাই নিয়ে চেঁচামেচি করেননি। বাড়ির কর্তার কথার ওজন থাকা চাই। সময় নেই অসময় নেই যখন-তখন হাঁ-হাঁ করে উঠলে, 'কিছু মানে লাগায় না'[1] সে লোকের। ভোরে দাঁতন করবার পর সবে গলার মধ্যে ফিতেটা ঢুকিয়েছেন, হঠাৎ কানে আসে, 'মহাবীরজী-কি জয়'-এর আওয়াজটা। কেমন কেমন যেন লাগল। আজ কোনো পরব তো নেই। মঠে আবার ব্যাটারা কুস্তির আখড়া খুলল নাকি? ছেলেছোকরারা তো বোঝে না, তর্ক করতে আসে। ইস্কুল আর কুস্তির আখড়া; দুটোই সংস্কার বিগড়োবার যম। তাইতো ছেলেদের বলি যে, ঠেকে শিখবি তোরা। বিনা কীর্তনে, বিনা পুজোয়, মহাবীরজীর জয় দেওয়া বড় কুলক্ষণ! চেঁচামেচি এই দিকেই আসছে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝে নেন যে কোয়েরীটোলার লোকেরা, চোট্টাটাকে ছাড়াবার দরবার করতে আসছে। এগুলোকে রামজী সুমতি দেন না কেন? তাঁর রাজ্যে তো চুরি ছিল না। ছেলেগুলো হয়েছে অপদার্থ। একদিন মাত্র বড়টাকে লাঠি তুলতে দেখেছিলাম। তাও দেখি সরু দিকটা নিয়েছে হাতের মুঠোর মধ্যে। এ কি কোদাল পাড়া নাকি? এখনও ঘুম ভাঙেনি। বৃষ্টির পরদিন কোথায় তাড়াতাড়ি উঠে ক্ষেত দেখতে যাবে, ধান রোপার ব্যবস্থা করবে, তা নয় এখনও ঘুমুচ্ছে। দেখি কত ঘুমুতে পারে।...আমি কিছুতেই ডেকে তুলছি না।

বাবুসাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে ঢোঁড়াইদের দলের উৎসাহ একটু মিইয়ে আসে। দুই-একজনের নিমের দাঁতন পাড়বার কথা মনে পড়ে। যাদের অছিলা জোটে না তারাও পিছনে থাকতে চায়। পরদেশী লোকের কত সুবিধা! না বাবুসাহেবের জমির 'আধিয়াদারি' করে, না কর্জ খায়, না লাঠিরযুগের জোয়ান বাবুসাহেবের খবর রাখে!

'বচ্চন সিং কোথায়? আমরা 'ভেট' করতে চাই তাঁর সঙ্গে।'

'বাবুসাহেবের সঙ্গে? কেন? দরকার থাকে তো ছোটামালিক এলে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করিস।'

'আরে বচ্চন সিংই সব—অনোখীবাবুকে সামনে রেখে, সেই তো সব কাজ চালায়।

বাবুসাহেবের কান খাড়া হয়ে ওঠে। তাঁর দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে বলছে বচ্চন সিং! কোনো বুড়োর গলা বলে তো মনে হল না।

তিনি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর সম্মুখে কোয়েরীটোলার লোকদের এক

১ গ্রাহ্য করে না।

পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে জড়িয়ে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ানো, জমিদারের সম্মুখে, এটা কেবল এ গাঁয়ের রেওয়াজ নয়, এ মুল্লুকের।

অবাক হয়ে যান বাবুসাহেব। আরও অবাক হয়ে যান নিজের সহিষ্ণুতা দেখে।

'হুজুর, আমরা এসেছিলাম একটা নিবেদন করতে কোয়েরীটোলা থেকে।'

বাবুসাহেবের ইচ্ছা হয় যে বলেন, 'আমার কাছে আবার কেন?' কিন্তু এরা যে জানে, বচ্চন সিং অনোখীবাবুকে সম্মুখে রেখে নিজেই কাজ চালায়। তাঁর মনে হয় এ কথাটা খানিক আগে পর্যন্ত এত পরিষ্কার করে জানতেন না। ধরা পড়ে গিয়েছেন তিনি এদের কাছে।

ঢোঁড়াই মনে মনে তৈরি হবার সময় পেয়েছে অনেকক্ষণ। সত্যিই পরদেশী হওয়ার লাভ আছে। হারলে পরোয়া নেই, গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হলেও পরোয়া নেই। যেখানে তার শিকড় ছিল, সেখানেই বলে সে 'পঞ্চ'দের সঙ্গে টক্কর দিতে পেছপা হয়নি, তার আবার এখানে সে ভয় পাবে। সেখানে সে হার মেনেছিল জাতের মাথাদের কাছে নয়, সে হার মেনেছিল নিজের মনের একটা দুর্বলতার কাছে। তা নইলে ঢোঁড়াই কখনো কারও কাছে ছোট হয়?

আর যখন সে জানে যে সে রামজীর কাছে কোনো পাপ করছে না, অন্যায় করছে না। দারোগা, হাকিমকে সে এখনও ভয় করে। বাবুসাহেব দারোগা, হাকিমের কাছে আজকাল আর যেতে পারবে না, এটা না জানলে, তার মনের জোর এখন এতটা থাকত কিনা বলা শক্ত।

বাবুসাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'এই চোট্টাটাকে ছাড়ানোর দরবার করতে এসেছিস নাকি?'

'না হুজুর, আমরা এসেছি ধান নিতে।'

'ধান? তুই আবার ধানের 'বালিস্টর'[১] হলি কবে থেকে? তুই তো মোসম্মতের ওখানে চাকরি করিস।'

ঢোঁড়াই এ কথার কোনো জবাব দিতে পারে না। জবাব দেয় বিল্টা। 'হুজুরই মা-বাপ। হুজুরের জুতোর বোঝা মাথায় করে আমাদের দিন চলে। ধান আমাদের আজ চাই-ই ক্ষেতের জন্য।'

বাবুসাহেবের মতো লোকও হকচকিয়ে যান, বিল্টার গলার স্বরের দৃঢ়তা দেখে। তাতে প্রার্থনার লেশমাত্র নেই। লোক ডাকতে পারেন তিনি

---

১ ব্যারিষ্টার।

এখনই, কিন্তু তাতে কি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা হবে না। নিজের লোকই বা ক'জন। সব চলে গিয়েছে ক্ষেতে। রাখালগুলো এখনও মোষ চরিয়ে ফেরেনি। অনোখীবাবু ঘুমুচ্ছে। তিনি এরকম গলার স্বর কোয়েরীদের মুখ থেকে কখনও শোনেননি। সত্যি করে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তিনি। নইলে এই সামান্য ব্যাপারে কোনো একটা হুকুম দেওয়ার আগে, এত সাত-পাঁচ কথা মনে আসবে কেন?

বাবুসাহেবের কথার জবাবটা সময়মতো মনে জুগোয়নি। নিজের উপর রাগ হয় ঢোঁড়াইয়ের।

ঢোঁড়াইরা গোলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আমরা গোলা থেকে মেপে ধান বার করে নিচ্ছি। এক ছটাক ধানও এদিক-ওদিক হবে না। সকলের নামে লিখে রাখুন গোমস্তাজী। সকলে টিপসই করে দেবে। ধামা আছে আপনাদের? আপনিই গুনে দেন গোমস্তাজী। এক এক করে। সকলে একসঙ্গে ভিড় কোরো না।

বাবুসাহেবকে আর বেশি ভাববার ফুরসত দেয়নি। রাগে বাবুসাহেবের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করে। হতভাগা লাডলীটা গঞ্জের বাজারে কাপড়ের দোকানের সম্মুখে মহাৎমাজীর হল্লা না করলে আজ এ হতে পারত না। এতক্ষণে এখানে বন্দুক চলে যেত, তারপর ঘোড়াতে চড়ে বাবুসাহেব নিজে যেতেন থানায়। নিজের লাঠির উপর তিনি আর ভরসা পান না। তবু তাঁর একটা সম্ভ্রম আছে গাঁয়ে। ছোট যা হবার তা হয়েছেন।

'গোলার টোপরটা খুলে উপর থেকে নে ধান। রাতে জল পড়েছে ধানে, পুরনো টোপরটার মধ্যে দিয়ে। ওটাকে নামিয়ে রাখিস, মেরামত করতে হবে। ধানগুলো একটু রোদবাতাসও পাক।'

একটা উদারতার খোলস পরিয়ে বাবুসাহেব নিজের সম্মানটুকু বাঁচিয়ে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি বোঝেন যে কথাগুলোয় কাজ কিছু হল না। ব্যাটারা বোঝে সব। থাকে অমনি চুপ করে! তবু মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতে হয়।

চোখের সামনে এই ধান ওজন তিনি আর দেখতে পারেন না।

'গোমস্তাজী, তুমি লিখে রেখো সবার নামে।' এই বলে বাবুসাহেব গোয়ালঘরের দিকে চলে যান। ধান দেওয়া-নেওয়ার মতো তুচ্ছ মামুলি ব্যাপারে মাথা ঘামানোর তাঁর সময় নেই, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে যান।

গোয়ালঘরে গিয়েও নিস্তার নেই। সেখানেও মূর্তিমানরা গিয়ে হাজির।

'কা আবার ?' যতদূর সম্ভব কড়াভাবে বাবুসাহেব জিজ্ঞাসা করেন। বলতে চেয়েছিলেন কত জোরে! কী রকম আস্তে হয়ে গেল!

'ধানের কিছু চারাও চাই হুজুর সকলের।' এবারে ঢোঁড়াই জবাবটা সব ঠিক করে রেখেছে। বলুক আবার বাবুসাহেব 'বালিস্টর' তাকে।

'আমার নিজের ক্ষেতে পুঁতবার জন্যও কিছু রাখিস তা বলে।' লচুয়া চৌকিদারটাও অন্তত আজ যদি তাঁর হাতের মধ্যে থাকত। এ কথাটুকু ভেবেও বাবুসাহেব একটু সান্ত্বনা পান মনে। বার্ধক্যের জন্য তাহলে তাঁর আজকের এই দুর্বলতা নয়; ও একটা ভুল সন্দেহ হয়েছিল তাঁর মনে। রাজপুত কেবল যে লাঠি চালাতে জানে তা নয়। দরকার হলে 'ভূমিহারী চাল'[১] সেও দেখাতে পারে। টিপসইগুলো নিল তো গোমস্তাজী ঠিক করে?

পড়া দাঁতের ফাঁকটায় বাবুসাহেবের জিভটা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

বাবুসাহেবের কটক সঞ্চারণ

এর পর থেকে কোয়েরীদের সঙ্গে বাবুসাহেবের লড়াইটা জমল বেশ ভাল করে। এত বড় আস্পর্ধা! রাজপুতদের বাড়ির বাসন মেজে যাদের সাতগুষ্টির জন্ম গেল, তারা শাসায় বাবুসাহেবকে! চুরি করে আবার চোখ রাঙায়। গোমস্তাজীর উপর হুকুম চালায়! এ বরদাস্ত করবার পাত্র বচ্চন সিংকে পাওনি। স্নানের পর বাবুসাহেবের তিলক কাটবার তর সয় না। আঁচানোর পর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সাদা গোঁফ জোড়াকে সাজিয়ে নিতে ভুল হয়ে যায়। সাবেককালের মতো বৈঠকখানার বারান্দায় এসে তিনি আবার বসতে আরম্ভ করেন।

এ হল কী কালে কালে! ইংরাজের রাজত্ব আবার চলে গেল নাকি, মহাত্মাজীর দু কৌটা নুনের ছিটেতেই! অনোখীবাবুর ঘুম ভাঙেনি নাকি এখনও?

'যা শিগগির ছোট মালিককে ডেকে নিয়ে আয়।'

গোমস্তাজী তটস্থ হয়ে ওঠে। বাবুসাহেবের এ চেহারা তাঁর অপরিচিত নয়। এখনই তিনি বার করতে বলবেন, পুরনো আঙুলের ছাপ দেওয়া কাগজগুলো। একটার পর একটা উদ্ভট ফরমাশ আরম্ভ হয়ে যাবে। বুড়ো হয়ে মেজাজটা আগের চাইতেও খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

১ ভূমিহার ব্রাহ্মণদের এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা কুটিল বলে অখ্যাতি আছে। (শব্দার্থ) ভূমিহার ব্রাহ্মণদের কূটনীতি।

পুরনোগুলো নয়। বাবুসাহেব ধানের দরুন নেওয়া আঙুলের ছাপগুলো দেখতে চান। দাগগুলো ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া লাগছে।

'গোমস্তাজী, সব কাজে তোমার হড়বড় হড়বড় !

আবার কী হল ! গোমস্তাজী মাথা চুলকোয়।

'ও ! না !'

কাগজটা দূরে ধরলে দাগটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কথাটা জোরে বলে তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। স্থচে স্থতো পরাতে তিনি নিশ্চয়ই পারেন এখনও। বহুকাল পরে কাগজে হাত দিয়েছেন কিনা !

'গোমস্তাজী, রাখালরা ফিরেছে ?'

'হাঁ হুজুর।'

বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ইশারাই যথেষ্ট। গোমস্তাজী আঙুলের ছাপ দেওয়া কাগজগুলি নিয়ে যায় যেখানে মোষগুলো বাঁধা থাকে খুঁটিতে। অধিকাংশের গায়ের কাদাই এখনও শুকায়নি। একটা শুকনো গোছের গা দেখে গোমস্তাজী সেইটার উপরই ঘষে, একটু ময়লা-ময়লা করে নেয় কাগজ-গুলোকে। বাবুসাহেবকে আর সে কথা খরচ করবার তকলিফ দেবে না। কাগজগুলোয় আর কী লিখবে সেইটা খালি একবার জিজ্ঞাসা করে নেবে। বাস্ ! আর কিচ্ছু না ! এতদিন ধরে বাবুসাহেবের খিদমৎ করছে সে। বাকি সব কাজ তার জানা। কাজও তো ভারি ! চিনিগোলা জল খানিক খানিক কাগজগুলোর উপর এখানে-সেখানে লাগিয়ে দেওয়া। তারপর পিঁপড়ে গেলে, বাঁশের চোঙার মধ্যে ভরে গুঁজে রেখে দিতে হবে রান্নাঘরের বাতায়। ভূসির মধ্যে রাখার চাইতে এতে জিনিসটা হয় অনেক ভাল।

গোমস্তাজী আবার যখন বৈঠকখানায় ফিরে এল, তখন বাবুসাহেব অনোখীবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। ছোট মালিক আবার দেখছি বাবুসাহেবের সামনেই তক্তপোশের উপর বসেছে। বয়স তো হল ! চুল পাকবে তুদিন পরে। এখনও বসবে না।

'এস গোমস্তাজী, তুমিও শোন।'

'অনোখীবাবু, আপনি চলে যান জিরানিয়ায়। অনিরুদ্ধ মোক্তারের সঙ্গে সঙ্গে সলা করে জোতের কোয়েরী 'রায়ত'গুলোর উপর বাকি খাজনার নালিশ ঠুকে আস্থন। কটাই বা 'রায়ত' হবে। অধিকাংশ কোয়েরীই তো 'দররৈয়ত আধিয়াদার'।[১] যেখানে পারেন এইগুলোর জায়গায় সাঁওতালটুলির লোকদের

১ রায়তের অধীনে ভাগচাষী। জোতদারের অধীন ভাগচাষী হলে কতকগুলি স্থবিধা পাওয়া যায়।

ঢোকান। ঐ যে নতুন লোকটা ঢোঁড়াই না কী নাম, ওটা ফেরারী-টেরারী নয়তো? বাড়ি যাওয়ার নাম করে না একদিনও। ঐটাই বোধ হয় উসকানি দিচ্ছে সকলকে। মোসম্মত যে রায়ত রাজপারভাঙার। আমার হলে না হয় একটু চাপ দিলেই লোকটাকে সরিয়ে দিত। এ সম্বন্ধে অনোখীবাবু আপনি একবার রাজপারভাঙার তশীলদারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। গোমস্তাজী, আপনিও যাবেন।' বাবুসাহেব জানেন যে, গোমস্তাজী সঙ্গে না থাকলে, এসব কাজের থই পাবেন না অনোখীবাবু।

এতক্ষণে গোমস্তাজী কথা বলবার সাহস পান। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাউণ্ডকীপার ইনসান আলি হাতের লোক। বাবুসাহেবের টাকা দিয়েই সে খোঁয়াড় নিয়েছে, নিলামে ডেকে। 'মোসম্মতের ক্ষেতে গরুমোষ রাতে ছাড়লেই তিনদিনের মধ্যে কাবু হয়ে যাবে। হুকুর, ঝোলাগুড় দিয়েই যদি মাছি মরে, তবে বিষ দেওয়ার দরকার কী।'

বাবুসাহেব তাড়া দিয়ে ওঠেন গোমস্তাজীকে। কেবল কথা! যা দরকার বুঝবে করবে। তা নিয়ে এত কথা কিসের?

কোয়েরীরা রাজপুত বচ্চন সিংকে 'চুনৌতি'[১] দিয়েছে। বড় বাড় বেড়েছে কোয়েরীগুলোর! গাঁয়ের অন্য রাজপুতরা সকলেই এই ব্যাপারে বাবুসাহেবকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তাই ছোট মালিক পরের দিন থেকে ভাঙের শরবতের ভাঁটি খুলে দিতে আরম্ভ করেন প্রত্যহ সন্ধ্যায়। শরবতের লোটা তাদের দিকে ঠেলে দিয়ে ছোট মালিক তাদের হেসে আপ্যায়িত করেন। 'জাতবেরাদারদের খোঁজখবর নিয়মিত নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর চিরদিনই; রাজপুতই রাজপুতের গতি তা সে চান্দেলাই হোক, আর বুন্দেলাই হোক; আর কিছু না হোক, ভালবাসা বলে একটা জিনিসও তো আছে পৃথিবীতে। হে-হে-হে।'

যারা বীরাসন হয়ে বসতে ভুলে গিয়েছিল তারাও ভুলটা শুধরে নেয়।

'যবে থেকে পৈতে নিয়ে ছত্রি হয়েছে, তবে থেকে তেল বেড়েছে হারামজাদা কোয়েরীগুলোর।'

'তেল বলে তেল।'

'বুঝলেন ছোটমালিক, ছোটলোকদের মাথায় চড়িয়েছে লাডলীবাবুরা। 'মুনিয়া'রা মাথায় টুপি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'ভালা আদমী'দের[২] সম্মুখে।'

১ Challenge: যুদ্ধে আহ্বান।

২ মুনিয়ারা:মাটিকাটার কাজ করে। আগে এরা সাটি থেকে 'সোরা' বার করার কাজ করত। গ্রামে ভাল আদমী অর্থাৎ 'ভাল লোক'-এর অর্থে বড়লোক।

'আরে দুনিয়ার কথা ছেড়ে দে গজাধর সিং। জেলে মুচি চামারের ছোঁয়া কি আর খাচ্ছে না লাডলীবাবু।'

'হাঁ, তোর তো জেলের সব হালতই জানা আছে লছমপৎ সিং।'

লছমপৎ সিং একবার ঘোড়া চুরি করে জেলে গিয়েছিল॥ 'বাপের বেটা হোস তো চলে আয়' বলে লছমপৎ সিং গজাধরের গলার টুঁটি চেপে ধরে।

সকলে মিলে তাদের ছাড়িয়ে দিলে দুজনেই বলে যে, বাবুসাহেবের বাড়িতে না হলে আজ একটা কাণ্ড হয়ে যেত এখানে।

'আর কিছু না থাকুক 'মোহব্বত'[১] বলেও তো একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে।'

কোনার দিককার কার যেন নেশাটা জমে এসেছে। সে বলে, 'তোরা কি আর পারবি কোয়েরীদের সঙ্গে লড়তে। ওগুলো এঁটো ধোয়ার সেপাই।'

'এক হাতে থালার ঢাল আর এক হাতে ঝাঁটার তরোয়াল দিয়ে বসিয়ে দেন ওদের একটাকে আপনার বদমাশ ঘোড়াটার পিঠে। তারপর ছোট-মালিক চাবুক মারুন ঘোড়াটাকে সপাসপ।'

ভাঙের উপর এই সূক্ষ্ম রাজপুতী রসিকতার দমকে ঘরসুদ্ধ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

'বুঝলেন, অনোখীবাবু, মেয়েমানুষে বুকে টানে সুখের সময়, আর জাতে বুকে টেনে নেয় বিপদের সময়।'

'তা তো বটেই ! 'মোহব্বত' বলেও তো একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে।'

ঢোঁড়াইয়ের অমৃত ফল লাভ

কোয়েরীরাও বসে থাকে না। রাজপুতদের মাটিতে কাটা লোহার দাগ মুছে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াইয়ে।[২] কিছুদিনের মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়ার আরম্ভ সে কথা সকলে ভুলে যায়। আর কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা জানেন কেবল মহাবীরজী। কিন্তু ঘটনার স্রোতের প্রতিটি ঢেউ নেওয়া চাই কোয়েরীটোলার প্রতিটি লোকের।

বাধা না পেলে ঢোঁড়াইয়ের আসল রূপ খোলে না। তাই কী করে যে সে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না ; বুঝতে চেষ্টাও

১ ভালবাসা ; টান।

২ লোহার দাগ মোছার অর্থ, to accept challenge।

করেনি বোধ হয়। এই টক্কর দেওয়ার সাধ বড় মিঠে। মধুর মতো। মাছি জড়িয়ে পড়বে জেনেও তাতেই বসে।

যে রায়তগুলোর উপর বাকি খাজনার নালিশ করেছে বাবুসাহেব, সেগুলো হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায় এখানে-ওখানে। পাশের গাঁয়ের রামনেওয়াজ মুন্সি জিরানিয়ার কাছারীতে মুহুরিগিরি করে। এক রবিবারে কোয়েরীর দলের সঙ্গে ঢোঁড়াই মুন্সিজীর দুয়োরে ধরনা দেয়। আশপাশের গাঁয়ের বহু লোক তার আগেই সেখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে।

'ভারি চোখা বুদ্ধির লোক মুন্সিজী। বালিস্টরকেও হারিয়ে দেয়: নইলে কি আর চশমা পরবার হক পেয়েছে মাঙনা।'

বিণ্টা কনুই দিয়ে খোঁচা দেয় ঢোঁড়াইকে—'ঐ শোন না কী বলছে।'

রামনেওয়াজ মুন্সি তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে নির্লিপ্তভাবে বলে চলেছে।—'সেবার যুদ্ধের সময় জিরানিয়ায় টুরমনের তামাশা[১] হয়েছিল না? সেই সময় অনেক টাকা উঠেছিল। তাই দিয়ে কমিটি কিনেছিল 'বার'-এর কাগজ[২]। সেই টাকা এখন সুদে আসলে সাত লাখ হয়েছিল। কলস্টর সাহেব অংরেজের বাচ্চা। বললে যে এই টাকা দিয়ে জিরানিয়া জেলার চাষবাসের উন্নতি করতে হবে 'ফারম'[৩] খুলে। জিরানিয়ার পুরুবে ঐ বকরহাট্টার মাঠ আছে না, সেই মাঠ কেনা হয়েছে ঐ টাকা দিয়ে। তারই খেলাপে বিজনবাবু ওকিল তাৎমাটুলির পাবলিকের তরফ থেকে আর্জি লিখে দিয়েছিল। বিজনবাবু বলে যে, এটা পাবলিকের গরু চরাবার জায়গা চিরকাল থেকে। পাবলিক নিমক তৈরি করেছিল মরণাধারের কাছে। অনিরুধ মোক্তার আর্জি দেখেই তো ঢোঁক গিলে, টাক চুলকে অস্থির। তখন ডাক পড়ল রামনেওয়াজ মুন্সির। সার্ভে খতিয়ান মক্কেলের দিকে, শিমুলগাছ কাটার সাক্ষী রয়েছে হাতে; দিলাম জবাব হেনে ঠুকে। পাটনার 'ঢাইকোর্ট' পর্যন্ত বাহাল থেকে গেল, আমার লেখা জবাব। এই তো গত হপ্তায় এসেছি পাটনা থেকে। খালি বিজন ওকিল কেন, ঢাইকোর্টের হাসান ইমান বলিস্টর পর্যন্ত 'পুটুর পুটুর' তাকাতে থেকে গিয়েছিল।'...

কোয়েরীটোলার দল ভারি দেখে মুন্সিজী চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে নেয়। কান থেকে কলমটা নিয়ে খশখশ করে একটা হিসাব লিখে দেয়, বাবুসাহেবের সঙ্গে মোকদ্দমা করবার খরচের। প্রথম দিনই লাগবে ছাব্বিশ

১ District War Turnament ১৯১৭ সালে জিরানিয়ায় হয়েছিল।

২ বার—ওয়ার লোন।

৩ Agricultural Demoustration Farm।

টাকা। লম্বা তারিখ চাও তো আরও চার টাকা বেশি।…'না না, এক পয়সা কমে হবে না। রামনেওয়াজ মুন্সির কাছে দরদস্তুর নেই। ঐ এক কথা। শস্তার কাজ চাও, জেলায় অনেক উকিল-মোক্তার আছে। রামনেওয়াজ মুন্সির কাছে কেন? তোমরা খরচ করতে না পার, বাবুসাহেব লুফে নেবে রামনেওয়াজ মুন্সিকে। তোমরাও যেমন পাবলিক, বাবুসাহেবও সেই রকম পাবলিকের বাইরে নয়।'

ঢোঁড়াইয়ের মন চায়, মুন্সিজী বকরহাট্টার মাঠের, তাৎমাটুলির কথা আরও বলুক। কিন্তু আর কি বলবে সে কথা মুন্সিজী! লোকটা আর-একটু কম বুদ্ধিমান হলেই ছিল ভাল। তাহলে হয়তো বিজন ওকিল বকর-হাট্টার মাঠটাকে বাঁচিয়ে নিতে পারত ঢাইকোর্টে।…

গাঁয়ে ফিরে এসে টাকার যোগাড় আর হয় না। যাদের নামে মোকদ্দমা নেই তারা কেন পয়সা খরচ করবে। এ কি 'বিদেশিয়া'র গান, না 'ছকরবাজি' নাচ। এ টোলার পঞ্চায়তের মোড়ল গিধর মণ্ডল। ঝাড়ু মার! ঝাড়ু মার। ও যাবে বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে তাহলে আর আমরা গোড়া ছেড়ে, পাতায় জল দিতে যাই।

কষ্টেস্রষ্টে এক টাকা বারো আনা যোগাড় হয়। ঢোঁড়াইয়ের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তারই শলা অনুযায়ী বাবুসাহেবের ধান আনা থেকেই, এই ঝগড়া পর্বের পত্তন। আর সে কিছু সাহায্য করবে না মোকদ্দমার খরচ দিয়ে? তার নিজের বলতে একটা পয়সাও নেই। কোমরের নেংটি, আর মুখের দানা রামজী তার জুটিয়ে দিয়েছেন। ভেবেছিল তার আর জীবনে পয়সা দরকার হবে না। কিন্তু মহাবীরজী গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়েছিলেন, সে কি নিজের খাওয়া-পরা জোটেনি বলে?

ঢোঁড়াই মোসম্মতের কাছে মোকদ্দমার খরচের টাকার কথা তোলে। মোসম্মত চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে।

'তাদের বাবারা কি বাঁশের কেঁড়েতে করে আমার কাছে টাকা আমানত রেখে গিয়েছিল? ওরে আমার হিতৈষী রে! আমার বরাতে কি সব কটাই এমনি লোকই জোটে!'

মরমে মরে যায় ঢোঁড়াই। গিধর মণ্ডল যে চার আনা করে মাইনে ঠিক করে দিয়েছিল অন্তত সেটাও যদি মোসম্মত দিত! কিন্তু একথাটা কি বলা যায় মোসম্মতের কাছে!

ঘুম আর আসতে চায় না, সে রাতে ঢোঁড়াইয়ের।

মোসম্মত এমন করে মুখ ঝামটা দেবে, তা ঢোঁড়াই আশা করেনি। যে

লোকটা মাইনে নেয়নি একপয়সাও তাকে এমনি করে কথা শুনোতে একটু সংকোচও হল না! সাগিয়াও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও তো মাকে কিছু বলতে পারত। কিন্তু মোসম্মতের কথাটা অন্যায্য নয়। তাই এ নিয়ে রাগ করা চলে না তার উপর।

ঘুম না এলেই মাচার ছারপোকাগুলো জ্বালাতন করে। করুক। আজকাল সজাগ হয়ে থাকাই ভাল। এই তো গত হপ্তায় খুঁটি থেকে মোষ খুলে নিয়ে গিয়ে পুরেছে খোঁয়াড়ে। নিশ্চয়ই ইনসান আলি পাউণ্ডকীপারের কাণ্ড। নিজে হাতে ঢোঁড়াই খুঁটিতে বেঁধেছিল। খোঁয়াড় থেকে ছাড়াতে গিয়ে দেখে বইয়ের পাঁচ দিন আগের পাতায় লেখা আছে। পাঁচ দিনের চার্জ লেগে গেল মিছামিছি। এসব কার কাণ্ড তা কি মোসম্মত বুঝতে পারছে না? তবু মোকদ্দমাজ জন্য দু'টাকা সাহায্য করল না।

তার উপর 'উজাড়'-এর[১] পালা চলেছে গাঁয়ে কিছুদিন থেকে। ঘোড়ার খাওয়া দেখলেই চেনা যায়। গরু-মোষের খাওয়া একেবারে আদেখলে হাভাতের সাপটে মুড়িয়ে খাওয়া। আর ঘোড়ায় খায় শুঁকে উলটে পালটে; ফর্‌র্‌র্ করে নিঃশ্বাস ফেলে ধুলো উড়িয়ে পাতার ডগাগুলো খায়। ঠিক যেন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিয়েছে। ঘোড়ার খাওয়া মানেই রাজপুতের কাণ্ড। রাজপুতরা ছাড়া আর ঘোড়ায় চড়ে কে গাঁয়ে। ঐ চড়তে গিয়েছিল একদিন লচুয়া হাড়ী।...

সেই ছোটবেলায় ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্তুর বিজ্জা সিং মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে যেত...মরণাধারে বেলেমাছের ভুড়ভুড়ি কাটার ঢেউয়ে কোথায় সে ছায়া মিলিয়ে যেত...

মিষ্টি চিন্তার আমেজে ঢোঁড়াইয়ের চোখের পাতা বুজে আসছিল।...হঠাৎ ও কী! কাপড়ের খসখসানির শব্দ না। একটা ছায়া নড়ল যেন ঘরে? ইনসান আলির ভাড়া-করা লোক নয়তো? মাচার পাশে রাখা বল্লমখানা শক্ত করে ঢোঁড়াই।

'কে?'

হাতভরা গালার চুড়িগুলো খট্‌খট্ করে শব্দ করে ওঠে! মেয়েমানুষ!

'আমি, আমি! চুপ!'

'সাগিয়া!'

কেন যেন, ভয়ে ঢোঁড়াই ঘেমে ওঠে।

১ গরু মোষকে দিয়ে অপরের ক্ষেতের ফসল খাইয়ে দেওয়া।

'এইটা রাখ ঢোঁড়াই।'

অবাক হয়ে যায় ঢোঁড়াই। 'কী?'

'টাকাকড়ি তো আমার কাছে থাকে না। সে মা কোথায় বাতায় গুঁজে রাখে, আমাকে জানতেও দেয় না। আমার গয়নাগুলো দেওর এ বাড়িতে আনতেই দেয়নি। এইটাই কেবল আমার আছে! মোকদ্দমায় খরচ করিস।'

জিনিসটা কী ঢোঁড়াই আঙুল দিয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করে।

'না, করিস না ঢোঁড়াই—'

বিরাট গলা খাঁকার দিয়ে ইঁদারাতলার দিক থেকে ধ্বনি ওঠে 'হো-হৈ··· ঘরবালা জাগো-ও-ও-ও-হৈ ··।'

একেবারে চমকে উঠেছে দুজনে।

লচুয়া চৌকিদার কোয়েরীটোলার দিকে পাহারা দেওয়া বাড়িয়েছে কিছুদিন থেকে। না হলে 'গরিবমার' হয়ে যাবে। একবার ধরতে পারলে ও ঐ মুসলমান পাউগুকীপারটাকে খাট্টা খাইয়ে ছাড়বে!···

বাড়ির ভিতর থেকে মোসম্মত কেশে চৌকিদারকে সাড়া দেয় যে, সে জেগেই আছে।

অন্ধকার ঘরে মায়ের খাটের তলে বেশ একটু শব্দ করেই লোটাটাকে রাখে সাগিয়া।

কোয়েরীদের ধর্মাধিকরণে গমন

ঢোঁড়াই সাগিয়ার দেওয়া জিনিসটা প্রাণে ধরে বেচতে পারে না। জিনিসটা পাকানো সুতোর গোছা দিয়ে গাঁথা একটা মালা। ছোট ছেলের গলার। মালা মানে, তাতে আছে দুটো চাঁদির টাকা। একটা রামচন্দ্রজীর টাকা, তীরধনুক কাঁধে দুই ভায়ের ছবি দেওয়া। আর-একটা ফারসি লেখা সিক্কা। অতি পরিচিত জিনিস। হিঁদু মুসলমান কোনোরকম ভূত দানো নজর দিতে পারে না, এই মালা ছেলের গলায় থাকলে। যাদের 'পরমাৎমা' দুধ-ঘি খাওয়ার মুখ দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা এমনি মালা গলায় পরে।

ঢোঁড়াই বোঝে এ জিনিসের দাম কত সাগিয়ার কাছে। কতদিন গল্পে গল্পে ছেলেটার কথা বলে ফেলে সাগিয়ার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। তাকে পরমাত্মা ঐ একটাই দিয়েছিলেন। তিন বছরের দামাল ছেলের চলে

যেতে তিন দিনের জ্বরেরও দরকার হল না। জ্বরের সময় মাকে চিনতে পর্যন্ত পারেনি এক পলকের তরে।...

সে সময় ঢোঁড়াই কী বলে সাগিয়াকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায়নি। ইচ্ছা করেছে তার মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। ইচ্ছে হয়েছে বলে, 'কাঁদিস কেন সাগিয়া?' মনে হয়েছে যে, আসল লোকসান সেই ছেলেটার, যেটা চলে গিয়েছে। এমন মা পেয়েছিলি!

আরও কত কী কথা ঢোঁড়াই সে সময় ভেবেছে। কিন্তু বলার সময় আনাড়ীর মতো বলেছে, 'ছেলে কি কখনও মরে, সোনা কি কখনও জ্বলে ছাই হয়ে যায়?' কারও ছেলে মরলে এই বলাই নিয়ম। তবু এর স্বরের গভীরতা সাগিয়ার অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে। নিজে এ ব্যথা না বুঝলে এত দরদ কি কারও আসে! ছেলের মা হলেও না-হয় কথা ছিল। তার কোল-খালি-করা ছেলের জন্য এত ব্যথা এই লোকটার!

হঠাৎ ঢোঁড়াই অনুভব করেছে যে সাগিয়া তার দিকে তাকিয়ে; তার মুখচোখের মধ্যে কী যেন খুঁজছে।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে ঢোঁড়াই বলে ফেলেছে, 'যাঁর জিনিস, তিনিই ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

সাগিয়া হাতে করে দিল বলেই কি ঢোঁড়াই ঐ মালাটা রাজপুতদের সঙ্গে জেদাজেদিতে খরচ করে দিতে পারে? আবার ফিরিয়ে দিলেও সাগিয়া দুঃখিত হবে। কথা তো বেশি কিছু বলবে না, কিন্তু তার চোখের কোণে জল এসে যাবে, সে কথা ঢোঁড়াই বেশ জানে। তাই মালাটাকে নিজের কাছেই রেখে দেয় ঢোঁড়াই। সে মনে মনে বোঝে যে, এটা তার খাতিরেই দিয়েছে সাগিয়া।

গঞ্জের বাজারের নৌরঙ্গীলাল গোলাদার লোক ভাল, কোয়েরীটোলার লোকদের আঙুলের ছাপ নিয়ে সাতটা টাকা দেয়। ছাপ না দিয়ে আর উপায় কী!

সাত টাকায় না-ই বা রাখতে পারলি রামনেওয়াজ মুন্সিকে। অনিরুধ মোক্তারও একটা কেউকেটা লোক নয়। জলদি করতে হয়। পরশু আবার বাবুসাহেব গিয়েছে অ্যাসেসরীতে। হাকিমকে দিয়ে কী করাচ্ছে কে জানে!

অগত্যা অনিরুধ মোক্তারের শলা অনুযায়ীই কোয়েরীরা কাজ করে। তাঁর এক কথা—'সমন কি নুটিস কখনও নিও না। বাস। আর কিছু করতে হবে না।'

দুই পক্ষকেই মোকদ্দমায় শলা দেয় অনিরুধ মোক্তার। জিরানিয়ায়

অনিরুধ মোক্তারের শালা নিতে কোয়েরীরা গিয়েছিল কাছারিতে। রামনেওয়াজ মুন্সিই তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলে সেখানে।

আরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন তোরা। বচ্চন সিংও কদিন থেকে আমার বাড়িতে আছে। ও আমার কাছে এসেছে তোদের খেলাপের মোকদ্দমার তদ্‌বিরে নয়। ও এসেছে অন্য কাজে। ওর নাম 'সেসরের ফিরিস্তি'[১] থেকে কেন যেন ছেঁটে দিয়েছে। পেশকারসাহেব অ্যাসেসরীতে ওর নাম আবার ঢুকানোর জন্য চায় দু'শ টাকা। কিন্তু বচ্চন সিংটা এমন হাড়কঞ্জুস যে, পেশাকারসাহেবকে পঁচিশ টাকার বেশি খুশী করতে রাজী না। আমি বলি যে, ওয়াজিব খরচ করতে পেছপা হলে চলবে কেন। নিজে, গাড়োয়ান আর দুটো বলদ, সব মিলিয়ে বোধ হয় পঁচিশ টাকার খেয়েছে এই ক'দিনে. তবু ন্যায্য খরচ করবে না। কাজের মধ্যে তো রাতে আমার বাড়িতে ঘুমনো। আর সারাদিন, 'টুরমনের ফারমের'[২] মরণাধারে ক্ষেতে জল সেচবার পাম্প বসিয়েছে না, সেখানে বসে বসে চীনাবাদামের ক্ষেত দেখা। বেশি চালাক কিনা! রাজপুতী বুদ্ধি আর কত হবে!

'বাবুসাহেব তাহলে বলো আর 'সেসর' নেই? তবে যে সেদিন অংরেজী কুর্তার[৩] উপর পাটকরা ভাগলপুরী চাদর কাঁধে ফেলে শ্যাম্পনিতে এল? কোয়েরীটোলার মধ্যে দিয়ে আসবার সময় চেঁচিয়ে পিছনের হরবংশ সিং সেপাইটাকে বলল যে ছ-সাত দিন লাগবে এ অ্যাসেসরীটায়! এর মধ্যে পচ্ছিমটোলার ক্ষেতটা যেন তোয়ের হয়ে থাকে!

'আমি যে বলছি যে, ওর অ্যাসসরী নেই, সেটা আর কিছু না, ও কী বলল সেইটাই বড় হল?' মুন্সিজী চটে ওঠে, এই মুখ্যু গেঁয়োগুলোর উপর।

কারও দেওয়া গালাগালি এর আগে কখনও এত ভাল লাগেনি কোয়েরীদের। এটা বুড়হাদাদার গালাগালির চাইতেও মিষ্টি। ঢোঁড়াইটাও এল না! এলে এখন জমত! তারপর মুন্সিজী কাজের কথা পাড়ে, 'তোরা হাজির হয়ে যাবি নাকি মোকদ্দমায়? কত টাকার যোগাড় করেছিস? উঠেছিস কোথায়?'

'এখনও টাকার যোগাড় হয়নি,' বলে বিন্টারা কোনোরকমে সেদিনকার মতো কথাটা এড়িয়ে যায়।

১ জজসাহেবের অফিসের অ্যাসেসরদের নামের তালিকা।

২ Turnament Agricultural Farm। ৩ কোট।

তারপর গাঁয়ে ফিরে এসে বিল্টারা গান বাঁধে।...

আজকাল মুন্সিজীর কুঠরীতে জজসাহেবের কাছারি ;
নড়বে নাকো বচ্চন সিং মুন্সিজীর পা ছাড়ি ;
কোথায় গেল কুর্সি এখন, কোথায় গেল সেসরী ?...ওরে বিদেশী !

গিধরের সহিত বাবুসাহেবের মিতালি

বাবুসাহেবের সঙ্গে গিধর মণ্ডলের হঠাৎ ইদানীং একটু গলাগালি হবার কারণ ছিল।

থানার চৌকিদার কিছুদিন আগে হাটে হাটে ঘণ্টা বাজিয়ে বলেছিল, কবে যেন গঞ্জের বাজারে সভা হবে। কিসের না কিসের সভা হবে, থানা-পুলিশের ব্যাপার। যা দিনকাল! কেউ আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কেবল খবর রাখত গঞ্জের বাজারের লোকেরা। মুলুক জুড়ে 'আমনসভা'[১] হচ্ছে থানায় থানায়। দারোগাসাহেব ভিতরে ভিতরে ঠিক করেছে, এ থানার আমনসভায় সভাপতি করবে রাজপারভাঙার সার্কেল ম্যানেজারকে। তারই মিটিন হবে। থানা আমনসভার নিচে পরে হবে গ্রাম আমনসভা।

মিটিনের সময় নৌরঙ্গীলাল গোলাদারের খাদীপরা ছেলে ভোপতলাল করে বসল এক কাণ্ড। ছোকরা পড়ত ভাগলপুরে। সেখান থেকেই মহাৎমাজীর আন্দোলনে তিন শাল 'হয়ে এসেছে'। মিটিনে সে উঠে প্রস্তাব করে যে, যার আয় একশ টাকার উপর সে যেন আমনসভার মেম্বর না হতে পারে। সকলে তো অবাক। বলে কী ছোকরা!

বাইরে বাইরে ইংরাজের দিকে, ভিতরে ভিতরে মহাৎমজীর দিকে, আর সব সময় নিজের দিকে ; এই তো দেখি সবাই। এ ছোকরা দারোগা আর সার্কেল ম্যানেজারের সম্মুখে নিজের দিকের কথাটা একেবারেই ভাবলই না! 'আলবৎ' বুকের পাটা বটে! চেঁচামেচি হৈ চৈ-এর মধ্যে সেদিনকার সভা ভেঙে যায়।

সেইদিন বাজারের সবাই জানতে পারে যে, থানা আমনসভার সভাপতি, মামুলী 'অফসর' নন। কলস্টর, হাকিম, যিনিই আসুন এদিকে, আগে তাঁরই সঙ্গে এসে 'ভেট মোলাকাত' করবেন, তারপর ডেকে পাঠাবেন দারোগা-

১ শান্তিসভা। এই সময় গ্রামাঞ্চলের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রতিরোধকল্পে গভর্ণমেণ্ট তার বিশ্বাসী লোকদের সহযোগিতায় সর্বত্র আমনসভা স্থাপিত করে।

সাহেবকে থানা থেকে। সেখানে এসেও দারোগাসাহেব বসতে পারবে না কুর্সিতে। বসুক তো; অমনি দারোগাগিরি নিলামে চড়বে; সরকারী ডাক এক! সরকারী ডাক দো! সরকারী ডাক তিন! আর দেখতে হচ্ছে না।

তারপর একদিন কী করে যেন, সার্কেল ম্যানেজার থানা-আমনসভার সভাপতি হয়ে যান। গিধর মণ্ডল হয় বিসকান্ধা গ্রাম-আমনসভার 'মুখিয়া'।[১]

বড় দায়িত্বের কাজ। মহাৎমাজীর চেলারা 'লেংটাদের'[২] মাথায় চড়িয়েছে। তারা সাপের পাঁচ পা দেখছে আজকাল। সরকারী কানুন নিয়ে তামাশা! কানুনেরই বাঁধন যদি আলগা করে দেয়, তাহলে জাত-পাত-আচার ব্যবহারের বাঁধন থাকবে কোথা থেকে? ভূতের নাচন আরম্ভ হবে দেশে। তবে কি হয়ে গিয়েছে! কাজের খরচা পাবেন কিছু কিছু। আর ভাল কাজ করতে পারলে ইনাম বকশিশের কথাও সরকার মনে রাখবে।...

দারোগাসাহেব আরও কত কী বোঝাল গিধর মণ্ডলকে।

এত বুঝোবার দরকার ছিল না। গিধর ভাল করেই জানে যে, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে লাডলীবাবুটা মহাৎমাজী তার মাস্টার সাহেবের ফাঁদে পা দিয়েছে। নইলে ঐ বচ্চন সিংয়ের গুষ্টি থাকতে, বিসকান্ধায় আর কারও 'অফসর' হতে হত না।

বাবুসাহেবও হাড়ে হাড়ে বোঝেন যে, দারোগা পুলিশ বিরুদ্ধে থাকলে, রাজপুতের লাঠি হয়ে যায় পেঁকাটির মতো ফঙ্গবনে; রাজপুতের ঘোড়া হয়ে যায় গাধার শামিল। আরে আহাম্মক লাডলী, বুঝছিস না যে, তোকে ঐ কুচক্করে মাস্টারসাহেবটা তাদের বোঝা বইবার গাধা করেছে, নিয়ে যাচ্ছে ঘাটের দিকে। বংশের ইজ্জতে ঘুণ ধরিয়ে দিলে; আর কি 'লেংটা'রা বচ্চন সিংয়ের পরিবারকে মানবে? সেসরীর 'জান'টুকু এখন পর্যন্ত ধুকধুক করছিল রাজপুতী কলজের ভিতর, তাই ঐ শকুনগুলো এখনও ছিঁড়ে খায়নি। এখন আমনসভার 'মুখিয়া'টাকে হাতে রাখতে পারলে সময়ে অসময়ে কাজ দিতে পারে।

তাই জাতের ইজ্জত ভুলে গিধর মণ্ডলটার সঙ্গে 'হাত মিলিয়েছিল,'[৩] বচ্চন সিং নিজে উপযাচক হয়ে।

আর গিধর মণ্ডল জানে যে, ঢোঁড়াইটাকে শায়েস্তা করতে হলে, রাজপুতদের সাহায্য বিনা হওয়ার উপায় নেই। তার উপর লচুয়া

১ সংস্কৃত শব্দ মুখ্য থেকে। সেক্রেটারি গোছের কাজ। ২ ছোটলোকদের।
৩ বন্ধুত্ব করেছিল।

চৌকিদারটাও একদিন নিরিবিলিতে তার কাছে সাগিয়া আর ঢোঁড়াইয়ের সম্বন্ধে কী সব যেন বলে গিয়েছে। দাঁত বার করে আবার হারামজাদা হাড়ীর বাচ্চাটা যাওয়ার সময় খোঁচা দিয়ে গেল যে, তোমাদের বাড়ির বৌয়ের কথা বলেই তোমার কাছে কথাটা বললাম মোড়ল।

সেইদিন থেকে তার মনটা ঢোঁড়াইয়ের উপর আরও বিগড়েছে।

আর ঐ নচ্ছার কুটনী মোসম্মতটা! ঐটাই তো যত নষ্টের গোড়া!

কোয়েরীটোলার উদ্যোগ

সেই যে রাতে সাগিয়া মায়ের খাটিয়ার নিচে ঠকাস করে লোটাটা রেখেছিল, তার পরদিন থেকে তাদের বাড়ির ভাব হয়ে ওঠে একটু থমথমে মতন। মায়ে বেটিতে রঙ্গরস কমে আসে। যে মোসম্মতের মুখে চব্বিশ ঘণ্টা বাজে কথার খই ফুটত, সে সুদ্ধ হয়ে আসে একটু গম্ভীর। রোদ, বাদল, বলদ, উনন প্রতিটি জিনিসের উদ্দেশ্যে, হুঁকোর ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উগলে দেওয়া গালির স্রোতে মন্দা পড়ে। ঢোঁড়াইয়েরও মোসম্মতের সঙ্গের ব্যবহারে অকারণে একটা আড়ষ্টতা এসে যায়।

ঢোঁড়াই সাগিয়াকে ঠিক বুঝতে পারে না। বড় দুঃখ হয়, বড় মায়া হয় তার সাগিয়াকে দেখে। দুনিয়ার দুখের বোঝা মনে হয় সাগিয়ার বুকে পাথর হয়ে জমে আছে, কিন্তু তা নিয়ে মুখে রা কাটবার মেয়ে সে নয়। সূর্যিঠাকুরের মতো, ঠিক যে সময় যে কাজটি করার দরকার, মুখ বুঁজে করে যায়, বাদলে ঢাকা পড়লেও কাজে কামাই নেই। তাকে দেখলেই ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে, ঢলাকুমারের গানের সেই রাজকন্যের কথা[১]। এত ভাল, তবু এত পোড়াকপাল নিয়ে জন্মেছে! ডাইনীবুড়ী হিংসে করে তাকে নিমগাছ করে রেখে দিয়েছে। রাজপুত্তুর ঢলাকুমারের কি তাকে চিনতে ভুল হয়? চোখের জলে বুক ভাসে ঢলাকুমারের, শুকনো নিমের গুঁড়ির উপর মাথা কুটবার সময়। আশ্বিনের মরনাধারের মতো কালো চোখদুটির তলায় কী আছে জানতে ইচ্ছা করে। সাগিয়া হাসবার সময়ও তার চোখদুটো ছলছল করছে বলে ভুল হয়। মেয়ে জাতটার অন্যগুলোর মতো নয়; তাই ঠিক বোঝা যায় না তাকে। একেবারে আপন করে টেনে নেবে, আবার দূরে দূরেও রাখবে। মজা নদী মরনাধারের মতো সাগিয়া। বান ডাকে না, পাড় ভাঙে না, আঁধি তুফানেও

১ প্রচলিত পালাগান।

ঢেউ খেলে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় উপরটা কাঁপে, নিচের শ্যাওলাটা একটু নড়ে, কেবল দুপুরের রোদ লাগলে তলের বালি চিকচিক করে। রোদ্দুরে যখন ঢোঁড়াই তেতেপুড়ে আসে, তখন চাউনিটা হয়ে যায় বৌকা বাওয়ার মতো। মুখে কিছু না বললেও দরদের পরশটুকু আদেখলে মনে বড় মিষ্টি লাগে। একে দেখলেই মন ভিজে ওঠে ঠাণ্ডা মিষ্টিরসে। এ কাছাকাছি আছে জানতে পারলেই মনটা ভরপুর হয়ে যায়।

আপনা থেকেই ঢোঁড়াইয়ের মনে আসে আর-একটা আওরতের কথা। 'পানের পাতার মতো' পাতলা ঠোঁট ছিল তার। তাকে দেখলেই দিলের উপর সাপ উল্টানি-পাল্টানি খেত। দিলের ভিতরটা হয়ে উঠত গরম। গুড়ও মিঠা, চিনিও মিঠা। তবু লোকে চিনিই চায়।

না, না, একটুও মনের উপর লাগাম নেই তার। সেই হারামজাদা আওরতটার উপর এখনও সে মন খরচ করছে। সাগিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে রামিয়ার মতো মেয়েলোকের দর 'এক কড়িতে তিনটে'। সেই রক্তের দলাটা আজ বোধ হয় তিন বছরের দামাল ছেলে। সে জিরানিয়াতে থাকলে ছেলেটাকে দুলদুল ঘোড়ার মেলা থেকে মাটির ঘোড়া কিনে দিত। এখনও হয়তো একজন দিচ্ছে। আর সেই দুষ্টু ছেলেটা হয়তো কটা মর্কটটার বুকের লাল চুলগুলোর মধ্যে খেলার ঘোড়াটা চরাচ্ছে; খা ঘোড়া লাল ঘাস খা! আর বোধ হয় খিলখিল করে হেসে ফেটে পড়ছে সেই বেজাত আওরতটা, যেটা ঢোঁড়াইয়ের সবুজ দুনিয়াটাকে গরু দিয়ে মুড়িয়ে খাইয়ে দিয়েছে।...

বাইরে কয়েকজন লোকের গলা শোনা যায়। 'কীরে ঢোঁড়াই এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছিস যে?

'আমি ভাবলাম যে আজ আবার তোদের জাতের মিটিন হবে মঠের মাঠে...'

'তুইও যেমন!'

বিল্টা ঢোঁড়াইকে টেনে মাচা থেকে নামায়। অথচ ঢোঁড়াই বাজে কথা বলেনি।

কোয়েরীদের ক্ষেতের ফসল রোজ রাতে রাজপুতদের গরু মোষ ঘোড়ায় খেয়ে যাচ্ছিল। দিন দিন বেড়েই চলেছে! একটু-আধটু ফসল খাওয়ানো, চিরকাল আছে, সব গাঁয়ে আছে। বুকে হাত দিয়ে বলুক তো দেখি কোনো ভৈসোয়ার[1] নিঝুম রাতে কলাই কুর্থির ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়

১ মোষ চরাবার রাখাল।

দু-চার গাল ফসল তার মোষকে খাওয়ায়নি। হতেই পারে না। মোষের পিঠে চড়লেই মনের ভাব ঐ রকম হয়ে যায়। মোষের গাটা চকচক করবে; হাড়-পাঁজরা ঢাকা পড়বে; ফেনায় ভরা কেঁড়েটার মধ্যে ছরর্ ছরর্ দু আঁজলা বেশি দুধ পড়বে, এর লোভ কোনো ভৈসোয়ার সামলাতে পারে না।

কিন্তু এ হচ্ছে অন্য জিনিস। একেবারে যা নয় তাই কাণ্ড! একজন সেপাই খয়নি খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে বুড়হাদাদুকে হুউ-উ পাক্কীর দিকে নিয়ে গিয়েছে, আর একজন তার ক্ষেতে একপাল গরু ঢুকিয়েছে সেই ফাঁকে।

বিল্টার ক্ষেতের বেলা কী হল! বাবুসাহেবের রাখালটা একটা উটকো গরর পিছনে ছুটল, আসল গরুর পালটা বিল্টার ক্ষেতের আলের উপর ছেড়ে। সেটা ভাব দেখাল যে, দূরের গরুটা পাছে অন্যর ক্ষেত নষ্ট করে দেয়, সেই জন্য তার ভাবনার অন্ত নেই। সব বুঝি আমরা; ওসব আমাদের মুখস্থ। কিন্তু সবচেয়ে জবর কাণ্ড করেছে মোসম্মতের যব-মটরের ক্ষেতে। রাতে ক্ষেতের পাহারাদার মাচায় ঘুমুচ্ছিল! মাচার চারিদিকে ফণীমনসার কাঁটা দিয়ে ঘিরে, তারপর মোষ ছেড়ে দিয়েছে ক্ষেতে। সে মোষ খোঁয়াড়ে দিয়েই বা কী। বাবুসাহেবেরই তো খোঁয়াড়, ইনসান আলির নামে নেওয়া। কোয়েরীদের চাইতেও মুসলমান হল আপনার লোক! এ নিয়ে ঢোঁড়াই থানা-পুলিশ করতেও ভয় পায়। দারোগাসাহেব আবার তার ঘরবাড়ি নিয়ে কী সব জিজ্ঞাসা করবে। যদি তাকে জিরানিয়া কাছারিতে যেতে হয়! না না, সে পড়তে চায় না ওসব গোলমালে।

কিন্তু একটা কিছু করতে তো হয়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সম্বন্ধে। গিধর মণ্ডলটাও আবার এখন বাবুসাহেবের সঙ্গে মিলে গিয়েছে জাতের লোকের বিরুদ্ধে। জাতের মোড়ল হয়েছেন!

বাবুসাহেবের 'ধরমপুরিয়া চাল'[১] দেখেছিস? জাতের মোড়লকে দিয়ে জাতের বরবাদ করাচ্ছে। সত্যিই প্যাঁচে, ভূমিহার আর লালা কায়েতের চাইতে কম যায় না রাজপুতরা!

তাই বিল্টা কাল দলবল নিয়ে গিয়েছিল গিধর মণ্ডলের কাছে, সে কেন জাতের লোকের বিরুদ্ধে গিয়েছে, তারই জবাবদিহি নিতে। গিধর জিব কেটে বলে, 'তা কী হয়? কী যে বলিস তোরা। আমার কি বিয়ে শ্রাদ্ধর ফিকির নেই? আমি যাব জাতের বিরুদ্ধে। জাতের সওয়ালে আমি জাতের দিকেই। আমরণ। তবে কি জানিস, ভদ্রতার জ্ঞানটা তো ধুয়ে পুঁছে ফেলতে পারি না। বাবুসাহেব যেচে আলাপ করতে চায়, আমি কেমন করে না করি!

১ এ জেলার মধ্যে ধরমপুর পরগনা কূটবুদ্ধিতে সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত।

আর জাতের মোড়ল বলে কি আর তোরা আমাকে মানিস! আজকাল জাতের মোড়ল মলহরিয়ার তাৎমা। সে ডাইনে চলতে বললে চলবি ডাইনে। বাঁয়ে চলতে বললে বাঁয়ে। কই রে বিল্টা, মোসম্মতের মানিজর সাহাবকে আনিসনি কেন সাথে? বিল্টা হেসে জবাব দিয়েছিল যে, গিধর গুরুজীর[২] সাথে মিতালি করেছে বুড়ো গিধ[৩]। এবার থেকে জ্যান্ত মানুষ খাবে। আর মানিজর এ মুখো হয়? লেজ তুলে গাঁ থেকে পালানোর পথ পাবে না।'

'বড় শয়তান তুই বিল্টা' বলে কোয়েরীরা হাসে। গিধর এ হাসিতে যোগ দিতে পারে না। শয়তানটার রসিকতার ইঙ্গিত আবার 'গরুখোর' কথাটার দিকে নয় তো! লেজ তুলে পালালো—বুড়ো শকুন।

অপ্রস্তুত হয়ে গিধর মণ্ডল বলেছিল, 'কাল সাঁঝে সকলে আসিস মঠের মাঠে। 'জাতিয়ারী' কথার বিচার করা যাবে। তোরা আমাকে জাতের বিরুদ্ধে মনে করিস সকলে!'

কোয়েরীদের জাতের সভায় ঢোঁড়াই গিয়ে কী করবে? এই জন্যই আজ ঢোঁড়াই সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিল্টার হাত থেকে কি নিস্তার আছে!

ঢোঁড়াইয়ের সুমন্ত্রণা প্রদান

টোলার সব লোক জড় হয়েছে মঠের মাঠে। বাইরের লোকের মধ্যে এসেছে একমাত্র লচুয়া হাড়ী। সবচেয়ে শেষে পৌঁছুল গিধর মড়র।

'যে জাত জেগে থাকে, সেই জাতই বেঁচে থাকে।' বলে গিধর মণ্ডল মধ্যখানটাতে গিয়ে বসে। অনেক ভেবে ভেবে কথাটা তৈরি করে সে এসেছে। এখন এগুলো বুঝলে হয়।

সবাই বলে, 'হাঁ, এ একটা কথার মতো কথা বলেছ বটে মোড়ল।'

তার মানেই হচ্ছে যে কথাটা বুঝতে পারেনি কেউ। গিধরের মনটা প্রথমেই খারাপ হয়ে যায়।

রাজপুতরা কোয়েরীদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। সেই কথাই সকলে উঠোতে চায়। আজ মোসম্মতের হয়েছে, কাল তোর ক্ষেতে হতে পারে! বল মড়র, কী করা যায়।

২ শৃগাল পণ্ডিত।

৩ শকুনি।

গিধর রাজপুতদের প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। ‘তাই বলে কি জল কাটবি নাকি ছুরি দিয়ে? কার মোষ তার ঠিকঠিকানা নেই। আগে সেটা ঠিক করে জানবি, তবে তো ভাবা যাবে তার পরের কথাটা। নীলগাইটাই এসে খেয়ে যাচ্ছে না তো?’

সকলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে। ‘নীলগাইতে ফণীমনসার কাঁটা দিয়ে গিয়েছে মাচার চারিদিকে?’ ‘যে মোষটাকে ধরে ইনসান আলির খোঁয়াড়ে দিলাম সেটাও কি কালো রঙের নীলগাই নাকি?’ ‘কী যে বল মড়র! তোমার মতো রামায়ণই না-হয় পড়তে শিখিনি, তাই বলে গাই আর নীলগাইয়ের তফাত বুঝব না।’

‘আরে তা নয়। সাঁওতালরা তীর-ধনুক দিয়ে যে নীলগাই মারল সেদিন ক্ষেতে দেখলি তো? আমি বলছিলাম যে হতেও তো পারে নীলগাই।’

গনৌরী বলে, ‘নীলগাইয়ের কথাই যদি তুললি, তবে শোন বলি, আর এক ব্যাপার। নীলগাইয়ের মাংস বিলি হচ্ছিল যখন সাঁওতালটোলায়, তখন পিথো সাঁওতালটা কী বলছিল শুনেছিস? বলছিল তোদের জমি যেগুলো বাবুসাহেব নিলাম করিয়েছে, সেগুলো আমাদের দেবে বলছে। আমি বলি নিলাম আবার করাল কবে? অনিরুধ মোক্তার বলেছে, নুটিস না নিলে নিলাম হবে না। তুই বললেই হল।’

যে কথাই পাড়ো রাজপুতদের কথা এসে পড়বেই পড়বে! গিধর মণ্ডল বিরক্ত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় বলে যে, জাঁতায় ভুট্টা পিষতে গেলে দানার মধ্যের দু-চারটে ঘুণ পিষে যাবেই। কিন্তু অনর্থক গোলমাল বাড়িয়ে লাভ কী? বলে, ‘অনিরুধ মোক্তারের চাইতেও পণ্ডিত হয়ে উঠছে সাঁওতালগুলো আজকাল।’

বুড়হাদাদা এই কথায় সায় দেয়।

একটা ছোকরা বলে, ‘বুড়হাদাদা সেই রাতের বাঁধনের কথাটা ভুলতে আর পারছে না।’

ঢোঁড়াই বিল্টাকে খোঁচা দিয়ে মনে করিয়ে দেয় যে আসলে কাজের কথা কিছু হচ্ছে না। এই জিনিসই তো চায় গিধর মণ্ডল।

‘বাবুসাহেব বোধ হয় সাঁওতালদের কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে কিছু সেলামি নিতে চায়। বিল্টা আবার বাবুসাহেবের কথা তুলেছে। গিধর আর একবার কথার মোড় ঘুরোবার চেষ্টা করে।

‘জাতের কে কে নীলগাইয়ের মাংস খেয়েছিলি সেদিন?’

প্রায় সকলেই দোষী। কেউ জবাব দেয় না।

এ আবার কি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল !

বিল্টা বলে, 'আসল কাজের কথায় এস 'মড়র' ! আমি চাই জাতের তরফ থেকে আমাদের মেয়েদের রাজপুতদের বাড়ি কাজ করা বন্ধ করে দাও। পৈতা নেওয়ার পর থেকে কুশবাহাছত্রি মরদরা রাজপুতদের বাড়ির এঁটোকাঁটার কাজ বন্ধ করে দিল। তবে মেয়েরা করে কেন সে কাজ এখনও ? আমাদের টোলার তিন-তিনটে মেয়ে বিয়ের পরও শ্বশুরবাড়ি যায় না। সেখান থেকে নিতে এলেও তাদের বাপ-মা 'রোকশোদি'[১] করায় না। কেন শুনি ? পরগনা সুদ্ধু লোক এ কথা জানে। আমার সাফ-সাফ কথা, রাজপুতদের বাড়ি দাইয়ের কাজ করা বন্ধ করে দাও। ঘরের বেড়ায় মেমের ছবি টাঙিয়েছে লছমনিয়া ; পেলে কোথা থেকে ?

তুলকালাম আরম্ভ হয়ে যায় মঠের মাঠে। বুড়হাদাদু ঠকঠক করে কাঁপে। হল কী কালে কালে ! এখনও তবু তার ছেলের বৌটা রাজপুতদের বাড়ি কাজ করে যাহোক দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে। 'নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারিস না রে বিল্টা। তবে হ্যাঁ, যে মেয়েদের বয়স কম, তাদের জন্যে একটা নিয়ম করলে হয় !'

খেঁকিয়ে ওঠে একসঙ্গে কয়েকজন।

'আমার মেয়ে লছমনিয়াকে ঠেস দিয়ে কথা বললি, সে বাবুসাহেবের বাড়ি কাজ করে বলে ?'

'তোর ছেলের বৌয়ের বয়স দেড় কুড়ি হয়েছে বলে কি তার চরিত্তিরটা দুধ দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করা হয়ে গিয়েছে ?'

'তোর চুরির জন্য আমাদের এই হালত আজ, আর তুই দিস আমার মেয়েকে খোঁটা ?'

বিল্টার আর ধৈর্য থাকে না। সে কারও কথায় কান না দিয়ে গিধরকে বলে, 'কী গিধর মণ্ডল ! তুমি যে মুখে রা কাটছ না, রাজপুতদের বিরুদ্ধের কথা বলে ? পহরে পহরেও তো একবার তোমার বুলি শোনাবে। তুমি একবার 'জিব নাড়লেই' তো রাজপুতী 'ময়লা' সাফ হয়ে যায়।'[২]

রাগে গিধর মণ্ডলের সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। তবু মুখে হাসি এনে বলে, 'এটা কি কুশবাহাছত্রিদের জাতের মিটিন নাকি যে এখানে জাতের তরফ থেকে ফয়সলা হবে কোনো জিনিসের ?'

১ দ্বিরাগমন।

২ দ্ব্যর্থবাচক কথাগুলি। ময়লা কথাটির অপর একটি অর্থ বিষ্ঠা। জিব নাড়ানোর একটী অর্থ কথা বলা।

সকলে অবাক হয়ে যায়। একটা জাতের মিটিন না! তবে যে কাল বললে সকলকে এখানে জুটতে? সব সময় একই মুখ দিয়ে কথা বল, না আর একটা মুখ আছে তোমার?'

এতক্ষণে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে গিধর মণ্ডল।

'জাতের মিটিন হবে, সে আবার আমি কখন বললাম! জাতের মিটিন হলে এর মধ্যে লচুয়া হাড়ী এসেছে কেন? ওই তাৎমাটা এসেছে কেন? তন্ত্রিমাকোয়েরী বলেও কি একটা নতুন জাত সৃষ্টি হয়েছে নাকি আজকাল? না হয়ে থাকলেও হবে। কী বলিস চৌকিদার?'

লচুয়া চৌকিদার ছাড়া কথাটার ইঙ্গিত এই উত্তেজনার মধ্যে কেউ খেয়াল করে না।

'সব জিনিসে কেবল মারামারি, কাটাকাটি এ গাঁয়ে!'

গিধর মণ্ডল ধড়মড় করে উঠে পড়ে। 'এই সব দলাদলির মধ্যে থাকা আমার অভ্যাসও নেই, আর আমনসভার 'মুখিয়া' হয়ে আমি তা করতেও পারি না।'

ঢোঁড়াইয়ের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে সে চলে যায়।

'ওরে আমার অভ্যাস না-রাখনেওয়ালা! দেরি হয়ে যাচ্ছে; যা শিগগির কানী মুসহরনীর কাছে অভ্যাস বদলাতে!'

এতক্ষণে লচুয়া চৌকিদার বলে যে, গিধর মণ্ডল তাকে আসতে বলেছিল, আপনসভার বৈঠক হচ্ছে বলে।

তাই নাকি! হারামীর বাচ্চা, গরুখোরটা।

'আবনসভার মিটিনের 'রপোর্ট' মাসে একটা না পাঠালে দারোগাসাহেব চটে যে।'

অনেক আশা করে আজকে সকলে জাতের সভা করতে এসেছিল, সাঁঝের ভজন বন্ধ করে। যে লোকগুলো সাঁঝের ভজনে আসে, সেইগুলোই শাদি আর শ্রাদ্ধের ভোজে যায়, বিষহরির আর রামনবমীর পুজো করে, রামখেলিয়া আর ভমরের গানের আসর পাতে। কিন্তু যেদিনের যে কাজ! আজ কি আর এখন 'জাতিয়ারী' সভার জন্য তৈরী করা মন, ভজনে বসে! সে কথা কেউ ভাবতেও পারে না। ঐ শালা গিধরটার জন্য কি জাতের কাজ আজ টকরসে জারানো থাকবে? তুই কী বলিস ঢোঁড়াই?

আরে জাতের সওয়াল তো জাতের সওয়াল। তাই বলে কি তুই কিছুই বলবি না? এখানে না থাকলে কি আর বলতাম তোকে। জাতের ব্যাপারে

কি আর আমরা রামনেওয়াজ মুন্সির কাছে যাই না নাকি? আরে তোর গায়ে তো তন্ত্রিমাকোয়েরীর ছাপ দিয়ে দিয়েছে জাতের মোড়ল নিজে।

বুড়হাদাদু বিল্টার শলাতে ভরসা পায় না। ও ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে! ধান ভানবার সময় বাড়ি মারতে হয় আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে। তবে না গোটা চালটা বেরিয়ে আসবে। জোরে বদাম করে মার, একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে চাল। এই সোজা কথাটা বিল্টা বোঝে না।

ঢোঁড়াই কেন বিল্টাও বোঝে যে, এই অভাব-অনটনের দিন কোয়েরী মেয়েরা রাজপুতদের বাড়ি কাজ করা বন্ধ করতে পারে না। ঠিক হয় কোয়েরীটোলার মেয়েদের বিয়ের দু বছরের মধ্যে 'রোকশোদি' করাতে হবে। যেমন করেই হোক এই সব মেয়েদের নিয়েই জাতের দুর্নাম হয় সবচাইতে বেশি। এতে রাজপুতদের বলার কিছু নেই।

গনৌরী কথা তোলে, কোয়েরীটোলার মেয়েরা বাবুদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে বলে কি রাজপুত মরদের কাপড় কাচবে নাকি?

সকলেই আশ্চর্য হয়, এত বড় অপমানের কথাটা তাদের এতক্ষণ মনে পড়েনি দেখে। গনৌরীটা কথা বলে কম! কিন্তু বলে বড় সময়মতো কাজের কথা।

সকলেরই মনে মনে গর্ব হয়; যাক! রাজপুতদের বিরুদ্ধে তবু তারা জবর একটা কিছু করতে পেরেছে! কিন্তু মোড়ল যে চলে গেল; ওটা আবার নীলগাইয়ের মাংস খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে গোলমাল-টোলমাল না করে! বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঐ কথাটাই তুলছিল মোড়ল! পৈতা নেওয়ার পর থেকে নীলগাইয়ের মাংস খাওয়ার সুযোগ কোয়েরীটোলার লোকের এর আগে হয়নি। বিবেকের দংশনটাই বোধ হয় মোড়লের কথা বার বার মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। অর্থাৎ আজকের নীলগাইয়ের আপদটা সেকালের নীলকর সাহেবের মতনই বড় আপদ হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই সকলকে সাবধান করে দেয়, 'দেখ, আজ থেকে আর কেউ নীলগাই বলবি না। বলবি বনহরণা[১], সাঁওতালরা যা বলে। সবাই এই মঠের মাঠে অশথ গাছের সমুখে হলপ নে, কেউ কথার খেলাপ করবি না। গিধর মোড়লের বাপ মোড়ল এলেও 'বনহরণা'র মাংস খেলে 'হুক্কাপানি'[২] বন্ধ করতে পারবে না।

'বনহরণা! খুব মাথায় খেলেছে যা হোক ঢোঁড়াই তোর। রামনেওয়াজ মুন্সির শাগরেদ হলি না কেন তুই?'

---

১ বনহরিণ। যথার্থ হ নীলগাই এক শ্রেণীর হরিণ।

২ হুঁকো জল। একঘরে করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বনহরণা! এত বড় একটা প্রশ্নের এত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে, তা কেউ আগে কল্পনাও করতে পারেনি।

আলবাৎ চোখা বুদ্ধি ঢোঁড়াইটার!

বনহরণা! বনহরণা!

হঠাৎ হাসির ধুম পড়ে যায় সভায়। বনহরণা!

বুড়হাদাদুর হাসতে হাসতে কাশি এসে যায়। বিল্টার পর্যন্ত হাসতে হাসতে জল এসে গিয়েছে চোখে।

'ম'ল বুঝি বুড়োটা এবার!'

তত্রিমাকোয়েরী কথাটা ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। গিধরটা তাকে ঠাট্টা করে গেল; আর সে জবাব দিতে পারলে না কথাটার! দিতে পারত সে জবাব ঠিকই। ইচ্ছা করেই সে কিছু বলেনি। একটা কিসের বাধা ছিল, সংকোচ ছিল তার মনে।

না, আর কেউ কথাটা ধরতে পারেনি বোধ হয়!

পরিষ্কার সামনাসামনি দু'পক্ষের লড়াই জিনিসটা ঢোঁড়াই ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে। এ কেমন যেন অনেক দলের লড়াই, অনেক লোকের লড়াই, অনেক রকমের ঝগড়ার মুখ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কে কোন দলে, কোন দল কখন কোন দিকে বোঝা যায় না। হরেক ধন সামলাতে লাগে লড়াই, অথচ একা হাতে লড়া যায় না। তাকে একা পেয়েই না তাৎমাটুলির 'পঞ্চ'রা তাকে যা করবার নয় তাই করেছিল। এই একা লড়া যায় না বলেই লোকে জাতের দুয়োরে মাথা কোটে। তাই না বচ্চন নিং অন্য রাজপুতদের রোজ সন্ধ্যাবেলায় শিদ্ধির শরবত খাওয়ায়। জাতের বাইরে যে লোকের সাহায্য পাওয়া যায়, তার কাছেই লোক আপনা থেকেই ছুটে যায়। তাই বাবুসাহেব যায় মুসলমান ইনসান আলির কাছে, তাই না বাবুসাহেব টানে লালাকায়েত রামনেওয়াজ মুন্সিকে তার দিকে। তাইজন্যেই না কোয়েরীরা ঢোঁড়াইয়ের মতো রামায়ণ না-পড়া-লোকেরও সাহায্য চায়। রাজপুতরা তাদের চাইতে বেশি বুদ্ধি রাখে। তারা কোয়েরীদের মোড়লকে দল থেকে ভাঙিয়ে নেয়; নিক তো দেখি কোয়েরীরা একজনও রাজপুতকে, তাদের দল থেকে ভাঙিয়ে। সাঁওতালদেরও কি বাবুসাহেব নিজের দিকে করেছে? পিথো খামকা মিথ্যে বলবে কেন।

সাগিয়া গোয়ালঘরে আগুন জ্বালাতে এসেছিল ধোঁয়া করবার জন্য। ঢুকতেই ঢোঁড়াই জিজ্ঞাসা করল, কী সব হল 'জাতীয়ারী সভায়'? তামাক

খাওয়ার শব্দ শুনে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে মোসম্মতও শোয়নি এখনও এই খবর শোনবার জন্য।

নিজে এসে জিজ্ঞাসা করুক, তবে ঢোঁড়াই বলবে তাকে খবর! নইলে দায় পড়েছে ঢোঁড়াইয়ের।

সাগিয়া সব শুনে যাওয়ার সময় বলেছিল, 'এত পাপও কি ধরতিমাই[১] সহ্য করতে পারে!'

ধরিত্রীদেবীর কোপ

সাগিয়ার কথা বোধ হয় ধরতিমাইয়ের কানে গিয়েছিল।

সে কী ধরতিমাইয়ের সাড়া![২] গম্‌-গম্‌-গম্‌-গম্‌! গুড়গুড়—গুড়গুড়! এককুড়ি মেঘের ডাক যেন টগবগ করে ফুটছে তাঁর বুকের ভিতর! হুংকার ছাড়ছেন ধরতিমাই। বুকখানা তাঁর ফেটে যাবে বুঝি এবার! যা ভাবা, তাই কি হল! চড়চড় করে তামাকক্ষেতের মধ্য দিয়ে জমিটা ফেটে গেল। ফোয়ারা দিয়ে বাতাস সমান উঁচু জল আর বালি বেরুল, ফাটলের মধ্যে দিয়ে এখানে, ওখানে অগুন্‌তি জায়গায়। অগুনতি হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলছে পাতাল থেকে। শব্দ থামেই না, শব্দ থামেই না! কুয়োটা গবগব করে জল বমি করছে। চারিদিকে বালির সমুদ্দুর ভুরভুর কাটছে। তামাকক্ষেত কখন ডুবে গিয়েছে জল-বালির মধ্যে, তা ঢোঁড়াই লক্ষ্যও করেনি। ভয়ে ঢোঁড়াই রামচন্দ্রজীর নাম পর্যন্ত ভুলে যায়। দুনিয়াটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে এইবার! আর রক্ষে নেই তার! কোথায় তলিয়ে যাবে সে! হঠাৎ কেন যেন আবছাভাবে মনে হয়, একমাত্র ঐ দূরের উঁচু পাক্কী সড়কে যেতে পারলে তার প্রাণটা বাঁচতে পারে। ঢোঁড়াই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয় পাক্কীর দিকে। দৌড়ান কি যায়। কাদা-বালির মধ্যে টলে টলে পড়ছে সে। অসম্ভব! এই তামাকক্ষেতটুকু পার হতেই তার জন্মযুগ কেটে যাবে। তাৎমাটুলির সেই আওরতটার মুখ হঠাৎ মনে পড়ে... তিন চার বছরের নেংটা ছেলেটা ভয়ে তার বুকে মুখ গুঁজছে···

'এগে মাইয়া গে! এ ঢোঁড়াই! জান গেল রে!'

১ ধরিত্রী দেবী।

২ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪। বিহার ভূমিকম্প।

সাগিয়ার গলা। ঢোঁড়াই থমকে দাঁড়ায়। এতক্ষণ সাগিয়ার কথা মনেই পড়েনি। তামাক ক্ষেতে তারা কাজ করছিল। ঢোঁড়াই ফিরে দেখে যে, সাগিয়ার কোমর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে একটা ফাটলের বালির মধ্যে। মায়েঝিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। ঢোঁড়াই আর মোসম্মত মিলে ধরাধরি করে সাগিয়াকে টেনে তোলে। মা-বেটিতে ঢোঁড়াইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসে। তারা দুজনেই তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে ভয়ে। তাদের বুকের ধুকধুকুনিটা পর্যন্ত যেন ঢোঁড়াই শুনতে পাচ্ছে। বেশ নূতন নূতন লাগে ঢোঁড়াইয়ের। বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে কত কী বলে যায়।

…বকরির কানদুটো ধরলে ব্যা-ব্যা করে ডাকবার সময় তার চাউনিটা কেমন হয়ে যায় লক্ষ্য করেছিস ঢোঁড়াই? আমার মেয়ের চাউনি হয়ে গিয়েছিল সেই রকম।…সাগিয়া, তোর কোমরে মাজায় লাগে-টাগেনি তো?…আমি ভাবলাম, আমার কপাল বুঝি পুড়ল। তুই না থাকলে কি করতাম ঢোঁড়াই, ভাবতে গেলেও বুক শুকিয়ে যায়।…

ঢোঁড়াই সব কথা ভাল করে শুনছেও না। মন চলে গিয়েছে তাৎমাটুলিতে। সেখানে কে কেমন থাকল। ছেলেটা।…আর তার মা-টাও। ছেলের মায়ের অমঙ্গল সে চায় না। দোষ রামিয়ার নয়, দোষ ঢোঁড়াইয়ের কপালের। পচ্ছিমা আওরতটা, কখনোই ঢোঁড়াইয়ের মায়ের মতো ব্যবহার করবে না তার ছেলের সঙ্গে। সব মা সেরকম হলে পাপের ভারে রোজ আজকের মতো ভূমিকম্প হত। এই সাগিয়াকেই দেখ না, এখনও মরা ছেলেটার কথা মনে করে চোখের জল ফেলে। ঢোঁড়াইয়ের সংসার যদি 'হরাভর'[1] থাকত, তাহলে বাঙালী বাবুভাইয়াদের ছেলের মত আরামে রাখত সে ছেলেটাকে। মায়ের দুধের উপরও মোষের দুধ কিনে খাওয়াত। ভগবানের সেরা দান ছেলে। তার নিজের জাত-বেরাদারই যখন তার হাত কেটে নিয়েছে, তখন সে দোষ দেবে কাকে। দোষ তার আগের জন্মের কৃতকর্মের। …ছেলেটার চেহারা যদি সেই কটা মর্কটটার মতো হয়। ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। এ কথা কত সময় তার মনে হয়েছে। ছেলের কথা মনে হলেই এই কথাই সব চাইতে আগে মনে হয় তার। না, তার মন বলছে যে, তা হতেই পারে না! রামচন্দ্রজী আছেন। কখনও হতে পারে না—যত পাপই সে করে থাকুক আগের জন্মে। তার ছেলে পর হয়ে যেতে দিয়েছে সে, কিন্তু মনের এই সান্ত্বনাটুকুকে কেড়ে নিতে দেবে না সে কাউকে, খোদ

১ সবুজ। সোনার সংসার।

রামচন্দ্রজীকেও না। তা হলে সে কি নিয়ে থাকবে।···খৃষ্টান হলেই কি রামচন্দ্রজীর রাজ্যের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে হয় নাকি?···দুটোকেই বাঁচিও রামজী, আজকের বিপদ থেকে ; তারা খৃষ্টান হয়নি। ·· কার হাতের কাঁপুনি কার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। শিরশির করে মনে-পড়াগুলো উঠছে ঢোঁড়াইয়ের মাথার দিকে।

হঠাৎ নজর পড়ে সাগিয়ার দিকে। একটা কী বুঝবার চেষ্টা করছে। ঢোঁড়াইয়ের চোখ-মুখের উপরের লেখাটার মানে বোধ হয়।

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটাবার জন্যে ঢোঁড়াই সাগিয়াকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেয়—'যাক, তোর মা'র রাগটা পড়েছে, এই হিড়িকে।' বাড়ির থমথমানিটা যাওয়া কম লাভ নয়।

মোসম্মতের কান্নার লক্ষ্য ততক্ষণে গিয়ে পড়েছে বালি ভরা তামাক-ক্ষেতটার উপর। আপন বলতে ভগবান আর কী রেখেছেন তার, ঐ মেয়ে আর জমি ছাড়া। তাতেও কি চোখ টাটাচ্ছে তাঁর।

সাপ দেখলে শালিখ পাখির ঝাঁক যেরকম কিচিরমিচির করে, সেই রকম একটা অবিচ্ছিন্ন হট্টগোলে গাঁয়ের আকাশ-বাতাস ভরে গিয়েছে। রাজপুত-টোলার দিক থেকেই চেঁচামেচিটা আসছে।

'যাস কোথা ঢোঁড়াই?'

এ সময় একজন মরদ কেউ কাছে না থাকলে ভয় করে মোসম্মতের আর সাগিয়ার।

'এই এলাম বলে।'

ন্যায়বিচারের হদ্দ করেছ রামচন্দ্রজী। গাঁয়ের যে বাড়ি যত বড়, সে-বাড়ি ভেঙেছে তত বেশি। কোয়েরীটোলার খড়ের বাড়িগুলো কিছু লোকসান হয়নি। পাকা দালানে ভরা রাজপুতটোলার রূপ হয়েছে শুয়োর চরাবার পর কচুর ক্ষেতের মতো। বাবুসাহেবের বাড়ির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে মাটির ফাটলটা। দালানটাকে একেবারে দু টুকরোয় ভাগ করে দিয়েছে। ছাতের একদিক থেকে আর একদিকে যাওয়া শক্ত।

এর মধ্যেও বিল্টা ফিসফিস করে বলে, একেবারে গঙ্গাজী চলে গিয়েছে ছাদের মধ্যে দিয়ে—

পয়সা, পয়সা!

এক পয়সা!

পয়সা ফেকো!

লালা দেখো!

কালী কলকত্তাবালী পুল!

গঙ্গাজীর উপর!

এর মধ্যেও তোর হাসি-মশকরা আসে? মুখে বলে বটে ঢোঁড়াই। কিন্তু বহুকাল পরে রামচন্দ্রজী ভগবান এই অন্ধ দুনিয়াটাকে দেখিয়েছেন তাঁর ন্যায়বিচারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। 'চার কাঙলা, তো এক বাঙলা।'[১] চারজন গরীব থাকলে তবে একটা পাকা দালান হয়। থাক পাকা দালানে আরাম করে গিধর মণ্ডল। কোয়েরীটোলার মধ্যে ঐ একটা বাড়িই গিয়েছে। খড়ের বাড়িগুলোর আর যাবে কী! একটু-আধটু বাঁশ-খুঁটি নড়েছে কোনো কোনোটার।

কিন্তু এতটা কড়া না হলেও পারতে রামজী, রাজপুতটোলার মেয়ে আর বাচ্চাদের উপর। তারা কি এই শীতের মধ্যে সারারাত বাইরে বসে থাকতে পারে!

সব চাইতে অবাক কাণ্ড হল জল নিয়ে। সেবার কলেরার সময় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে টিউবওয়েল বসিয়ে গিয়েছিল মঠের মাঠে। সেটাতে জল ওঠেনি। মিস্ত্রিরা বলে গিয়েছিল যে, সদর থেকে আরও নল এনে পুঁতে দেবে। তাহলেই জল উঠবে। মিস্ত্রিরা সেই যে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি বিসকান্ধায়। সেই কলটাতে ভূমিকম্পে হঠাৎ জল এসে গিয়েছে!

রাজপুতদর্পহারী অবধবিহারী রামচন্দ্রজীর অদ্ভুত লীলা! বিসকান্ধায় সব কুয়ো ইঁদারা বালিতে ভরে গিয়েছে। রাজপুতটোলার লোকদের এবার থেকে পায়ের ধুলো দিতে হবে কোয়েরীটোলায়, কল থেকে জল নেওয়ার জন্য। ইঁদারার ফুটানি দেখাত এতদিন!

সাগিয়া ঢোঁড়াই সংবাদ

ভূমিকম্পের হৈ-হল্লার মধ্যে গাঁয়ের ঝগড়া-দলাদলির ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। বাবুসাহেবের ছোট ছেলে লাডলীবাবু ফিরে আসেন গাঁয়ে; সরকার মহাত্মাজীর চেলাদের ছেড়ে দিয়েছে জেল থেকে ভূমিকম্পের জন্যে। মঠের টিউবওয়েলটাতে চব্বিশ ঘণ্টা মেলা লেগে রয়েছে। দু-ক্রোশ দূরের কুশীতে স্নান করতে যেতে হয় সকলকে। সেখান থেকে মেয়েরা কলসীতে করে জলও নিয়ে আসে। নইলে কলতলাতে রাজপুতদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি

১ স্থানীয় প্রবাদ।

করে জল নেওয়া সে কি মোসম্মত ছাড়া যে-সে মেয়ের কর্ম। তাছাড়া হাজার হলেও রাজপুতরা 'ভালা আদমী'[১]। ঘি-দই খাওয়ার মুখ দিয়ে ভগবান তাদের পাঠিয়েছেন। কোয়েরীরা সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করলেই তারা যদি একটু আরাম পায় তো পাক। এতে কোয়েরীদের পয়সা খরচ নেই। তবে হ্যাঁ, চোখ রাঙিয়ে যদি কলে জল নেওয়ার 'হক' দেখাতে আসত, তাহলে ছিল আলাদা কথা।

দু-ঘড়া জল দু-ক্রোশ বয়ে আনা, এ কি চাড্ডিখানি কথা। সাগিয়া দু-ঘড়া জল নদী থেকে এনে রেখে যেন ধুঁকছে। শক্তি ছিল তাৎমাটুলির সেই 'পচ্ছিমা' মেয়েটার। তিনটে জলভরা কলসী একসঙ্গে নিয়ে আসবার সময় এক ফোঁটা জলও উছলে পড়ত না তার গায়ে। সব সময় ঢোঁড়াই সেইটার সঙ্গে সাগিয়াকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। উঠানের মধ্যে কুয়ো না হলে চলত না সে মেয়েটার। সাগিয়ার কিন্তু কোনো আবদারের বালাই নেই। নিজে দিয়েই খুশী; যা পায় তাতেই খুশী। দাবি কিছুর নেই। সেটা ছিল সোহাগী বিল্লি। যত দাও, তত তার চাই; তৃপ্তি আর নেই কিছুতেই! শীতের রাতে কম্বলখানির ভাগ চাই; তবে তিনি আরামে গরব গবর শব্দ করতে করতে ঘুমোবেন। ঘুমের ঘোরে লেজে হাত পড়ে গেলে আঁচড়াতেও কসুর করবেন না।

ভাগ্যে সাগিয়া পচ্ছিমের তরিবত শেখোন। তাই ঢোঁড়াই এক মুহূর্তের জন্য ভাববার অবকাশ পায়নি যে, সে কোনো বিষয়ে সাগিয়ার চাইতে ছোট।

এ অঞ্চলের কুয়ো খোঁড়ার কাজ করে 'নুনিয়া'রা। তারা আগে মাটি থেকে সোরা আর নুন বার করবার কাজ করত। নিমকের হল্লার সময়. এরাই মহাত্মাজীর চেলাদের নিমক তৈরি করতে শেখাত! তাই এদের উপর পুলিশের নজর ছিল তিন-চার বছর থেকে। কলস্টরসাহেবের হুকুমে ভূমিকম্পের পরদিনই দারোগাসাহেব ডাকতে পাঠায় থানার সব নুনিয়াদের। 'মুলুক জুড়ে' কুয়ো পরিষ্কার করবার কাজ করতে হবে বলে। তারা বিশ্বাস করতে পারেনি চৌকিদারের কথা। একবার থানায় গেলে দারোগা জেলের খিচুড়ি খাওয়াবে, সেই ভয়ে সবাই নিজের নিজের গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিল।

কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ তাৎমাটুলির লোকের কাছে নূতন নয়। সাগিয়ার বড় কষ্ট হচ্ছে নদী থেকে জল আনতে। ঢোঁড়াইয়ের জীবনের উপর দিয়ে একটা করে বিপদের ঝাপটা কেটে যাওয়ার পরই সে দেখেছে যে,

১ ভাল লোকের অর্থ বড়লোক, জিরানিয়া জেলাতে।

কিছুদিনের মধ্যে রামচন্দ্রজীর কৃপা অজস্র ধারে তার তুনিয়াটুকুর উপর পড়েছে। নতুন করে কাজে উৎসাহ পাচ্ছে সে।

সাগিয়া ঢোঁড়াইকে বারণ করে, না, না, ঢোঁড়াই, তুই নামিস না ইঁদারার মধ্যে। ঐ দেখতে মনে হচ্ছে বালিতে ভরে গিয়েছে কুয়োটা, কিন্তু ভিতরে পাতালে কী আছে, কে জানে।

ঢোঁড়াই হেসে বলে, 'ধরতিমাই সীতাজীকে পাতালে টেনে নিতে চান। আমার মত অচল টাকাতে তাঁর দরকার নেই।'

সাগিয়ার মুখে সলজ্জ হাসির আভাস ফুটে ওঠে। 'তুই-ই তো টেনে তুলেছিলি।'

'তুলেছিলাম কি আর সাধে। জান গিয়া রে ঢোঁড়াই বলে কী চিৎকার।'

'জানের ডর নেই কার? তুই দৌড়ুচ্ছিলি কেন পাক্কীর দিকে? সে সময় তো আমাদের কথা মনে হয়নি।'

কথাটা সত্যি। ঢোঁড়াই লজ্জিত হয়ে যায়। বালি-ভরা বালতিটা সাগিয়ার হাতে দেয়।

ঢোঁড়াই বালি তোলে কুয়ো থেকে, সাগিয়া বালতি-ভরা বালি দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসে।

সত্যিই 'পাক্কীর' সঙ্গে তার নাড়ী বাঁধা। লাঙলের ফালের দাগ যেন 'পাক্কী', আর তার দু-পাশের গাছের সার, হলরেখার দু-ধারের উঁচু মাটি। জীবন কেটেছে ঐ গাছের আওতায়, গোঁসাই-থানে, শীতের হিমে, বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের লু-বাতাসে। পাক্কীর ধারের মাটি-কাটার গর্তগুলো দেখলেই তার মনের মধ্যে ভিড় করে আসে, শনিচরা, বৃদ্ধ, ঠিকেদারসাহেব, ওরসিয়রবাবু, আরও কত কে। সবাই তারা ছিল ভাল লোক। সেখানকার সেই ছেলেটা আর তার মা, আর এখানে সাগিয়া, এই তুইয়ের সংযোগের সূত্র এই পাক্কী। তাই না তার মন এখান থেকে ছুটে ওখানে যায়; ওখান থেকে ছুটে এখানে আসে। সেখানে ঘা খেয়ে, এই পাক্কী ধরে এসেছিল বলেই তো, আজ এখানকার সাগিয়া বিপদে পড়লে জান বাঁচানোর জন্যে তাকেই ডাকে। বর্ষায় দু-ধার জলে ডুবে গেলেও মাথা উঁচু করে থাকে রাস্তাটা। পাক্কী ঢোঁড়াইয়ের কাছে নির্ধিন্নতা, দৃঢ়তা, আর বিশালতার প্রতীক! তাই সে ছুটে যাচ্ছিল পাক্কীর দিকে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।

'বুঝলি সাগিয়া, এই পাক্কী ধরে এসেছিলাম বলেই তো এখানে পৌঁছেছিলাম।'

'তবু ভাল। চুপ করে থাকতে দেখে আমি ভাবলাম বুঝি আমার কথায় গোসা হল সাহেবের। দেখেছিস তো পাক্কীর ফাটলগুলো। সেদিন ছুটে মলহরিয়াতে যেতে চাইলেও যেতে হত না।'

সাগিয়া ঠাট্টাই করছে, না তার ছুটবার একটা মন গড়া মানে করে নিয়েছে, তা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না! গল্পে গল্পে কুয়োর বালি তোলার কাজ চলে। শীতের দিনের সাগিয়ার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে! দেখতে রোগা না হলেও সাগিয়া বড়ই ক্ষীণজীবী।

'আর বেশি পারবি না সাগিয়া। এ কি মেয়েমানুষের কাজ। আমি বরঞ্চ বিল্টাকে ডেকে নিয়ে আসি!'

'না।'

ছোট্ট জবাব। রামিয়া হলে নিশ্চয়ই বলত, 'হয়েছে, আর মরদগিরি ফলাতে হবে না।' ক্ষেতে সাগিয়ার সঙ্গে বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু আজকের মত এত তৃপ্তি কোনোদিন হয়নি ঢোঁড়াইয়ের কাজ করে। এক থালায় ভাত খাওয়ার মতো। সেই রকমই আপন-আপন লাগছে।

বিল্টাকে ডেকে আনতে হয় না। খালি বিল্টা কেন, গুটিগুটি পাড়ার সব লোক এসে জোটে কেবল জোটে না, ঢোঁড়াইকে সাহায্যও করে। কুয়োর বালি তোলার কাজ এত সোজা, তা আগে জানা ছিল না।

সাঁঝের খানিক আগে লাডলীবাবু পর্যন্ত এসে ঢোঁড়াইয়ের পিঠ ঠুকে তারিফ করে যান।

'এই তো চাই। নইলে সরকারের ভরসায় বসে থাকলেই হয়েছে। পাক্কীর ফাটল মেরামত হবে, তবে আসবেন হাকিম সাহেবরা হাওয়া-গাড়িতে! আলবাত নজির দেখিয়েছে কোয়েরীটোলা! পথ দেখাতে পারলে কি আর সাথে চলার লোকের অভাব হয়? এবার বিসকান্ধার সব কুয়ো ঢোঁড়াই তোমার দলকে করতে হবে। এই তো কাংগ্রিস আর মহাৎমাজীর হুকুম।'

কৃতার্থ হয়ে যায় ঢোঁড়াই। সে অবাক হয় একই মায়ের পেট থেকে লাডলীবাবু আর অনোখীবাবু তুজন তুরকমের লোকের জন্ম হয় কী করে!

ঢোঁড়াই! ঢোঁড়াই!

এর পর চারিদিকে কেবল ঢোঁড়াইয়ের নাম। সকলের ক্ষেত থেকে বালি সরাবার কাজের উদ্ধারক করে ঢোঁড়াই, কিন্তু কেন যে সে কুয়োর বালি তোলার কাজ আরম্ভ করেছিল, মনের কোণের সেই গোপন খবরটা সে কাউকে জানতে দেবে না। সেটা ঢোঁড়াইয়ের নিজের জিনিস।

কলির রঘুনাথ মহাৎমাজী। তাঁর চেলাদের বলে 'কাংগ্রিস'। বিলেত থেকে এসেছিল লাল টকটকে সাহেবের দল ভুমিকম্পের লোকসান দেখবার জন্য। কাংগ্রিসের লোকের সঙ্গে গঞ্জের বাজারে যাওয়ার পথে বিসকান্ধায় লাডলীবাবুদের বাড়ি হয়ে যায়। অতিথ-অভ্যাগতকে 'আলবৎ খাতিরদারি'[১] করতে পারে বাবুসাহেবরা। 'পুরি' খেল না। লোটা-ভরা গরমাগরম মোষের দুধের মধ্যে থলে থেকে বার করে চায়ের পাতা দিল। লাডলীবাবু তাড়াতাড়ি নতুন তোয়ের করা খড়ের ঘরটা থেকে একথালা ভুরা এনে দিলেন। হাকিম-দারোগারা ইদানীং বাবুসাহেবের বাড়িতে আসতেন না, তাই চা ছিল না তাঁদের বাড়িতে; নইলে অমন দশটা সাহেবকে মোষের দুধে নাইয়ে দিতে পারে বাবুসাহেব।

এই দলের সঙ্গে লাডলীবাবুও গিয়েছিল গঞ্জের বাজারে। ফিরে এসে খবর দেয়, কাংগ্রিস থেকে সাহায্য করবে লোকদের, বিশেষ করে গরীবদের। নতুন নতুন কুয়ো খুঁড়িয়ে দেবে; মাটির পাট নয়, সিমেণ্টের পাট দেওয়া। লাখ লাখ বস্তা সিমেণ্ট এসেছে, জিরানিয়াতে মাস্টার সাহেবের আশ্রমে। বাঁশ, খড়, কাঠের তো কথাই নেই। এই সরসৌনী থানার রিলিফ দেওয়া হবে লাডলীবাবুর 'রিপোর্ট'-এর উপর। তাই জন্যেই সরকার ছেড়ে দিয়েছে কাংগ্রিসের লোকদের জেল থেকে। কোথায় গেল এখন সাহেবি-টুপি-পরা সরকার? কত ধেনো জমি বালি পড়ে উঁচু হয়ে গেল, তার খবর নিয়েছে নাকি, ঐ খাসী খাওয়ার যম দারোগাসাহেব?

বড় সাচ্চা লোক লাডলীবাবুটা। সে কাংগ্রিসে বলে দিয়েছে যে, তার নিজের গাঁ বিসকান্ধার 'রিপোর্ট' যেন উপর থেকে কাংগ্রিসের লোক এসে নিয়ে যায়। গাঁয়ের সবাই তার পরিচিত। কাকে ছেড়ে সে কাকে দেবে। সত্যি, দৈত্যকুলে এমন প্রহ্লাদ জন্মাল কি করে। যেদিন লাডলীবাবু প্রথম জেল থেকে এল, সেদিন বাবুসাহেব সিধা হুকুম দিয়েছিল যে, এক হপ্তার মধ্যে তাকে কাংগ্রিস ছাড়তে হবে। লাডলীবাবুটাও নাকি রুখে জবাব দিয়েছিল, তোমাকে এক হপ্তার মধ্যে জজসাহেবের সেসরী ছাড়তে হবে। অমনি জোঁকের মুখে নুন, এঁটুলির গায়ে চুন। সবে বলে বাবুসাহেব আড়াইশ' টাকা খরচ করে 'সেসরীতে' আবার নাম ঢুকিয়েছে।

---

১ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন।

লাডলীবাবু আবার বলেছে যে মহাৎমাজী আসবেন জিরানিয়ায়। ভূমিকম্পে মুলুকের লোকসান দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে। এত বড় 'সন্ত' তিনি যে আঙিনার কোণের সরষে গাছটা পর্যন্ত ঝাঁটা চাপা পড়লে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। কোথায় থাকেন মহাৎমাজী। পাক্কী যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকেও অনেক দূরে, মুঙ্গের তারাপুর, অযোধ্যাজীর চাইতেও দূরে। পুরুবে ধান কাটনীর দেশ, গনৌরীর ভাইটা যেখানে কাজ করে, সেই কলকাত্তা, জিরানিয়া, তাৎমাটুলি, বিসকান্ধা, শোনপুরের মেলা, কুশীজী পার হয়ে গঙ্গাজী পার হয়ে অনেক গাঁ, আর একটা কী যেন খুব ভাল নাম, ভাগলপুর—ভাগলপুর, আর কাটিহার, আরও কী কী যেন,...এই মুলুকটার ভালমন্দ দেখাশুনার ভার মহাৎমাজীর উপর। আঙুলের ডগা কেটে গেলে মাথা জানতে পারবে না? তার ব্যথা লাগবে না? তাই মহাৎমাজী আসছেন জিরানিয়াতে।

লাডলীবাবুকে নিশ্চয় মহাৎমাজী খুব পেয়ার করেন। ধন্যি জীবন লাডলীবাবুর!

সাগিয়া হুজুগে নেচে উঠবার মেয়ে নয়। তবুও 'গানহী ভগমান'কে দর্শন করবার লোভ সামলাতে পারে না। এক সিরিদাস বাবাজী ছাড়া আর কোনো সন্তের দর্শন তার ভাগ্যে ঘটেনি। না ঢোঁড়াই, আমাদের নিয়ে চল্।

মোসম্মতের গম্ভীর ভাবটা আজকাল কেটেছে। সে-ও মেয়ের কথায় সায় দেয়। ঢোঁড়াই নানা রকম ছুতো দেখায়। কিন্তু মোসম্মতের সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।

'বারো কোশ পথ তো কী হল? কত দূর দূর থেকে বলে লোকেরা আসবে। গাঁয়ের অন্য মেয়েরা যাচ্ছে না কে বলল? রাজপুতটোলা থেকে সাতখানা গাড়ি যাবে। গাড়ি নেই বলে কি আমরা যাব না। না যাক কোয়েরীটোলার আর কেউ, আমরা যাব। পাক্কী দিয়ে হাওয়াগাড়িতে চলে যাবেন মহাৎমাজী। আমাদের টোলার লোকেরা সেই ঝাঁকি দর্শনেই খুশী। আজ আছি, কাল নেই। তীরথ সাধু-সঙ্গ জীবনে হল না। কষ্মের মধ্যে সেই মরা লোকটার নামে একটা ইঁদারা করে দিয়েছিলাম। সেটা পর্যন্ত ভূমিকম্পে ফেটে গিয়েছে। কপালই আমার ফাটা রে ঢোঁড়াই। হয়তো দেখবি দর্শনের আগেই আমি খতম হয়ে গিয়েছি। মরা স্বামী-জামাইয়ের নাম করে মোসম্মত বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে।

ঢোঁড়াই এর আগে জিরানিয়া যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু সাগিয়াটা তো কখনও কিছু আবদার করে না! তার কথা ঢোঁড়াই ঠেলতে পারে না।

এতদিন সে এই বিষয়ে নিজের মনের উপর কড়া রাশ টেনে রেখেছিল। ঢোঁড়াই নিজের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না যে, জিরানিয়ার আকর্ষণ সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। পাছে আবার কেউ বুঝে ফেলে, তাই ঢোঁড়াই জিরানিয়া ফেরত কোয়েরীটোলার লোকদের নিজে থেকে খুঁচিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। বিল্টা গত বছর মোকদ্দমার তদবির থেকে ফিরে বলেছিল যে, বকরহাট্টার মাঠে ফট্‌ফট্ ফট্‌ফট্ করে হাওয়াগাড়ি চলে আর বিঘার পর বিঘা জমি চাষ হয়ে যায়। ঐ গাড়ি মেরামতের ঘর করেছে পাক্কীর পীপর গাছের কাছে। দত্যির মতো গাড়িগুলো দেখলেই গা ছমছম করে। এরই মধ্যে একটা লোকের 'জান' নিয়েছে। লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে। বলা নেই, কওয়া নেই, উপরের লোকটা দিয়েছে গাড়ি চালিয়ে। আর যাবে কোথায়! পিছনের লোকটা হালের ফালগুলো দিয়ে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে! সরকারী ব্যাপার বলে সাজা হয়নি কারও, না হলে ডেরাইভারসাহেবকে লটকে দিত হাকিমরা। রামনেওয়াজ মুন্সি নিজে বলেছিল।

ঢোঁড়াই সেদিন বিল্টাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ময়নার জঙ্গলগুলোও কেটে দিয়েছে নাকি বকরহাট্টার মাঠের?

বিল্টা একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। হালওয়ালা হাওয়াগাড়ির কথা জানতে আগ্রহ লোকটার নেই, জানতে চায় ময়নার জঙ্গলের কথা! ঢোঁড়াইটা কীরকম যেন!

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'ময়নার ডাল দিয়ে কোদালের বাঁট হয় কিনা, তাই মনে এল।'

এমন জিরানিয়ার খুচরো খবর আরও দু-একদিন ঢোঁড়াইয়ের কানে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ গাড়োয়ান চোখ বুজে কানে তুলো গুঁজে গাড়ি চালায়। কোনো খবর রাখে না। কেবল জিরানিয়া বাজারের ভুট্টার দর, আর বিনা আলোতে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানোর কেরামতির বড়াই! কেউ ধরলেও হয়তো তালে মহলদার কিম্বা অন্য কোনো চেনা লোকের কিছু খবর পাওয়া যেত। দুবৎসরের কথাটা এক যুগ আগের বলে মনে হয়, আর এক যুগ আগেকার কথাগুলো মনে হয় যেন সেদিনকার। কতদিন মনের কোণে কত ইচ্ছা এসেছে। ছেলেটাকে দেখতে, রামিয়ার কোলে। রাতের বেলায় গিয়ে বলদজোড়াকে একটু আদর করে আসতে। সাহস হয়নি। ঠেলে দূর করে দিয়েছে এই সব চিন্তাগুলোকে মন থেকে। বিসকান্ধা তো তার খারাপ লাগে না। লোকের কি আর জায়গা

ভাল খারাপ লাগে। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে সম্বন্ধটাই লাগে ভাল কি বা খারাপ। এখানেও তো ঢোঁড়াইয়ের নতুন মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কত লোকের সঙ্গে। ছোটবেলার জানাশুনা আর বড় হয়ে পরিচয়ের মধ্যে তফাত গরম ভাত আর ঠাণ্ডা ভাতের মধ্যে তফাত। জিরানিয়ায় যেতে ইচ্ছে করলেও সে এতদিন ঠিক করেছিল যে, মরে গেলেও সে ওমুখো হবে না জীবনে! এখন ঠিক করে যে যেতে ইচ্ছে না থাকলেও সে যাবে। নিজের ইচ্ছাটাই জীবনের একমাত্র জিনিস নয়। অন্যের ইচ্ছাও কত সময় রাখতে হয় দুনিয়ায়। নিজের সংকল্প বজায় রাখার চাইতে সাগিয়ার আবদার রাখতে মনে তৃপ্তি পাওয়া যায় বেশি।

অন্ধকার হওয়ার পর সে সাগিয়াদের নিয়ে জিরানিয়ায় পৌঁছুবে, যাতে তাৎমাটুলির কোনো চেনা লোকের সঙ্গে তার দেখা না হয়ে যায়।

পাপ ক্ষয়ের উপায় কথন

জিরানিয়ায় সেদিন মোসম্মত আর সাগিয়া প্রাণভরে মহাৎমাজীর 'দর্শন' করেছিল। ধন্যি তাদের পুণ্যের বল! ধন্য হো রামচন্দ্রজী! দেখে আর তাদের তৃপ্তি হয় না! সাধুবাবাজী তারা এর আগেও দেখেছে। কিন্তু দেবতার সাক্ষাৎ 'দর্শন' এর আগে হয়নি। চারিদিকের সাদা আলোগুলো, তাঁর শরীরের ঠাণ্ডা জ্যোতির কাছে মিটমিট করছে!

কত কী কথা বললেন মহাৎমাজী! তাঁর কথা নিজে কানে শুনতে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!

…'পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাইজন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে।'…

ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় ঠিক বলেছেন মহাৎমাজী। রাজপুতদের পাপ; তাৎমাটুলির মোড়লের পাপ।

…'অছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায় করি। তাদের মানুষ বলে ভাবি না। ধরতিমাই সে পাপের বোঝা সইতে পারেননি।'…

কথাটা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। রাজপুতদের পাপের কথা কি তাহলে ভুল? তাৎমাটুলির মোড়লদের পাপের কি তাহলে কোনো ওজন নেই।

…'এই বিপদে কত লোক জেরবার হয়ে গিয়েছে। রামজীর উপর বিশ্বাস

রাখবে। সমাজে যে সব চাইতে নিচে আছে, তার সঙ্গেও ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে। তবে না পৃথিবীতে রামরাজ্য ফিরে আসবে। রামরাজ্যে—

নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা

নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা।[১]

রামরাজ্যে দরিদ্র, দীনদুঃখী, নির্বোধ বা অলুক্ষুনে কেউ থাকবে না! তারই জন্য আমরা চেষ্টা করছি, তারই জন্য তোমাদের মাস্টারসাহাব চেষ্টা করছেন। তাঁর উপরই এ জেলার ভূমিকম্পের রিলিফ সেবার ভার আমরা দিয়েছি। যে মাস্টারসাহাব পৃথিবীতে রামরাজ্য আনবার জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন আমি জানি তাঁর হাতে গরীবের উপর অবিচার হবে না।'···

এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের নজর পড়ে মাস্টারসাহেবের উপর। আগের চেয়ে একটু বুড়ো-বুড়ো লাগছে। তবু একজন চেনা লোকের মুখ সে দেখতে পেয়েছে। এতদূর থেকেও ভারি আপন-আপন লাগে মাস্টারসাহেবকে।

মহাৎমাজীর পা ছোঁয়া কি সোজা ব্যাপার! জিরানিয়া বাজারের সাওজী যেন সকাল বেলা দানা ছিটোচ্ছে কবুতরদের! ওখানে পৌছানোর সাগিয়ার সাধ্যি নাই! এখান থেকেই ছুঁড়ে দে পয়সা সাগিয়া, মহাৎমাজীর নাম করে। দে আমার কাছে, আমিই ছুঁড়ে দি। তুই কি পারবি অতদূরে ফেলতে?

আবার গায়ে-টায়ে না লাগে! মোসম্মতকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সে প্রণাম করবেই মহাৎমাজীর পা ছুঁয়ে। ভিড়ের চাপে সে এগিয়ে যায়। ঢোঁড়াই সাগিয়াকে আগলাবার জন্য সেখানেই থেকে যায়।

তারপর ঢোঁড়াই আর সাগিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করে মোসম্মতের জন্য। ভিড় পাতলা হয়ে যাবার পরও মোসম্মতকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুজনেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। গেল কোথায়! গাঁয়ের কারও সঙ্গে হয়ে গিয়ে থাকবে; হয়তো তাদেরই সঙ্গে চলে গিয়েছে। দেখ দেখি আক্কেলখানা একবার!

জিরানিয়া থেকে বেরিয়ে আকাশ-বাতাসের পরিচিত গন্ধটা হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের নাকে যায়। চোখ বাঁধা থাকলেও সে বুঝতে পারত যে কোথায় এসেছে। শীতের সাঁঝে শহর থেকে বেরিয়ে এখানে এলেই কনকনানিটা একটু বেশি মনে হত। আরম্ভ হয়ে যেত স্বর্ণলতায় ভরা কুলের ঝোপ, হরিয়ালের ঝাঁকের অশথপাতার সঙ্গে খুনসুরি।

[১] তুলসীদাস থেকে।

একটা অজ্ঞাত ভয়ে শিহরণে ঢোঁড়াইয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বুকের টিপটিপুনিটা কমানোর ক্ষমতা মানুষের হাতের মধ্যে থাকলে বেশ হত! কীসব যেন বলছে! চারিদিকে ঢোঁড়াই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অন্ধকারে বকরহাট্টার মাঠে গাছপালা আছে কিনা কিছুই ঠাহর করা যায় না। শুনেছিল তো চীনাবাদামের চাষ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হবে এই জায়গাটুকু। যদি আবার কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! নিজের বাড়ির দিকটায় তাকাতে ভয় করে। সেই দিকটা ছাড়া, এতক্ষণ ঢোঁড়াই আর সব দিকের জিনিস দেখবার চেষ্টা করেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না; কেবল মিটমিটে আলো দু'চারটে। যে দিকটা দেখছে না সেইটারই ছবি পড়েছে তার মনে, সাড়া জাগিয়েছে তার প্রতিটি রোমকূপে। এ কেবল একটা অহেতুক কৌতূহল নয়। এ তার সত্তার অঙ্গ। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।···

···তার বাড়ির বাইরে একটা আলো জ্বলছে। কুপীর আলো বলে বোধ হয় না। নিশ্চয়ই সেই বাওয়ার দেওয়া বিলিতি লণ্ঠনটার আলো। যদি সেই ছোটছেলেটা ঐ আলোর পাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত এখন! একটা ছায়া নড়তেও যদি দেখা যেত ওখানে! সাগিয়া সঙ্গে না থাকলে আর একটু কাছে যেত সে বাড়িটার। সাগিয়াটা আবার লক্ষ্য করছে না তো। গোঁসাইথানের অশ্বত্থ গাছটার তলাটা ভাঁটের জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।

'এটা গোঁসাইথান সাগিয়া। ভারি জাগ্রত।' দুজনে সেখানে প্রণাম করে।

সেইখানেই পিদিম দিয়ে প্রণাম করার সময় আর-একজনের চুলের বোঝা ছড়িয়ে পড়েছিল। গলাকাট্টা সাহেবের হাতার কুলের গাছটা আছে কিনা কে জানে। শুকনো পাতাভরা একটা গর্তর মধ্যে ঢোঁড়াইয়ের পা পড়ে, হয়তো ভূমিকম্পের সময়ের ফাটল। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে এটা নিশ্চয়ই বাওয়ার উনোনের গর্তটা। কেন যেন সেটাকেও মনে মনে প্রণাম জানায়।

গরুর গাড়ির সার চলেছে রাস্তা দিয়ে। নিশ্চয়ই মহাত্মাজীর সভায় গিয়েছিল এরা সকলে। পাক্কীর ধারে এটা আবার কার বাড়ি? ইয়া উঁচু! টিনের বাড়ি! কয়েকজন হাফপ্যাণ্ট পরা লোক জটলা করছে। এইটাই তাহলে লাঙলের হাওয়াগাড়ি মেরামতের ঘর, যেটার কথা বিল্টা বলেছিল। লোকগুলোর গল্প কানে ভেসে আসে।

'এতদিন থেকে এত হই-হই রই-রই। লে হালুয়া! তিন মিনিটের মধ্যে মহাৎমাজীর তামাশা শেষ হয়ে গেল। খেল খতম! পয়সা হজম!'[১]

কতদিন পর ঢোঁড়াই 'লে হালুয়া! খেল খতম পয়সা হজম।' কথাগুলো শুনল। বিসকান্ধায় এসব কথা কেউ বলে না। এই কথা কয়টার মধ্যে দিয়ে সমস্ত পুরনো তাৎমাটুলিটা মনে হচ্ছে কথা বলছে তার সঙ্গে।

জানা গন্ধটা ফিকে হয়ে আসছে। আর ঢোঁড়াইয়ের তাড়াতাড়ি এ জায়গাটা পার হয়ে যাবার উৎসাহ নেই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে গন্ধটা উপভোগ করবার চেষ্টা করে।...

এতক্ষণে সাগিয়ার কথা কানে আসে। 'এখানে খানিক বসে মায়ের জন্য অপেক্ষা করে গেলে কেমন হয়? হয়তো আগেই চলে গিয়েছে।'

এই গাড়োয়ান! এই শগগড়!'[২]...তালে মহলদার ঘুমন্ত গাড়োয়ানদের জাগিয়ে পয়সা আদায় করছে। মহাৎমাজীর কৃপায় আজ হঠাৎ মরসুম পড়েছে তার।

'না না, সাগিয়া, আর খানিক আগে গিয়ে বসা যাবে মোসম্মতের জন্য।...'

মোসম্মতের অভিশাপ

ঢোঁড়াই আর সাগিয়া যখন গিয়ে বিসকান্ধায় পৌঁছুল তখনও সাগিয়ার মা বাড়ি ফেরেনি।

'এ ছাখ আবার কী কাণ্ড হল! না ঢোঁড়াই, তুই জিরানিয়াতে একবার খোঁজখবর কর মায়ের। তখনি আমি বলেছি। কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে। বুড়ো মানুষ!'

'দেখা যাক না আর খানিক। কোন দলের সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবে। আর 'পাক্কী' ধরে একা আসতে অন্ধতেও পারে।'

সাগিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। ঢোঁড়াই বলদের খাওয়ার জন্য জল আনতে চলে যায় ইঁদারায়। মোসম্মত দশ মরদের সমান! ও হারাবার মেয়ে নয়! অথচ এ কথাটা সাগিয়ার কাছে বলা যায় না।

উৎকণ্ঠায় যখন সাগিয়ার পুণ্য অর্জনের মিষ্ট আমেজটুকু প্রায় উবে গিয়েছে,

১ এ জিরানিয়া শহরের বাক্যরীতি; গ্রামাঞ্চলের নয়। 'লে হালুয়া।' কথাটির অর্থ 'আশ্চর্য!' কোনো পর্ব শেষ হলেই বলে 'পালা শেষ হল। পয়সা হজম হয়ে গেল।'

২ গরুর গাড়ি।

তখন তার মা এসে বাড়ি পৌঁছুল। সাগিয়া আর ঢোঁড়াই দুজনেই দাওয়ায় বসে। দুশ্চিন্তায় থমথমে মুখ। উনোনে আগুন পড়েনি।

...মহাৎমাজীকে প্রণাম করবার পর মোসম্মত ভিড়ের চাপে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। আঁধারে দিক ঠিক করতে পারেনি। ভিড়ের সঙ্গে এ মুল্লুক ও মুল্লুক ছিষ্টি সাত মুল্লুক ঘুরতে ঘুরতে দেখা গিধর মণ্ডলের সঙ্গে 'হালুয়াই'-এর দোকানের সমুখে। গিধর আবার তাকে নিয়ে যায় সভার মাঠে। সেখানে গিয়ে কত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি! ও ঢোঁড়াই! ও সাগিয়া! কে শুনছে বুড়ির কথা। তখন কেঁদে বুক চাপড়ে মরে। গিধর বলে, 'ভাবনা কী; ওরা বাড়ি ফিরবে ঠিকই। ওই হারামজাদাটার সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মেয়ে সাগিয়া নয়। তবে দিনকাল খারাপ; মন না মতি; ঘি আর আগুন। বাড়ি পৌঁছুবে ওরা ঠিকই। কেবল আগে আর পরে। তুমি কেঁদে আর কী করবে। আমার গাড়িতে করে তোমায় নিয়ে যাব। ভোর রাত্রে বেরুনো যাবে? বুড়ো মানুষ; এতটা পথ হেঁটে আসবার দরকার কী ছিল? আমাকে একটা খবর দেওয়াতেও আজকাল অপমান হয় তোমাদের। মহাৎমাজীকে 'দর্শন'-এর পরও এই প্রবৃত্তি! কেঁদে কী হবে। সব ঠিক হয়ে যাবে মহাৎমাজীর আশীর্বাদে।

চোখের জল আর ঢুলুনির ফাঁকে ফাঁকে মোসম্মত গিধর মণ্ডলকে কত হাবিজাবি মনের কথা বলে। বড় আপনার জন বলে মনে হয় গিধরকে আজ। লোকটা খারাপ নয়। তবে দশে মিলে বিশেষ করে ঢোঁড়াই অহরহ মোসম্মতের কানে মন্তর পড়ে পড়ে বিষ করে তুলেছে লোকটাকে। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিল না জেনে এতদিন। তোকে দোষ দিই না গিধর। তুই করেছিস আমার খুব। নিজের হাত আমি নিজে কেটেছি।

গল্পে গল্পে এক রাত্রের কথা বেরিয়ে আসে। কথাটা লচুয়া চৌকিদার গিধর মণ্ডলকে বলেছিল। তুমি জান না মোসম্মত, এ নিয়ে কানাকানি হয়েছিল গাঁয়ে। তোমায় আর এ কথা কে বলবে।

মোসম্মতের চোখে ছানি পড়েনি এখনও রামজীর কৃপায়। কানেও সে তুলো গুঁজে থাকে না। ইঙ্গিতে ইশারায় ইঁদারাতলায় এ নিয়ে কেউ ঠেস দিয়ে কথা বলছে বলে মনে তো পড়ে না তার। আগে সে ভেবেছিল চুপ করে যাওয়াই ভাল। এতক্ষণে জানতে পারে যে, দুনিয়াসুদ্ধ সব লোক তাকে দেখে এসেছে এতদিন। আর আজকের এই কেলেঙ্কারির পর তো গিধর ঢিঢিক্কার করে দেবে সারা গাঁয়ে। এর চাইতে সাগিয়াকে রাজপুতদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করতে পাঠালে দুর্নাম কম ছিল।...

গাড়ি থেকে নামতেই ঢোঁড়াই আর সাগিয়া ছুটে আসে, রাজ্যের প্রশ্ন মুখে নিয়ে। একটা কথারও জবাব দেয় না সাগিয়ার মা। সাগিয়া ঢোঁড়াইকে ইশারা করে, 'খুব চটেছে! ঢোঁড়াইদের দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে সাগিয়ার মা বাড়ির ভিতর ঢোকে।

ঢোঁড়াই অবাক হয়ে যায়। হল কী আবার বুড়ির। পাড়া মাতিয়ে কোঁদল করবার সময় এখন, অথচ যেন গরু মরেছে উঠোনে! গিধরটাও জুটেছে দেখছি সঙ্গে।

মোসম্মত মন ঠিক করে ফেলেছে।

শোন ঢোঁড়াই। অনেকদিন থেকে বলব বলব মনে করছি। তোমাকে রাখা আর আমার পোষাবে না। মুখে খানিক, আর পেটে খানিক, তেমন কথা নেই আমার কাছে।

গিধর জিজ্ঞাসা করে, মাইনে-টাইনে বাকি নাই তো?

ঢোঁড়াই, সাগিয়া. আর মোসম্মত তিনজনের কারও কানে কথাটা গেল কিনা বোঝা যায় না।

সাগিয়ার অন্তর্ধান

যখনই ঢোঁড়াইয়ের জীবনটা চলনসই গোছের হয়ে আসে, অমনি একটা করে আঁধি উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। তার জীবনে বরাবর লক্ষ্য করে আসছে এটা ঢোঁড়াই! মনের রাজ্য চালানোর এই রীতি রামচন্দ্রজীর।

সেদিন তখনই সে বিল্টার বাড়িতে চলে এসেছিল। আসবার সময় সাগিয়ার দিকে সংকোচে তাকাতে পারেনি।

'চাকরি থেকে 'জবাব' হয়েছে কী রে?'—বিল্টা হেসেই বাঁচে না। 'গিধরটা আছে নাকি এর মধ্যে? সে আমি আগেই বুঝেছি।'

টোলার লোকে এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না।

জোয়ান মরদ; খেটে খাবে; তার এখানেই বা কী আর ওখানেই বা কী! মাথার ঘায়ে বলে কুকুর পাগল! এখন ঐ ডাইনী মোসম্মতটা রইল কি মরল কে ভেবে মরছে তা নিয়ে। ও বুড়িটার কথা ভাববার ঠিকে দেওয়া আছে, ঐ শালা গরুখোরটার উপর। 'আমনসভার' জলুস ঘুচেছে গিধরটার গা থেকে। আর এখন সরকারের আমনসভার দরকার নেই। নতুন দারোগাসাহেব এসেছে। তাঁর সঙ্গে লাডলীবাবুর বেশ মাথামাখি হয়েছে,

ভূমিকম্পের রিলিফের ব্যাপার নিয়ে। দারোগা হাকিমের আবার এসে বাবুসাহেবের ভাঙা বৈঠকেই পুরি-হালুয়া উড়োচ্ছে। এখন আর গিধরকে পোছে কোন রাজপুতটা। বাবুসাহেবের লেজ ধরে যতখানি যাবে, ততখানি ওকে পুছবে ওরা আর দারোগাসাহেব। ক'ষে ধরে থাকিস গিধর! দেখিস, বাবুসাহেবের কাছাটা আবার খুলে না যায়!

এত কথা ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। তার মন টক হয়ে আছে।

কিছুদিন পর 'বিদেশিয়ার নাচ'-এর দল এসেছিল গাঁয়ে। গরম আর বর্ষাটা গাঁয়ে গাঁয়ে দেখাবে, আর শীতকাল ঘুরবে মেলায় মেলায়। 'পচ্ছিম'-এর জিনিস; জিনিস ভাল। হাটের চালাটায় উঠেছে 'বিদেশিয়ার' দল। স্থায়ী কুষ্ঠরুগীটা তাদের জন্য খাতির করে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। গাঁয়ের ছেলেবুড়ো ভেঙে পড়েছে সেখানে। সরকার এখন আর বিদেশিয়ার গানের উপর বিরক্ত নয়। কেননা মহাৎমাজীর নিমক তৈরির গান, তালগাছ কাটার গান, চরখার সুদর্শন চক্র দিয়ে দুশমন তাড়ানোর গান উঠে গিয়েছে এরই মধ্যে! তবু লচুয়া চৌকিদারকে এখনও 'রপোর্ট' দিতে হবে থানায়, বিদেশিয়ার দল কোন্ গান গাইল।

ঢোঁড়াই দুদিন যায়নি। বলে ভাল লাগে না। তৃতীয় দিনে বিল্টা আর গনৌরী জোর করে ধরে নিয়ে যায় ঢোঁড়াইকে! কত বলে নতুন নতুন গান আমদানী করেছে এই দল, কত 'লালমুনিয়ার গান', 'গরুবেচার গান', কত কত! শুনলে কান্না আসে। আজকেই শেষ। কাল চলে যাবে এরা ফলকাহাটে। কোনো ওজর শোনা হবে না তোর ঢোঁড়াই!

বাধ্য হয়ে ঢোঁড়াই যায়। গান তখন চলেছে।

গিয়েছে সে পুরুবে বাঙালা মুলুকে,
আমাকে ছেড়ে গিয়েছে আমার রাজা,
গিয়েছে করতে চাকরি,
নিশ্চয় শুখিয়ে হয়েছে লাকড়ি।
মরি মরি। হাঁটুর উপর রঙিন ধুতি,
কী শোভাই দিচ্ছিল![১]
ভাবলেই মন দিয়ে রস গড়ায়।
ওরে বিদেশী!
জানি তুমি এখন কার কথা শুনছ,

[১] হাঁটুর নিচে পুরুষদের কাপড় নামালে এদের চোখে খারাপ লাগে।

জানি কেন রোজগারের পয়সা গুনছ,
নিশ্চয়ই তার জন্য কিনছ,
আঁটো আঁটো ফাটো ফাটো 'চোলি'।[১]
ওরে বিদেশী !

মেয়ে-পুরুষ সকলেই সীতাজীর মতো অত ভাল মেয়েটার দুঃখে হাপুস নয়নে কাঁদছে। বিল্টা যে বিল্টা সে সুদ্ধ নাক ঝাড়বার ছুতো করে লুকিয়ে চোখটা মুছে নিল। কিন্তু ঢোঁড়াই নির্বিকার। সব লাগছে ফিকে, পানসে। কত অঙ্গভঙ্গি করে দেখানো, কত কসরত করে গাওয়া শেষের লাইনটা, ঠিক ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে এসে। তারপর তার থুতনিটা ধরে নেড়ে মেয়েটা শেষ করল 'ওরে বিদেশী।' নিশ্চয়ই বিল্টাটার শেখানো। তাই আজ ঢোঁড়াইকে ধরে এনেছে। রাগ হলেও রাগ দেখাতে নেই গানের আসরে। এটা হল ইজ্জতের কথা। ঢোঁড়াই হেসে ট্যাকের থেকে এক আনা পয়সা বার করে দেয়। সকলে হেসে বলে, যাক লোকটার 'দিল' আছে !

অথচ ঢোঁড়াইয়ের মনে এ গান একটুও সাড়া জাগায় না। দেখতে হয় দেখছে। শুনতে হয় শুনছে। সে দশটা আঁটো আঁটো ফাটো ফাটো কাঁচুলি কিনলেও দুনিয়ার কোথাও কেউ কেঁদে মরবে না ! দুনিয়াতে তার জন্য কেঁদে মরবার লোক থাকলে আর তার দুঃখ কিসের !

পরের দিন গাঁয়ে দারুণ হট্টগোল। সাগিয়া চলে গিয়েছে বিদেশিয়ার দলটার সঙ্গে।

...ঐ যে দলের কর্তাটাকে দেখিসনি, শিয়ালের লেজের মতো গোঁফ, জবজবে তেল মেখে টেড়ি কাটা, ঐ যে যেটা 'হরমুনিয়া' বাজায় সেইটার সঙ্গেই ভেগেছে। রাতে নাচ দেখে বাড়িতে ফিরেছিল। তারপর ভোর রাতে উঠে, বাইরে যাবার নাম করে, উড়েছে ফুড়ুত করে। সকালে গিধর কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল প্রথমটায়। কিন্তু পারেনি। কে কে যেন যেতে দেখেছে, সাগিয়াকে বিদেশিয়ার দলের গরুর গাড়িতে। বাজে কথা নয়, তারা স্বচক্ষে দেখেছে, মাথায় কাপড়টা পর্যন্ত তুলে দেয়নি বেহায়া মেয়েটা !

সাগিয়া ! সাগিয়া পালাবে ঐ লোকটার সঙ্গে ! বিশ্বাস হয় না ঢোঁড়াইয়ের। কাপড়টা পর্যন্ত টেনে দেয়নি মাথায় গাঁয়ের লোক দেখেও ! সে যে জোরে কথা বলতে জানে না। রাগতে জানে না বলে গিধরকে দেখে চোখ নামিয়ে দেয়। ছেলের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে মরে। মনের মধ্যে ঝড় বইলেও মুখের ভাব বদলায় না। ঠাণ্ডা মিষ্টি কথা ঝরে তার মুখ থেকে,

[১] স্ত্রীলোকদের খুব ছোট কুর্তা। গানের লাইনটিতে আছে 'কসমস্ চোলিয়া।'

ঠিক যেন মালসা থেকে বোশেখে টুপটুপ করে জল পড়ছে নিচের তুলসী গাছটার উপর। হাঁটুর উপর রঙিন ধুতির গান শুনে, ঘর ছাড়বার মেয়ে তো সে নয়।

ঢোঁড়াই বুঝবার চেষ্টা করে। সে জানে সাগিয়াকে। তার উপর রাগ করা যায় না। আওরত জাতটার উপর ঢোঁড়াইয়ের মনটা আর বিষিয়ে ওঠে না। গিধরের হাত থেকে বেঁচেছে সাগিয়া। সেই বিদেশিয়ার দলের মোচওয়ালা কর্তাটার উপরও তার রাগ হয় না। তার দুঃখ নিজের কপালটাকে নিয়ে। সব জায়গা থেকে তাকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে তার কপাল। রামজীকে পর্যন্ত সে আজ দোষ দেয় না। দুনিয়া চালানোর এই নিয়ম। তাদের নিজেদের দরকারেই তারা রামজীকে ডাকে। দুনিয়ার দরকার আছে রামচন্দ্রজীকে, কিন্তু তাঁর এই দুনিয়াটা না হলেও চলে।

বিল্টা বলে, ঐ দলের কর্তাটা আবার কী জাত না কী জাত কে জানে। জাতের মেয়ে নিয়ে গেল আর সকলে তাই পিট্‌পিট্ করে দেখবে? কত দূরই বা গিয়েছে। কাল থেকে তো ফলকাহাটে বিদেশিয়ার গান হবার কথা আছে। শুনে ঢোঁড়াইয়ের মনেও একটু খটকা লাগে। লোকটা মুসলমান নয়তো? যে রকম জুলফির বাহার!

মোসম্মত এসে কেঁদে পড়ে। ঢোঁড়াই, তুই একবার যা ফলকাহাটে; তুই বললে ফিরে আসতেও পারে। আমি গিধরের সঙ্গে গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে আনতে পারিনি। কোনো কথা বলেনি আমাদের সঙ্গে।

গিধর হন্যে হয়ে উঠেছে। সব গুছিয়ে এনেছিল আটঘাট বেঁধে। কেবল একটা দিক দেখেনি। এখন দেখছে সেই দিকটাই ছিল আসল। মোসম্মতকে নিয়ে ফিরবার সময় গিধররা রামনেওয়াজ মুন্সির বাড়ি হয়ে এসেছিল। মুন্সিজী বলছে এ নিয়ে মামলা চলবে না।

জুলফিওয়ালা দলের পাণ্ডাটাকে আমি জেলের খিচুড়ি খাইয়ে ছাড়ব; সদরে তিন দফার নালিশ ঠুকব; যতই মুন্সিজী মানা করুক না কেন। আমি ওকে ছাড়ছি না। অনিরুধ মোক্তারকে দিয়ে আমি এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে মামলা দায়ের করব। শালা বলে কিনা, আমি কি ঐ আওরতকে নিয়ে এসেছি? ও নিজে এসেছে। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। আমি আটকাচ্ছি না ওকে। বিদেশিয়ার গান শুনে 'হরহামেশা' জোয়ান জোয়ান ছুঁড়িরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসে। যতদিন ইচ্ছে থাক, যখন খুশি চলে যাও। তাদেরই বলে আটকে রাখি না, তার আবার এই এত বয়সের আওরতকে আটকাব! ও চলে যেতে চায় এই মুহূর্তে চলে যেতে পারে। ঐ

ধড়িবাজটাকে জুলফি আর মোচ দেখেই চিনেছি আমি! কত বলে 'ভালা আদমী'দের[১] দেখে নিলাম, হরমুনিয়ার বাজনাদার এসেছে আমাকে কানুন দেখাতে। আর বলিহারি ঐ মেয়েটার প্রবৃত্তির! গিধরের সব রাগ গিয়ে পড়ে সাগিয়ার উপর।

মোসম্মত ঢোঁড়াইয়ের পায়ে মাথা কোটে। না করিস না ঢোঁড়াই। কবে তোকে কী বলেছি সে কথাটা মনের মধ্যে গিঁট দিয়ে বেঁধে রাখিস না। বুড়ো হয়েছি, মুখের বাধন নেই। আমার সাতটা পাঁচটা নয়, ঐ একটা মাত্র মেয়ে। ঐ গিধরটার জন্যেই আজ আমার এই হাল। ওকে চুমৌনা করবার জন্য চাপ না দিলে হয়তো সাগিয়া আমার এমন করত না। তুই একবার যা ঢোঁড়াই।

ঢোঁড়াই যখন ফলকাহাটে গিয়ে পৌঁছুল তখন রাত হয়েছে। ইটের উনুন পেতে সাগিয়া বসেছে রাঁধতে, দলের লোকের জন্যে। পাড়ার লোকে ভিড় করছে খানিক দূরে, গোলার সম্মুখের নিমগাছটার তলায়। সেই জুলফিওয়ালা দলের কর্তাটা তারই মধ্যেখানে বসে কথার তুবড়িতে আসর জমাচ্ছে। দলের অন্য সকলে হাটের এদিক-সেদিক ছড়ানো মাচাগুলোর উপর পড়াচ্ছে।

আশ্চর্য লাগে ঢোঁড়াইয়ের। একটুও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না সাগিয়ার মুখে চোখে ব্যবহারে।

কে, ঢোঁডাই। নিজের বসবার ইটটা এগিয়ে দেয় সাগিয়া। কুপীর আলোয় মুখের খুঁটিনাটি দেখা যায় না। এই আলো-আঁধারির খেলায়, সাগিয়ার নরম মুখটা পাথরের 'মুরত'-এর মতো লাগছে। চোখের জলও কি তার শুকিয়ে গিয়েছে! ঢোঁড়াইকে দেখেও কি তার চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল আসতে নেই। অদ্ভুত মেয়ে। কথা বলে না। একটা কথা বলতেও কি ইচ্ছা করছে না ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে।

ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ঢোঁড়াইয়ের মুখ দিয়ে বার হয় না। দারোগা হাকিমের সম্মুখে গড়গড় করে কথা বলে যায় সে, আর এখানে কী কথা বলবে খুঁজে পাচ্ছে না।

বলে, 'গিধর মণ্ডল এসেছিল না?'

বলেই মনে হয় ঠিক এই গিধরের কথাটাই না তোলা উচিত ছিল এখন।

'হ্যাঁ।'

১ ভাল লোকদের অর্থাৎ বড়লোকদের।

আবার কথা ফুরিয়ে যায়। সাগিয়া ভাতের ফেন গালে। ঢোঁড়াই একটা আধপোড়া পাটকাঠি ভেঙে, অন্ধকারে মাটিতে কী সব হিজিবিজি কাটে।

'মোসম্মত পাঠিয়েছিল।'

বলেই, আবার ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যেন ভুল করেছে সে। ঠিক কথাটা বলা হয়নি। সাগিয়া মুখ তুলে তাকায়। কুপীর আলো পড়েছে মুখে। মুখ দেখে তার মনের নাগাল পাওয়া ভার। তবু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, তার চোখদুটো কী যেন জিজ্ঞাসা করতে চায়। যদি এখনই বলে 'ও! তাই জন্য এলে?' কথার সূক্ষ্ম মারপেঁচ ঢোঁড়াই বোঝে না। যা মনে আসে তাই বলে ফেলে। আজ কী হয়েছে তার। যা বলতে চায় তা বলতে পারছে না কেন। কিছু কি তার বলবার নেই? কত কী ভেবেছে এতদিন। কিছু না বলাই ভাল ছিল। না আসাই ছিল উচিত। যাক, এসেছিল বলে তবু তো দেখা হল।

ঢোঁড়াই উঠে পড়ে।

'মাকে দেখো।'

ফল্গুতেও বান ডাকে। চোখের জল লুকোবার জন্য দুজনেই আঁধারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লঙ্কা কাণ্ড

কোয়েরীদের নিদ্রাভঙ্গ

অনেকদিন আগে একজন মহাৎমাজীর চেলা বিসকান্ধার লোকদের ভূমিকম্পের দরুন ক্ষতির তদন্ত করতে এসেছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক; সকলকে জিজ্ঞাসা করে করে অনেক লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন কাগজে। লাডলীবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। সকলেই শুনেছিল যে, তাঁর 'রপোর্ট'-এর উপরই ভূমিকম্পের রিলিফ দেওয়া হবে সকলকে।

তারপর বছর ঘুরে গেল। 'রিলিফ'-এর আর কোনো সাড়াশব্দ পায়নি কোয়েরীটোলার লোকে। একরকম ভুলেই এসেছিল তারা এই কথাটা; হঠাৎ একদিন কী করে যেন সবাই জেনে গেল যে, বাবুসাহেবের বাড়িতে যে স্তূপাকার ইট আর সিমেণ্টের বস্তা জড় করা রয়েছে সেগুলো কাংগ্রিস থেকে রিলিফ পেয়েছে। গিধর মণ্ডলও পেয়েছিল দু'শখান ঢেউ-খেলানো টিন শালের গুঁড়ি, চুন, সিমেণ্ট আরও কত কী।

তখনই বিল্টারা দল বেঁধে দৌড়ায় জিরানিয়ার মাস্টারসাহেবের আশ্রমে। অনেক কিতাব ঘেঁটে মাস্টারসাহাব বিসকাজ্ঞার রপোটটা খুঁজে বের করেন। তাতে লেখা আছে 'কোয়েরীটোলায় গিধর মণ্ডল ছাড়া আর সকলেরই খড়ের ঘর। খড়ের ঘরগুলির ভূমিকম্পে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কেবল যে ঘরগুলির মধ্যে দিয়ে ফাটল গিয়েছিল তার বেড়াগুলো হেলে পড়েছিল। সেসব কোয়েরীরা নিজেরাই মেরামত করে নেয়। ঘরের ভিতরের ফাটলগুলিও তদারকের বহু পূর্বেই তারা ভরাট করে নিয়েছিল। গ্রামের আসল ক্ষতি হয়েছে পাকা দালানগুলির। ক্ষতির পরিমাণের ফিরিস্তি পরে দেওয়া আছে। ঐ পরিমাণে রিলিফ এদের দেওয়া উচিত। কোয়েরীটোলার এক গিধর ওরফে গিরিধারী মণ্ডল ছাড়া বাকি সব ক্ষতিগ্রস্ত ইটের বাড়িই রাজপুতটোলায়। কোয়েরীটোলার যে জমিগুলিতে বালি উঠেছিল সেগুলি তারা আগেই পরিষ্কার করে নিয়েছে। ইঁদারার বালি ছাঁকবার জন্যও তারা পরমুখাপেক্ষী নয়। এর জন্য তারা সত্যই প্রশংসার পাত্র। এখানকার ইঁদারাটির পাট কয়েক জায়গায় ফেটে গিয়েছে। তবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি টিউবওয়েল কোয়েরীটোলার মধ্যে থাকায়, গরমের সময় লোকের অসুবিধা হয়নি। জমিগুলি থেকে বালি সরানো হলেও কিছু কিছু বালি থেকে গিয়েছে। ঐ সব জমিতে চীনাবাদাম লাগিয়ে দেখা যেতে পারে। টুর্নামেণ্ট এগ্রিকালচার ফার্ম থেকে কিছু কিছু চীনাবাদামের বীজ, কোয়েরী আধিয়ারদের দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। রাজপুতটোলায় একটি নূতন ইঁদারা দেওয়া উচিত। তাদের সব পাকা ইঁদারাগুলিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। সাঁওতালটোলায় ক্ষতি কিছুই হয়নি। তারা বালিতে গর্ত খুঁড়ে যে জল বেরোয় তাই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করে। ভূমিকম্প রিলিফের টাকা থেকে সাঁওতালটোলার জন্য একটা ইঁদারা কিম্বা টিউবওয়েল করিয়ে দিলে, ঐ টাকার অপব্যয় করা হবে না বলেই আমার ধারণা।'

এর মোটামুটি মানেটা মাস্টারসাহেব বিল্টাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

যাদের যাদের বাড়িতে ক্ষীরে ছাতা ধরে তারাই পাবে রিলিফ? এরই নাম রপোট। তাই বল! যখনই লোকটা পুরি-হালুয়া খেয়েছে বাবুসাহেবের বাড়ি তখই বোঝা উচিত ছিল! মাস্টারসাহেব নিজে যদি রপোট লিখত, তবে মহাৎমাজীর কথা থাকত। মহাৎমাজী বলেছিলেন যে, কাংগ্রিস থেকে সাহা J দেওয়া হবে গরীবদের, যারা নিজেরা খরচ করতে পারে তাদের নয়। তাঁর কথা থাকল কই?

সকলে গাঁয়ে ফিরে এসে ঢোঁড়াইকে দোষ দেয়। তার পাল্লায় পড়ে

নিজেরা জমির বালি সরিয়ে এই ফল হল। কুয়োর বালিটা না তুললেই হত। রপোর্টে একটা রিলিফের কথা একবার লিখতে আরম্ভ করলে হয়তো কলমের ডগায় কত রিলিফ এসে যেত। সত্যিই ঢোঁড়াইটার কথায় না পড়লেই হত। লাডলীবাবু যে বলেছিলেন, নিজের হাতে কাজ করাই মহাৎমাজী চান, তবে যারা নিজে হাতে বালি তোলেনি তারা মহাৎমাজীর রিলিফ পেল কী করে?

খালি ঢোঁড়াই কেন, কোয়েরীটোলার ছোট ছেলেটা পর্যন্ত বোঝে যে, 'রপোর্ট' বাবুসাহেবের পক্ষে। যতগুলো লোক রিলিফ পাচ্ছে সবাই বাবু-সাহেবের দিকের। এক রইল কেবল সাঁওতালটোলার কথা। তারা কী করে কাংগ্রিসে তদ্‌বির করাল, সেটা কোয়েরীটোলার লোকেরা বুঝতে পারে না। যাকগে! গরীব মানুষ। আমাদেরই মতো পোড়াকপাল ওদের। মহাত্মাজীর নেকনজর যদি পড়ে থাকে ওদের উপর তা নিয়ে আমাদের চোখ টাটানো পাপ হবে।

এদের প্রশ্নের হঠাৎ সমাধান হয়ে যায় একদিন। নৌরঙ্গীলাল গোলাদারদের ছেলে ভোপতলাল, ঐ যে, যে ছেলেটা সেবার আমনসভার মিটিনে বাগড়া দিয়েছিল, সেটা একদিন ঢোঁড়াইদের ডেকে বলে, তোরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুস নাকি? বাবুসাহেবরা সাঁওতালটোলার পাশে যে নতুন কলমবাগান করেছে না তাতেই এনে বসিয়েছে কাংগ্রিসের দেওয়া সাঁওতালটোলার টিউবওয়েলটা! ঘুষ খাইয়েছে মহাৎমাজীর চেলাদের।

গিধর মণ্ডল বলে, ও যাদের টোলার ব্যাপার তারা বুঝুক গিয়ে। আমাদের 'পাবলিশে'র[১] ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার কী?

ভোপতলাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে যে, আমি এই ব্যাপার নিয়ে মহাৎমাজী পর্যন্ত লেখাপড়া করব। বাবুসাহেব আগে আগে হাল দিয়ে চলেছে, আর তুমি বকধার্মিক পিছনে পিছনে চলেছ খোঁড়া মাটির পোকা খাওয়ার জন্য! আশ্চর্য! গিধর মণ্ডল চটে না। আচ্ছা বাবা, যাদের জিনিস তাদের জিজ্ঞাসা করলেই তো লেঠা চুকে যায়, যে তারা টিউবওয়েলটা কোথায় কোথায় বসাতে চায়।

কথাটা সকলের মনে ধরে। দল বেঁধে সবাই যায় সাঁওতালটোলায়। সাঁওতালরা বলে, থাকুক টিউবওয়েলটা বাবুসাহেবের বাগানে। আমরা ওখান থেকেই জল নিয়ে আসব।

'দেখলি তো?'

---

১ পাবলিক।

মিলেছে ভাল! গরুখোর গিধরটার সঙ্গে শুয়োরখোর সাঁওতালগুলোর। মুখের কইমাছ পিছলে পালিয়েছে ফুস মন্তরে। তাই গিধরটা রাগে নিজের হাত কামড়াচ্ছে। আর এখন ওর মোসম্মতেরই বা দরকার কী, নিজের জাত বেরাদারের সঙ্গেই বা সম্পর্ক কী। ঢোঁড়াই, তোকে একবার ও বলেছিল না তত্রিমাকোয়েরী? এবার থেকে আমরা বলব যে, ও জাতে রাজপুত-কোয়েরী! বাবুসাহেবের কাছ থেকে ও মন্তর নিয়েছে জানিস না? 'রপোর্ট'-টপোর্ট সব ওরা মিলে সাজশ করে করিয়েছে। নিতে হবে না চীনেবাদামের বীজের রিলিফ, রাজপুতদের পাতকুড়ানো বকশিশ।

পরের দিন ঢোঁড়াই মাচার নিচের ছায়ায় বসে একটু আরাম করে নিচ্ছে। বিন্টা কাজ করছে পুবের ক্ষেতে। একা বসে থাকলেই তার মন চলে যায় 'পাক্কীর' দিকে। পাক্কীর উপরের গরুর গাড়ির সারকে ঠিক পিঁপড়ের সার বলে মনে হয়! ধুলো উড়িয়ে কুরসাইলার বাস চলে গেল। এখান থেকে গাড়ির ভেঁপুর শব্দ শোনা যায়। গরুর গাড়িগুলো বাস চলে যাবার পর আবার সার বেঁধেছে। দূরে গরুর গাড়ি যেতে দেখলেই সাগিয়ার কথা মনে পড়ে; এক মেলা থেকে আর মেলাতে হয়তো যাচ্ছে; মাথার কাপড়খানা পর্যন্ত তুলে দেয়নি।···

লাইন ভেঙে একখানা গাড়ি পাক্কী থেকে নামল এইদিকে। গাড়ির উপর বস্তা বোঝাই করা। হবে হয়তো বাবুসাহেবের!···হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের বুকের স্পন্দন একটু দ্রুত হয়ে ওঠে।···সেই রকমই তো মনে হচ্ছে! ঠিক সেই রকমই সোজা সোজা শিঙ! বাঁ দিককার বলদটার কপালের কালো দাগটা আরও কাছে এলে নজরে পড়ে। এ গাড়ি বলদে তো ঢোঁড়াইয়ের ভুল হতে পারে না; লেজের গোছার অর্ধেক চুল সাদা, ডাইনের লালিয়া বলদটার।···
ক্ষেত থেকে বিন্টা জিজ্ঞাসা করে, 'কোথাকার গাড়ি?'

জিরানিয়া টুরমনের ফারমের[১]। এটা বিসকান্ধা না? কোয়েরীটোলা? এখানকার জন্যে চীনাবাদামের বীজ পাঠিয়েছে, টুরমনের ফারম থেকে।

চেনা চেনা লাগে গাড়োয়ানের গলার স্বরটা!·· যা মনে করেছিল ঠিক তাই! মোড়ল! তাদের তাৎমাটুলির মোড়ল! তার গাড়ি মোড়ল চালাচ্ছে কেন? কী ভেবে যেন ঢোঁড়াই পাশের বেড়াটার আড়ালে গিয়ে বসে। আশপাশের ক্ষেত থেকে লোক গিয়ে জমে গাড়ির চারিদিকে।

'ফারম থেকে বলে দিয়েছে, যাকে যেমন দেওয়া দরকার, লাডলীবাবু খাতায় লিখে লিখে সকলকে দেবে।'

১ টুর্নামেণ্ট এগ্রিকালচারাল ফার্ম।

'ঐ যে ছাত হাঁ করে রয়েছে, ঐটাই লাডলীবাবুর বাড়ি। ওখানেই নিয়ে যা গাড়ি। আর এ পথে ফিরবার দরকার নেই। ঐ হাঁ-করা বাড়িটার মুখের মধ্যে পুরে দিস এই বস্তাগুলো। বড় পেট ওদের। তারপর যদি কিছু বাঁচে বিলিয়ে দিস রাজপুতটোলায়।'

গাড়োয়ানটার চোখেমুখে কথা। এক মুহূর্তে সে ব্যাপারটা বুঝে নেয়।

'আরে, চটে কী করবি। ভূমিকম্পে তোদের আর কী হয়েছে। আমরা করতাম ঘরামির কাজ, আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। ভূমিকম্পে ভাঙবার পর সব খোলার ঘরে টিনের ছাত উঠেছে, সব বাড়িতে টিউবওয়েল বসেছে। তিরিশ টাকায় টিউবওয়েল পাওয়া যায়, কে আর কুয়ো খোঁড়াচ্ছে! 'ধরতিমাই'র খেয়ালই বলব একে। তাই না এই চীনাবাদামের বস্তার উপর সারারাত বসে কাটাতে হচ্ছে। আর যা পাচ্ছিস নিয়ে নে। ক্ষেতে না লাগাস খেয়ে ফেলবি। এও কি পেতিস নাকি? আশ্রমের মাস্টারসাহেব রপোট দেখে এক হুড়ো দিয়েছে ফারমের উপর যে, এক বছরের উপর হল এখনও কটা চীনাবাদামের বীজ পাঠাতে পারলে না বিসকান্ধায়?

বিল্টা ক্ষেপে ওঠে, 'ঢের হয়েছে, তোর আর রাজপুতদের তরফ থেকে 'বালিস্টারি' করতে হবে না। জলদি বেরো আমাদের টোলা থেকে।'

রাগে গজগজ করতে করতে গাড়োয়ান বলদের লেজ মোড়ে। 'বাপের কেনা সড়ক তোদের। ধার অনেক, তো কিনে নে 'ঘোড়া'—তোদের হয়েছে তাহ।'

ঢোঁড়াই বেড়ার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।···রাশের টান আলগা, তবু বলদ জোড়া মুখ উঁচু করে রয়েছে। বাতাস শুঁকছে নাকি? নিশ্চয়ই তার গন্ধ পাচ্ছে! ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেয়। হাত-বুলোনো দূরের কথা, এমনি কপাল করে পাঠিয়েছে রামচন্দ্রজী যে, নিজের গাড়ি-বলদও বেড়ার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়!

অভীষ্ট পূরণে বাবুসাহেবের উল্লাস

'সেসরসাহেবেব পায়াভারি খানদান। কিছুদিন টাল খেয়ে পড়েছিল। এতদিনে আবার মাথা উঁচু করে জমিয়ে বসেছে গাঁয়ে। লাডলীবাবুই না একটু বিপথে গিয়ে অমন পরিবারটার জলুস একটু কমিয়ে দিয়েছিল সেই লাডলাবাবুর কল্যাণেই তাঁদের ছাতলাধরা বাড়িঘরদোর আবার চকচকে ঝকঝকে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দারোগা-হাকিমের চোখেও তাঁদের কলঙ্কের

দাগ মুছেছে। আসলে সব হয়েছে সময়ের গুণে ; কিন্তু বাবুসাহেব বাড়িতে বলেন যে, তিনি সংসারের ভার আবার হাতে নিয়েছেন বলেই সামলাতে পেরেছেন।

বাবুসাহেব আজ সাঁঝের পর এখনও বাড়ির ভিতরে যাননি। গিধর মণ্ডলের জন্য অপেক্ষা করছেন। গিধর আজকাল প্রায় রোজই আসছে। সংসারের কাজে তালিম দেওয়ার জন্য বাবুসাহেব নাতিকে নিয়ে বসেন এই সময়টায়। আজকে গিধর সেই ব্যাপারটার একটা অন্তিম নিষ্পত্তি করে আসবে বলেছে। সব হয়েই এসেছে। গিধর করেছে এবার খুব। কাজটা করেছেও বেশ গুছিয়ে। আজকের খবরটা শুনবার পর তবে তিনি গিয়ে পুজোয় বসবেন। পুজোর উপচার সব ঠিক করাই আছে। 'ঘরবালী'[১] ইতিমধ্যেই দুবার ডেকেও পাঠিয়েছেন। মেয়েমানুষের কাণ্ড! বুঝবে না কিছু, কেবল রাত হয়েছে, রাত হয়েছে!

মনের অস্থিরতা কাটাবার জন্য বাবুসাহেব অভ্যাস মতো নাতিকে উপদেশ দেওয়া আরম্ভ করেন। সে বেচারা অনেকক্ষণ থেকে বসে বসে ঢুলছে।... 'অতিথি এলে দুধদই দেবেন পুরো। কিন্তু সব সময় বলবেন যে, আজকাল আর দুধ কই বাড়িতে। সব মোষ মরে হেজে গিয়েছে।...মরদের জমি বেড়ে চলে, মেয়েমানুষের জমি কমে যায়, আর হিজড়ের জমি যেমন-কে তেমন থাকে। · জমির সীমানায় তালগাছ পোঁতাটা একদম ভুল। ও হিজড়েরা পোঁতে। ঐ একটা বেঢঙা লম্বা গাছ সাপ শকুনের আড্ডা। দু পুরুষে জমি বাড়ে মোটে বেড়ের অর্ধেকটা।...যেদিকে লোক চলাচল কম সেদিককার সীমানায় বাঁশঝাড়ই ভাল, আর বাড়ির কাছে কলার ঝাড়।' বাবুসাহেব মনে মনে ভাবেন, মেয়েমানুষের জমির ধর্মই যে কমে যাওয়া। গিধর মণ্ডল তো শুধু নি:মত্তের ভাগী!

গাঁয়ের লোকের মন না মতি। ঘুঘু গিধর মণ্ডল এই নরম জায়গাটায় ঘা দিতে পেরেছিল এতদিনে। বুড়হাদাদার পাঁচ বছরের নাতিটা রক্তবমি করে দুদিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল। তারপরই গিধর বুড়হাদাদাকে কী সব যেন বলেছিল।

'ঠিক বলেছিস গিধর, এ ঐ ডাইনী মোসম্মতটারই কাজ। এ তো আমার মাথায় ঢোকেনি আগে।' বুড়হাদাদার ঘোলাটে চোখ দুটোকে লেজে-পা-পড়া, বিড়ালের চোখ বলে ভুল হয়। রাগের জ্বালায় এখনই বুঝি বেড়া আঁচড়াতে বসে।

---

১ গিন্নি।

বুড়হাদাদার পুত্রবধূ চিৎকার করে কাঁদছিল। তার হঠাৎ মনে পড়ে যে, মোসম্মত একদিন তার কাছে আগুন নেওয়ার জন্য এসেছিল।

লছমিনিয়ার মা-ও লক্ষ্য করেছে যে, মোসম্মতের খাওয়ার পরও তার হেঁশেলে এক থালা ভাত নিত্য ঢাকা থাকে। নিশ্চয়ই সেই যাদের নাম করতে নেই তাদের খাওয়ানোর জন্য।

সাক্ষীর অভাব হয় না।

সারারাত নাকি মোসম্মত জেগে বসে থাকে। পায়ের শব্দে চমকে ওঠে।

সত্যিই তা! বিল্টাও নিষুতিরাতে একদিন ক্ষেতে পাহারা দিয়ে ফিরবার সময় মোসম্মতের তামাক খাওয়ার শব্দ শুনেছে।

সাঁঝের পর কে একজন যেন মোসম্মতকে হাটের চৌরাস্তার বটগাছটার নিচে বসে থাকতে দেখেছে। সেদিন হাটের দিন ছিল না। চারিদিক চুপচাপ ফাঁকা, জনমানবের চিহ্ন নেই, তারই মধ্যে বুড়ি বসে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল যে, হাটের কুষ্ঠ রুগীটাকে চারটে ভাত দিতে এসেছিল। বুড়োমানুষ, থকে গিয়েছিলাম বলে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।

আরও কত রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 'গাঁয়ের মধ্যে থেকে এই কাণ্ড! জাতের বুকের উপর বসে জাতের দাড়ি উপড়ানো! এর এখনই একটা 'জাতিয়ারী'[১] বিহিত করতে হয়।'

'ঠিক বলেছে গিধরটা।'

বিল্টা পর্যন্ত বলে, 'না, না ঢোঁড়াই এ আমাদের জাতের সওয়াল। তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না। সত্যিকারের ডান কিনা সেটা না দেখেই কি আর কিছু করা হবে? তোকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল তাও তোর দরদ ঘোচে না ঐ ডানটার উপর।'

এই 'ডাইনী কিনা দেখা' কথাটার মানে সকলেই জানে। পরীক্ষায় উতরে গেলেও নিস্তার নেই। বিষ্ঠা গুলে খাওয়ানোর পরও সে যদি স্বাভাবিক থাকে, তখন আবার প্রশ্ন উঠবে ঐ জিনিস খাওয়া লোককে জাতে তুলবার। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এ ব্যাপারটির গুরুত্বও কম নয়।

'আচ্ছা বিল্টা, তোরা গাঁ-সুদ্ধ লোক যদি চাস যে, মোসম্মত গাঁ ছেড়ে চলে যাক, তাহলে সে চলেই যাবে। তা বলে কোনো জুলুম করিস না তার উপর। আমি তাকে মানিয়ে নেব। দেখছিস না কী ছিল আর কী মানুষ হয়ে গিয়েছে, মেয়ে চলে যাওয়ার পর। তুই বরঞ্চ একবার বলে ভাখ গিধর মণ্ডলকে।'

১ জাতের পক্ষ থেকে।

অনেক সাধ্যসাধনা, কথা কাটাকাটি, সলাপরামর্শের পর ঢোঁড়াইয়ের কথা রাখে গিধর। 'একবার তোর কথা রাখলাম বলে, বার বার অনুরোধ করতে আসিস না যেন, ফিরে ফিরে।'

এখান থেকে খানিক দূরে, রামনেওয়াজ মুন্সির বাড়ির পথে একটা জলা জমি উঁচু হয়ে উঠেছিল ভূমিকম্পে। সেই জমিটা বাবুসাহেবকে বলে মোসম্মতকে পাইয়ে দিল গিধর মণ্ডল।

...'পুরনো ধরনের লোক বাবুসাহেব। কেউ গিয়ে কেঁদে পড়লে না করতে পারেন না। খোশামোদ করে যা চাও পেতে পার তাঁর কাছ থেকে, কিন্তু রুখে কথা বল, ঠকবে। তা ছাড়া মোসম্মতও তো আমার পর না। নগদ পয়সা বার করাই আজকালকার দিনে শক্ত। তাই নতুন জমিটার বদলে, কোয়েরীটোলার জমিটা বাবুসাহেবকে দিতে হল। তবে হ্যাঁ, সকলেরই টাকার দরকার। বাবুসাহেবকে ভাবিস সকলে 'ডবল' মানুষ[২]। আরে মানুষও যেমন 'ডবল' তেমনি তার খরচাও ডবল। সেসবের আন্দাজও তোরা করতে পারবি না, বুঝলি রে গনৌরী। আমি অনেকদিন মিশেছি কিনা, আমি জানি।'...

এবার গিধরটা মোসম্মতের জন্য সত্যিই করেছে খুব। এককালে যে টাকা খেয়েছে সেটা সুদে আসলে উসুল করে দিয়েছে। বাবুসাহেবকে বলে তাঁর লোকজন দিয়ে, নিজের তদারকে, সে মোসম্মতের চালা আর খুঁটিগুলো উপড়ে নতুন জমিতে বসিয়ে দিয়ে এসেছে। কদিন ধরে দিনরাত মেহনত করেছে এর পিছনে।

ঢোঁড়াই মোসম্মতের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। সেই মুখরা ডাইনীবুড়ি কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। স্বামীর ভিটে ছাড়বার সময়ও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদে না। জাতের লোকদের গালাগালিটা পর্যন্ত দেয় না। তার জাতের লোকেরা তো খারাপ না! যার মেয়ে জাতকুল ভাসিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, তাকে সুদ্ধ এতদিন একঘরে করেনি। জাতের মোড়ল গিধর, সেও তার এই বিপদের সময় যতটুকু পেরেছে করেছে। সে তাঁর এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে থেকেও, একটা কিছু ভাল খুঁজে বার করে, মনে স্বস্তি পেতে চায়।...গাঁয়ের বাইরে গেলে হয়তো সাগিয়াটা কোনোদিন মা'র কাছে আসতেও পারে।...মহাবীরজী আজ তাকে তার জাতের লোকের হাতে বেইজ্জতি থেকে বাঁচিয়েছেন।

---

২ বড়লোক।

যাবার সময় মাটির তাল বাড়ির গোঁসাইটিকে কোলে নিয়ে মোসম্মত উঠোনের তুলসীতলায় প্রণাম করে 'জয় মহাবীরজী।'

এই খবরের প্রতীক্ষা করেছিলেন বাবুসাহেব সন্ধ্যা থেকে। গিধরের কাছে খবরটা পেয়েই, তিনি তাঁর ঠাকুরঘরে ঢোকেন। ডাকবার মতো করে ডাকতে পারলে ভক্তের কথা শুনতেই হবে তাঁকে! কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বিগ্রহের পায়ের কাছ থেকে তাঁর মাথা তুলতে আর ইচ্ছা করে না। নিজের জমির উপর দিয়েই তাঁর গাড়ি সদর দরজা থেকে সোজা গিয়ে 'পাক্কী'তে উঠতে পারবে এবার থেকে।...

জয় জয় হো জানকীবল্লভ রঘুনাথজী! জয় জানকী মাই! জয় লছমনজী, ভরতজী, দশরথজী, কৌশল্যা মাই, মহাবীরজী, শত্রুঘনজী, সুগ্রীব, বিভীষণ... আর কোনো নাম ছেড়ে গেল না তো? রামচন্দ্রজীর আয়ুধগুলির নাম তাঁর মনে পড়ছে না ঠিক। বুড়ো হওয়ার নানা লেঠা। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং রামোজাতঃ স্বয়ং হরি,' বলে বাবুসাহেব মন্ত্র শেষ করে ওঠেন।

ও অনোখীবাবু, কোয়েরীটোলার ভজনের দলকে পাঁচসিকে চাঁদা পাঠিয়ে দেবেন কাল সকালে মনে করে।

রামরাজ্য আনয়নার্থে যজ্ঞ

রবিবার করলে কুষ্ঠরোগ সারে বটে, কিন্তু এক রবিবারে নয়। কথাটা মনে রাখবার মতো স্মৃতিশক্তি বাবুসাহেবের এই বুড়ো বয়সেও আছে। আজকে গাছ পোঁত, দশ বছর পরে ফল ধরবে! জমি-জিরেতের ব্যাপার! অত হড়বড় করলে কি চলে!

তাই সত্যি করে ঘাড়ে পড়বার আগে কোয়েরীটোলার লোকরা তাদের বিপদের কল্পনাও করতে পারেনি। জানতে পারল হঠাৎ।

সাঁওতালটুলির লোকেরা এ জেলার লোকদের বলে 'বিরকু'[১]। নেহাত দরকার না পড়লে তারা বিরকুদের পাড়ায় আসে না। সেইজন্য এক রাতে মঠের ময়দানে সাঁওতালের দলকে আসতে দেখে কোয়েরীটোলার লোকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপার কী! শিকার-টিকার থেকে ফিরছে না তো? কী রে. বড় শিকার না ছোট শিকার? খরগোস না শজারু? বোস. রে ঐদিকে। খয়নি নে। আগুন নিবি?

১ 'বিরকু' কথাটির মধ্যে খানিকটা অবজ্ঞা মেশানো।

সাঁওতালরা প্রথমটায় কোন কথা বলে না। অন্ধকারের মধ্যে তাদের সাদা দাঁতগুলো দেখে বোঝা যায় যে তারা হাসছে। তারপর পিথো মাঝি এক নিশ্বাসে বলে ফেলে যে, গেনা, গনৌরী, পরসাদী, ভবিয়া আরও কার কার যেন জমি ছেড়ে দিতে হবে সাতদিনের মধ্যে।

ঠেসে পচই চড়িয়েছে রে শালা আজ! চেঁচামেচির মধ্যে দিয়ে আসল কথা বেরোয়, আস্তে আস্তে। বাবুসাহেব ঐসব রায়তী জমি সেলামি নিয়ে বন্দোবস্ত দিয়েছে সাঁওতালদের কাছে। সদরে ডিগ্রি করিয়ে দু'বছর আগেই নিলামে কিনে নিয়েছিল। তবে যে অনিরুধ মোক্তার বলেছিল 'নুটিস' না দিলে কিছু করতে পারবে না! হাকিমটা রাজপুত নাকি জাতে? না হলে নিশ্চয় টাকা খেয়েছে। নিলাম আবার কবে হল? ঢোল নেই, ঢাক নেই, গোরার বাদ্যি! চাপরাশি নেই, নুটিশ নেই, নিলাম হলেই হল আর কী!

'জান কবুল!'

এই দিন যে হাতাহাতিটার আরম্ভ, সেটা চলে বহুদিন। থানা-পুলিশ, মাথা ফাটাফাটি, ফৌজদারী আদালত, কিছু করেই জমিগুলো রাখা যায়নি। দারোগা হাকিম, এমনকি হাসপাতালের ডাক্তারটা পর্যন্ত সবাই বাবুসাহেবের দিকে। শেষ পর্যন্ত একদিন পুলিশের সম্মুখে সাঁওতালরা ঐ জমিগুলোর উপর মুর্গি কেটে খেল।

এই আবহাওয়ার মধ্যে প্রথম যেদিন 'বলন্টিয়র'রা গান গাইতে গাইতে কোয়েরীটোলায় এল সেদিন গাঁয়ের বড়রা গান শুনবার জন্য তাদের উপর ভেঙে পড়েনি। মহাৎমাজীর চেলাদের নাম 'বলন্টিয়ার'।

ছেলেরা তাদের বলে, এখান থেকে সিধা গেলে লাডলীবাবুদের বাড়ি পাবেন।

তারা লাডলীবাবুদের বাড়ি থেকেই এদিকে এসেছে। সেখানে উঠবে বলে গিয়েছিল। বাবুসাহেব খাসকামরায় তাদের ডেকে বলেছিলেন যে ছাপোষা মানুষ তিনি। সংসারধর্ম করে খেতে হয়। ছেলে হচ্ছে নিজের হাত-পা। তারই একটাকে তিনি তো দানই করেছেন মহাৎমাজীকে। লাডলীবাবুর দোস্তরা তাঁর ছেলেরই মতন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের থাকতে দেওয়ার মানে রাজপারভাঙার বিরুদ্ধে যাওয়া। কোয়েরীটোলায় ভাঙা মঠটা এখনও লোক থাকবার যোগ্য আছে। শীত পড়ে এসেছে, এখন আর সাপের ভয় নেই এখানে।

'তোমাদের টোলায় এলাম, আর তোমরা চলে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিচ্ছ? টোলায় আমাদের থাকতে দিলে পুলিশে ধরবে না।'

সাঁওতাল, রাজপুত, আর পুলিশের সঙ্গে বলে কত লড়লাম, এই কয় বছর ধরে, তার আবার পুলিশের ভয়! ভারী সুন্দর কথা বলে বলন্টিয়ররা।

'তাসের গোলাম বড়র খেলা জান না? আমাদের মুলুক সেই গোলাম বড়র রাজ্য! অংরেজের মাইনে-পাওয়া চাকর কলক্টর দারোগা, আর পাতের এঁটো কুড়ানোর চাকর জমিদার। লড়ে দেখেছ তো? এদের সঙ্গে লড়লে 'পাবলিস' হেরে যায়। মহাৎমাজীর খেলায় পাবলিসের এক্কা[১] বড়!'

কত মজার মজার কথা বলে বলন্টিয়ররা। বোট[২] না কী একটা কথা তারা ঠিক ধরতে পারে না। কেবল এইটুকু বোঝে যে এক দিকে মহাৎমাজী, আর এক দিকে রাজপারভাঙা। মহাৎমাজীর দিকে আছে কাংগ্রিস আর মাস্টারসাহেব। রাজপারভাঙার দিকে বাবুসাহেব রাজপুতরা, দারোগাসাহেব, ইনসান আলি আড়গড়িয়া, গিধর মণ্ডল। বাবুসাহেবের পা-চাটা সাঁওতালগুলো কোন দিকে বোঝা যাচ্ছে না। কোন দিকে আর হবে। যে দিকে যইয়ের ক্ষেত সেই দিকেই ঐ মোষগুলো মুখ বাড়ায়।

'তোরা মানুষ না কি! 'পাবলিস'-এর জমি হড়পাচ্ছে বাবুসাহেব। মঠের জমি। আখের চাষ আরম্ভ করেছে সেই সব জমিতে। মঠবাড়ির চৌকাঠগুলো সুদ্ধ খুলে নিয়ে গিয়েছে!'

ঢোঁড়াই বলে, 'হুজুর! নিজের জমিই বলে আমরা বাঁচাতে পারলাম না জান কবুল করেও, তার আবার 'পাবলিসের' জমি।' বলন্টিয়ররা বলছে বটে কড়া কথা, কিন্তু কথাগুলো দামী কথা। গুরুজীও তো ছাত্রদের গালাগালি দেয়, বাপও ছেলেকে মারে। না হলে আবার আপনার জন কী!

'হুজুর বলোগে তোমাদের বাবুসাহেবকে, আর দারোগা হাকিমকে। মহাৎমাজী আমাদের বলে দিয়েছেন, যে-যে গাঁয়ের লোক তোমাদের হুজুর বলে সে গাঁয়ে থেকো না।'

কোয়েরীরা সকলেই ঢোঁড়াইয়ের উপর চটে ওঠে, 'মহাৎমাজীর এই হুকুমটুকুও জানিস না ঢোঁড়াই?'

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয় না। বলে, 'আমরা মুখ্যু লোক, চোখ থাকতেও অন্ধ। আপনারা রামায়ণ পড়া লোক, আপনাদের হুজুর বলতেই আমাদের বাপ-দাদা শিখিয়েছে। এ শুধু আপনাদের ইজ্জত দেখান নয়, রামায়ণকে ইজ্জত দেখান।'

১ এক্কা কথাটি স্থানীয় ভাষায় দ্ব্যর্থবাচক। এর একটি অর্থ একতা। অপর অর্থ তাসের টেক্কা।

২ ভোট।

এই লোকটাই তাহলে ঢোঁড়াই! এরই কথা লাডলীবাবু বলে দিয়েছিল। কথার বাঁধুনি তো খুব। বলন্টিয়ররা হঠাৎ ঢোঁড়াইকে আপনি বলে কথা বলতে আরম্ভ করে। একে দিয়েই তাদের কাজ হবে। এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইয়ের জীবনে। ঠাট্টা করছে বলে তো মনে হচ্ছে না মুখ দেখে! আজকে তেল মেখেছে বলে বাবুভাইয়া ভাবল না তো তাকে! কী রকম একটা অস্বস্তি লাগে মনে।

আ গয়া! এসে গেল! এসে গেল! এল আবার কী! সাদা বাক্সতে আবার কী! 'বোট'! বোট! ভয়ের তো লক্ষণ দেখছি না বলন্টিয়রদের মুখে। মহাৎমাজীর খাদি সাদা, মহাৎমাজীর বাক্স সাদা! সাদাতে মনের ময়লা কাটবে। 'পাকসাফ'! জমিদারে রক্ত শুষে সাদা ফ্যাকাশে করে দিয়েছে আপনাদের, তাই আপনাদের বাক্স সাদা। দিতেই হবে আপনাদের। সাদা বাক্সতে।

কোনো চাঁদা কিম্বা তোলা টোলা নয়তো? এ টোলায় যারা দশ আনার বেশি চৌকিদারী খাজনা দেয়, তাদেরই কেবল বোট দিতে হবে। সাঁওতাল-টোলায় যারা পাঁচ আনা খাজনা দেয় তারাই বোট দিতে পারবে।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে বুড়হাদাদার। ভাগ্যে সে সাঁওতাল নয়। খুব বেঁচে গিয়েছে সে। তাকে চৌকিদারী খাজনা দিতে হয় সাড়ে-ছয় আনা।

বিল্টার চোখ জ্বলে ওঠে। জবরদস্তি পেয়েছ! আমার বোট বসালেই হল নাকি! সার্কিল মানিজর, জমিদার আমি কিছু বুঝি না!

ঢোঁড়াইয়ের সব শুনে মনে হয় যে বোটটা গঞ্জের বাজারে সাদা বাক্সতে দিতে হয় 'ধর্মদায়'-এর মতো। নৌরঙ্গীলালের গোলায় পাট, তামাক বেচতে গেলেই দাম থেকে গাড়ি পিছু চার আনা করে কেটে নেয় 'ধর্মদায়' বলে। নৌরঙ্গীলাল সিকিটা একটা তালা দেওয়া বাক্সের ফুটোর মধ্যে ফেলবার সময় সুর করে বলবেই 'গৌ সেবা কি করো তৈয়ারি, প্রাণ বাঁচে গোমাতাকী।'...

অদ্ভুত জিনিস এই 'বোট'। হঠাৎ টাকা পেলে লোকের ইজ্জত বাড়ে, এর অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইয়ের জীবনে আগে হয়ে গিয়েছে। বোটও সেই রকম রাতারাতি লোকের ইজ্জত বাড়িয়ে দেয়,—কেবল যে বোট দেবে তার নয়, সারা গাঁয়ের। তাই মানিজার সাহেবের মতো অত বড় একটা লোক একদিন বাবুসাহেবকে সঙ্গে করে কোয়েরীটোলায় এলেন। বাবুসাহেব তাঁকে বলেছিলেন যে, ঢোঁড়াইটাকে বুঝোতে পারলেই কোয়েরীটোলার কাজ হয়ে

যাবে। অত বড় একটা 'অফসর আদমী'[১], পায়খানাতেও নাকি কুর্সিতে বসে, আর আরদালি জিরানিয়া থেকে সাইকেলে রোজ পাউরুটি আর খবরের কাগজ নিয়ে আসে। এহেন সার্কিল মানিজর সাহেবও ঢোঁড়াইকে চেনেন, নাম ধরে ডাকেন, তুই না বলে তুমি বলেন। গর্বে ঢোঁড়াইয়ের মন ভরে ওঠে।

বলণ্টিয়ররা বলেছে সারা মুলুক জুড়ে এই রকম 'বোট' হচ্ছে। চেরমেন সাহেব যদি তাৎমাটুলিতে যান এইরকম তবে না তাৎমাটুলিকে বলব গাঁ! বলণ্টিয়ররা মঠের বটগাছে একটা সুন্দর ঝাণ্ডা বেঁধে সেইখানেই আস্তানা গেড়ে বসেছে কিছুদিন থেকে।

একদিন জিরানিয়া-ফেরত একজন বলণ্টিয়র ঝোলার ভিতর থেকে বার করে দিল মহাৎমাজীর চিঠি; যে যে 'বোট' দেবে সবার নামে এক-একখান। রামায়ণের হরফের মতো লেখা মহাৎমাজীর। যারা দশ আনা চৌকিদারী খাজনা দেয় তাদের স্ত্রীদের নামেও মহাৎমাজী চিঠি দিয়েছেন। 'সন্ত আদমী'রা সকলের নামধাম সব জানতে পারেন। তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াইয়েরও চৌকিদারী ট্যাক্স দেড় টাকা ধরা হয়েছিল। সেখানে থাকলে তার নামেও মহাৎমাজী চিঠি দিতেন। আরও একখান চিঠি যেত 'রামপিয়ারী জৌজে'[২] ঢোঁড়াই-এর নামে। এখন হয়তো গিয়েছে রামপিয়ারী 'জৌজে' সামুয়র। মহাৎমাজীর স্বীকৃতির সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে এত বড় একটা অবিচারের উপর। এই মনখারাপ করা কথাগুলো ঢোঁড়াই দূর করে ফেলতে চায় মন থেকে। মহাৎমাজী বোধ হয় সামুয়র ধাঙড় লিখবেন না, লেখা থাকবে রামপিয়ারী জৌজে সামুয়র হরিজন···কী ভাগ্যি লোকগুলোর যেগুলো মহাৎমাজীর চিঠি পায়!···

শেষ পর্যন্ত মহাৎমাজীর কাছ থেকে ঢোঁড়াইয়ের নামে একখানা চিঠি আনিয়ে দিতে রাজী হয় বলণ্টিয়ররা, যদি ঢোঁড়াই তাদের সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গাঁয়ে মহাৎমাজীর গান গেয়ে বেড়ায়। আপনার গানের গলাটা বেশ, ভজনের সময় শুনেছি তো। এ কথা কাউকে বলবেন না যেন। সেই 'বোট'-এর দিন চিঠি দেব।

ধন্যি ভাগ্যি তার, যে মহাৎমাজীর চেলাদের নেকনজরে পড়তে পেরেছিল। মনে মনে ভাবত যে দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে সে। ছাই জানে সে! এত বড় ব্যাপার 'বোট' যার জন্য সার্কিল মানিজর দুয়োরে মাথা কোটেন, মহাৎমাজী চিঠি দেন, তার সম্বন্ধে কিছুই জানত না সে। দৈবক্রমে সে

১ ক্ষমতাশালী লোক।

২ রামপেয়ারী স্ত্রী ঢোঁড়াই, ভোটারদের তালিকায় স্ত্রীলোকদের নাম এইভাবে লেখা হয়।

বলন্টিয়রদের কাছ থেকে জেনেছে, ভোটের মানে সাদা ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলতে হবে, মহাৎমাজীর চিঠির জবাবে। বিনা টিকিটের চিঠিই ঠিক জায়গায় পৌঁছোয়! ঐ চিঠি পেলেই মহাৎমাজী বুঝবেন যে তোমরা রামরাজ্য চাও কিনা। প্রথমেই তিনি কানুন করবেন খাজনা কমাবার আর জমিদারকে কাবু করবার।

'সাদা বাক্সর গান তো নয়, রামরাজ্য কায়েম করবার গান; রামচন্দ্রজী আর মহাৎমাজীর নামের মহিমা প্রচারের ভজন। অষ্টপ্রহরভজনের দিন যে-রকম ঘোর ঘোর আবেশ আসে, সেই রকম মাদকতা আছে সাদাবাক্সর গানে। থামতে আর ইচ্ছে হয় না। ঠেলে নিয়ে যায়। সার্কিল মানিজার সাহেবের দিক থেকে টাকার লোভ দেখাতে এলে, গিধর মণ্ডলকে মারতে ইচ্ছা করে। ভোটের দিন সার্কিল মানিজার তাদের কুশীঘাটের নৌকা সরিয়ে নিলে, এই নেশাটা সাঁতরে নদী পার হতে বাধ্য করে। সাঁওতালের দলকে ওদের তাঁবুতে পুরি খেতে দেখলে, মনটা পাগল হয়ে ওঠে; ঝাঁপিয়ে কেড়ে নেয় ঢোঁড়াই পাশের বলন্টিয়রের হাতের চোঙাটা; গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে:

মাগনা কচুরি পাও খেয়ে নিও
মাগনা গাড়ি পাও চড়ে নিও
পয়সা পাও বটুয়াতে ভরে নিও
কিন্তু ভোটের মন্দিরে গিয়ে বদলে যেও ভাই হামারা
সাদা বাক্সা, মহাৎমাজীকা সাদা বাক্সা!

বাবুসাহেবের পাহারাদার বজ্রবাঁটুল তিলকুমাঝি ছুতো করে তাঁবুর বাইরে এসে ঢোঁড়াইকে ইশারা করে জানিয়ে যায় যে, তারা ঠিক আছে।

বলন্টিয়ররা মহাৎমাজীর চেলা; সাচ্চা আদমী। তারা তাদের কথা রেখেছিল, সেদিন বেলাশেষে। সাদা ছোট এক টুকরো কাগজে, ভারী সুন্দর কী যেন একটা লিখে দিয়েছেন মহাত্মাজী। হোক ছোট। দেশজোড়া লাখ লাখ লোককে লিখতে হচ্ছে তাঁর। কত আর লিখবেন! একখানা চিঠি লিখতেই বলে মিসিরজী হিমশিম খেয়ে যায়।

বলন্টিয়র ভাঙা গলায় তাকে বলে, 'তোর নাম ঢোঁড়াই কোয়েরী, বাপের নাম কিরতু কোয়েরী বিসকান্ধার। হাকিম জিজ্ঞাসা করলে বলবি। মুখস্ত রাখিস, বাপকা নাম কিরতু কোয়েরী। হাকিম আর একখানা মহাৎমাজীর চিঠি দেবে।' এখান নিয়ে গিধর মণ্ডলের তন্ত্রিমাকোয়েরী কথাটা ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে। এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় তার সারা শরীর ঘেমে ওঠে; সকলে

বোধ হয় তাকে দেখছে; চলবার সময় পা জড়িয়ে আসছে। সে যখন হাকিমের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি চটে আগুন হয়ে পিথো সাঁওতালকে বকছেন। চিঠি ফেলবার আগে সাদা বাক্সটায় সিঁদুর দিচ্ছিল সে।...জেলে পুরব তোকে আমি; বাক্সর রঙ বদলান হচ্ছিল!...

ঢোঁড়াইকে দেখেই অসহায় পিথো অকূলে কূল পায়। 'দেখছিস ঢোঁড়াই হাকিমের কাণ্ড! আমি বলি হাকিম তুমিও নাও না কেন বিড়ি খাওয়ার জন্য এক আনা পয়সা। তা নয় আমাকে হাজতে পুরবে বলছে!'...

হাকিম ঢোঁড়াইকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই হাত বাড়ান, তার হাত থেকে মহাৎমাজীর চিঠিখানা নেওয়ার জন্য। 'ঢোড়াই কোয়েরী?' নতুন মহাৎমাজীর চিঠিতে হাকিম ডাকঘরের মোহর মেরে দেন। 'যাও!' হাকিমের চিৎকারে ঢোঁড়াই চমকে ওঠে। তবু ভাল! হাকিম পিথোটাকে ছেড়ে দিল।

ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখান তার মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাৎমাজী, ধন্য হো কাংগ্রিসের বলণ্টিয়র, যাদের দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেরালির কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল। দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, সে যদি লিখতে জানত তা হলে নিজে হাতে লিখে দিত মহাৎমাজীকে। এই চিঠির মধ্যে দিয়ে মুলুকের এক পারের লোক সেই কোথায় অন্য পারের মহাৎমাজীর কাছে পৌছুতে পারছে, এক সঙ্গে, এক সময়। তাৎমাটুলি, জিরানিয়া, বিসকান্ধা, গঞ্জের-বাজার, ঢোঁড়াই, রামপিয়ারী, পিথো সাঁওতাল, বলণ্টিয়র, তিলকুমাঝি, মাস্টারসাহেব একই জিনিস চায়। তারা সকলে একই চিঠি দিয়েছে মহাৎমাজীকে। সরকার, হাকিম, পুলিশ, জমিদার, সার্কিল মানিজর, গিধর কোয়েরী, বাবুসাহেব, ইনসান আলি বোধ হয় কিরিস্তান সামুয়র, সব তাদের বিরুদ্ধে। জাতের মিল নেই তবু কত কাছে এসে গিয়েছে তারা। রামিয়া আর তার ছেলেটা যে-রকম আপন হলেও পর, তেমনি এরা সব পর অথচ আপন। মাকড়সার জালের মতো হালকা সুতোর বাঁধন; ধরতে গেলেই ছিঁড়ে যায় এমন মিহি। সব সময় বোঝাও যায় না আছে কি নেই; হাওয়াতে যখন দোলা দেয়, ভোরের শিশিরে যখন ভিজে ওঠে, হঠাৎ-রোদের যখন ঝলকানি লাগে, তখন দেখা যায়; তাও খানিক খানিক। রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা সুতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাৎমাজী। সেই পশ্চিমা মেয়েটার বাঁধন, সেই সাত বছরের ছেলেটার বাঁধন, সাগিয়ার বাঁধনের মতো এ বাঁধন কেটে বসে না গায়ে। ঝামা দিয়ে ঘষলেও কলজের

উপর থেকে সেগুলোর দাগ তোলা যায় না, কিন্তু এটাতে কেবল আমলকী খাওয়া মুখের মতো একটা ফিকে স্বাদ রেখে যায়।

'এই করছ কী ভিতরে?'

হাকিমের তাড়া খেয়ে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে!

লাডলীবাবুর চক্রু লাভ

লাডলীবাবুটা আবার আনাগোনা আরম্ভ করেছে কোয়েরীটোলায়। ও লোক ভাল, মহাৎমাজীর চেলা। 'দুবার হয়ে এসেছে'[১]। কিন্তু তবু বিশ্বাস নেই ঐ রাজপুতদের ঝাড়কে।

বিল্টা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এই যে তিন মাস অন্তর বোট আরম্ভ হল এর শেষ আছে কি নেই। আসল কাজের কথা কিছু নেই, কেবল নিত্যি তিরিশ দিন 'বোট, বোট, বোট'। বোট জিনিসটা খারাপ নয়। সেদিন দারোগাসাহেব আর সার্কিল মানিজার সাহেবের গা ঘেঁষে তারা চলে গিয়েছিল, আদাব না করে! আরে কাংগ্রিসের লোকেরা লাটসাহেবের সঙ্গে লড়েছে, ওরা দারোগা-জমিদারকে গিলে ফেলতে পারে গলার গুলীটাকে পর্যন্ত না নাড়িয়ে। আর এই রাজপুতদের? চোখেও দেখা যাবে না; উটের মুখে জিরে! ফুঃ!

লাডলীবাবুর সম্মুখে রাজপুতদের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস তাদের হয়েছে, আগের ভোটের পর থেকে। কাংগ্রিস থেকে আধিয়াদারদের জন্য নতুন কানুন হবে বলন্টিয়র বলেছে। আর পরোয়া কিসের!

বাবুসাহেবের খোশামোদ করে তো গনৌরী, ভবিয়া, পরসাদী কেউ জমি রাখতে পারেনি। ভোলাকে যেতে হয়েছে কাটিহারে কাজের জন্যে। গনৌরী, ভবিয়া আর পরসাদী গিয়েছে কুরসাইলা। সেখানে রাজপারভাঙা চিনির কল খুলেছে তিন বছর থেকে। আর চায় না তারা বাবুসাহেবের পা চাটতে। এক সময়ে অসময়ে কিছু খরচখরচার ব্যাপার। রামজীর আশীর্বাদে তারও একটা সুরাহা হয়েছে। গঞ্জের বাজারে নৌরঙ্গীলাল গোলাদার, ঐ যে, ভোপতলালের বাবা, সেই দরকার হলে খরচ দেয়। যত চাও। ভাল রক্তের লোক। ধার শোধ দেবার সময় বুড়হাদাদু প্রতিবার দড়িতে যে গিঁট দিয়ে রাখে, সেটাকে কখনও অবিশ্বাস করেনি আজ পর্যন্ত। ঐ হত্ত বাবুসাহেব!

---

১ জেল থেকে।

সব জানা আছে। এত বছর থেকে দেখছে বাবুসাহেব আর তাঁর গোমস্তাদের। এক কথার মানুষ নৌরঙ্গীলাল গোলাদার। সাফ বলে দিয়েছে আখের চাষ আর লঙ্কার চাষ করতে হবে। না করলে তার গোলামুখো হওয়ার দরকার নেই। সে কুরসাইলা মিলে আখের যোগান দেয়, আর লঙ্কা পাঠায় পূর্বীবাঙাল। তারই গাড়ি এসে গাঁয়ে থেকে নিয়ে যায়। কোনো হুজ্জত নেই। তবে আর রাজপুতদের এত 'খাতিরদারি' কিসের? বিপদের সময় রামচনরজী কাকের মুখ দিয়ে পথের হদিশ পাঠিয়ে দেন। তাই না নৌরঙ্গীলালের কাছ থেকে তারা এমন আখ পেয়েছে পুঁতবার জন্য, যা বাবুসাহেব পর্যন্ত যোগাড় করতে পারেননি। বুনো-শুয়োরের দাঁত ভেঙে যায় সে আখ চিবুতে গেলে। পাটনাই লঙ্কার বীচি দিয়েছে, এত বড় বড়, এই আঙুলের মতো; কাঁচা লঙ্কারও যা দর, পাকা লঙ্কারও তাই দর। গোলাদারই তো শিখিয়েছে, কেন অতদিন ক্ষেত পাহারা দিবি, কাঁচাই বেচে দে। এই নৌরঙ্গীলালই প্রথম কাঁচা লঙ্কা পাঠাতে আরম্ভ করেছে রেল-গাড়িতে। বাবুসাহেব চটবে তো বসে বসে নিজের গোঁফের চুল কাটবে দাঁত দিয়ে।

লাডলীবাবু বলে, 'হাঁ, 'পূর্বীবাঙাল'-এর মতো নরম পানির দেশে কাঁচা লঙ্কা না খেলে লোকে বাঁচে না। আমি একবার গিয়েছিলাম। খালি পানি, খালি পানি। সাধে কি আর বাঙালীরা এখানে এসে জমিয়ে বসে! এই মাস্টারসাহেবকে দেখ না। এবার ঠিক ডিস্টিবোডের চেরমেন হওয়ার চেষ্টা করবে।'

কেউ কথাটার উপর কোনো গুরুত্ব দেয় না। ঢোঁড়াইয়ের একটু আনন্দই হয়। তবে পুরনো চেরমেনসাহেবের মতো অত বড় একটা লোকের কাজ মাস্টারসাহেব চালাতে পারবে তো? বড় ভাল লোক ছিল চেরমেনসাহেবের বাড়ির বুড়িমাইজী।

সবাই জানে যে, লাডলীবাবু এবার ডিস্টিবোডে দাঁড়াচ্ছে কাংগ্রিসের থেকে। হাতে কাটবে এবার। ডিস্টিবোডে যাওয়ার আগেই বলে খোঁয়াড়ের মালিক ইনসান আলি, গঞ্জের-বাজারের হাসপাতালের ডাক্তার, ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। রাজপুতদের সঙ্গে জমি নিয়ে ঝগড়ার সময় কিছু বলতে গেলে বলত যে, আমি তো জমি-জিরেত সম্বন্ধে কিছু জানি না; জমি দেখাশোনা করেন অনোখীবাবু আর বাবুসাহেব।

মরে যাই রে! মুখের মাছিটা তাড়াতে পারেন না! সব বুঝি রে, আমরা সব বুঝি।

লাডলীবাবুও এদের হাবভাব সব বোঝে, কিন্তু তবু হাল ছাড়ে না।

হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন টোলাসুদ্ধ সকলের নেমন্তন্ন হয়ে গেল 'সত্যদেবের কথা' শুনবার জন্য, গিধর মণ্ডলের বাড়িতে।

ব্যাপারখানা কী! হাড়কঞ্জুস লোকটা তো বিনা পয়সায় গায়ের ময়লাটুকুও কাউকে দিতে রাজী নয়। সে করবে দেড় টাকা খরচ বিনা মতলবে! আরে, বাবুসাহেবের দেওয়া ভজনপার্টির দরুন সেই পয়সাটা নয় তো? ঠিক, ঠিক, ঠিক! উগলে দিচ্ছে। দেবদানো পুরুত গুণীর পয়সা কি কারও পেটে থাকে? সে যত বড় গরুখোরই হোক না কেন।

ঢোঁড়াইয়ের নেমন্তন্ন হয়নি। সকলের চোখেই জিনিসটা বিসদৃশ ঠেকে। 'জাতিয়ারি' সত্যদেবের কথা, এ তো সাত জন্মেও কেউ শোনেনি কোনোদিন।

সেখানে গিয়ে, এদিককার কোয়েরী জাতের মাথা গরভু পত্তনিদারকে দেখে, তারা ব্যাপারটার মোটামুটি আন্দাজ করে নেয়।

পুজোর পর গরভু পত্তনিদার কাজের কথা পাড়ে।···সবাই মিলে রাজপুত আর ভূমিহার বামুনদের ঠাণ্ডা করতে হবে। নামেই মহাৎমাজীর কাংগ্রিস। রাজপুত ভূমিহাররাই মহাৎমাজীকে ঠকিয়ে এটাকে হাত করেছে।··· লাডলীবাবু! কোথায় ছিল লাডলীবাবু, যখন ইনসান আলির আড়গড়িয়ার খোঁয়াড় থেকে, একটা লাল বলদ কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল বকরঈদের আগে। সে সময় কোথায় ছিল রাজপুতগিরি? 'মহাবীরী ঝাণ্ডা' নিয়ে যাওয়ার দিন কলস্টরকে খবর দিয়েছিল কে? হাতে কঙ্কণ, আরশির দরকার কী? অনেক চেটাং চেটাং কথা বলেছিল কাংগ্রিস মহাৎমাজীর ভোটের আগে। এখনও শুনছি কানুনই তৈরী হচ্ছে। একটা কানুনও করবে না, এই বলে রেখে দিলাম।···আমাদের সাহায্যেই ভোটে কাংগ্রিস জিতেছিল আগেরবার। এবার তাই আমরা ঠিক করেছি কূর্মছত্রি, কুশবাহাছত্রি, আর যদুবংশীছত্রি[১] এই তিন জাত মিলে রাজপুত ভূমিহারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। এই তিন জাতে মিলে হয়েছে, 'ত্রিবেণী সঙ্ঘ।'

ভারী সুন্দর নামটা। তিরবেণী সং।

বুড়হাদাদু গরভু পত্তনিদারকে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিল্টাকে, 'এত বুদ্ধির কথার সঙ্গে এর আগে মোলাকাত হয়েছে জিন্দেগীভরে?'

রাজপুতি শান দেখাতে আসে! অবজ্ঞায় বাঁকানো ঠোঁটের পিচকারি থেকে, চিক চিক করে খয়নিগোলা থুতু মেঝের উপর ছোটে।

১ কুর্মি, কোয়েরী, গোয়ালা।

গিধরটা এতক্ষণ কথা বলেনি। সকলের উঠবার সময় সে কেবল বলে, 'যে জাত ঘুমিয়ে থাকে, সে জাত বাঁচে না।'

বিন্টার ছাঁত করে মনে লাগে কথাটা। এর আগেও একবার কথাটা শুনেছিল গিধরের মুখে, কোথায় যেন। মনে করে দেখবার চেষ্টা করে বাড়ি আসতে আসতে।

ডিস্টিবোড ঢোঁড়াইয়ের কাছে যেমন জীয়ন্ত জিনিস, এদের কাছে ততটা নয়। ছোটবেলায় সে অষ্টপ্রহর শুনেছে ডিস্টিবোডের কথা—বাবুলাল চাপরাসী, ঠিকাদারসাহেব, শনিচরার দল, তালে মহলদার রোড পিয়ন। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে ডিস্টিবোডের ঘড়িঘরের ঘড়ি বাজবার শব্দ শুনেছে।...তবু এই ডিস্টিবোডের ব্যাপারে কোয়েরীটোলার লোকেরা তাকে আমলই দিতে চায় না। ঢোঁড়াইয়ের 'পাক্কী'র মালিক ডিস্টিবোড কী করে যেন, কোয়েরীদের 'জাতিয়ারি সওয়াল'[২] হয়ে গিয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা 'তিরবেণী সং' শুনতে শুনতে একেবারে কান ঝালাপালা!...গয়লাদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে জানিস তো? 'কিসনৌৎ' আর 'বিসনৌৎ'। একটা দুধে জল মেশায় আর একটা মেশায় না। ঐ দুধে জল মেশানোর যমগুলোকে রাজপুতরা নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে মহাৎমাজীর নাম করে।...আরও কত কথা।

...'এক গাছের বাকল কি অন্য গাছে জোড়া লাগে?'

ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, তাকে শুনিয়েই কথাটা বলল বুড়হাদাদা।...

ভোটের দুদিন আগে খবর পাওয়া যায় যে, গরভু পত্তনিদার নাম তুলে নিয়েছে। বিনা ভোটে লাডলীবাবু ডিস্টিবোডে যাবে।

জাতের মাথা গরভু পত্তনিদার; সে কিনা জাতের সঙ্গে এই নেমকহারামি করল রাজপুতদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে! তাই জন্যই গিধরটা ক'দিন থেকে লাডলীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে বোধ হয়।

এর দিনকয়েক পরে কী করে যেন লাডলীবাবু ডিস্টিবোডের চেরমেন হয়ে গেল।

তবে যে লাডলীবাবু বলেছিল মাস্টারসাহেব চেরমেন হবে? এবার সত্যিই হাতে কাটবে রাজপুতরা!

কোয়েরীটোলার কেউ আর সেদিন ক্ষেতে কাজ করতে যায়নি।

২ জাতের প্রশ্ন।

আচম্বিতে দৈববাণী হওন

লাডলীবাবু চেরমেন হওয়ার পর থেকে জিরানিয়ায় মাস্টারসাহেবের আশ্রমেই থাকেন। ডিষ্টিবোডের ওরসিয়রবাবু এসে 'পাক্কী' থেকে বাবুসাহেবের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা তোয়ের করিয়ে দিয়েছেন। নতুন কুরসাইলা জিরানিয়া লাইনের বাসটা সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাবুসাহেবের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। বাবুসাহেব প্রত্যহ জিরানিয়াতে যাতায়াত করেন অনিরুধ মোক্তারের কাছে। ঢোঁড়াইরা আবছাভাবে অনুভব করে যে, একটা কোনো বিপদ আসছে তাদের উপর। কোথা দিয়ে আসবে কেমন করে আসবে, তা তারা জানে না। তবে বাবুসাহেব কাছারী যাচ্ছে রোজ। নিশ্চয়ই রামনেওয়াজ মুন্সি কানুনী সলা দিচ্ছে তাঁকে।

পরিষ্কার করে বলে না ঢোঁড়াই। কিন্তু তারা সবাই জানে বিপদ একদিক থেকেই আসে 'আধিয়াদারদের'। জমির দিক থেকে। যেদিন ইচ্ছে জমি থেকে সরিয়ে দিতে পারে বাবুসাহেব। এতদিন হয়ে গেল, এখনও কাংগ্রেসের কানুন এল না। বলন্টিয়রকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, কানুন কি কমলালেবুর বীচি যে, টিপে দেবেন আর পুচ্ করে বেরিয়ে আসবে।

এদিকে বাবুসাহেব যে রোজ ডেকে পাঠাচ্ছে সাঁওতালটোলার আর কোয়েরীটোলার 'আধিয়াদারদের' নতুন করে টিপসই দেওয়ানোর জন্য!

সকলে যখন প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তখন একদিন সত্যিসত্যিই কানুন এসে গেল। বলন্টিয়রকে দিয়ে মহাৎমাজী পাঠিয়েছেন পাটনা থেকে।

বলন্টিয়র বলে, কত নেবেন নেন—একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, আরও···

বিল্টা 'আরও একটা' বলে সার্কাসের ভাঁড়ের মতো বটুয়া থেকে বিড়ি বার করে—

মরদের কথা হাতির দাঁত। কাংগ্রেস কথা রেখেছে কিনা দেখুন। দু'মুখ দিয়ে কথা বলে না মহাৎমাজীর চেলারা। বিনা রসিদে কোনো আধিয়াদার ফসল দেবেন না। আঠারো সের পাবে জমিদার, বাইশ সের আপনি। আধাআধি নয়।

'মজকুরী সেপাই' আর কোনো জমিদার রাখতে পারবে না।

যারা নগদ খাজনা দেয়, তাদের খাজনা কমে যাবে।

যাদের জমি নীলাম হয়ে গিয়েছে, ফেরত পাবে। তার জন্য দরখাস্ত দিতে

হবে 'ফারম'এ[১]। আমার কাছে 'ফারম' আছে। আমি শস্তায় 'ফারম' দেব আপনাদের। আট আনা করে দাম। সাদা রঙের। রামনেওয়াজ মুন্সিরা বেচবে চার আনা করে, কিন্তু সেগুলোর রং হলদে, যাতে করে সাওজী পোস্তদানা বেচে। আমার ফারম পাটনায় ছাপা। আজকাল কাংগ্রিসের সরকার, কাংগ্রিসের হাকিম, তাই কাংগ্রিসের 'ফারম'-এই ফল ভাল হবে। খাতা খেশরা নম্বর দিতে হবে দরখাস্তে। যাদের নেই তারা আমাকে তিন টাকা করে দিলে জমিদারী সেরিস্তা থেকে আমি আনিয়ে দেব ;

জমিতে কুয়ো খুঁড়তে পারবেন আপনারা।

এতদিন পারা যেত না নাকি। নিজের অজ্ঞানতায় ঢোঁড়াই মনে মনে লজ্জিত হয়। স্বর্গের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে বলণ্টিয়র। সাঁওতালগুলো আবার কখন এসে জুটেছে। বোস বোস। মাদলটা নিয়ে এলে পারতিস বড়কামাঝি!

ঢোঁড়াই একরাশ রাঙা আলু দেয় ঘুরের আগুনে।

ঘুরের ধোঁয়ায় চারিদিকের কুয়াশা আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় ধোঁয়ার কুণ্ডলাগুলো একটা একটা লোকের চেহারার মতো হয়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কারও বাপ-দাদার আকৃতি নিশ্চয়। বাপ-দাদারা স্বপ্নতেও যা ভাবেনি, তাই আজ দেখিয়েছে বলণ্টিয়র। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোনালি ধানের স্তূপ, তার বাইরের দিকটা 'মোরঙ্গ'-এর[২] পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠছে ; আর আঠারোর দিকটা যেন মেঠো ইঁদুরের গর্তের উপরের বালির ঢিপি। সেদিকটায় বসে রয়েছে বাবুসাহেবের সেপাই বটেশোয়ার সিং।

বলণ্টিয়র উঠে দাঁড়ায়। বাবুসাহেবের নূতন বৈঠকখানায় তার শোবার জায়গা হয়েছে।

সেই ভাল বলণ্টিয়র, শীতের মধ্যে।

বলণ্টিয়রের বোধ হয় একটু লজ্জ লজ্জা করে। সে আগুনের মধ্যে থেকে একটা রাঙা আলু বার করে নেয়।

'আমরাও কিসানের ছেলে, কীর্তিগঞ্জের রাজার খানদানের লোক না। লাডলীবাবু আবার তাঁদের ওখানে খাইনি শুনলে দুঃখিত হবেন তাই··'

সকলে দল বেঁধে তাকে বাবুসাহেবের বাড়ির গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

'বন্দেগী।'

১ দরখাস্তের ফরম।
২ মোরঙ্গ নেপালের একটি জেলার নাম।

বলণ্টিয়র বলে, 'নমস্তে!'

ফিরবার পথে বড়কামাঝি বলে, কিতাব পড়া লোক বলণ্টিয়র; দেখিস না 'মৈ মৈ'[1] বলে পচ্ছিমা ঝিল্লির মতো।

সকলে হেসে সমর্থন জানায় বড়কামাঝির কথাটাকে।

ঢোঁড়াইয়ের মনে হয়, এত ভাল মহাৎমাজীর বলণ্টিয়র, এর কথা শুনতে ভাল লাগে, দেখলে ভক্তি হয়, তবু কোথায় যেন একটা ব্যবধান আছে। ভাল না হলে কি আর রামায়ণপড়া লোক তাদের দুয়োরে দুয়োরে ঘুরে বেড়ায়। রামায়ণের হরফগুলো একটা পাতলা পর্দা টেনে ধরেছে তাদের আর বলণ্টিয়রের মধ্যে।

রসিদ প্রার্থনায় বিপত্তি

গঞ্জের বাজারের ভোপৎলাল ঢোঁড়াইকে বলে দিয়েছিল, নতুন কানুনে বারো বছরের উপর দখল থাকলে 'আধিয়াদারদের' কিছুতেই সরাতে পারবে না বাবুসাহেব।

এর কথা তো বলেনি বলণ্টিয়র।

'মরে মুছে যাবি' তবু দখল ছাড়িস না। 'আঠার বাইশ' ভাগের সময় আগে রসিদ নিয়ে তবে ফসল দিবি। ঐ রসিদখান পরে দখলের প্রমাণ হয়ে যাবে হাকিমের সম্মুখে।

বড়কামাঝিও এসেছিল সঙ্গে। সে জিজ্ঞাসা করে, 'আর দারোগার সম্মুখে?'

'সেখানেও!'

'সেই রসিদখানাই?'

'হ্যাঁ।'

অদ্ভুত! একথা ভাবতেও মনে একটা উদ্দীপনা আসে। ফসল দেওয়ার কথাটা এক টুকরো কাগজে লিখে দেবে, আর সেটা হয়ে যাবে রসিদ। দুনিয়ার 'গুড়ের ভাণ্ডার আখ'[2] যে ঐ কাগজটুকুর মধ্যে, তা কি সে আগে জানত। কাঁচা ধানের দুধটা যেমন আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে চাল হয়ে ওঠে, তেমনি ঐ

---

১ যুক্তপ্রদেশের হিন্দীতে আমি অর্থে 'মৈ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিহারে ঐ অর্থে 'হম' কথাটি প্রচলিত।

২ স্থানীয় বাক্যরীতি।

রসিদটা হয়ে উঠবে দখলের প্রমাণ! হুকুম করেছে কংগ্রেসী সরকার! বেদখল করতে না পারার মানেই যে পায়ের নিচের মাটিটুকু এক রকম তারই হয়ে যাবে।

এতখানি উঁচু আল দেওয়া চারিদিকে; নিড়ানো আগাছাগুলির একটাও সে আলের বাইরে যেতে দেবে না; একটুখানি গোবরও ধুয়ে যেতে দেবে না ক্ষেতটুকুর বাইরে; ক্ষেত থেকে বেরুবার সময় পায়ের কাদামাটিটুকু আলের ধারে মুছে নেবে। ও যে নিজের। একেবারে নিজের ছেলের মতো খাওয়াবে বুড়ো বাপকে।...

সেই রাতেই কোয়েরী আর সাঁওতালরা মঠের মাঠে জড় হয়। ফসল তোয়ের ক্ষেতে। তাই দেখেই মহাৎমাজী কানুন পাঠিয়েছেন জল্দি করে।

চেঁচামেচি হট্টগোলের মধ্যে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা কিছু হয় না। মহাৎমাজী কানুন করে দিয়েছে। আর ভাববার কী আছে। রসিদ দখল, রসিদ জমি, রসিদ জিন্দগি. জান কবুল; মরে মুছে যাও; রসিদ দেও, ফসল দেও! রসিদ দেও, ফসল লেও! মহাবীরজীকি জয়! মহাৎমাজীকি জয়! ভোপৎলাল লোকটা বলন্টিয়রের চাইতে ভাল; কিন্তু বলন্টিয়রের মতো আমাদের গাঁয়ে আসে কই! কেবল দোকান আর বাজার!

রসিদ চাইবার প্রথম ঝাপটা গেল সাঁওতালটুলির উপর দিয়ে।

ঢোঁড়াই বলে দিয়েছিল, ফসল কেটে টোলার খলিহানে[১] জড় করতে। সেখানেই ভাগ হবে। না হলে বাবুসাহেবের খলিহানে একবার গেলে কি আর রসিদ দেবে, না আঠার-বাইশ ভাগ করবে?

ক্ষেতে ফসল কাটছিল বড়কামাঝি, তার স্ত্রী আর পুত্রবধূ। খবর পেয়ে বাবুসাহেব গিয়েছিলেন হাতিতে; পিছনে ঘোড়ার উপর বটেশোয়ার সিং লাঠি নিয়ে। পিছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলে হাতি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়য়। তাই সিপাহিজী হেঁটে না এসে ঘোড়ার পিঠেই এসেছিল। বিশেষ কিছু গোলমাল হবে তা বাবুসাহেব ভাবেনওনি। শুধু সাঁওতালটুলিকে একটু ভয় দেখানোর জন্যে হাওয়ায় একটা বন্দুক ছুঁড়েছিলেন! অমনি ডুমডুম-ডুমডুম করে মোষের চামড়ার কাড়া বেজে উঠেছিল। তীর, ধনুক, লাঠি, খুন্তি নিয়ে প্রতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ।

সবাই এসে দাঁড়ায় বড়কামাঝির আলের উপর, এক দিকে একটুখানি পথ

১ যেখানে ফসল কেটে প্রথমে জড় করা হয়। প্রতি গ্রামে এরকম একটি করে জায়গা থাকে। এ ছাড়া খুব বড় লোকদের নিজের নিজের আলাদা খলিহান থাকে।

রেখে ক্ষেতে হাতিটাকে ঢুকতে দেবার জন্যে। ডুম-ডুম-ডুম বেজে চলেছে কাড়া একটানা। ক্ষেটে চল বড়কামাঝি, থামিস না। ওদিক পানে তাকাস না। ঘাবড়াস না, এসে পড়ল বলে কোয়েরীটোলার দল কাড়ার শব্দ শুনে। কথা হয়ে গিয়েছে কালকে এই নিয়ে। কারও মুখে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য নেই, সকলে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

পিথো মাঝির বৌ আধ চিবুতে চিবুতে হাতির দিকে এগিয়ে গেল। অদ্ভুত সাহস! শক্ত করে চেপে ধরে হাতের লাঠি বটেশোয়ার সিং। তাই বল! সাঁওতালনীটা হাতির নাদ কুড়োচ্ছে। এমনি বড় বড় অশথের চাকলা থাকে এর মধ্যে। ভাল জ্বালানি হয়। পিথোর স্ত্রীর দূরদর্শী গিন্নি বলে পাড়ায় সুনাম আছে।

'চল মাহুত!' বাবুসাহেব ফিরে যান।

ডিগি ডিগি ডিগি ডিগি; বিজয়ের উল্লাসে কাড়ার তাল দ্রুত হয়ে ওঠে! বড়কামাঝি হুংকার ছাড়ে, 'হাঁ, নাচতে আরম্ভ কর ক্ষেতের মধ্যে। পায়ে-পায়ে সব ফসল যে ঝরে পড়ল।'

কে তার কথায় কান দেয়! সকলে তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'রসিদ দাও, ফসল নাও।' বাবুসাহেবকে শোনাচ্ছে।

ঢোঁড়াইকে দূর থেকে ছুটে আসতে দেখে, এতক্ষণে সাঁওতালদের খেয়াল হয় যে কোয়েরীটোলার কেউ কাড়ার ডুমডুম শব্দ শুনেও আসেনি। ঢোঁড়াই কেবল দুঃখিত নয়, অপ্রস্তুতও হয়েছে বিলক্ষণ। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'ওরা কেউ এল না বড়কামাঝি। বলন্টিয়র এসেছিল এখনি, কলস্টরসাহেবের কাগজ নিয়ে। তাতে লেখা আছে, বাবুসাহেব 'কিসান'[১]। তার আধিয়াদারদের উপর আঠার-বাইশের কানুন চলবে না। ও কানুন হচ্ছে রাজপারভাঙার আধিয়াদারদের জন্য।'

বলন্টিয়রের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। সেদিন বলল এক কথা, আজ বলছে আর এক কথা। কোয়েরীদের উপর সকলে ক্ষেপে ওঠে।

'মরদ! বাবুদের বাড়ির মেয়েদের শাড়ি কাচতে কাচতে শালাদের মর্দামি ঘুচে গিয়েছে।'

ঢোঁড়াই এ কথার জবাব দিতে পারেনি। মহাৎমাজীর কানুন কলস্টরসাহেব বদলে দিল! কলস্টরসাহেব কি মহাৎমাজীর থেকেও বড়?

তারপরই চলেছিল থানা-পুলিশ। তিনজন সাঁওতালের জেল হয়েছিল। রসিদ কেউ পায়নি হাকিম বলেছিলেন যে, এদের বুড়ো আঙুলের ছাপ দেওয়া

১ রায়তী-স্বত্বধারী লোক।

কাগজে লেখা আছে যে, এদের জমি দেওয়া হয় এক বছরের জন্য। এরা জোর করে অন্যের ফসল নিচ্ছিল।

ঢোঁড়াইরা কী করবে ভেবে পায় না। ভোপৎলালের কাছে সলা নিতে যেতেও মন চায় না। ওটা বোধ হয় পণ্ডিতমশাইকে কোদো[1] দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। কানুনের হরফ পড়তে পারে না।

কার কাছে দরখাস্ত করলে সুবিচার হবে জানা নেই। ডিষ্টিবোডের নূতন নিলামের ডাকে ইনসান আলির জায়গায় গিধর মণ্ডলকে খোঁয়াড়টা দিয়েছে লাডলীবাবু। কাজ গুছিয়েছে গিধরটা। বাবুসাহেবেরই বেনামাদার। ইনসান আলি তাই সবুজ নিশানের লিঙে[2] গিয়েছে, আর পাটনার জিন্দাবাদ-সাহেবের কাছে না কার কাছে নালিশ করেছে। এ কথা ভোপৎলালকে একদিন গল্প করতে শুনেছিল বাজারে। ওটার পর্যন্ত দরখাস্ত করার লোক আছে রে, আমাদের নেই।

তাই ইচ্ছা না থাকলেও ছুটতে হয় ভোপৎলালের কাছে। ভোপৎলাল বলে, এদের ঠাণ্ডা করতে পারে একমাত্র কিসানসভার স্বামীজী। তারপর কোয়েরীটোলার লোকদের টিপসই নিয়ে কী সব লেখাপড়া করে।

কোথা থেকে কী হয় তা ঢোঁড়াই জানে না; হঠাৎ একদিন একজন হাকিম এসে হাজির। তিনি বাবুসাহেবের বৈঠকখানায় কিছুতেই উঠলেন না; উঠলেন গিয়ে ইনসান আলির বাড়িতে। কলস্টরসাহেব তাঁকে পাঠিয়েছেন কোয়েরীটোলার রসিদ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে। হাকিম বলেন দুপক্ষ থেকে দুজন বলবে। বাবুসাহেবের দিক থেকে কাগজপত্র দেখায় রামনেওয়াজ মুন্সি; আর কোয়েরীটোলার সকলে বলছে ঢোঁড়াইকে সকলের হয়ে কথা বলবার জন্য। ঢোঁড়াই বলে ভোপৎলালকে ডাক, কিন্তু বিল্টারা কেউ বিশ্বাস পায় না ভোপৎলালকে; তার কানুনে বিদ্যের দৌড় আগেই দেখা গিয়েছে।

বিজন উকিলকে হারায় রামনেওয়াজ মুন্সি! একেবারে কানুনের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঢোঁড়াইয়ের বুক টিপটিপ করে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল বলতে পারবে না ঠিক করে। কিন্তু একবার আরম্ভ করবার পর, রসিদ আর দখলের কথা ছাড়া, দুনিয়ার সব কিছু মুছে যায় তার মন থেকে।

রামনেওয়াজ বেশি কিছু বলে না। সাত-আট বছর আগে ধান নেওয়ার

১ ধানের ক্ষেতের একরকম আগাছা।

২ জিরানিয়া জেলায় মুসলিম লীগকে সাধারণ লোকে বলে 'লিঙ'। শব্দটি বিদ্রূপাত্মক বা বিদ্বেষপ্রসূত নয়।

সময়কার আঙুলের ছাপগুলো কেবল দেখায় হাকিমকে। বুড়ো আঙুলের ছাপে লেখা হয়ে গিয়েছে, কেউ রসিদ পাবে না।

হাকিম রামনেওয়াজ মুন্সি আর বাবুসাহেবকে তাড়া দেন, 'সব বুঝি, ঘাস খাই না আমরা।' তারপর অংরেজীতে 'চোখ-গরম করা' কী সব কথা যেন বলেন বাবুসাহেবের দিকে তাকিয়ে। আলবাৎ বলেছে বটে ঢোঁড়াইটা!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাকিমের রায় শুনে অবাক হয়ে যায় সকলে। বুড়ো আঙুলের কানুনের জোর, মহাৎমাজীর কানুনের চাইতেও বেশি!

সাহেবী টুপি না থাকলে কী হয়, লাডলীবাবুও হাকিম। নতুন হাওয়াগাড়ি কিনেছে দেখিস না চেরমেনসাহেব। সরকারী হাকিম কখনও কাংগ্রিসের হাকিমের বিরুদ্ধে যেতে পারে! জাত বেরাদার সব হাকিমে। দেখলি না বাবুসাহেবের নতুন সড়ক দিয়ে এই সরকারী হাকিমের হাওয়াগাড়ি এল! অন্য কোনো লোকের গাড়ি বাবুসাহেব আসতে দেয় ঐ রাস্তা দিয়ে?

শশুর!

বলন্টিয়রের পতন

রামরূপ, গনৌরী, পরসাদি, ভবিয়া এরা তিন বছর থেকে কাজ করত কুরসাইলা চিনির কলে। সারা বছর মিল চলে না। তাই কয়েকমাস করে গাঁয়ে থাকতেই হয়। সেই যে বলন্টিয়রের 'ফারমের'[১] উপর টিপসই দিতে গাঁয়ে এসেছিল বাবুসাহেবের কাছ থেকে নিলাম করা জমি ফেরত পাবার জন্য, আর ফিরে যায়নি তারপর। আবার কোনদিন হাকিম জমি ফেরত দেবার জন্য এসে খোঁজ করবে তারই এন্তেজারিতে ছিল। হাকিমের ডাক, আর নিলামের ডাক! এক, দু, তিন খতম! তাই আর যেতে সাহস করেনি। খানদানের অযোগ্য ছেলে তারা, বাপদাদার করা জমিটাও রাখতে পারেনি। পরের জমির ধানে নবান্ন করিয়েছে বাড়ির মেয়েদের। তাদের বাপদাদার পায়ের ধুলো মিশে আছে ঐ জমিতে, তাঁরা উপর থেকে দেখছেন। মহাৎমাজীর কৃপায় সে-জমি ফিরে পাবার একটা সুরাহা হল, 'ফারম'-এর জবাব এল কই? প্রত্যেক বলন্টিয়রকে সাত টাকা বারো আনা করে দিয়েছে; ফারমের কোণের দিকে পর্যন্ত বলন্টিয়র লিখে দিয়েছিল, তবু হাকিম সাড়া দেয় না কেন? এক বছরের উপর হয়ে গেল।

১ দরখাস্তের ফরম।

আরও কত লোকের এই অভিযোগ, নিত্য তিরিশ দিন ঢোঁড়াইয়ের কাছে।

বলণ্টিয়র এখন আসাও কমিয়ে দিয়েছে। একদিন ঢোঁড়াইয়ের দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। গনৌরীদের 'ফারম'-এর কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই বলে, 'দেড় লাখ দরখাস্ত পড়েছে ; আপনাকে ঢোঁড়াইজী আমি ওয়াকিবহাল লোক বলেই তো জানি। আপনি সুদ্ধ এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলবে কেন ?'

ঢোঁড়াইজী ! আশ্চর্য কথাটা। গায়ের মধ্যে শিরশিরুনির ঢেউ খেলে যায়। যেদিন প্রথম 'আপনি' শুনেছিল সেদিন লেগেছিল মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। শুধু আপনি কথাটা দূরে ঠেলে, আপনার করে না। কিন্তু ঢোঁড়াইজী ! কথাটা শুনলেই বোঝা যায় যে, বলণ্টিয়র যে স্বীকৃতিটুকু দিচ্ছে ঢোঁড়াইকে সেটা অনিচ্ছায় নয়। একজন তার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়ে যাচ্ছে মাত্র। ইজ্জত গায়ে লেখা থাকলে তবে লোকে বলে 'জী'। বড় মিষ্টি এর অনুভূতি, একেবারে নূতন। এর পর বলণ্টিয়রকে দরখাস্তের সম্বন্ধে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে না সে আজ। বড় ভাল বলণ্টিয়র। এবার থেকে সেও বলণ্টিয়রজী বলবে।

তার নিজের এক ধুরও জমি নেই, রামায়ণও পড়তে জানে না। কিন্তু বলণ্টিয়রজী আজ তাকে পনর বিঘা জমিওয়ালা লোকের ইজ্জত দিয়েছে, রামায়ণ-পড়া লোকের ইজ্জত দিয়েছে। তবু কেন যেন আজ তাকে 'বন্দেগী' করতে বাধছে। 'নমস্তে বলণ্টিয়রজী !'

'নমস্তে !'

গনৌরীর ভাল লাগে না বলণ্টিয়রের হাবভাব। এ কখনও হয় কাছারিতে ? কোন খোঁজ নেই খবর নেই কাছারি থেকে ! জমি যাবার সময় এমনিই হয়েছিল তাদের। হঠাৎ জানতে পেরেছিল যে জমি নিলাম হয়ে গিয়েছে। টালবাহানা করিস না ঢোঁড়াই এ ব্যাপার নিয়ে। তুই টোলার 'সরগনা আদমী'[১] বলেই বলছি। গিধর যদি মোড়লের মত মোড়ল হত, তাহলে কি আর আমরা তোর কাছে ছুটে আসি।

'থাকুক গিধরটা খোঁয়াড়ে আটক।' বিণ্টার রসিকতায় বুড়হাদাদা হেসে ওঠে।

এই সব কাজের ভার কী করে কবে থেকে ঢোঁড়াইয়ের উপর এসে পড়েছে, তা জিজ্ঞাসা করলে গাঁয়ের লোক কেউ বলতে পারবে না। জলের

১ গণ্যমান্য লোক।

ধারা কেন নিচের দিকে গড়িয়ে এক জায়গায় জমা হয় এ প্রশ্নও তারা কোনো দিন করেনি।

এসব কাজে ঢোঁড়াইয়ের ক্লান্তি নেই। বাপ-দাদার ভিটে ছাড়ার যে কী দুঃখু তা ঢোঁড়াই বোঝে। কাজের মলম দিয়ে সে নিজের মনটাকে ঢেকে রাখতে চায়। নিজেকে সে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে, কয়েকটা মুখের ছবি যেন তাকে অনবরত নিচের দিকে টানছে; সে যেতে চায় উপরে, বাওয়ার মুছে আসা স্মৃতি যেদিকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, পটের ছবির মহাবীরজী যে পা-দুটির দিকে তাকিয়ে তাকে পথের ইঙ্গিত দিচ্ছেন; সেইখানে পৌঁছুবার সড়কের নির্দেশ দিচ্ছেন সেই চরণেরই আশ্রিত মহাৎমাজী। এই যে সে যখন-তখন সাঁওতালটুলি, গঞ্জের বাজার, ভোপৎলাল আর বলণ্টিয়রের কাছে ছুটোছুটি করছে, অন্যের কাজে, এটা হুজুগের নেশা নয়। রামচন্দ্রজীর হুকুম মানবার নেশা; আর দশজন তার কাছে ছুটে এসে যে ইজ্জত দিচ্ছে তাকে, সেইটার দাম দেওয়ার নেশা। আবার নেশাটার ফাঁকে ফাঁকে তার মনে হয়েছে যে এসব নিজের মন ভুলোনোর 'নৌটাঙ্কী'[১]। মনের নিচে, অনেক ভিতরে একটা জায়গা আছে যেখানে কারও হুকুম খাটে না; দাম দেওয়া-দেওয়ির পালা সেখানে অচল। রামজী এক হাতে নেন, আর এক হাতে দিয়ে দেন। তাঁরই কৃপায় আজ গাঁয়ের লোকে তার কাছে ছুটে এসে দুঃখের কথা বলে মন হালকা করে যায়, টোলার লোকে 'সরগনা' বলে, হাকিমের সম্মুখে সে রামনেওয়াজ মুন্সির সঙ্গে বহস করে, বলণ্টিয়র ঢোঁড়াইজী বলে। কিন্তু রামজী যত ঢোঁড়াইয়ের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন তত কি আশীর্বাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছেন? ছি ছি, এ কী ভাবছে সে? এর কি হিসানিকাশ চলে, আখ আর কাঁচালঙ্কার দামের মতো!

আছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ভোপৎলাল। অনেক খোশামোদ করে ঢোঁড়াই তাকে রাজী করায়, কাছারি থেকে দরখাস্তগুলোর কী হল জেনে আসতে। ভোপৎলাল পাঁচ টাকা খরচ করে কাছারির সেরিস্তায় তন্নতন্ন করে খোঁজে। কোয়েরীটোলার কোনো দরখাস্ত কাছারিতে নেই।

এসে বলে যে বলণ্টিয়র টাকাগুলো খেয়েছে। ওর বলণ্টিয়ারি আমি ঘোচাচ্ছি মহাৎমাজীর কাছে চিঠি লিখে। তোমরা এই কাগজে টিপসই দিয়ে দাও।

'টিপসই? মরে গেলেও না।'

[১] যাত্রার মতো একরকম গ্রাম্য অভিনয়।

সকলের মুখে কাঠিন্যের রেখা পড়ে। জীবনে একবারই লোকে ভুল করে। বাপদাদার উপদেশ না মেনে, বুড়ো আঙুলের এক ছাপে ভিটেমাটি ছাড়া হতে চলেছে টোলা-সুদ্ধ লোকের! বাপরে বাপ! 'না না ভোপৎলালজী, বাবুসাহেবই হয়তো কাছারিতে টাকা খরচ করে সরিয়ে ফেলছে দরখাস্তগুলো।'

বলণ্টিয়রের পুনরুত্থান

গঞ্জের বাজারে সার্কিল মানিজার সাহেবের বাংলায় একটা কল আছে না, যাতে করে মেমসাহেবরা গান শোনায় তাঁকে, সেই কলে লাটসাহেব তাঁর কাছে খবর পাঠিয়েছে যে বিলাতে ইংরেজ-জর্মন লড়াই লেগেছে। সেখানকার হাটে ঢোঁড়াইরা কথাটা শুনেছিল। সেখানে আরও কানাঘুষা শুনেছিল যে লড়াইয়ে লঙ্কা, তামাক খুব লাগে। দাম বাড়বে। নৌরঙ্গীলাল গোলাদার যাই বলুক কাঁচালঙ্কা আর বেচা নয়। গাছে পাকানোই ঠিক।

এর কিছুদিন পরই বলণ্টিয়র একদিন গাঁয়ে এসে হাজির। এতদিন শত চেষ্টা করেও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এল যখন, একেবারে আসার মতো আসা! ফৌজের উর্দি পরে, খটমট খটমট করে। গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে আসে, ছোট ছেলেরা বেড়ার পাশে লুকোয়, বিণ্টার বুড়ি চাচী মাথার শনের নুড়োর উপর ঘোমটা টেনে দেয়। ঢোঁড়াই পর্যন্ত ভাবে, 'বন্দেগী হুজুর' বলবে, না নমস্তে করবে।

অনেক দূর দেশ থেকে আসছে বলণ্টিয়র। তাজা নতুন খবর এনেছে ইংরেজ জর্মন লড়াইয়ের। লড়াইয়ের খবর ফৌজের লোকে জানবে না তো আর কে জানবে! সব চেয়ে জবর খবর কাংগ্রিস ইংরেজ সরকারের দেওয়া পাটনার গদিতে লাথি মেরে চলে এসেছে।

'তাহলে মহাৎমাজীর হুকুমত আর নেই মুলুকে?'

'নেই বলেই তো ঢোঁড়াইজী এসেছি আপনাদের কাছে কাংগ্রিসের ফৌজে ভর্তি করাতে।'

'ফৌজে?'

সকলে চেঁচামেচি আরম্ভ করে। বিণ্টার চাচী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। বুড়হাদাদু বলণ্টিয়রের হাত চেপে ধরে, যেমন করে হোক দারোগাকে বলে, আমাদের ফৌজ থেকে নাম কাটিয়ে দাও বলণ্টিয়র। উথলি বাঁধা দিয়ে আমি তোমাকে খুশী করব।

লড়াইয়ের খবর প্রথম দিন শুনে সবার মনে হয়েছিল বিলাতে লড়াই। তাতে বিসকান্ধার কী? এ আবার কী বিপদ এসে উপস্থিত হল। চায় না তারা লঙ্কাগুলোকে গাছে পাকিয়ে বিক্রি করতে!

বলন্টিয়র তখন কাংগ্রিসের ফৌজে ভর্তির 'ফারম'[১] বার করে সকলকে বুঝোয় যে, সে এতদিন ছিল রামগড়ে। সেখানে আসছে-বছর মহাৎমাজীর প্রকাণ্ড জলসা হবে। সেখানেই বলন্টিয়র ফৌজী 'টিরেনি'[২] নিতে গিয়েছিল। এখন সে জিরানিয়ার সকলকে ফৌজে ভর্তি করে নিজেই 'টিরেনি' দেবে। তারই 'ফারম' এগুলো।···

ফারমের কথা ওঠায় এতক্ষণে গনৌরী কাজের কথা পাড়বার সুযোগ পায়।

'লট্‌পট্ কথা ছাড়ো বলন্টিয়র। আমাদের জমি ফিরে পাবার দরখাস্তের কী হল? একবছর থেকে হয়রান করছ তুমি আমাদের।'

মহাৎমাজীর চেলা হলে কী হয়। বলন্টিয়র জানে যে, কখন রাগে জ্বলে উঠতে হয়।

'নেমখারামের দল কোথাকার!' তারপর ঢোঁড়াইকে বলে, 'কোন খাস্তা খাতায় ফেলে রেখে দিয়েছে তার কি হিসেব আছে? তার উপর কাংগ্রিসের উজিররা ইস্তফা দিয়েছে; আর কি এখন সাহেব কলস্টর ঐ সব দরখাস্ত পড়বে মনে করেছেন? এতদিন সেই সাহেবই ঐ হরিজন মন্ত্রীর ছেলেটাকে সফরের সময় কোলে নিয়ে, নাকের শিগনি মুছত।···' আরও কত কথা বলন্টিয়রজী বলে যায়। তার সিকিও ঢোঁড়াইরা বোঝে না। শোনবারও উৎসাহ নেই তাদের। বিল্টার শুদ্ধ কথা বার হয় না মুখ দিয়ে। কতদিন থেকে ভেবে রেখেছিল যে বলন্টিয়র এলে, চেপে ধরবে তাকে।

কপালটাই পোড়া কোয়েরীটোলার! রংরেজ জর্মন লড়ায়ের গরম তাজা খবরের মধ্যে কোয়েরীটোলার এতগুলো লোকের হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কোন খাস্তা খাতায় তলিয়ে যায়।

যাবার সময় বলন্টিয়র দুঃখ করে যায়—'শ্বশুররা' যে যুদ্ধে হাসতে জানে না!

কোয়েরীটোলার গিধরেরও দুঃখ কম হয়নি। সে সবে দেড় বছর থেকে খদ্দর পরা ধরেছিল। শান্তি আর নেই কিছুতে! সব চেয়ে চিন্তার কথা যে নাইট স্কুলের নাম করে সে একটা লণ্ঠন, আর এক টিন করে মাসে কেরোসিন তেল, আরও কী কী যেন, লাডলীবাবুর সাহায্যে পেয়ে আসছে। এত দিন 'নিসপেক্টর'সাহেব লাডলীবাবুর ভয়ে কিছু করতে সাহস করেনি। এবার

১ ফরম। ২ ট্রেনিং।

নিশ্চয়ই রিপোর্ট করে দেবে যে, কোয়েরীটোলায় কোনো ইস্কুল খোলেনি গিধর মণ্ডল। সে বলে, 'পাবলিসের কথাটা একবারও ভাবল না কাংগ্রেস গদ্দি থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে। নে! দুবচ্ছর খুব উড়িয়েছিস হালুয়াপুরি, এবার মজা চাখাবে সরকার!'

কিন্তু সরকার সব চেয়ে আগে মজা চাখাল কিনা গনৌরীদের।—ঢোঁড়াইয়ের মনটা খারাপ হয়ে যায়। মহাৎমাজীর লোকেরা তবু চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সরকারের চাকর এই হাকিম দারোগা, এরাই না বাবুসাহেবের দিকে গিয়ে সব পণ্ড করে দিল। দারোগা-হাকিমদেরই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে। যার নুন খায় তার গুণ গায়। অংরেজ বাদশা হল দুনিয়ার রাজা, কত বড়লোক। তাই না সে চাকর রাখতে পারে, কলস্টর দারোগাকে। কোথায় পাবে অত টাকা মহাৎমাজী! ঢোঁড়াই সেবার দর্শন করতে গিয়ে ছ পয়সা দিয়েছিল মহাৎমাজীর পায়ে। দু পয়সা সে, দু পয়সা সাগিয়া, দু পয়সা মোসম্মত, ছ পয়সা। এই সব পয়সার রোজগার থেকে কি কলস্টর দারোগা পোষা চলে? তার জন্যে দরকার লোটের[১]।

হঠাৎ সাগিয়ার কথাটা মনে এল কেন? ভাল আছে তো?

অনেকদিন পর আজ বাড়িতে ফিরে ঢোঁড়াই সেই সিক্কার মালাটা বার করে দেখে, যে তেলচিটচিটে সুতোগুলো দিয়ে এগুলো গাঁথা ছিল, সেগুলো ঝুরঝুরে হয়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। রুপোর সিক্কাগুলো কালো হয়ে উঠেছে কলঙ্ক পড়ে। ঢোঁড়াই ছাই দিয়ে সেগুলোকে ঘষতে বসে।

সাগিয়া যেন ভাল থাকে রামচরনজী!

ভূম্যধিকারীর তপস্যায় বিঘ্ন

জিরানিয়া জেলার পশ্চিমে যত নদীনালা সবগুলোর নামই 'কোশী'। রগচটা 'কোশীমাই' পুরুবের 'বাঙাল মুলুক' থেকে বাপের বাড়ির দিকে চলেছেন হোঁচট খেতে খেতে। চোখের জলের অজস্র নদী-নালায় রেখে যাচ্ছেন তাঁর নামের, আর চলার পথের চিহ্ন। রাগটা পড়লেই তিনি আবার ফিরবেন, এ কথা জিরানিয়া জেলার প্রত্যেক লোক জানে। তাঁর বউকাটকী শাশুড়ী, তাঁর ফেরবার পথ বন্ধ করবার জন্যে জিরানিয়া জেলা জুড়ে শিমুল, কুল, বাব্‌লা আর ক্যায়া-গোলাপের কাঁটা-জঙ্গল ভরে রেখেছিলেন। আস্তে আস্তে অনেক বছর ধরে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে এখনও সকলে কোশীমাইয়ের

১ লোট।

প্রতীক্ষায় ঢোলক, ঘণ্টা, ঝাঁজর, শিঙে নিয়ে বসে আছে। হোক পাগল, হোক বদমেজাজী, তবু মা না থাকলে আবার সে কি একটা সংসার। যতদিন মা না ফিরে আসে, ততদিন এইসব মরা নদীগুলোকে তারা সাবধানে আগলে বসে থাকবে। তারপর কোশীমাই ফিরে এলে আবার সমৃদ্ধির জোয়ার আসবে এই পথে। এখন তো কেবল বর্ষাকালে মাটির হাঁড়ি বোঝাই নৌকা যায়। তখন আবার বারো মাস পাক্কীর মোটর ট্রাকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে হাজার-মনী নৌকাগুলো। বিরতাহা গোলায় পাটের গাঁইট বাঁধবার পেঁচকলগুলোয় আবার রেড়ির তেল পড়বে।

মরা কুশীকে, আর কুশীর ধারের পড়তি জমিগুলোকে গাঁয়ের লোকে কী চোখে দেখে তা বাবুসাহেব জানেন। জানেন বলেই তাঁর এত ভাবনা।

জমিগুলোকে বহুকাল থেকে লোকে জানত রাজপারভাঙার পড়তি জমি বলে। নদীর ধারের জমির উপর বাবুসাহেবের নজরটা বেশি। নদী আর নৌকোই তাঁর পছন্দ। তার সঙ্গে কি আর রেলগাড়ির তুলনা হয়। কিসে আর কিসে! নদীর পথেই তিনি প্রথম এসেছিলেন। দূর-দূরান্তর থেকে মাটির গন্ধ যাদের টানে, কুলের গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবার যাদের 'তাকত' আছে, শিমুলগাছ কেটে ডোঙা তৈরি করবার নিয়ম যার জানা, বাব্‌লা গাছ দেখলেই যার লাঙলের কাঠের কথা মনে পড়ে, বুনো শুয়োরের সঙ্গে লাঠি নিয়ে ভিড়বার হিম্মত যে রাখে, সেই আসে নদীর পথে। আর রেলের গাড়ি টানে, দুধ-ঘি-খাওয়া লোকদের যারা কুলগাছ দেখলে রেশম আর লা-র কথা ভাবে, শিমুল গাছ কাটায় মাটিহার দেশাইয়ের কারখানার ঠিকেদারের জন্য, স্টেশনের কাছে বাব্‌লা গাছ দেখলে দৌড়ে একগোছা দাঁতন কেটে নিয়ে এসে তখনি বাক্সে পোরে। এই রামে-রাম, দুয়ে-দু'র দল শেষ জীবনে জ্ঞান হলে বনেদী হবার জন্য কেনেন জমি। যে ইজ্জত প্রতিষ্ঠা চায় তাকে যে এই পথে আসতেই হবে।

যতই কোয়েরী আর সাঁওতালগুলো জ্বালাতন করুক না কেন, জমি রাখার মধ্যে আছে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ, অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার তলেও আছে একটা গভীর পরিতৃপ্তির ভাব কিন্তু নিশ্চিন্দি আর নেই। ঘুরেফিরে নাকের উপর মাছি বসলে ধ্যানী সন্ন্যাসীরাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, বাবুসাহেব তো কোন্ ছার। কোয়েরী-সাঁওতালগুলোর সেই যে তড়্পানি আরম্ভ হয়েছে, আট-দশ বছর আগে থেকে, এ কি কোনদিন থামবে না। নিত্যি নূতন ফ্যাসাদ বাধিয়েই রেখেছে। করবি আধিয়াদারদের কাজ, তার আবার দারোগা-পুলিশের মতো মেজাজ!

কুশীর ধারের রাজপারভাঙার পড়তি জমিগুলোতে গত ক'বছর থেকে কলাই-কুথি ছিটোচ্ছিলেন বাবুসাহেব। ওটা ছিল গাঁয়ের লোকের গোরু-মোষ চরাবার জায়গা। কলাই কুথির দামই বা কী ছিল। গোলাতে পচত। গাঁ-সুদ্ধ লোকের মোষের গায়ের খাঁজ ঢেকেছে ঐ কলাই-কুথির গাছ খেয়ে, বাবুসাহেব একদিনও বারণ করেননি। সেইজন্যই রাজপারভাঙার পড়তি জমির উপর কে কোথায় কলাই ছড়িয়েছে, তা নিয়ে গাঁয়ের লোকে মাথা ঘামায়নি। বাবুসাহেবের অধিকারের পলি, এই ক'বছর পড়বার পর, বাবুসাহেব হালে বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন ঐ জমি রাজপারভাঙার কাছ থেকে। রাজপারভাঙাব স্বত্বে বোধ হয় কোন গোলমাল ছিল, কিংবা বোধ হয়, সাকিল মানিজর চেরমেনসাহেবের বাবাকে নারাজ করতে চাননি, তাই নামমাত্র সেলামিতে ছেড়েছিলেন জমিগুলো। তারপরই লেগেছিল খটাখটি। সাঁওতালটুলির মোষ নদীর ধার থেকে ধরে, গিধরের খোঁয়াড়ে দিয়েছিলেন বাবুসাহেব। বড়কামাঝি তখন জেল থেকে ফিরেছে! তার ছেলে বলে, 'এবার আমাকে হয়ে আসতে দাও।'

বাবুসাহেবের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। কোয়েরীটোলার লোকরা সাঁওতালের মোষ খোঁয়াড়ে দিলে মাথা ঘামাবে তা তিনি ভাবেননি। তাদের 'কোশীমাই'কে নিয়ে ব্যাপার। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বলে কি মায়ের বে-ইজ্জতি 'পুটুর পুটুর'[১] দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওগুলো হল তাদের সারা গাঁয়ের 'নিকাশ' জমি। সকলের গোরু-মোষ জল খেতে যায় ঐ পথে; মেয়েছেলেরা যায় দরকার পড়লে নদীর ধারের আবরুতে; 'দশবিধ করম' আছে নদীর ধারে; জানোয়ার মরলে ফেলতে হবে, ছোট ছেলেটা মরলে পুঁততে হবে, ঘর নেপবার মাটি আনতে হবে সেখান থেকে খুঁড়ে; তারই নাম 'নিকাশ'। এই 'নিকাশ' কেড়ে নেওয়ার আবার জাত আছে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে টোলার পঞ্চায়েৎ বসে যায় মাঠে মাঠে। দিনের বেলায় মাঠে মাঠে 'পঞ্চায়তি' বুড়হাদাদু পর্যন্ত এর আগে জীবনে দেখেনি।

এত বড় কথা! এ কী জবরদস্তি কাণ্ড বাবুসাহেবের। আর ঐ গিধরটা হাত মিলিয়েছে বাবুসাহেবের সঙ্গে। সাজস না থাকলে সে খোঁয়াড়ে মোষ নিল কেন? মোড়ল তো মোড়ল! তার হয়েছে কী? সাজিমাটির মধ্যেও ময়লা থাকে। দে গিধরটার হুক্কাপানি বন্ধ করে। জেলার জাতের বড় মাতব্বররা গিধরের হাতের লোক। 'গিধর গুরুজী'[২] বডডো কানুন জানে, সেইটাই ভয়। শালা গোরুখোর, গোরু খেয়ে হাঁড়িটা ফেলবি কোন্ চুলোয় 'নিকাশ'

---

১ পিটপিট করে।   ২ শৃগাল পণ্ডিত।

গেলে! কানী মুসহরনীটা যে দিকেই তার কানা চোখটা ফিরিয়ে রাখে, সেদিকেই তার আবরু; কাজেই মেয়েদের যে 'নিকাশ'-এর আবরুর দরকার, তা কি আর গিধরটা বুঝবে? ভূমিকম্পের রিলিফের দয়ায় ওর মেঝে দেয়াল পাকা হয়েছে। আর ওর নদীর ধার থেকে মাটি কেটে আনবার দরকার হয় না তো।

সব দিক ভেবে-চিন্তে ঠিক হয় যে, গিধরের হুঁকোজল বন্ধ করবার কারণগুলির মধ্যে খোঁয়াড়ের ব্যাপারটার সঙ্গে কানী মুসহরনীর ব্যাপারটাও জুড়ে দেওয়া ভাল।

তারপর মহাবীরজীর জয় দিতে দিতে নিজেদের গোরু-মোষ নিয়ে সকলে পৌঁছোয় সাঁওতালটোলাতে।

আরে ভয়ের কী আছে! রাজপুতদের লাঠি আজকাল ভাঙ ঘুঁটবার নিমের কাঠি হয়ে গিয়েছে। আর 'ভালার'[1] কাছে লাঠি। এখান থেকে ছুঁড়ে দেব এই-ই ফন্-ন্ন্…সাঁওতালটুলির আর কোয়েরীটোলার গোরু-মোষ ছেলে-বুড়োর বিরাট মিছিল গিয়ে ঢোকে কুশীর ধারের কলাই-কুথির ক্ষেতগুলোতে। সবচেয়ে আগে ঢোঁড়াই, আর বড়কামাঝির ছেলে।

ছু'দলকে একসঙ্গে চটান না বাবুসাহেব। মুহূর্তের অনবধানতায় চালে ভুল করে ফেলেছেন। বাবুসাহেব দোতলা থেকে দলটাকে যেতে দেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বটেসোয়ার সিং সেপাই দৌড়ে বাবুসাহেবকে খবর দিতে এসেছিল। কিন্তু সে অবাক হয়ে গিয়েছিল বাবুসাহেবের রকম-সকম দেখে। মালিক বন্দুক রাখবার দেরাজটা তো খোলেনই না, উপরন্তু নড়েচড়ে পর্যন্ত বসেন না।

ভুল করে ফেলেছেন, স্বীকার করতে দ্বিধা করলে চলবে কেন। বড়কা-মাঝির পরিবারের সরকারের খিচুড়ি খাওয়ার ভয়টা কেটে গিয়েছে। ভাল লক্ষণ না এটা!…আরও ক'বছর অপেক্ষা করা বোধ হয় উচিত ছিল।…যাক, যা হবার হয়েছে। গুড় দিয়েই যদি মাছি মরে, তবে বিষ দেওয়ার দরকার কী?

বটেসোয়ার সিং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কোনো জবাব না পেয়ে চলে যায়।…

তাই আজ ভাববেন বলেই ভাবতে বসেছেন বাবুসাহেব।

১ ভল্ল।

বাবুসাহেবের অক্ষয় তূণীর লাভ

জিরানিয়ার টুরমনের ফারমের কাজ চালানোর জন্য একটা কমিটি আছে। ডিষ্টিবোডের চেরমেন সাহেব তার একজন মেম্বর থাকেন। লাডলীবাবু আগের বার যখন বাড়িতে এসেছিলেন তখন বাবুসাহেব শুনেছিলেন যে টুরমনের কমিটি এবার দেহাতে আস্তে আস্তে কাজ বাড়াবে ঠিক করেছে, গাঁয়ের লোকদের ভালর জন্য। এই নিয়ে বাবুসাহেবের মাথায় একটা জিনিস খেলছে, দিনকয়েক থেকে।

লাডলীবাবুটা চেরমেন হবার পর থেকে বাড়ি আসা আস্তে আস্তে কমিয়ে দিয়েছেন। কাংগ্রেসি চেয়ারম্যান, খাটুনি বেশি। এ তো আর আগেকার ওকালতি করা রায়বাহাদুর চেয়ারম্যান নয়। তাই বোধ হয় সময় হয় না। কিছুদিন থেকে বাড়ির মেয়েমহলে বাবুসাহেব কানঘুষো শুনছিলেন যে, লাডলীবাবু নিজে বাসা ভাড়া করবেন। মাস্টারসাহেবের আশ্রমে থাকবার ঠিক সুবিধা হচ্ছে না। কত লোকজন, সাহেবসুবো, পণ্ডিত, ঠিকেদার আসে দেখা করতে চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে,…মাস্টারসাহেবকে আজকাল আর কে পোঁছে!…

আবার এক খরচের রাস্তা করছে! আকজালকার ছেলেরা পয়সা চেনে না। আর কেবল বাসা ভাড়া করলে কোনো চিন্তার কারণ ছিল না, ভালই হবে। মাস্টারসাহেবের আশ্রমে গিয়ে উঠতে তাঁর মন চায় না আর। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে লাডলীবাবু তাঁর স্ত্রীপুত্র নিয়ে যেতে চান সহরে। বলেছেন যে নইলে তাঁর ছেলেদের লেখাপড়া হবে না। প্রকাণ্ড জিলা ইস্কুল আছে সেখানে, বাবুসাহেবও দেখেছেন। রাজপারভাঙার জমিদারের ছেলে পড়ে নাকি সেই স্কুলে। তাদের পড়ারই যুগ্যি পেল্লায় মহল, সদর কলস্টরি থেকেও বড়। হাঁ, বড় হয়েছ, চেরমেনসাহেব হয়েছ, তোমার ছেলে তো আর তোমার মতো মজকুরি সেপাইয়ের ছেলে নয়। পড়াতে হবে বৈকি তাদের, রাজরাজড়ার ইস্কুলে। কিন্তু বউ নিয়ে যাওয়া? কভভী নহী! চন্দাবৎ রাজপুতের বাড়ির বউ গিয়ে থাকবে নিজের সংসার ছেড়ে সেইখানে। লোকে থুতু দেবে না তাহলে বাবুসাহেবের গায়ে। লাডলীবাবুর মাকে যখন তিনি প্রথমে আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের দেশ থেকে তখন কি সে আসতে চেয়েছিল? সে এক রকম জোর করে আনা। আর এ বোধ হয় লাডলীবাবুর বউই স্বামীর কানে মন্তর দিচ্ছে। তাঁর মায়ের তো তাই ধারণা। আসতে দাও লাডলীবাবুকে এবার।

…জোছনারাতে এখান থেকে পাক্কী পর্যন্ত আবছা দেখা যাচ্ছে। সমস্তটা এক 'চক' হয়ে গিয়েছে কবে! নতুন রাস্তাটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। পরিতৃপ্তির বোঝার নিচে সেটা কবে চাপা গিয়েছে। এখন মনের মধ্যের সমস্ত জায়গাটা জুড়ে আছে কুশীর ধারের জমির ফ্যাসাদটা। এক জোড়া হাওয়াগাড়ির আলো নামল পাক্কী থেকে তাঁর নিজের রাস্তাটার উপর। এত দূর থেকেও তিনি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আলো দুটোকে। তাঁর অত সাধের রাস্তাটা তাঁকে দেখানোর জন্য যেন আলো ফেলছে। কোনো হাকিম-টাকিম নাকি? বাবুসাহেব একটু তটস্থ হয়ে ওঠেন। অনোখীবাবু, ও অনোখীবাবু। ঢুলছে বোধ হয়। দেখুন তো কে এল। জানালার মধ্যে দিয়ে তাঁর ঘরের মধ্যে আলোটা এসে পড়েছে। নিচে লাডলীবাবুর গলা শোনা যায়। তাই বলো! সঙ্গে একজন টুপি-পরা হাকিম। বাবুসাহেব নিজের মনের অস্থিরতা চাপবার জন্য কেশে সোজা হয়ে বসেন। নিচে হাঁকডাকের সাড়া পড়ে যায়।

খানিক পরেই লাডলীবাবু বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এই ঘরে আসেন। কাল ভোরেই চলে যেতে হবে। একজন হাকিম আছেন তাঁর সঙ্গে সফরে। তখনও বোধ হয় বাবুসাহেবের পূজো শেষ হবে না। তাই এখনই দেখা করতে এসেছেন।'

'এতদিন পরে এলেন, তাও যেন ধান রোপার কাজ ফেলে এসেছেন।

ভাষাটা অনুযোগের হলেও কথার সুরে বিরক্তির আভাস নেই।

'আমি একা থাকলে কথা ছিল না। সঙ্গের হাকিমটি ভোরেই যাবেন কি না।'

'কিসের হাকিম উনি?'

'রেশমের হাকিম। ভাগলপুর থেকে এসেছেন।'

'ও!' তাহলে এ জেলার হাকিম নয়? লাডলীবাবুকে বেশিক্ষণ পাবেন না তিনি। তাই বাবুসাহেব আর দেরি করেন না। একেবারে কুশীর ধারের জমিসংক্রান্ত কাজের কথাটা পাড়েন।

লাডলীবাবু বলেন, তার আর কী। এই রেশমের অফিসার এদিককার কয়েকটা গাঁয়ে গুটিপোকার চাষের সেণ্টার খুলতে চান। তারই জায়গা দেখতে এসেছেন সফরে। লড়াইয়ের জন্য খুব দাম হবে এগুলির রেশমের। গুটিপোকা খাওয়ানোর রেড়ির চাষের জন্য নদীর ধারে জমি পেলে তাঁরা তো লুফে নেবেন। এক রকম নতুন জাতের রেড়ির বীজ বেরিয়েছে, গাছ বড় হয় না, হাত দিয়েই ফল পাড়া যায়। ওরাই কাছে ঘর তুলে নেবে, পোকা

রাখবার জন্য। টুরমনের ফারম থেকে, আমি পাঠিয়ে দেব দুজন 'কামদারকে'[১]। তাদের দেহাতে নতুন ধরনের চাষবাসের কাজ শেখানোই ডিউটি। বকরহাট্টার মাঠের টুরমনের ফার্ম লোকসানে চলছে। একেবারে বেলে জমি; চীনেবাদাম পর্যন্ত ভাল হয় না। তাই সরকারী কমিটি ঠিক করেছে এর কাজ অন্য দিকেও বাড়াতে। ফৌজী ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও একটা কথাবার্তা চলছে বকরহাট্টার মাঠ নিয়ে।

লাডলীবাবু আরও কী কী সব বলে যান। সে সব কথা বাবুসাহেবের কানেও যায় না। এত তাড়াতাড়ি এত বড় একটা প্রশ্নের সুরাহা হয়ে যেতে পারে তা বাবুসাহেব ভাবতেও পারেননি। গর্বে, তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। ধন্যি সেই আওরত যে এই চেরমেন সাহেবের মতো ছেলে পেটে ধরেছিল। তার গায়ের দু সের চাঁদির সত্যিই যুগ্যি সে। বৃথাই এতদিন মনে হত যে সে চুরি করে গোলার ফসল বেচে পয়সা জমায়। সেটা চুরি নয়, তার আগের জন্মের জমানো পুণ্যের রোজগার। বহু বছর আগেকার একটা ছবি তাঁর চোখের সম্মুখে জলজল করে···তখন হরিয়ানা গোরুর চাইতেও নধর চিকন তার দেহ; ফুটফুটে রঙের উপর সর্বাঙ্গে নীল উলকির মিনে করা; তার কোলে ছোটটো লাডলী; মায়ের নাক থেকে বার হওয়া তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলীটাকে থাবলে ধরবার চেষ্টা করেছে। কৌশল্যা মাইয়ের মতো দেখতে লাগে, বেশ লাগছে ভাবতে। কিন্তু লাডলীবাবুটা কী মনে করছে? তাই বলতে হয় 'তোমাদের হালচাল বল, ডিস্টিবোডের।'

মন্ত্রীর গদি ছেড়েই কাংগ্রিস ভুল করেছে। আরও করবে যদি ডিস্টিবোড ছাড়ে। ছাড়লে তো সরকারেরই সুবিধা; সরকার ডিস্টিবোডের সব পয়সা লড়ায়ের কাজে লাগাবে। এই তো রাস্তার রোলারগুলো ডিস্টিবোড থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি থাকলে দু-চারমাস সে চিঠির জবাব না দিয়ে চেপে রাখতে পারি কিনা?

তা তো বটেই।

তা নয়, 'ন এক পাই, ন এক ভাই'[২] বলে জেলে চলে গেলেই অংরেজ হেরে গেল আর কী! আমি তো সাফ বলে দিয়েছি যে, চেরমেনের পদ থেকে আমি ইস্তফা দেব না। 'পাবলিসের' ভালর জন্য এসেছি এখানে। যতদিন পারব সাধ্যমতো 'পাবলিসের' উপকার করে যাব।···

কথাটা শুনতে শুনতে আনন্দে আর উদ্বেগে বাবুসাহেবের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে

১ এগ্রিকালচারাল ফার্মের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী।

২ ইংরেজের যুদ্ধে একটি পয়সা বা একটি লোক দিয়েও সাহায্য করব না।

আসছিল। যাক, রামচন্দ্রজী সুমতি দিয়েছেন লাডলীকে। খুব মুখ রেখেছেন তাঁর। এমন দিনকাল পড়েছে যে ছেলে 'চেরমেন' না হলে, আজকাল জজসাহেবের সেসরকেও কেউ পোছে না; তার 'আধিয়াদার'রা পর্যন্ত না। চেরমেনসাহেবের বাপ না হলে পাক্কীর ধারের মাটি কাটার গর্তগুলোতে ধান লাগানো যায় না; তিন টাকায় কুশী থেকে মহানন্দা পর্যন্ত পাক্কীর ধারের আম কাঁঠাল জমা নেওয়া যায় না। এমন ছেলের উপর যে চটে, সে ছেলের বাপ না।

'শুনুন লাডলীবাবু, বৌমাকে যদি নিয়ে যেতে চান তাহলে একটা ভাল আবরুওয়ালা বাসা ঠিক করবেন। সেসরসাহেবের মর্যাদার যোগ্য বাসা হওয়া চাই। রাজপুতদের নিয়ম যে দাঁতওয়ালা হাতির পিঠে চড়েও আঙিনা দেখা যায় না বাইরে থেকে; এত উঁচু হবে বাড়ির পাঁচিল। রেশমের সাহেবটা আবার বদমেজাজী নয়তো? চলুন একবার দেখা করে আসি তাঁর সঙ্গে। বলছিলেন না এণ্ডির গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে আসবার পর গুটিগুলোকে সিদ্ধ করতে হয়? যাক নিশ্চিন্দি! তাহলে প্রাণীহত্যা করতে হবে না। একটা জীবন তোয়ের করতে পার না, তবে জীবন নেবার কী অধিকার আছে? মরবার পর রামজী এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব তিনি দিতেন।' তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামেন। মৃত্যুর কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হয় যে পাতালপুরীর গভীর অতলে নেমে চলেছেন।

'লাডলীবাবু ইনসান আলির বাড়ি থেকে ভালমন্দ কিছু রাঁধিয়ে-টাধিয়ে আনতে বলে দিয়েছেন নাকি হাকিমের জন্য?' রেশমের হাকিম বড় হাকিম।

সতিয়াগিরার উৎসব

আজ জমজমাট 'তামাশা' কোয়েরীটোলায়। বলন্টিয়র 'সতিয়াগিরা'[১] করবে গাঁয়ের। 'রামখেলিয়ার নাচ' এলেও গাঁয়ে সাড়া পড়ে যায় এই রকমই। কিন্তু সতিয়াগিরা তার চাইতেও জবর জিনিস। সতিয়াগিরার মানে যে কী তা ঢোঁড়াইও জানে না, তবে শোনা শোনা মনে হয় কথাটা। ভূতের গল্প শোনার আসল আনন্দ গা ছমছমানিটুকু। সতিয়াগিরার রহস্যের সঙ্গেও সেই ভয় মেশানো;—পুলিশ, লালপাগড়ি, হালবলদ ক্রোক হওয়া, জেলের খিচুড়ি, হাকিম, আরও কত জানা-অজানা আতঙ্কের। সতিয়াগিরার

১ সত্যাগ্রহ।

সম্বন্ধে কৌতূহলের সঙ্গে মিলানো আছে মহাৎমাজীর নামের সম্মোহন; রঙ্গতামাশার মধ্যেও আছে বিশ ক্রোশ দূরের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মন্দিরে 'জল ঢেলে আসার'[১] সমান পরিতৃপ্তি।

ঢোঁড়াইয়ের সারা রাত ঘুম হয়নি। এত বড় দায়িত্ব এর আগে কখনও তার মাথায় পড়েনি। আবার সামলাতে পারলে হয়। 'ডাবর কমঠ কি মন্দর লেঁহী?'[২] ডোবার কচ্ছপ কি মন্দর পর্বতের ভার সইতে পারে? ভিনগাঁ থেকেও কত লোক আসছে দেখতে। আশপাশের এত গাঁ থাকতে তাদের টোলাকেই বেছেছে বলন্টিয়র। এখন কোয়েরীটোলার ইজ্জত তার হাতে। যে গাঁয়ে যেত বলন্টিয়র সেই গাঁয়ের লোকেই লুফে নিত তাকে। এ কি আর নিমক তৈরির যুগের 'বিদেশিয়ার গান'? তখন লোকে গাঁয়ের বাইরে করাত তামাশা, থানা-পুলিশের ভয়ে! বড় ভাগ্যি কোয়েরীটোলার যে বলন্টিয়র এই জায়গাটাই পছন্দ করেছে।

সে যেদিন জায়গা ঠিক করতে এসেছিল সেদিন বলেছিল যে, মহাৎমাজী ভাল ভাল লোক দেখে দেখে বেছে নিয়েছেন অংরেজের বিরুদ্ধে সতিয়াগিরা করবার জন্য। বড় ভাল লোক বলন্টিয়ারজী; নইলে কি আর গত বছর ফৌজের উঁদি পরবার অধিকার দিয়েছিলেন তাকে মহাৎমাজী। এতকাল বাবুসাহের বলন্টিয়রকে ভূমিকম্প রিলিফের টাকায় করা নূতন বৈঠকখানায় থাকতে দিত, সবচেয়ে কশা দড়ির খাটিয়াখানা দিত, ওয়াড়-দেওয়া বালিশ দিত, পুরনো কলের গানের চাকার রেকাবি করে অঢেল ছোটএলাচ দিত। কাংগ্রিস মন্ত্রিত্ব ছাড়াতে, 'ছু মন্তরে ফুস বিড়াল' হয়ে গিয়েছে সব। লাডলীবাবু যে লাডলীবাবু মহাৎমাজীর অত আদরের চেলা, সে সুদ্ধ তাঁর হুকুম মানলে না, চেরমেনগিরির রোজগারের লোভে। লোকটা যে কেবল 'মুখেই মালপুয়া ভাজে' তা কি কেউ আগে ভাবতে পেরেছিল। আসল কাজের সময় না কে কী মেকদারের লোক বোঝা যায়। 'ঐরু গৈরু নথ্‌ খৈরু'[৩] শুনতে সবাই ভাল গোরুর গাড়ি চালায়। আঁধার রাতে থানাডোবায় গাড়ি উলটানোর মুখে, যে বাঁচিয়ে নিতে পারে, তাকে না বলি ভাল গাড়ি-চালিয়ে। চিরকাল হাকিম। পুলিশের দিকে ওরা। দেখে আসছি তো। লড়াইয়ের সময় অংরেজের পা চাটবে না তো কী? চারপেয়ে জানোয়ারগুলো যেদিকে সবুজ দেখে সেইদিকে ছোটে, ছরতে। এরা হচ্ছে সেই শিংওয়ালা রাজপুত।

ঢোঁড়াইয়ের কাজের অন্ত নেই। এমন যে আক্কিলে টোলার ছেলেগুলো

১ কুশীতারের সিংহেশ্বরথান নামে জায়গা। ২ তুলসীদাস থেকে।

৩ রাম শ্যাম যদু মধু।

যে বলন্টিয়রজীর মালার জন্য, রাতে বাবুসাহেবের বাগান থেকেই ফুল চুরি করে এনেছে। বাবুসাহেবের বাড়ির ফুলে কি মহাৎমাজীর কাজ হয়? মঠের বটগাছে বলন্টিয়রের দেওয়া মহাৎমাজীর ঝাণ্ডাটা টাঙানো হয়েছে। চারকোশ দূরের থানা দেখতে পায় তো দেখুক দারোগাসাহেব। ছানিপড়া চোখটা আঙুল দিয়ে ঘষে নিয়ে বুড়হাদাদা বলে, 'মহাবীরী ঝাণ্ডাটা'[১] তুলে ভাল করলি না ঢোঁড়াই। ইনসান আলিটা আবার 'লিগে' খবর দিয়ে হাকিম না আনায় গাঁয়ে। বেটা আবার শাঁখ বাজানোকে আজকাল বলে 'কড়ি ফোঁকা'।

বিল্টা সকাল থেকে ঢোল গরম করতে বসেছিল। বুড়হাদাদার কথায় হঠাৎ কী মনে হয়, সে ঢোল ছেড়ে ওঠে, নদীর ওপারের গয়লাদের বস্তি থেকে বাজিয়ে সমেত শাঁখের যোগাড় করতে। পাড়ার মেয়েরা রন্ধননিপুণা গনৌরীর বউয়ের বাড়িতে জটলা করছে। সেখানে আলুর তরকারি রান্না হবে। চাঁদা করে দেড় পোয়া আলু কেনা হয়েছে। বেচারা বলন্টিয়রকে আবার কতকাল জেলের খিচুড়ি খেতে হবে।

শিউজীর বেলপাতা, আর মহাৎমাজীর খাদি। বলন্টিয়রের বসবার জায়গাটায় খাদি দিয়ে দিলে হত। গিধরটা তো দিন কতক পরেছিল খাদি। না, ওর কাছ থেকে চাওয়া হবে না কোনো জিনিস, যতই এই ত্রুটিটুকুর জন্য মন খুঁতখুঁত করুক। দারোগাসাহেবকে দেওয়ার জন্য একখানা কুর্শিরও দরকার ছিল, কিন্তু পাওয়া যাবে কোথা থেকে।

বলন্টিয়র গাঁয়ে এসেই জিজ্ঞাসা করে এখনও দারোগাহেব আসেননি? এখনও এলেন না কেন। গোঁসাই ঠিক মাথার উপর এলেই সতিয়াগিরা করবার কথা। পনর দিন আগে সরকারের কাছে রেজেষ্ট্রি লুটিশ পাঠিয়েছি। তবু দারোগাসাহেব এল না এখনও। শীতের দিন, ছোটবেলা। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক দুপুরে সময়টা ঠিক করেছিলাম। এখান থেকে থানা-হাজতে যাতে দিনে দিনে পৌছে যেতে পারি।

আজব জিনিস এই সতিয়াগিরা। গঞ্জের 'বাজারের নাটক' সাকিল মানিজর সাহাব না আসা পর্যন্ত আরম্ভ হয় না। সতিয়াগিরাও তেমনি দারোগাসাহেব না এলে আরম্ভ হয় না।

ঢোঁড়াই বোঝায়, আরে না না। এ একটা লড়াই। মহাৎমাজীর সঙ্গে রংরেজের লড়াই। রামরাবণের যুদ্ধে রামজীর অনুচররা যে রকম লড়েছিল

---

১ 'মহাবারী ঝাণ্ডার' মিছিল নিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হয়। মহাবীরের নামে এই নিশান ওড়ানো হয়।

রাবণের নাতিপুতির সঙ্গে, এ তেমনি মহাৎমাজার চেলা বলণ্টিয়র লড়বে, রংরেজের নাতি দারোগাসাহেবের সঙ্গে।

তাই বল ঢোঁড়াই! এ হবে 'উঠাপটক'[1] দারোগাসাহেবের সঙ্গে। তা না সতিয়াগিরা! সতিয়াগিরা!

বলণ্টিয়র সকলের ভুল ধারণা শুধরে দেওয়ার জন্য কী সব যেন বলে, কেউ বুঝতে পারে না। থামেই না, থামেই না বলণ্টিয়র। ভারি সুন্দর সুন্দর কথাগুলো। একেবারে থুতু ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু চেষ্টা করেও কোনো মানে বোঝা যায়। সতিয়াগিয়ার মনগড়া অস্পষ্ট মানেটা, আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সাধুসন্তদের কথার ধারাই এই। মধ্যে মধ্যে মাথা নেড়ে সায় দিতে হয়, বলণ্টিয়রের মুখে হাসি দেখলে হাসতে হয়, তার সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে সোজা হয়ে বসতে হয়। আর কত বোঝাবে বলণ্টিয়র'···

ঢোঁড়াই তিনটি কথা বোঝে। মহাৎমাজী চান সকলে সত্যি কথা বলুক; সকলে 'বৈষ্ণব'[2] হয়ে থাক; আর দারোগার সঙ্গে লড়ায়ের সময় বলণ্টিয়রজী কিছুতেই চটবে না। এই তিনটি কথা। সে বাপু এরাই পারে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই লোক বেড়ে চলেছে। দারোগাসাহেবের এখনও দেখা নেই। বলণ্টিয়রের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়। যে দুজন ছোকরাকে দূর থেকে দারোগাসাহেবকে দেখবার জন্য বটগাছের মগডালে চড়ানো হয়েছিল, তারা ধৈর্য হারিয়ে নেমে আসে।

বলণ্টিয়র বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'নবাবপুত্তুরদের স্বভাব যাবে কোথায়! খেয়েদেয়ে এক ঘুম দিয়ে বোধ হয় আসবে।'

ঢোঁড়াইয়ের মতো লোকও হঠাৎ বলণ্টিয়রের মুখ-চোখ দেখে আবিষ্কার করে যে, তার বিরক্তির চাইতে উদ্‌বেগই হয়েছে বেশি।

'বলণ্টিয়রজী, দারোগাসাহেব ভয় পেলেন না কি?'

'কে জানে। সে খোঁজে আমার দরকারও নেই।'

বলণ্টিয়রজীর কথার ঝাঁঝ দেখে ঢোঁড়াই চুপ করে যায়। হাতের খাড় দেখতে আয়নার দরকার কী? বলণ্টিয়র ফৌজের উর্দি পাওয়া লোক বলে বোধ হয় দারোগাসাহেব একটু ভয় পেয়েছে। এ দারোগাটাও আবার একটু রোগা রোগা গোছের।

---

১ তুলে আছাড়।

২ জিরানিয়া জেলায় বৈষ্ণব কথাটির অর্থ নিরামিষাশী। এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

একটানা কীর্তন শুনিয়েও এত লোকের ভিড়কে আর শান্ত রাখা যাচ্ছে না। দারোগাসাহেব বোধ হয় আর আসবেন না। ঢোঁড়াই একেবারে মুষড়ে পড়েছে। দুদিন ধরে দিনরাত মেহনত করেছে তারা। সে কি এই জন্য। সতিয়াগিরা না হলে রাজপুতটোলার লোকেরা মুখ টিপে টিপে হাসবে। বলন্টিয়রজী তো বেশ বসে বসে চরখা কাটছে। 'বলন্টিয়রজী, সতিয়াগিরা কি তাহলে আর হবে না আজ?'

বলন্টিয়রজী চটে কী যেন বলে। কীর্তনের কানফাটানো মাতনের মধ্যে ঢোঁড়াই কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে না। তবে এটুকু বোঝে যে সতিয়াগিরা হবে। আর বোঝে যে, মহাৎমাজী দারোগাসাহেবের উপর রাগ করতে বারণ করেছেন বলন্টিয়রকে, কিন্তু ঢোঁড়াইদের উপর চটে উঠতে মানা করেননি।

হবে! হবে! দারোগা না এলেও হবে। সকলের মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে।

বলন্টিয়র হাত উঁচু করে বলে, 'শান্তি! শান্তি!' কীর্তনের মাতন থামে। লোকের হটগোল থামে। সে দাঁড়িয়ে বলে, মহাৎমাজীর হুকুম ছিল বেশি কিছু না বলা। কিন্তু দারোগাসাহেব যখন আসেননি তখন খোলসা করেই বলি।·· তারপর সে অংরেজ-জার্মান লড়াই, কাংগ্রিস মহাৎমাজী কত কী বলে, যায়।···অনেকক্ষণ বলবার পর শেষের দিকে ভারি ভাল কথা বলতে আরম্ভ করে। বাবুসাহেবকে বলে 'জুলুমকার'। পাবলিস জুলুমকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই, সবচেয়ে বড় জুলুমকার অংরেজ সরকার, তাকে সাহায্য করতে এসে দাঁড়ায়। 'এই দেখুন কুশীর ধারের গাঁয়ের 'নিকাশ' বাবুসাহেব হড়পে নিল। এগিয়ে দিল অংরেজ সরকারকে। পোকা থাকবার জন্য যে আটচালা তুলেছে সরকার, তেমন ঘর আপনাদের টোলায় একখানও আছে? রেড়ির বীচি চলে যাবে বিলাতে লড়াইয়ের কাজে, আর আপনাদের খুঁটিতে বাঁধা গরুগুলো জল না পেয়ে তড়পে মরবে। এণ্ডির চাদর গায়ে দেবে, বাবুসাহেবের মতো জয়চন্দদের আওরতরা, আর আপনাদের বাড়িতে মা-বোনেদের আবরু-ইজ্জত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে'···

আগুনের হলকা ছিটোচ্ছে বলন্টিয়রের কথাগুলো। সকলের রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সব মনগুলো গলে তাল পাকিয়ে এক হয়ে গিয়েছে। বলন্টিয়রজী যে এ রকম প্রাণের কথা বলতে পারে তা আগে কারও জানা ছিল না। দামী কথা বলেছে। 'জুলুমকার!'

বলন্টিয়র লচুয়া চৌকদারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বলে দিও তোমার

ারোগাকে, আমি সরকারের বিরুদ্ধে কী কী বলেছি। কানুন যদি ভাঙতেই য় তবে ঠিক করে ভাঙাই ভাল।'

উত্তেজনায় সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুড়হাদাদার ছানিপড়া চোখ দিয়ে লে গড়াচ্ছে গাল বেয়ে। সে বলে, বসে পড় সবাই। এর পর সতিয়াগিরা াকি রয়েছে। এখনই সবাই উঠে পড়ল কেন?

কে কার কথায় কান দেয় তখন।

বলন্টিয়র বলছে 'অংরেজ', আর সকলে বলে 'জুলুমকার'।'

ঢোঁড়াই বলে 'বাবুসাহেব!' সকলে বলে 'জুলুমকার!' 'লাডলীবাবু'! জয়চন্দ্র!'

কখন যেন সকলে বলন্টিয়রের সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করেছে। কুশীর ারে যেখানে গুটিপোকার ঘর হয়েছে, সেখান পর্যন্ত গিয়ে সকলে প্রাণভরে চঁচায়। তারপর বলন্টিয়রজী 'ন এক পাই, ন এক ভাই অংরেজকী লড়াইমে' লে ভঁইসদিয়ারার পথ ধরে।

মহাৎমাজীর হুকুম, যতদিন পুলিশ না ধরে গ্রামে গ্রামে এই বলে বলে ঘুরে বেড়াতে হবে। সাঁঝের আগে বোধ হয় ভঁইসদিয়ারায় পৌছুতে পারবে না। দেখছিস না হাওয়াই জাহাজ চলল। জিরানিয়ায় নেপালী ফৌজ ভর্তি করবার ছাউনি খুলেছে। সেখানকার ফৌজী হাকিম রোজ হাওয়াই জাহাজে কলকাত্তা থেকে আসা-যাওয়া করে।

ছেলেপিলেরা বলন্টিয়রের দেওয়া মালাগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। বলন্টিয়রকে আর চেনা যাচ্ছে না এতদূর থেকে। হাতের বার্নিশ করা চরখার বাক্সটার উপর রোদ্দুর পড়ে ঝকমক করে উঠল। কুশীর ধারে টিলার পিছনে গোঁসাই পাটে বসবেন এইবার।

'পরণাম মহাৎমাজী!' 'পরণাম'! 'পরণাম'!

তারা সকলে ফিরে এসে দেখে, মঠের মাঠে বুড়হাদাদা তখন মেয়েদের বসিয়ে রেখেছে, সবাই এলে সতিয়াগিরা আরম্ভ হবে বলে।

হাকিম রায়বার

বেচারা বলন্টিয়রকে গ্রেপ্তার না করে দারোগাসাহেব ভারি বিপদে ফেলেছে, একবার জর গায়ে কোয়েরীটোলায় এসে সেই যে ভাঙা মঠে আস্তানা নিয়েছিল, সেই থেকে রয়ে গিয়েছে সেখানেই। দু-চার দিন পর পর এ-গাঁ, সে-গাঁ, মাস্টারসাহেবের আশ্রম ঘুরে আসে। কোয়েরীটোলার লোকের ইচ্ছে

যে বলন্টিয়র তাদের গাঁয়েই থাকে। থাকলে পর সময়ে অসময়ে একটু মনে বল পাওয়া যায়। জিবানিয়া থেকে এসেই তার খদ্দরের ঝোলার মধ্য থেকে বলন্টিয়র প্রত্যেকবার বার করে একখানা করে মহাৎমাজীর কাগজ। তার উপর মহাৎমাজীর ছবি, হাঁসের পিঠে চড়ে উড়ে যাচ্ছেন আকাশে। তার থেকে পড়ে পড়ে কত খবর শোনায় মুলুকের। এ ছাড়াও বলন্টিয়র আরও কত খবর আনে।

…অংরেজকে কাবু করছে জর্মন!…লাডলীবাবু জেলা 'কৌমি মোর্চা'র[১] সভাপতি হয়েছে; লোটা-ভরা টাকা পাবে মাইনে, সরকারের কাছ থেকে। খুব বড় হাকিম।…পাট-তামাকের দাম বাড়ছে।…ঐ দেখ নেপালী রংরুটদের হাওয়াগাড়ি চলেছে পাক্কী দিয়ে—এক, দু, তিন, চার, পাঁচ। রোজ বিশখান করে যায়। কুরসাইলা স্টেশনে এগুলো চড়বে রেলগাড়িতে। জিরানিয়ার 'বাঙালিয়া'গুলো[২] আজকাল ভারি কাবু; বাজারের সব মাছ এই নেপালী রংরুটগুলো কিনে নেয়। খায় কী করে জানেন তো? পুড়িয়ে।…

লাডলীবাবু আরও বড় হাকিম হয়েছে—কথাটা ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। কোয়েরী আর সাঁওতালরা বাবুসাহেবের মঠের দরুন জমিগুলোতে গোরু চরানো আরম্ভ করেছিল। তারা জানে যে, এ জমিগুলো নিয়ে বাবুসাহেব মামলা-মোকদ্দমা করতে সাহস করবে না। যে চুরি করে খায় সে কি হাকিমের কাছে যায়? লাডলীবাবু বড হাকিম হয়ে গেলে আবার কলস্টর দিয়ে গোলমাল না করায়।

কলস্টর না হোক, একদিন এস. ডি. ও. সাহেবকে নিয়ে সত্যিই লাডলীবাবু এল গাঁয়ে। খবর দিল মিটিন হবে; সকলে ভয়ে কাঠ। এই দিনই আবার বলন্টিয়রের জিরানিয়া না গেলে চলছিল না। কী যে করে সেখানে বুঝি না। লাডলীবাবু নিজে এসে সকলকে ডেকে নিয়ে গেলেন মিটিনে।

তাজ্জব ব্যাপার! মিটিনে মাঠের জমির কথা কিছু বলেন না এস. ডি. ও. সাহেব। কেবল লড়ায়ের কথা। হিটলার রাবণের মতো 'জুলুমকার'। রাঙা আলুর চাষ করা খুব লাভের। সাড়ে-সাত টাকা করে মণ উঠেছে। গাঁয়ের উচিত, চোর-ডাকাতের বিরুদ্ধে 'রক্ষীদল' কায়েম করা গাঁয়ে গাঁয়ে।

ঢোঁড়াই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ায়। 'আমাদের বাড়ি থেকে আর হুজুর কী নেবে ডাকাতে?'

১ ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্ট।

২ বাঙালীদের তাচ্ছিল্যে 'বাঙালিয়া' বলা হয়।

হাকিম বোঝান, 'এ কথা বললে কী চলে? সকলকে মিলে-মিশে থাকতে হবে গাঁয়ে।'

'হয়ে আসা'[1] বড়কামাঝি বলে, 'বলছ বটে ঠিক, হাকিম শুনতে লাগছে ঠিক বাপের কথার মতো। কিন্তু কুশীকিনারের নিকাশে, তোমরা আর লাডলীবাবুরা মিলে যে রেড়ির চাষ করছ, আমাদের টোলার মেয়েরা কি কুর্বাঘাটে মেলার তাঁবুর আওরত?'

এস. ডি. ও. সাহেব প্রথমে কথাটা ধরতে পারেননি। লাডলীবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি একটু আমতা আমতা করেন। বাবুসাহেব পাট-করা চাদরখানার উপর হাত বুলোতে বুলোতে কাশেন।

'দিনকাল বোঝেন না আপনারা।'

হাকিমের মুখ-চোখ দেখে বিল্টাটা আবার বুঝতে পারল কি না পারল, তাই গিধো মাঝি তার পায়ে খোঁচা মেরে বুঝিয়ে দেয়—'বকছে রে বাবুসাহেবকে।

'না, না, লাডলীবাবু, এদের সঙ্গে সম্বন্ধটার একটু উন্নতি হওয়া দরকার।'

লাডলীবাবুও কথাটা অস্বীকার করেন না। আজকালকার দিনে কি চাষবাসে, কি অন্য কাজে লোকবলই আসল বল। ফসলের দাম বাড়ছে। এখন এদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটিটা জিইয়ে না রাখাই ভাল।

কথাটা বাবুসাহেবও কিছুদিন থেকে ভাবছেন; কিন্তু হাকিম একথা ক'টা তাঁদের আলাদা ডেকেও তো বলতে পারতেন।

এস. ডি. ও. সাহেব ইনসান আলিকে সঙ্গে করে হাওয়াগাড়িতে ওঠেন। ইনসান আলির বাড়িতেই খানাপিনা করবেন আজ।

লাডলীবাবু বাড়ি ফিরবার সময় বলেন, 'এস. ডি. ও. টা লম্বরী 'লিগি'[2] তাই জন্যই ইনসান আলি আড়গড়িয়ার বাড়ি গেল।'

'আবার রাবণের কথা তুলেছিল বক্তৃতার মধ্যে।'

লচুয়া হাডি বলে, 'হাকিম চটেছিল কেন জানিস? 'কৌমি মোর্চার' মিটিন করবে বলে লাডলীবাবু হাকিমকে আনিয়েছিল এখানে। জেলার সব বড়লোককে, কাকে কত ওঅর-ফাণ্ডে দিতে হবে, কলস্টর সাহেব ঠিক করে দিয়েছে। অত দিতে চায় না লাডলীবাবু। এখানে এনে এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে পাঁচশ টাকা নিতে। তিনি তো শুনে চটে লাল। কলস্টর বসিয়েছে তিন হাজার টাকা। এস. ডি. ও. কি পাঁচশ টাকা নিয়ে ছেড়ে দিতে পারে? তুই হলি 'কৌমি মোর্চার সভাপতি।'···

---

১ জেল থেকে।   ২ লিগি—মুসলিম লীগের লোক।

ঢোঁড়াইদের কারও এসব কথা শুনবার উৎসাহ নেই। কী বাজে গল্প করতেই ভালবাসে এই লচুয়া চৌকিদারটা! এখন এটা গেলে বাঁচা যায়!

লচুয়া হাড়ি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের কথা আরম্ভ হয়।

লাডলীবাবুটা তাহলে বেশি বড় হাকিম নয়। দেখলি না এস. ডি. ও. সাহেবের চাইতেও ছোট হাকিম।

হাঁ, 'ডবল' হাকিমের গরমই আলাদা।

যা তাড়া খেয়েছে। আর সাহস করবে না মঠের জমি নিয়ে গোলমাল করতে। বাবুসাহেবের কাছ থেকে 'আধি বন্দোবস্ত' নেওয়া মঠের জমিগুলোর ফসলের ভাগ এবার না দিয়ে দেখলে হয়। দেখাই যাক না বাবুসাহেব কী করে। মঠের পড়তি জমিতে গোরু চরালেও কিছু বলেনি, সতিয়াগিরার দিনের অত গালাগালিও হজম করে গিয়েছে। বাবুসাহেবকে না দিয়ে কিছুটা বলটিয়রকে দিলে কী হয়। ওরও তো বাল-বাচ্চা আছে নিজের গাঁয়ে।

বড়কা মাঝিরও রায় তাই। 'তুইও বুড়হাদাবার মতো পুতুপুতু করিস না ঢোঁড়াই, এই সব ব্যাপার নিয়ে। যা হবার হবে, পরে দেখা যাবে। কাজ আজকাল দুয়োরে দুয়োরে ঘুরছে লোকের।

সে কথা ঢোঁড়াইও জানে। এই তো ইনসান আলি এসেছিল পরশু লোকের জন্য। সেই বলল, রাজপুতরা ডিস্টিবোডের খোঁয়াড় তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তার 'সুথনী'[১] করবে। লড়ায়ের জন্য সরকারবাহাদুর 'পাক্কী' নিয়ে নিয়েছে ডিস্টিবোডের হাত থেকে। এখন পাক্কীর ধারের গাঁয়ে গাঁয়ে লোক রাখবে, রাস্তা মেরামত করবার জন্য। তারই ঠিকেদারি পেয়েছে ইনসান আলি। ইনসান আলি আড়গড়িয়া আরও বলে গিয়েছিল, এই জন্যই বাবুসাহেবরা পাক্কীর ধারের আমগাছ তিনটে তাড়াতাড়ি কাটিয়ে নিল। জিরানিয়ায় চালান করছে। ও রপোর্ট করবে লাটসাহেবের কাছে। আজই হয়তো বলবে, এস. ডি, ও. 'সাহেবের কাছে ; দুজনই তো 'লিডের' লোক।·

ডিস্টিবোডের রাস্তা মেরামতির কাজ আবার যদি ঢোঁড়াই নেয়! ভাবতেও বেশ লাগে। কোথায় গিয়েছে সেই শনিচরা বুদ্ধুর দল··· রাস্তায় কাজ করতে করতে যদি সে কুশীস্নানের দিন দেখে যে, গোরুর গাড়িতে করে রামিয়া আর তার ছেলে চলেছে···উদাস হয়ে ওঠে মনটা।

না, এখন পাক্কীর কাজ নিলে এরা ভাববে যে, বাবুসাহেবের মুখে এদের ছেড়ে দিয়ে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। তা হয় না।

১ একরকম কন্দ। 'কচুপোড়া' করবে এই অর্থে ব্যবহৃত।

জমি জাতির রাজ্যে খবরের দৌরাত্ম্য

আজকাল বছরে যত দিন, তত খবর, হাটে যত লোক, তত খবর। আর সব খবর সত্যি। না পেলে মন শক্ শক্ করে; মৌতাতের জিনিস পাওয়া না গেলে যেমন হয়, তেমনি। এতকাল মঠের মাঠের খবরগুলো টিকত অনেক দিন। তার থেকে চুইয়ে চুইয়ে রস নিতে হত ন মাস ছ-মাস ধরে। এখনকার খবরগুলো আসে ভিড় করে। একটা সত্যি খবর আর একটা সত্যি খবরকে ঠেলে নিজের জায়গা করে নেয়। কালকেরটা কালকে খুব সত্যি ছিল, আজকেরটা আজকে আরও সত্যি। তবে সত্যির মধ্যে কড়া ফিকে আছে। হাটের সত্যির চাইতে গঞ্জের বাজারের সত্যি কড়া। গনৌরীর কুরসাইলা থেকে আনা খবর আরও কড়া। বলন্টিয়রের জিরানিয়া থেকে আনা রামায়ণের হরফের খবর, তার উপর তো কথাই নেই।

কাপড়ের জাপানীরা হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবার বাঘের খেলা, জর্মনবালা! লে লে লালা! সুরুজজী মহারাজের আর বুধভগমানের[১] পুজো করে জপৈনীরা। গোরু-টোরুর গণ্ডগোলের মধ্যে তারা নেই। ঠেলা বোঝাবে ইনসান আলি আড়গড়িয়াকে!

কাগজ দিয়ে ওরা হাওয়াই জাহাজ তৈরি করে, রবার দিয়ে জাহাজ। জল খাইয়ে ছাড়বে টমি পল্টনকে। জলের নিচ দিয়ে একেবারে কলকাতা থেকে করসাইলা পৌছে যাবে।

রাজপারভাঙার তরফ থেকে রেলগাড়িভরা লোকদের যখন বিনা পয়সায় পুরিতরকারি খাওয়ান হচ্ছিল সেই সময় একদিন কোয়েরীটোলার কাঁচা লঙ্কার গাড়িগুলো ফেরত এল নৌরঙ্গীলালের গোলা থেকে। 'পূর্বিবাঙ্গাল' মুলুক নাকি জপৈনীরা নিয়ে নিয়েছে। হাটে আর কত কাঁচা লঙ্কা বিক্রি করা যায়। সব বরবাদ হল। কিছুদিন পর শোনা যায় যে, নৌরঙ্গীলালের গোলায় কাঁচা লঙ্কা বিক্রি 'খুলে গিয়েছে'[২] আবার। যে গনৌরী আগের খবর দিয়েছিল. সেই বলে যায় যে, 'টিশন মাস্টার' সাহেব বখেড়া তুলেছিল। দস্তুরের চাইতেও বেশি চাচ্ছিল পান খেতে। তাই লঙ্কা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল নৌরঙ্গীলাল কিছুদিনের জন্য। জপৈনীরা পূর্বি বাঙ্গাল নিয়েছে না ছাই!

আগেকার কাল হলে বিল্টারা তাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করত, সে ক'টা মুখ

১ সূর্যদেব ও বুদ্ধদেব।

২ আরম্ভ হয়েছে।

দিয়ে কথা বলে? এখন কারও সে কথা খেয়াল হয় না। সাত জঙ্গলের লাকড়ি এক করে আঁটি বাঁধা; সব কি সমান জ্বলে।

তবে হ্যাঁ, বলন্টিয়রের খবরের সঙ্গে গনৌরীর খবরের তুলনা! কিতাব দেখে বলুক তো গনৌরী কবে রামনবমী! এক মাস আগে বলন্টিয়র বলে গিয়েছিল যে, পরের মাস থেকে পাক্কী দিয়ে গোরুর গাড়ি যেতে দেবে না, কাঁচা অংশটা দিয়েও নয়। পাক্কী দিয়ে চলবে খালি হাওয়াগাড়ি। ফৌজী সড়ক হয়েছে পাক্কী. একেবারে কামিখ্যামাইয়ের দেশ থেকে পালাবার রাস্তা করে রাখছে সরকার পচ্ছিমে! ঠিক বলেছিল কি না বলন্টিয়র? বর্ষায় জিরানিয়া বাজারে কেউ পাট নিয়ে যেতে পেরেছিলি?

অষ্টপ্রহর ফৌজী হাওয়াগাড়ি চলছে পাক্কীতে। এত গাড়িও কি ফৌজের ছিল। বলন্টিয়র বলেছে যে জিরানিয়াতে টুরমন ফারমের[১] লাঙলের হাওয়াগাড়ি সারাবার আর রাখবার যে ঘর ছিল না, সেইখানে হাওয়াগাড়ি মেরামতের কারখানা খুলেছে ফৌজি সরকার। একেবারে পাক্কীর পশ্চিম দিকটা ভাঙা হাওয়াগাড়িতে ভরে গিয়েছে। কত ঘর তৈরি হচ্ছে সেই দিকটায়। বিজলী বাতি বসাবে। আর পুবের দিকের টুরমনের ফারমের সিধা রেললাইনের কাছে কাঠের ইষ্টিশান করেছে ফৌজের সাহেবরা। বড় বড় চালা তুলেছে সেখানে। গোরু, ঘোড়া, ছাগল, খচ্চর, ভেড়ায় ভরা। সব বেলুচি ফৌজ মুসলমান নইলে এত কসাই আর কে হবে। অথচ মুসলমানরা চটবে বলে উট আর শুয়োর রাখেনি সরকার। ফৌজ না হাতি! সহিস, সহিস! উর্দি পরেছে বলে ছাগল চরানোর রাখালকে ফৌজ বলতে পারি না। আর ফারমের কী হালত জানেন তো ঢোঁড়াইজী? বিলিতী ঘাস পোঁতা হয়েছে ঐসব জানোয়ারদের খাওয়ানোর জন্য। তার আবার যত্ন কত! ঝরণাধার থেকে নলের পিচকিরি দিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে, সেই খচ্চরের খাওয়ার ঘাসের জন্য।

ঢোঁড়াই জানে যে বলন্টিয়র বাজে কথা বলে না।

আরও বলুক বলন্টিয়র পাক্কীর ধারের ঐ জায়গাগুলোর খবর। সেখানকার লোকগুলোর কথা তো কিছু বলে না। 'টুরমনের ফারমের' উপর তার মনে মনে আক্রোশ আছে; তাদের বকরহাট্টার মাঠ নষ্ট করে দিয়েছিল চিরকালের জন্য। আবার চীনাবাদামের বিচি দিতে এসেছিল সেবারে। হাওয়াগাড়ির লাঙল দিয়ে চীনেবাদাম করতে গিয়েছিলি, এবার থেকে ফলবে ছাগলের নাদি!

তার 'পাক্কী'ও কি তাহলে বদলে গেল? ক্ষেতের রঙ বদলায়, লোকের

১ Tournament Agricultural Farm.

মন বদলায়, আজকের ছোট ছেলেটা কাল জোয়ান হয়ে ওঠে, রোজার তাকত' কমে, রোজগারের ধারা বদলায়, তাৎমাদের মোড়ল গোরুর গাড়ি চালায়, দুনিয়ার সব জিনিস বদলায়। বদলায় না কেবল 'পাক্কী' আর রামায়ণ। এ দুটোর সঙ্গে যে নাড়ি বাঁধা তার। এগুলো চিরকাল একরকম। পাক্কীর বটগাছের পাতা ঝরুক শীতে; পশ্চিম বাতাসের নূতন পাতা গজাক, বর্ষায় রাস্তার মাটি ধুয়ে যাক; রাস্তা চওড়া কর না যত ইচ্ছে; কামাখ্যাজী থেকেও আগে নিয়ে যাও না যদি চাও; এসবকে সে বদলানো বলে না। কাঁচা অংশটা দিয়েও গোরুর গাড়ি যাবে না, গাড়োয়ানের গান শোনা যাবে না রাতে, লোকে ব্যবহার করতে পারবে না, ছাগল-ভেড়ার কদর হবে মানুষের চাইতে বেশি, একেই বলে বদল। শিলিগুড়ি নকসালবাড়িতে গোরাদের জন্য শুয়ারের পাল নিয়ে যাচ্ছে রোজ ডোমরা এই পথে, কিন্তু ধান নিয়ে যেতে দেবে না লোককে গোরুর গাড়িতে। অদ্ভুত! ফৌজের লোক ছাড়া আর যেন লোক নেই দুনিয়াতে!

কানে আসছে বলন্টিয়রের কথা—থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে—সৌরা, সলিমপুর, বিরসোনি, বাজিতগঞ্জ, সাতকোদারিয়া....না, না, বিসকান্ধা মৌজার নাম নেই ফিরিস্তিতে··

বলন্টিয়রজীর গল্প তাহলে এবার শেষ হল। বলন্টিয়র প্রতি সপ্তাহে জিরানিয়া থেকে মহাৎমাজীর কাগজ নিয়ে এলেই সকলে ঘিরে বসে তাকে। সব খবর বলা শেষ হয়ে যাবার পর, সবাই বলন্টিয়রকে বলে কাছারীর নিলামী ইস্তাহারটা দেখতে, মহাৎমাজীর কাগজখানা থেকে। বিসকান্ধার নামটা নাই তো? কিছু বিশ্বাস নেই বাবুসাহেবকে। দেখছি তো! চাজার লড়ায়ের খবর বল, মহাৎমাজীর খবর বল, আর জিরানিয়ার ফৌজী ছাউনির খবর বল, এর কাছে আর কোনো কথা কথাই না।

জমির কাছে আবার অন্য কথা! ফৌজে বকরহাট্টার মাঠের জমি নেয়, সরকার পর্যন্ত কুশীর ধারের জমি নেয়। রোজগার মানেই যে জমি। ইজ্জতের সঙ্গে রোজগার, জমি। আবার রোজগারের সঙ্গে ইজ্জত চাইলে তারও দরকার জমির। চাষের জমি, গোরু চরাবার জমি, নিকাশের জমি, ধেনো জমি, তামাকের জমি, ভুট্টায় জমি। যার আছে, সে আরও চায়, যার কোনোদিন ছিল না, সে-ও আজকে চায়; যাদের ছিল, গিয়েছে, তারা তো চাইবেই। বদলাক দুনিয়া। হয় যদি হোক রামায়ণে বদল। জমি, আর জমি, আর জমি! অথচ সকলেই চায় রামায়ণের নজিরের বলে।

উদাস হয়ে উঠেছে ঢোঁড়াইয়ের মন একটা অজানা উৎকণ্ঠায়।

দিব্যদৃষ্টি লাভ

'পাক্কী' ঢোঁড়াইয়ের কাছে একটা সজীব জিনিস। তার কোনোরকম সন্দেহ নেই যে পাক্কীটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোহাতে ঘুণ ধরেছে, সোনাতে মরচে পড়েছে; এ কি কলির শেষ হয়ে এল নাকি? বাবুসাহেব কাটিয়ে নিয়েছিল পাক্কীর ধারের অনেক আমগাছ। ফৌজের থেকে কাটিয়ে নিল সব সেগুন, শাল আর শিশুগাছগুলো। কুশী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পাক্কীর গাছের মৌচাকগুলো একজন পাঞ্জাবী ঠিকেদার জমা নিয়েছে। আসামে ফৌজদের জন্য মধু চালান যাবে। ফৌজি হাকিমরা 'পাক্কীর' ধারের জমি কতদূর পর্যন্ত তাদের, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না! তাই দুধারের মাটিকাটা গর্তগুলোতে বাবুসাহেব ধান লাগিয়েছে।

দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না। পায়ের নিচের শক্ত মাটি, তাতে দাঁড়িয়েও যেন নিশ্চিন্দি নেই; ঐ শুনতেই রাঙা আলু সাড়ে-ন' টাকা মণ! রোজার রাজ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন রাজা—সরকার বাহাদুর। এতদিন 'ইনরধনুর'—আড়ালে 'ইনরজী মহারাজের'[1] মতো ছিল সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পারের রাজা। সুর্যিঠাকুরকে সেই রূপকথার রাজা রাখতেন দারোয়ান। সে দারোয়ানের চোখের পলকটুকু পর্যন্ত ফেলবার হুকুম ছিল না। রাজপুত্তুর 'ঢলাকুমার আর বিজাসিং'-এর রূপটা তবু পালাগানের সুরে আর ঢোলকের বোলে ধরা পড়ত। এ রাজাকে জানবার সে উপায়টুকুও ছিল না। সেই রাজা এসে গিয়েছেন কাছে। আবছা রূপটা স্পষ্ট না দেখা গেলেও অনুভব করা যায়। 'পাক্কী' আর পাটের দামের রাজা, কাপড় আর কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদার হাকিম দারোগা ফৌজের রাজা, আকাশে 'হাওয়াই-জাহাজের' রাজা, বাতাসে ফৌজী হাওয়াগাড়ির গন্ধের রাজা। রামায়ণে এ-রকম রাজার কথা লেখা নেই। 'বিলাক'-এর[2] কথা লেখা আছে? লাডলীবাবু নিজের বৈঠকখানায় দোকান মঞ্জুর করে দিয়েছিল, অনোখীবাবু, ইনসান আলি আড়গড়িয়া আর গিধর মণ্ডল, এই তিনজনকে। পবর টাকা দিয়ে নাম লেখালে, তবে চিনিখোররা সেই দোকান থেকে জিনিস পেতে পারে। রামায়ণপড়া পণ্ডিতজীও জানত না যে ঐ দোকানের নাম

১ রামধনুর আড়ালের ইন্দ্রদেব।

২ ব্ল্যাকমার্কেটিং।

'কণ্ট্রোল'।[1] এসব জিনিসের কথা রামায়ণে থাকে না, নিলামি ইস্তাহার-ওয়ালা মাস্টারসাহেবের কিতাবে। বলন্টিয়রজী জানে। তাই না এসব জানতে হলে বসতে হয় বলন্টিয়রজীর কাছে।

বদলায় অথচ বদলায় না। পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়। ইনসান আলি পাক্কীর ঠিকেদার হওয়ার পরও তার ইনসান আলি 'আড়গড়িয়া'[2] নাম ঘোচে না। গিধর মোড়লের মোড়লি ঘুচল তবু সে গিধর মোড়লই থেকে যায়। খোঁয়াড়ে কাজ করলেও কেউ তাকে আড়গড়িয়া বলে না; কলকাত্তায় রাঙা আলু চালান দেওয়ার ঠিকে নিলেও কেউ তাকে ঠিকাদারসাহেব বলে না। ভাঙ্খোর অনোখীবাবু রাত জাগতে হবে বলে আজকাল অন্য জিনিস খায়; কৌমি মোর্চার[3] সাহায্যে কণ্ট্রোলের দোকানের নাম করে কেনা নুন রোজ রাতে নৌকা বোঝাই করে চালান দেয় বাঙ্গাল মুলুকে; তবুও সে নিজেকে বলে 'কিষাণ'। কুরসাইলার চিনির কলের আর বাস লাইনের মালিক রাজপারভাঙা; তবু সবাই বলে জমিদার।

যা শোন সব আসামে যাচ্ছে। রাজ্যিসুদ্ধ লোক ঠিকেদার হয়ে উঠছে। মন হয়ে যাচ্ছে অন্যরকম। গোরু দুইতে আরম্ভ করেছে কিষাণরা। জিরানিয়া জেলায় এত দিন গোরু রাখা হত বাছুরের জন্য আর গোবরের জন্য কেবল। গাছের থেকে পড়া ফল যার ইচ্ছে নেওয়ায় অধিকার ছিল গাঁয়ে, এখন ঠিকেদাররা কাঁচা আমই চালান করে দিচ্ছে, গাছতলায় ফল আসবে কোথা থেকে। যদিই বা দৈবাৎ কোনো বাগানে গাছে আম পাকতে দেওয়া হয়, সেখানেও ঠিকেদাররা তলের ফল কুড়োতে দিচ্ছে না।

এতও খেতে পারে ফৌজরা!

ঢোঁড়াই কিছুতেই বুঝতে পারে না কী করে তারা এত জিনিস নিয়ে, মধু থেকে আরম্ভ করে রাঙাআলু পর্যন্ত।

বলন্টিয়র বলে, 'মৌকা এসেছে যে যা পারে করে নেবার। এমন সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসে না। কালকে এ সুবিধা নাও থাকতে পারে। সাধে কি আর মহাৎমাজী গরমেছেন! বরদাস্তের বাইরে হয়ে গিয়েছে। মহাৎমাজী বলে গিয়েছেন এই তাঁর শেষ লড়াই, দুনিয়াতে রামরাজ্য আনবার লড়াই।'

[1] ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্টের সাহায্যে খোলা কো-অপারেটিভ দোকান।

[2] খোঁয়াড়রক্ষক।

[3] ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্ট।

রামচন্দ্রের অবতার মহাৎমাজী! রামায়ণের লেখার সমান তাঁর কথার ওজন।

এবার আর আগের মতো নিমক তৈরীর ফিস্‌-স্ স্ আর সতিয়াগিরার ফুস্‌-স্ স্ নয়। সে সব ছিল থোঁড়া-নুলোর 'নৌটাঙ্কি'। এবার মরদের লড়াই রেললাইন তুলবার, তার কাটবার আরও অনেক! অনেক! মাস্টারসাহেব পাটনা থেকে খবর নিয়ে এসেছে।

মাস্টারসাহেব এনেছে? পাটনা থেকে? তবে আর এ খবর অবিশ্বাস করার কিছু নেই। রেলগাড়ি দিয়ে কি আর রামরাজ্যে পৌছন যায়। ওতে করে সব জিনিস পাঠানো যায় আসামে, কুরসাইলা থেকে আর জিরানিয়ার ইষ্টিশান থেকে। বুড়হাদাদা বলন্টিয়রকে জিজ্ঞাসা করছে, মাতাল গোরাপল্টনরা কেরোসিন তেল খায় নাকি? না হলে এত তেল কী হয়? বুড়হাদাদার উপর ঢোঁড়াইয়ের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। এত বাজে কথাও বলতে পারে। এইবার নিশ্চয়ই দেশলাই নুন আর কাপড়ের পুঁথি খুলে বসবে।...না না বলন্টিয়রজী, এসব কথা যেতে দিন। মহাৎমাজীর কথা বলুন। ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা হয় আরও শোনে, সব কথা শোনে। রামায়ণ শোনার পুণ্যি না থাকুক এতে। তবু এ'কথা আরম্ভ হলে বলন্টিয়রের কাছে ঘেঁষে বসতে ইচ্ছে করে। রাবণের চাইতেও অংরেজ সরকারের উপর আক্রোশ আরও জীয়ন্ত হয়ে ওঠে। ধন্য তার পুণ্যের বল যে সে অমন মহাৎমার দর্শন করতে পেরেছিল। এই দর্শনের দিনের সঙ্গে তার জীবনের কতখানি অংশ জড়ানো। শুধু তার কেন আরও একজনের। সে এখন কোথায় কোথায় জলকাদায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেঁচে আছে কি মরে গিয়েছে কেউ জানে না।...

অজ্ঞাতে ঢোঁড়াইয়ের হাত চলে যায় কোমরের বাটুয়াটিতে। উপর থেকে টিপে টিপে দেখলে চাঁদির সিক্কাগুলো বোঝা যায়। ভাল লোকদের অদ্ভুত ধরন অবিচারের প্রতিবাদ জানাবার। সাগিয়া প্রতিবাদ জানায় নিজেকে কাদায় নামিয়ে; বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের উপর প্রতিশোধ নেয় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। মহাৎমাজী অংরেজের জুলুমের জবাব দেন জেলের খিচুড়ি খেয়ে; সীতাজী নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন ধরতিমাইয়ের কোলে গিয়ে।

'ও বলন্টিয়র। গোঁসাই মেঘে ঢাকা রয়েছে বলে আজ কি আর খাওয়ার সময় হবে না?'

বলন্টিয়র এক-একবেলা এক-একজনের বাড়িতে খায়। গনৌরীর বৌ তাকে ডাকতে এসেছে।

'আর এ গাঁয়ের দানাপানি উঠল আমার।'

আবার কী হল। গনৌরীর বৌয়ের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। এত বড় একটা লোককে খাওয়ানোয় আবার কিছু ক্রটি হয়ে যায়নি তো। তার স্বামী থাকে কুরসাইলা। গাঁয়ে জমি কিনবার মতো টাকা জমলে তবে ফিরবে। তার কষ্টের সংসার থেকে, কত চেষ্টা করে বলন্টিয়রের খাওয়ার পালাটা চালাতে হয় তাকে।

'না না, তা বলছি না, জেলের খিচুড়ি আবার খেতে হবে শীগগিরই'—একটু আদর কাড়াতে চায় বলন্টিয়র।

'বাবুসাহেব ?'

'মেয়েমানুষের আবার কত আক্কেল হবে।' বুড়হাদাদা অবাধ্য মাজাটা সোজা করে নিয়ে বসে, তারপর এই বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকটিকে এক কথায় সমস্ত ব্যাপারটি জলের মতো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়, 'মহাৎমাজীর লাইন তোলা হবে।'

বলন্টিয়রের খাওয়া হলে, গাঁসুদ্ধ সকলে তাকে টিপটিপুনি বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে দিতে আসে। 'জিরানিয়া থেকে খবর পাঠিও বলন্টিয়র।'

'মহাৎমাজীর মুখ রেখো ঢোঁড়াই।'

'ও বলন্টিয়র থামো থামো।' গনৌরীর বৌ ছুটে আসছে তার বিছানায় পাতবার বোরাটা নিয়ে। 'গায়ে মাথায় দিয়ে নাও এটা, না হলে এক কোশ যেতে না যেতেই ঐ অমনি হয়ে যাবে চেহারা।' গনৌরীর বৌ বাবুসাহেবের ভুট্টা ক্ষেতের কাকতাড়ুয়াটাকে দেখায়। যেদিন কলস্টরসাহেব লাডলীবাবুর সঙ্গে কণ্ট্রোল খুলতে এসেছিলেন, সেদিন তাঁকে দেখানোর জন্য প্রজাপতি ছাটের গোঁফওয়ালা হিটলার কাকতাড়ুয়াটিকে এখানে খাড়া করা হয়েছিল। খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। রোদে বৃষ্টিতে সেটার রূপ গিয়েছে বদলে এখন। সেটাকে দেখিয়েই মুখ্‌খু গনৌরীর বৌটা হেসেছিল, যাতে রামায়ণপড়া বলন্টিয়রজী চটের বোরাটা নেওয়ার সময় কুণ্ঠিত হবার অবকাশ না পায়।

মহাৎমাজী সাবধান করে দিয়েছেন অংরেজকে। কী করতে হবে তা বলন্টিয়র বলে যায়নি। তবে কাঠবিড়ালের কর্তব্য করতে ঢোঁড়াই পিছপা নয়।

বিসকান্ধার অঙ্গীকার

বাবুসাহেব বহুকালের অভ্যাসমতো আজও হাটে এসেছিলেন। দুদিন থেকে তাঁর মনের উপর দিয়ে বড় অশান্তি চলেছে। তাঁর ছাব্বিশ বিঘার বাঁশঝাড় নির্মূল করে অনোখীবাবু কোশীজী গঙ্গাজী দিয়ে পাটনায় পাঠিয়েছে।

এক টাকায় একখানা করে বাঁশ বলে কী সব বেচতে হবে? ছেলেদের এ হ্যাংলামি বাবুসাহেবের পছন্দ না। বললেও শোনে না। তোদের জিনিস যা ভাল বুঝিস কর। তবে তিনি শর্ত করিয়ে নিয়েছেন যে, ওর থেকে এক পয়সাও ফস্‌বেনে ঠিকেদারির কাজে খরচ করতে দেবেন না তিনি। ঐ টাকা দিয়ে গোরু, বলদ, মোষ কিনতে হবে, যত আক্রাই দাম পড়ুক না কেন। কম করে পাঁচশটা গোরু-মোষ না হলে সেগুলোকে নিজের রাখালের দলের সঙ্গে 'মোরঙ্গে'[১] পাঠান যায় না চরবার জন্য। জনকয়েকে মিলে পাঠাতে হয়। সে-রকম লোকদের এ অঞ্চলে অভিজাতদের মধ্যে ধরা হয় না। যা দাম বাড়ছে গোরু মোষের! বাঁশের দাম বাড়াটাই দেখছে অনোখীবাবু, মোষের দাম বাড়াটা আজ নজরে পড়ে না। হরে-দরে হাঁটুজল। সেই বাঁশঝাড়ের জমিটা থেকে, তিনি বাঁশের শিকড় খুঁড়ে বার করাচ্ছিলেন দিনকয়েক থেকে। মুসহরগুলোর[২] উপর কোনো কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই! একদিন রোজগার করে দুদিন জিরোয়। তিন দিন থেকে সেই বে আক্কিলে লোকগুলো কাজে আসছে না। বোঝে না যে আজকালকার দশ টাকা মণ রাঙা আলুর দিনে এক ধুর জমি অনাবাদী ফেলে রাখলে কিষাণের কত লোকসান। পোপাই মুসহরটা হাটে এসেছে ঠিকই। কিন্তু গেল কোথায়?

তাকে দেখতে পাওয়া যায় কুয়োর পাশের ভিড়টার মধ্যে। রাজপুতটোলার বাচিতরোয়াটাকেও[৩] তো দেখছি একটা কাগজ দেখে দেখে কী যেন পড়ছে। ব'স মুসহর আর হাড়ীগুলোর গা ঘেঁষে! মহাত্মাজীর হল্লা। এসব বহু দেখেছেন তিনি সারাজীবন ধরে। দেবে সরকারবাহাদুর ভুট্টা পেটানোর মতো করে ঠেঙিয়ে, অমনি টাঁয় টাঁয় ফিস্‌-স্‌[৪] হয়ে যাবে সব। প্রত্যেক ক'বছর পর পরই তো হয়। এবার যেন একটু তাড়াতাড়ি! তা করছিস বাপু তোরা কর। এর মধ্যে আবার মুসহর-টুসহরকে নেওয়া কেন?

'এই পোপাই, শোন্‌ এদিকে।'

'চেঁচামেচি করবেন না এখানে। কাল সকাল আটটায় নটায় যাব।'

'কেন এখানে কি রামায়ণপাঠ হচ্ছে নাকি? হাটে কথা বলতে হলেও খাজনা দিতে হবে?' 'ফের এখানে বকবক করবে তো জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

১ নেপালের একটি জেলা।

২ একটি স্থানীয় অনুন্নত জাতের নাম। এরা ক্ষেতমজুরের কাজ করে।

৩ বিচিত্র সিং নামের তাচ্ছিল্যসূচক উচ্চারণ।

৪ বস্ত্রারম্ভে লঘুক্রিয়া।

বহুদর্শী বাবুসাহেব মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারেন যে, এরা যা বলছে তা করতে ইতস্তত করবে না আজ। দারোগাসাহেব পরশু ঠিকই বলছিলেন, বাবুসাহেব, ইনসান আলি, গিধর মণ্ডল তিনজনই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথা। তাঁর টোলার বাচিতর নামের ছোকরাটা কী সব বলছে তা তাঁর কানেও যায় না। চারিদিকে এত ভিড় চাপ বেঁধে গিয়েছে এই চেঁচামেচিতে যে বেরুনও শক্ত। সেখানেই বসে পড়েন তিনি। ঘড়ির টাইম ছাঁটে মুসহরের ব্যাটা! শিখল কোথা থেকে?

সরকার জুলুমকার! অংরেজ জুলুমকার! বলে বাচিতর সিং শেষ করল তার কথা। মহাৎমাজী গ্রেপ্তার! হো যাও তৈয়ার! হঠাৎ ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কেউ মহাৎমাজীর হুকুমের বিরুদ্ধে যেও না। যে খেলাপে যাবে সে পাবলিশের দুশমন। বিশকান্ধার বিশ কাঁধ এক হলে কারও দাল গলবে না সেখানে। তাঁর কথা রাখবে তো সকলে?'

সকলে চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'নিশ্চয়।'

'মরদের এক কথা!'

'নিশ্চয়।'

'দেখো, যার এক বাপ, তার এক বাত!'

এত মনের মতো করে কথা কি বাচিতর সিং বলতে পারে? ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে গিয়ে বেঁধে। পা ঠুকে ঠুকে আর হাত নেড়ে নেড়ে সকলে চিৎকার করে, এক বাপ! এক বাত! এক বাপ! এক বাত! এত মনের মতো কথা তারা এর আগে কখনও শোনেনি।

বিল্টা একটা ঘণ্টা হাতে করে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সেটা বাচিতর সিংয়ের হাতে দিয়ে ভিড় ঠেলে আসে বাবুসাহেবের কাছে। তাঁর হাত ধরে তাঁকে টেনে দাঁড় করায়। চুপ করে কেন? বলো এক বাপ, এক বাত। বলো, বলো, থেমো না।

কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলেন বাবুসাহেব। সকলে শ্রান্ত হয়ে থামবার পর বড়কামাঝি লচুয়া চৌকিদারের হাত চেপে ধরে। বলবি নাকি এসব কথা তোর বাপ দারোগার কাছে? সে ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে বলবে না।

'এক বাপ! এক বাত!'

চৌকিদারকে ধরে এনে বাবুসাহেবের পাশে দাঁড় করান হয়।

আবার বলো। দুজনে একসঙ্গে বলো।

মহাৎমাজীর কাজে তারা কাঠবেরালির সাহায্যটুকু করতে পেরেছে, এই

সন্তোষ মনে নিয়ে সেদিন সবাই বাড়ি ফেরে। ঢোঁড়াইটাকে আগে রেখে মনে ভরসা পাওয়া যায়। ও যাঃ!

বিল্টা ঠিক করে গিয়েছিল, হাটে 'ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে' যে আর কাউকে চৌকিদারি খাজনা দিতে হবে না। এক বাপ এক বাতের ঠেলায় যথাসময়ে সেটা ভুলে গিয়েছে। আর এখন হাট ভেঙে গিয়েছে।

তিতলি কুঠি দাহন

এর পরে কয়দিন একরকম নেশার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। একটা যা হোক কিছু করবার নেশা। দল বেঁধে বেঁধে সকলে এখানে-ওখানে সাত জায়গায় ছুটে বেড়ায়। সবাই সব-কিছু করছে মহাৎমাজীর 'সেবাতে'। থানাতে স্বরাজ হয়ে গেল। ঢোঁড়াই কাউকে বলে না, কিন্তু তার মনে মনে দুঃখ যে সে মহাৎমাজীর কাজ কিছু করবার সুযোগ পেল না। লোকে জানুক, দশজনে বলুক যে, সে খুব মহাৎমাজীর কাজ করছে। এই বাসনাটা প্রবল হয়ে উঠেছে আজ কয়েকদিন থেকে।

গঞ্জের বাজারের দাগী আসামী বিশুনি কেওট পর্যন্ত ভোপতলাল আর বলন্টিয়রের প্রশংসা পেয়ে গেল মহাৎমাজীর কাজ করে। থানার কাগজ জ্বালানোর দিন সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে দারোগাসাহেবের চালাকি। তার 'শ্বশুরা' দারোগা নাকি 'দাগী রেজিস্টার'খান[১] লুকিয়ে রেখে বাজে কাগজগুলো জ্বালানোর জন্য দিয়েছিল। তারপর পেট্রল দিয়ে ছোট দারোগাকে সমেত থানার ব্যাপারটা সে নিজে শেষ করে। মাঝে থেকে ফাঁকি দিয়ে নাম কিনে নিল ভোপতলাল আর বাচিতর সিং। তবে বিশুনি কেওটের মতো মহাৎমাজীর কাজ করতে সে চায় না। বলন্টিয়রের দেখা পাওয়াই শক্ত। নইলে ঢোঁড়াই তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করত।···

একদিন বিসকান্ধার দল কুরসাইলার কাছের একটা রেললাইনের ব্যাপার দেখে ফিরছে। কাঁধে তীর-ধনুক বড়কামাঝি তান ধরেছে। নেশায় গলা ভেঙে এসেছে। কাল রাত থেকেই 'পচই'-এর[২] স্রোত বইছে সাঁওতালটোলায়। স্বরাজ হয়ে গিয়েছে। বড় দারোগা ভেগেছে, সারকিল মানিজর হাকিমি টুপি খুলেছে। জুলুমকার সরকারকে এতদিন এক টাকা করে বছরে দিতে হত পচই খাওয়ার কাগজের জন্য। জয় হো মহাৎমাজী! তাঁর রাজ্যে পচই খেতে

১ 'Village Crime Note Book'।

২ ভাত থেকে তৈরী এক রকম মদ।

আর কাগজ[১] নিতে হবে না। পাওয়া যেত এখন সেই পচইয়ের হাকিমটাকে, তাহলে কেড়ে নেওয়া যেত তার কুর্তা-পাতলুন। নাচ শালা হাকিমি নাচ। কী করে যে স্বরাজ এসে গেল ঠিক বোঝাও গেল না। মহাত্মাজীর কাজ প্রাণভরে করাও গেল না। দুঃখে তাই কান্না এসে গিয়েছে বড়কামাঝির। তাই ভাঙা গলায় সে তান ধরেছে—

…রেললাইন উঠিয়ে ফেললে
তো পা ভেঙে দিলে সরকারের।
তার কেটে দিলে
তো কান কেটে দিলে সরকারের।
থানা জ্বালিয়ে দিলে
তো চোখ গেলে দিলে সরকারের।[২]

নেশার ঘোরে তুই অংরেজের জন্য কাঁদছিস নাকি রে বড়কামাঝি?

নেশার ঘোরে! পচইয়ের আবার নেশা, তা আবার ধরবে বড়কামাঝিকে! ঐ দ্যাখ কুশীর ধারে কাকচিল উড়ছে; পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। নেশা হলে কি দেখতে পেতাম।

বলেই বড়কামাঝির সন্দেহ হয় নিজের উপর। একটা চিলকে অতগুলো চিল দেখছে না তো?

বিণ্টা বলে, 'বাদলা পোকাটোকা উড়ছে মনে হয়।'

বড়কামাঝি নিশ্চিত হয়, যাক, তাহলে চোখের ভুল না। শিকারীর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সে বোঝে যে কাকচিলগুলো উড়ছে গুটিপোকার ঘরের উপর। ডালা পরিষ্কার করে রোগা পোকাগুলোকে ফেলেছে বোধ হয়।

কাছে এসে দেখে যে ঠিক তাই। 'তিতলি'র হাকিম[৩] হাফপাতলুন পরে, গুটিপোকার ঘরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে। দারোগাতে রাজ্য ছেড়েছে, 'তিতলি'র আবার হাকিম। এতদিন 'তিতলি'র হাকিম কথাটার মধ্যে কেউ হাসির কিছু খুঁজে পায়নি।

ঠিক বলেছিস বড়কামাঝি। পচইয়ের হাকিমের পিসতুতো ভাই তিতলির হাকিম? চৌকিদার উর্দি ছেড়েছে, কিন্তু তিতলির সাহেব পাতলুন ছাড়েনি। গুট্ মোটিং। গুট্ মোটিং তিতলি সাহেব। সকলে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে।

১ আবগারী বিভাগের লাইসেন্স।

২ স্থানীয় গীত।

৩ তিতলি—প্রজাপতি। রেশমের গুটি কেটে প্রজাপতি বার হয়। সরকারী রেশম-বিভাগের কর্মচারী।

হাফপ্যান্টপরা লোকটি ভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। সকলে সেইদিকে আগিয়ে যায়।

হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের মুখেচোখে একটা জিনিস মনে পড়ার ঝলক লাগে। হাতের কাছের এমন জরুরি কাজ এতদিন মনে পড়েনি কেন তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়।

ঢোঁড়াই বলে, বাইরে চলে এস তিতলিসাহেব, ঘরে আগুন লাগাচ্ছি আমরা। চালের খড় সকলে টেনে বার করে এক এক মুঠো।

একখানা লুঙ্গি পরে তিতলিসাহেব বেরিয়ে এসেছে।

দম বন্ধ করা ধোঁয়ার মধ্যে ঢোঁড়াই গুটিপোকার ডালাগুলোকে এক এক করে বার করে মাঠে রাখে। কিলবিলে পোকাগুলোকে দেখে গা ঘিনঘিন করে।

'যত তোর উদ্ভট কাণ্ড? কার জন্য বার করছিস ওগুলো? এখনই তো কাকে চিলে খেয়ে যাবে।'

'তা থাক?'

—মাথায় জড়ানো গামছাখানা আলগোছে খুলে নিয়ে বড়কামাঝি ঢোঁড়াইয়ের পায়ের কাছে রাখে; নাটকে ঠিক যেরকম সে দেখেছে। 'লোহা মানছি[১] আমি তোর ঢোঁড়াই আজ থেকে। তোর খুনে পানি নেই।'

ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে সেই একদিনকার কথা ছোটবেলার, যেদিন রেবণগুণী লোহা মেনেছিল মহাৎমাজীর। আজ সাঁওতালটুলি তার লোহা মানছে। এতে আনন্দ আছে। কাল হয়তো আরও দূরের লোকরা তার তারিফ করবে। দেখা হলে বলণ্টিয়রজী পিঠ চাপড়ে দেবে তার। মহাৎমাজীর কাজ মন বদলে দেয় লোকের দেখতে দেখতে। অন্য কাজে কেবল নিজের গাঁয়ের লোকের প্রশংসা পেলেই মন ভরে ওঠে। এ কাজে শুধু ঐটুকুতে তৃপ্তি হয় না। কিন্তু সে কদর পেতে হলে রামায়ণপড়া লোক হতে হয়।

তার সত্যিকারের তৃপ্তি হয়েছে পোকা-ক'টাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে।

সত্যই ঢোঁড়াই নিজেকে বুঝতে পারে না। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে, খুঁজে পায় না নিজেকে। দিনকয়েক আগে যেদিন পাক্কীর ধারের অশথগাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছিল সেইদিনের কথা। অত মেহনত, অত হৈ চৈ, কিন্তু তার মধ্যে কেবল একটা কথাই তার মনে আছে। অনেকদিনের পর সেদিন মোসম্মতকে দেখেছিল সেখানে, গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে। মোসম্মত তাকে একপাশে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল—'তুই নিজে অশথগাছ কাটার মধ্যে থাকিস না ঢোঁড়াই। ওতে অমঙ্গল হয়।'

১ পরাজয় স্বীকার করা।

কী ভাল যে লেগেছিল তার এই কথাটা? মহাৎমাজীর কাজের চাইতেও ভাল। কিছুক্ষণের জন্য মহাৎমাজীর কাজ তার চোখের সম্মুখ থেকে মুছে গিয়েছিল সেদিন। মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছে কথা ক'টা। বড়কামাঝির কথা কানে আসছে।···মাস্টারসাহেব কলেস্টর হবে। লাডলীবাবু অংরেজের হাকিম হতে গিয়েছিল, এখন লে সুথনি[১]। ঢোঁড়াই তুই চেষ্টা করিস দারোগা হতে। 'তিতলি'র হাকিম তো মহাৎমাজীর রাজ্যে থাকবেই না।···

ঢোঁড়াইয়ের আজাদ দস্তায় প্রবেশ

যেদিন বড় দারোগাসাহেবকে সঙ্গে করে গোরারা আসে বিসকান্ধায়, সেদিন সকালেই ঢোঁড়াই পালিয়ে এসেছিল কুশী পার হয়ে এই 'আজাদ দস্তা'য়[২]। লচুয়া চৌকিদার খবর দিয়ে দিয়েছিল যে, তাকে ধরবার জন্যই টমিরা আসছে।

ভিনদেশের রঙবেরঙের পাখি লালমুখো কাকতাড়ুয়া দেখে দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছিল। সাঁঝ পড়াতে একগাছে রাত কাটাচ্ছে। তার নাম 'আজাদ দস্তা।' বুলিমুখস্থ তোতা আছে, নাচনদার ফিঙে আছে, পাঁকে পাখি কাদা খোঁচা আছে, সবজান্তা ভুশণ্ডী কাক আছে। ইস্কুলের ছেলেই বেশি। নাম জিজ্ঞাসা করলে নামের শেষে 'আজাদ' কথাটা যোগ করে দেয়।

ভালমন্দ যেমন লোক চাও সব পাবে এখানে। কাজের লোক কি আর নেই? বলন্টিয়রজী আছে, ভোপতলাল আছে, মিলিটারি-ফেরত সর্দারজী আছে; মাস্টারসাহেবের ডান হাত বিস্থন শুকুলা আছে। বিস্থন শুকুলাকে ঘিরেই দলটা দানা বেঁধেছে।

পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য দলের যোগ্য লোকেরা নতুন নাম পায়। ভোপতলালের নাম হয়েছে গান্ধী, বিস্থন শুকুলাল নাম জওয়াহর, বলন্টিয়রজীর নাম প্যাটেল, বাচিতর সিংয়ের নাম আজাদ, মিলিটারি-ফেরত লোকটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সর্দার'। এই নাম পাওয়ার চাইতে বড় সম্মান দলের মধ্যে আর কিছু নেই। এ নিয়ে ঈর্ষা দ্বন্দ্বেরও অন্ত নেই।

এ দিকটা বন্যার দেশ। তের মাইলের মধ্যে হাওয়াগাড়ির রাস্তা নেই; টমিরা আসতে পারবে না। তাই সবাই নিশ্চিন্দি হয়ে কী কী ভুল করে ফেলেছে, তারই বিরামহীন গল্প করবার ফুরসত পেয়েছে।

১ খা কলা পোড়া। সুথনি এক রকম কন্দের নাম।

২ 'আজাদ-দস্তা'র শব্দগত অর্থ স্বাধীন-দল।

ঢোঁড়াই যেতেই বলন্টিয়রজী সকলকে বলে দেয় যে, এ আমাদের চেনা লোক। 'খুফিয়া'[১] নয়।

'বাবুসাহেব আর ইনসান আলির পাখিমারা বন্দুক দুটো যদি নিয়ে নিতিস রে ঢোঁড়াই।'

'বন্দুক? বন্দুক নিতে তো বলেনি বলন্টিয়রজী কখনও। আর ভোপতলালজী তুমি তো আমাদের ওদিকে যাওইনি।'

সকলে একসঙ্গে হাঁ-হাঁ করে ওঠে। সকলের মুখ দেখে ঢোঁড়াই বোঝে যে, সে কোথায় যেন একটা দোষ করে ফেলেছে। সে ভেবে পায় না, কী আবার বলল সে? বলন্টিয়রজী বলে দেয় যে, এখানে বলন্টিয়রজী আর ভোপতলালজী বলে ডাকা বারণ, তবে জওয়াহরকে বিস্নন শুক্লা বলে ডাকতেও পার। সবে নতুন এসেছে সে। সেইজন্য তার অজ্ঞতা সেবারকার মতো দলের লোকে মাফ করে দেয়।

'গান্ধী' হেসেই খুন। 'পাখিমারা বন্দুকের কথায় আকাশ থেকে পড়িস; তোরা আবার অংরেজের সঙ্গে লড়বি।'

কোনা থেকে গর্জে ওটে 'প্যাটেল'। 'ডিং হাঁকিস না[২] গান্ধী। এই আমাদের সকলের সম্মুখে বলে রাখলাম, গান্ধী যদি পাখিমারা বন্দুকেও টোটা ভরতে পারে তবে আমার নামে কুকুর পুষবেন। ফৌজের কাছ থেকে নেওয়া তিন-তিনটে রাইফেল পড়ে রয়েছে। কাউকে তো একদিনও চালাতে দেখলাম না।'

'চালাবে কি টোটা খরচ করবার জন্য? আমাদের ইস্কুলের পণ্ডিতজী বলতেন 'বৃহৎ দন্তা হি ক্বচিৎ মূর্খাঃ।' প্যাটেলটা সেই 'ক্বচিৎ'-এর মধ্যে পড়ে গিয়েছে।'

প্যাটেলের সম্মুখের দাঁতকয়টি বড়। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। একবছর ভাগলপুর কলেজে গান্ধী পড়েছিল বলে সংস্কৃততে অপমান করবে!

দুজনে হাতাহাতি হবার উপক্রম। জওয়াহর তাদের দুজনের মধ্যে পড়ে ব্যাপারটাকে আর বেশি দূর গড়াতে দেন না।

কে একজন পিছন থেকে বলে, জওয়াহর সব ব্যাপারে গান্ধীর দিক টেনে কথা বলেন। আজাদ দস্তায় এসব চলবে না।

আবার একটা চেঁচামেচি আরম্ভ হয়।

একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় ঢোঁড়াই সমস্ত দেখে।

১ গুপ্তচর।

২ বড় বড় কথা বলিস না।

সেই রাতেই ঢোঁড়াইয়ের পাহারা দেওয়ার ডিউটি পড়ে সম্মুখের মাঠে। দুজন দুজন করে একসঙ্গে ডিউটি দেয়। তার সঙ্গের লোকটিকে ঢোঁড়াই দেখেই চিনতে পারে, গঞ্জের বাজারের দাগী আসামী বিশুনি কেওট। এইটাই থানা জ্বালানোর দিন দারোগাসাহেবের চালাকি ধরে ফেলেছিল।

সে গল্প জমায় ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে। দুনিয়ার বহু খবর রাখে লোকটা।

…তোর মাগ ছেলে নেই ঘরে, তবে এই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? পোকার ঘর পোড়ানোর সাজা আর কতদিন হবে: দুধে দম্বল দিয়ে জেলে যাবি, আর ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে সেই দই খাবি।…বিস্থন শুকলাকে এরা দলের পাণ্ডা করেছে কেন জানিস? এখন কাজের মধ্যে তো চাঁদা তোলা কেবল। বিস্থন শুকলা মাস্টারসাহেবের চেলা কিনা, তবু লোকে ভাববে যে টাকাটা মহাৎমাজীর কাজেই লাগবে। দেখলি না ঐ জন্যই তো দল থেকে নিয়ম করে দিয়েছে যে, ওকে বিস্থন শুকলাও বলতে পার, জওয়াহরও বলতে পার। ঐ পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে আর কাউকে আসল নাম ধরে ডাকো তো! তাহলেই কালকে খাওয়া বন্ধ! পাঁচজনে আবার যাওয়া হল ভুখনাহার বাঙ্গেসোয়ার যাদবের বাড়ি শোবার জন্য। সে নাকি বিশ্বাসী লোক। আরে বুঝি সব। খুব দুধ দই চালাচ্ছে সেখানে রোজ রাতে। দেখলি না কত কটা করে ভাত খেল এখানে। তোরাও মহাৎমাজীর কাজ করেছিস, আমরাও মহাৎমাজীর কাজ করেছি। তবু দুধ দইটার বেলায় শুধু তোরাই থাকবি কেন? নিজেরা গান্ধী জওয়াহর সব ভাল ভাল নাম নিয়ে নিল। ওরে আমার ভাল নাম লেনে-ওয়ালারে! জেলের মধ্যে কত কাণ্ডই দেখেছি এই সব মহাৎমাজীর চেলাদের!…বিস্থন শুকলা করমজাহা ইউনিয়ন বোর্ড পুড়িয়েছে কেন জানিস তো? টাকা খেয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের। তাই হিসাবের খাতাপত্তরগুলো নষ্ট করে দিল। এই আজাদ দস্তার নামে নেওয়া চাঁদার টাকাও খাবে এই দশভূতে মিলে। এ আমি বলে রেখে দিলাম দেখে নিস। চাঁদা আর বলিস না ওকে।…

নিজের তর্জনীটি বেঁকিয়ে বন্দুকের ঘোড়া টিপবার মুদ্রা দেখায়।…এই এরই ভয়ে। নইলে কেউ উপুড়হস্ত করত?…দ্যাখ না, আর কয়েক দিন। রেলগাড়ি আবার চলতে আরম্ভ হয়েছে। এই টাকার থলে নিয়ে নিয়ে সব বেরুবে কাজের নাম করে।

আসল রাজনীতির এই প্রথম পাঠ নিতে নিতে ঢোঁড়াই হাই তোলে। বিশুনি কেওট বলে, 'খুব থকে আছিস, না ঢোঁড়াই? কাল সারাদিন

সারারাত হেঁটেছিস।...গান্ধীটা সুশীলা'র[১] দলের কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সুশীলা আর কামিনী দুই সতীন জানিস তো একজন যদি বলে পুবে যাবার কথা, আর একজন বলবে পচ্ছিমে। কত বলে দেখেছি এসব জেলে। একদল যদি বলে মাংস খাব, আর একদল বলবে আণ্ডা খাব।... বুঝলি ঢোঁড়াই, টাকার দরকার সব কাজে। নইলে সব বসে যাবে, মাঝপথে বলদ বসবার মতো।... দে দেখি একটু খয়নি ; চোখের পাতাটা ভারি হয়ে আসছে। এই ! এই ঢোঁড়াই ! ঘুমিয়েছে শ্বশুরটা।...

পরদিন সকালে খোঁজ পড়লে দেখা যায় কার্তুজগুলির একটিও নেই। বিশুনি কেওটেরও কোনো পাত্তা নেই। বন্দুকগুলোর মধ্যে একটা মাত্র গিয়েছে। মহাৎমাজীর কাজের সে ক্ষতি করতে চায় না। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা জিনিসও নেয়নি।

রামরাজ্য স্থাপনের কাজে অবহেলা করবার কলঙ্ক প্রথম দিনই ঢোঁড়াইয়ের উপর পড়ে। দুদিন খাওয়া বন্ধর সাজা সে মাথা পেতে নেয়।

স্বর্গের সোপানের সন্ধান লাভ

ঢোঁড়াইয়ের সবচেয়ে ভাল লাগে সর্দারকে! কনৌজী ব্রাহ্মণ। ভারি ঠাণ্ডা স্বভাব। পুজো করে, রামায়ণ পড়ে। সকালবেলায় দু-ঘণ্টা করে ড্রিল করায়। তারপর সারাদিন ছুটি। ছোট ছোট দলে কোথাও তাস, কোথাও দশ-পঁচিশ খেলা। প্যাটেল, গান্ধী আর জওয়াহর সফরে বাইরেই বেশি থাকেন। কে কোথায়, কেন যাচ্ছে, সেসব খবর ঢোঁড়াই রাখে না। সে খুশি যে, সর্দার বলেছে তাকে এক বছরের মধ্যে রামায়ণ পড়া শিখিয়ে দেবে। মুখস্থ তোমার যখন আছেই ঢোঁড়াইজী, তখন হয়তো এক বছরও লাগবে না। এখন এতদিন সময় পেলে হয়।

ঢোঁড়াইয়েরও সেই ভাবনা। এরই মধ্যে একদিন জওয়াহর তাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলেছিলেন যে, ঢোঁড়াইকে তাঁর ভারি পছন্দ। সে যদি রাজী থাকে, তাহলে তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারেন, নিজে হাতে তাকে কাজ শিখোনোর জন্য। তাহলে তিনি ঢোঁড়াইকে দল থেকে একটা নাম দেওয়ানোরও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। 'ইস্কুলিয়া'দের[২]

১ জিরানিয়া জেলার গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা সোস্যালিষ্ট ও কমুনিষ্ট দলকে সুশীলা ও কামিনী বলে বিদ্রূপ করে।

২ ইস্কুল কলেজের ছাত্র।

াধ্যে কেউ হলে এ-প্রস্তাবে হাতে চাঁদ পেত। কিন্তু ঢোঁড়াই রাজী হয়নি। র্ণপরিচয়ের অক্ষর তো নয়, রামায়ণের স্বর্গে উঠবার এক-একটা সিঁড়ি। সেই পিছল সিঁড়িতে হাত ধরে টেনে তুলছে তার মতো অযোগ্য লোককে সর্দার।

দলের প্রত্যেকেই জওয়াহরের সান্নিধ্য চায়। তাই তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, ঢোঁড়াই তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। সেই দিন থেকে তিনি ঢোঁড়াইয়ের পিছনে লেগেছিলেন। কোথাও দূরে চিঠি পাঠাতে হলে ঢোঁড়াইয়ের উপরই সেই ডিউটি পড়ত। এটা দলের সবাই লক্ষ্য করেছিল। তবে সুবিধার মধ্যে জওয়াহর বাইরেই থাকতেন বেশি। সেই সময়টার জন্যই ঢোঁড়াই অপেক্ষা করে থাকত। মিলিটারি ড্রিল করালে কী হবে, সর্দার ভাব প্রবণ লোক। সে ঢোঁড়াইয়ের দরদী মনের মধ্যে এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছিল, যা সে দলের আর কারও মধ্যে পায়নি।

ঢোঁড়াই গান্ধীকে ব্যাপারটা বলেছিল। সে বলে, 'খুব ভাল করেছিস, জওয়াহরের সঙ্গে না গিয়ে। ও তোকে কাপড় কাচানো আর বিছানা বওয়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। 'ইস্কুলিয়া'রা সে কাজ করবে না বলে তাদের বলেছি। কাজ শেখাত না ছাই। 'সব বেলনায় বেলা আছে আমার।' জানি তো ওকে আমি।'

ঢোঁড়াইয়ের আর তর সয় না। 'গান্ধী, তোমরা তো প্রায়ই পাটনা-ভাগলপুর-মুঙ্গের যাও। আমার জন্য একখানা রামায়ণ কিনে এনো।'

সর্দার বলে, 'হবে, হবে। ঠাকুরদা মরবে তবে তো বলদ ভাগ হবে? এত হড়বড় কিসের?'

'বুঝলে না, সর্দার হবে তো ঠিকই। তবে কিনা আগে থেকে কেনা থাকলে…'

তার মনে হয় যে, এখনই যদি কেনা না হয়, তাহলে আর কখনও কেনা হয়ে উঠবে না।

'আমার রামায়ণখান দিয়ে চলবে না?'—সর্দার হেসে ঢোঁড়াইকে জড়িয়ে ধরে। 'গান্ধী, কাল তো জামালপুর যাচ্ছ তুমি। নিয়ে এসো একখান রামচরিত-মানস কিনে ঢোঁড়াইজীর জন্য।'

'মনে থাকলে আনব।'

সে রাতে ঢোঁড়াই ঘুমোয় না। ধন্য রামচন্দ্রজী, যিনি তাকে এই পথে নিয়ে এসেছিলেন। চিরকাল তিনি তার উপর সদয়। আগে থেকে তাঁর ইচ্ছেটা, বোঝা যায় না, তাই লোকে ভুল করে। রামায়ণখান হবে তার একেবারে নিজের। ঠিক নিজের জমির মতো, নিজের ছেলের মতো।…

দূর ভুখনাহাদিয়ারায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে, ঠিক তারার মতো দেখাচ্ছে। চরার ক্যায়া-গোলাপের জঙ্গলের মধ্যে তিতিরপাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। খয়ের আর বাবলা গাছগুলোর নিচের জলের ভাপসা পচা গন্ধটাও মিষ্টি লাগছে। কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, কোনো সমাজের চাপ নেই এখানে। বামুনসর্দার এখানে তার সঙ্গে বসে ভাত খায়। সম্মুখে মহাৎমাজীর রামরাজ্য স্থাপনা করবার কাজ নিশ্চয়ই আছে। কী, তা সে জানে না। 'ইস্কুলিয়া'রাও জানে না। দলের মাথাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'হবে, হবে। অরে ক'দিন সবুর কর না।' তা নিয়ে ঢোঁড়াইয়ের বিশেষ দুশ্চিন্তাও নেই। তার উপর যা হুকুম হবে, সে তাই করবে।···ততদিন তার রামায়ণ এসে যাবে। তার বটুয়ার মধ্যে সাগিয়ার ছেলের মালাটা ছাড়া এক টাকা তিন আনা আছে। শেষ রাত্রে যখন গান্ধী রওনা হবে, তখন তাকে এগিয়ে দেওয়ার ছুতো করে, খানিকটা পথ তার সঙ্গে যাবে সে। তারপর চুপিচুপি এই এক টাকা তিন আনা তাকে দেবে; রামায়ণের দাম। মহাৎমাজীর পয়সায় কেনা রামায়ণ নিলে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে না?

যেদিন গান্ধী ফিরে এল জামালপুর থেকে, সেদিন দলের কারও মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। রাতে চৌকিদার এসে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে, জওয়াহর পুলিশের কাছে 'সারেণ্ডার' করেছেন। তাঁর বাবাকে জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল; তাই আর তিনি থাকতে পারেননি।

গান্ধী বলে, 'বন্দুক-পিস্তল আসতে আরম্ভ করেছে দেখে ঘাবড়েছে! 'ঘরে থুতু ফেলা বারণ', এই প্রচারের কাজ যদি আজাদ দস্তা করত, তাহলে জওয়াহর থাকত এখানে। হারামী!'

প্যাটেল বলে, 'ছুতো খুঁজছিল পালাবার। কায়ের।'[১]

আজাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জওয়াহর একটা পুলিশের 'খুফিয়া'[২]। আবার দলের সকলকে না ধরিয়ে দেয়। গোরু একবার যখন উখ্‌লিতে মুখ দিয়েছে, তখন কি আর কিছু না খেয়ে ছাড়বে?

এই আবহাওয়ার মধ্যেও ঢোঁড়াইয়ের মন পড়ে রয়েছে গান্ধীর ঝোলাটার উপর। অনেকক্ষণ উশখুশ করবার পর সে আর থাকতে পারে না। গান্ধীর গা ঘেঁষে গিয়ে বসে, যদি তাকে দেখে রামায়ণের কথাটা মনে পড়ে। সর্দার গান্ধীর ঝোলাটা খুলে লাল রঙের পকেট রামায়ণখান বার করে দেয় ঢোঁড়াইয়ের হাতে। কী ঠাণ্ডা রামায়ণখান। ঢোঁড়াইয়ের হাতে কাঁপুনি

১ কাপুরুষ।

২ গুপ্তচর।

ধরে গিয়েছে। গান্ধী যে তার দিকে কটমট করে তাকাল, সেদিকে তার খেয়ালও নেই।

ক্রান্তিদলে ঢোঁড়াইয়ের নূতন নামকরণ

'আজাদ দস্তা'র নাম 'ক্রান্তিদল' হয়ে গিয়েছে। না হলে ভাগলপুর মুঙ্গের জেলার দলগুলোর সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল না। জামালপুর থেকে পিস্তল আর কার্তুজ তৈরির সরঞ্জাম এসেছে, মুঙ্গের থেকে মিস্ত্রি এসেছে। মাচার উপর পাটনা থেকে আনা ইস্তাহারগুলো 'ইস্কুলিয়া'রা দিনরাত বসে বসে নকল করছে। প্যাটেল 'মন্ত্রী' হয়েছে এখানকার ক্রান্তিদলের। কাছাকাছি বাবলা গাছের গুঁড়িগুলো পিস্তল ছোঁড়া অভ্যাস করবার ঠেলায় মৌমাছির চাকের মতো দেখতে হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলো জায়গায় দলের কেন্দ্র হয়েছে। নিত্যি নূতন নূতন 'ইস্কুলিয়া' আসছে দলে ভর্তি হতে। কত বা চলে যাচ্ছে নেপালে।

সব চেয়ে বড় কথা, ঢোঁড়াই নতুন নাম পেয়েছে। তার নাম হয়েছে 'রামায়ণজী'। সর্দারই প্রস্তাব করে। গান্ধীর এ নামে আপত্তি ছিল। সে বলেছিল যে এখনও অনেক লীডারের ভাল ভাল নাম বাকি রয়েছে। ক্রান্তিদলে আবার রামায়ণ-টামায়ণ আনা কেন? কিন্তু তার কথা টেকেনি।

এখন আর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই কারও। কাজের আর কথার অন্ত নেই। গল্পের মধ্যে যেমন লোকে অজানতে চলে যায় এক কথা থেকে অন্য কথায়, তেমনি এরা যায় এক কাজ থেকে অন্য কাজে।

ছোট বড় কাউকে ছেড়ে কথা বলা হয় না প্রাত্যহিক 'মিটিনে' মন্ত্রীকে পর্যন্ত না। •

সেদিন 'মিটিনে' প্যাটেলের দল গান্ধীর দলকে হারিয়ে দিয়েছিল হাফপ্যান্ট কাচবার ব্যাপার নিয়ে। আজকাল সকলের উর্দি হয়েছে খাকির হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট। প্যাটেল বলেছিল খাকির হাফপ্যান্ট আবার কাচানো! ও কি ময়লা হয়! নেহাত দরকার পড়লে, মাসে একবার কাচলেই যথেষ্ট। গান্ধীর দল বলেছিল এত বড় একটা ব্যাপারে দল থেকে নির্দেশ দেওয়া ঠিক হবে না। আজাদ গান্ধীকে সমর্থন করেছিল—কাপড়কাচা সাবানের খরচ কমানোর আগে, পান-জর্দার খরচ কমানোর দরকার।

ভোটে হেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীর দলের একটি ছোকরা চেঁচিয়ে বলে, পানের খরচ যার চোখে বেঁধে, নিজের হাতের ঘড়িটা কি তার নজরে পড়ে

না? আবার মিটিনে নতুন করে সাড়া পড়ে যায়। দলের পিরখিলাল পুলিশের কাছে যাতায়াত করত। তাই সেটাকে দিনকয়েক আগে খতম করে দেওয়া হয়েছিল। কুশীতে ফেরবার আগে আজাদ লাশটার হাত থেকে রিস্টওয়াচটা খুলে নেয়।

'কেড়ে নেওয়া হোক ওর নামটা।'

এই নিয়ে বাদানুবাদ যখন বেশ জমে এসেছে, আজাদ উঠে দাঁড়ায়। নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত দিয়ে পড়্‌পড়্‌ করে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলে। অনাবৃত বুকটায় একটা চাপড় মেরে বলে, 'বুক চিরে যদি দেখান যেত তাহলে দেখাতাম আমার মনের মধ্যে কী ছিল···'

প্যাটেলের মুখের কাঠিন্য নরম হয়ে এসেছে। 'দেখি দেখি আজাদ, বুকের সেই চিতি সাপ লাগবার জায়গাটা। ঘা হয়নি তো দেখছি।···

সঙ্গে সঙ্গে সকলের নজর গিয়ে পড়ে সেই দিকে। দিনতিনেক আগে হামিদপুরে আজাদ যেখানে শুয়েছিল, মিলিটারি ঘেরাও করে সেই পাড়াটা। একখানা পুরনো চালা মাটিতে নামানো ছিল। আজাদ তারই নিচে উপুড় হয়ে সারারাত কাটিয়েছিল। সকালে সে নাকি দেখে যে, একটা চিতি সাপ চেপটে মরে রয়েছে তার বুকের নিচে।

কে যেন বলে, 'খানিকটা আমের আঠা লাগিয়ে নিলি না কেন বুকে?'

আমের আঠার কথাটা ওঠায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে বিসকান্ধার লোকে খবর দিয়ে গিয়েছে যে, ঠিকেদার দু-একদিনের মধ্যে আম চালান দেওয়া আরম্ভ করবে। তোমরা বাগানে বসে ঝুড়ি বুনছে।

কলার খাবে রে, আসামের ফৌজে! চল চল। এখনই!

ঘোড়ায় চড়ে উদিপরা ক্রান্তিদল চলে।

বাগানে পৌঁছুতেই ঠিকেদার বলে, এখন হাতে পয়সা নেই। আর দিনকয়েক পরে আমটা বেচেই আমি হুজুরদের খুশী করব। আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।

তার গলার টুঁটি চেপে ধরে আজাদ। 'শালা, পিটিয়ে তোর শরীর ঢিলে করে দেব। খুশী যা করবে সে আমরা জানি। আমটা পাড়বার পরও তোমরা বসে থাকবে কিনা এখানে।'

কোয়েরীটোলার আর সাঁওতালটোলায় যে ছেলেকয়টি বাগান পাহারা দেবার কাজ নিয়েছে তাদের গাছে চড়িয়ে সব আম পাড়ানো হয়।

'বিলিয়ে দিও তোমাদের টোলায়।'

ঠিকেদার আর চুপ করে থাকতে পারে না, 'হুজুররা আমার দোষ দেখছেন,

আমি পশ্চিমের লোক বলে। এই গাঁয়ের গিধর মড়র যে 'কৌমী মোর্চার'[1] চাঁদা মাফ করিয়ে দেবে বলে, টোলা থেকে এত টাকা নিল তাকে তো কিছু বলেন না?'

'গিধর মণ্ডল?'

যারা আম পাড়ছিল তারা বলে কথাটা মিথ্যে নয়।

'তবে আমাদের খবর দিসনি কেন?'

'ওতো 'বার'[2] বসায়নি আমাদের উপর। যেটা বসেছিল সেটাকে মাপ করিয়ে দিয়েছে।'

তাকে মুখ ভেংচে ওঠে গান্ধী। 'আহাম্মক কোথাকার! মাপ করিয়ে দিয়েছে! এই, তোদের বলে রাখলাম, আম বিলি করবার সময় সবাইকে আম দিবি, একে খবদ্দার দিস না! মাপ করিয়ে দিয়েছে!…'

গিধর মণ্ডলের এই কাণ্ড! সকলের নাকের উপর!

আর এখানে সময় নষ্ট করা যায় না।

গিধরের বাড়ি যেতে যেতে মাঝপথে প্যাটেলের মনে পড়ে, যে হরিজনগুলো ঝুড়ি বুনছিল, তাদের আম দেওয়ার কথা তো ঐ গাছের ছোঁড়াদের বলা হয়নি। আবার ফিরে গিয়ে কথাটা বলে আসা হয়।

গিধর মণ্ডলের দেখা পাওয়া যায় না বাড়িতে। আঙুল থেকে বার করা রক্ত দিয়ে একখানা কাগজে কী যেন লেখে গান্ধী। তারপর সেখানাকে আমের আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয় গিধরের বারান্দায়।

টোলার লোকেরা বলে ইনসান আলি আড়গড়িয়াকে বলেই গিধর 'বার' মাফ করিয়েছিল। সে আজকাল সদরে থাকে কিনা। জিরানিয়া স্টেশনের কাছে ওর বেয়াইয়ের সঙ্গে মিলে বড় ঠিকেদারি কারবার খুলেছে, সব হাকিমের সঙ্গে তার দোস্তি।

সকলের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। হাতের কাছে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না!

প্যাটেল গর্জে ওঠে, 'এখানে থাকে না কেন ইনসান আলি?'

'হুজুর, আপনাদের ভয়ে।'

যাক্! তবু মনটা একটু ঠাণ্ডা হয়।

রাজপুতটোলাতেও সাড়া পড়ে গিয়েছে। 'কেরান্তি! কেরান্তি!'[3] বাবুসাহেব লোটা নিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করছিলেন। ধরা পড়ে যান।

---

১ ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্ট।　　২ ওয়ার লোন।

৩ সাধারণ লোকে ক্রান্তিদলকে কেরান্তি বলত।

'আসুন। পায়ের ধুলো পড়ল আপনাদের সকলের অনেকদিনের পর।'

গান্ধী কোমরের ভিতর থেকে একটা কালো রঙের রিভলবার বার করে খাটিয়ার উপর রাখে। ভাবে দেখাতে চায় যে কোমরের বেল্টটা আলগা করে দিয়ে একটু আরাম করে নিচ্ছে মাত্র। তারপর ফরমাশ করে, 'কাউকে ক'টা দাঁতন দিতে বলবেন তো। ছ'টা নিমের, চারটে বাবলার।'

এর ইঙ্গিত বাবুসাহেব বোঝেন। 'ও অনোখীবাবু, এঁরা সকাল থেকে কিছু খাননি, কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন আগে। ও আজাদ, আপনি তো ঘরের ছেলে। রান্নাঘরে ঠাকুরকে বলে আসুন না গোলমরিচ দিয়ে যেন রাঁধে; প্যাটেল আবার লঙ্কা খান না।'

ক্রান্তিদলের সবাই হেসেই খুন। কোন যুগের দুনিয়ায় আছে এই বুড়োটা? সেই লঙ্কা না খাওয়া বলন্টিয়রের জীবন কি আর ক্রান্তিদলেও চলে নাকি!

বাবুসাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকান সকলের মুখের দিকে। কিছুই তাল পাওয়া যায় না এদের কথাবার্তার।...তাঁকে খাটিয়া থেকে উঠতে দেবে না, তার কারণটা তিনি বুঝতে পারেন...একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে না, সেটার কারণও বোঝা যায়; তাঁদের পুরো বিশ্বাস পায় না, তাই দুজন পাহারায় থাকে। কিন্তু এদের হাসি, এদের রাগ, এদের চাউনি, এদের কথাবার্তা সব বদলে গিয়েছে। দলের প্রায় বেশির ভাগ লোকই তাঁদের আগেকার জানা! তারা কী করে এই কদিনে বদলে গেল। কোয়েরীটোলার ঢোঁড়াইয়ের পায়ে জুতো উঠেছে, শু জুতো। লোটা নিয়ে ময়দানে যাবে তাও পায়ের জুতো খুলবে না।...জাতের লোক বাচিতর সিং, গাঁয়ের লোক ঢোঁড়াই, কত পরিচিত বলন্টিয়র, ভোপতলাল! এখন এদের সমুখে আসতে ভয় করে।...

পান জর্দা খাওয়ার সময় প্যাটেল কাজের কথা পাড়ে। 'আর সিংজী, আপনি তো লাল হয়ে গেলেন যুদ্ধের বাজারে।'

'কী যে বলেন আপনারা।'...উদ্‌বেগে বাবুসাহেব মাড়ি দিয়ে জিবটা একবার চিবিয়ে নেন। এ কী জুলুম! এই তো কালই নিয়ে গিয়েছে তিনশ টাকা। আবার সরকারী হাকিমও এসে নিয়ে গেল চারশ টাকা, কিসের যেন চাঁদা বলে, গত রবিবারে। দুদিক থেকে জুলুম 'পাবলিসের' উপর!...

'দেখুন প্যাটেলজী, আমি কি আর আপনাদের 'বাইরে' নাকি? কালই তো বিশুনি এসে নিয়ে গিয়েছে ক্রান্তিদলের জন্য তিনশ টাকা। আপনারা বলেন তো রোজই দিতে হবে, কিন্তু...'

'কোন বিশুনি? বিশুনি কেওট? কে বলল ও ক্রান্তিদলের লোক?'

'সকলেই তো তাই জানে। উর্দি আছে, বন্দুক আছে, জুতো আছে। কাল এখান থেকে গিয়েছিল রামনেওয়াজ মুন্সির ওখানে। এখনও হয়তো সেটা ওখানে আছে।'

'তাই নাকি?' দশজোড়া চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। এখনও হয়তো ধরা যেতে পারে শয়তানটাকে। জলদি। দস্তা! এক কাতার![1]

ধুলোর ঝড় বইয়ে আপদ বিদায় হল বাবুসাহেবের বাড়ি থেকে। এখন কেবল সরকারের কানে না গেলে হল যে, ক্রান্তিদলকে তাঁর বাড়িতে খেতে দিয়েছেন আজকে। শান্তি আর নেই 'পাবলিসের'।

দৈবক্রমে বিশুনিকে রামনেওয়াজ মুন্সির বৈঠকখানাতে পাওয়া যায়। রামনেওয়াজ মুন্সির কাছ থেকেও সে তখনই দু'শ টাকা নিয়েছে।

আজাদ প্রথমেই গিয়ে তার বন্দুকটা কেড়ে নেয়। একটাও কার্তুজ পাওয়া যায় না তার কাছে! সে বলে ফুরিয়ে গিয়েছে।

নিজের বোকামিতে রামনেওয়াজ মুন্সি হাত কামড়ায়। বিনা কার্তুজের বন্দুকের ভয়েই দু'শ টাকা বার করে দিয়েছে সে।

'দস্তা। এক কাতার!'

টানতে টানতে বিশুনি কেওটকে নিয়ে যাওয়া হয় গাঁয়ের বাইরে, পামারসাহেবের নীলকুঠির দীঘির ধারে। একটা বাদামগাছে বাঁধা হয় তাকে। বিশুনি চিৎকার করে কাঁদে। আর কখনও সে এমন কসুর করবে না, মহাৎমাজীর নামে ছেড়ে দাও, অনেক জমানো টাকা আছে তার, সে দেবে ক্রান্তিদলকে, দুটো নাবালক ছেলে অনাথ হবে, তোমরাও ছেলেপিলের বাবা···

ক্রান্তিদলের লোকেরা এ-সব অনেক শুনেছে। রামায়ণজী আর থাকতে পারে না। সে প্যাটেলের হাত চেপে ধরে।

'না না, এটাকে প্রাণে মেরো না। আমার কথা রাখো।'

গান্ধী বিরক্ত হয়। 'এই জন্যই তো এসব কাজে রামায়ণজীকে আনতে বারণ করি।'

'এর কি ঠিক ছিল নাকি? আগে থেকে জানব কী করে?'

সকলেই ভাব দেখায় যে তারা রামায়ণজীর দুর্বলতায় বিরক্ত। অথচ রামায়ণজীর কথায় তাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। তারা নিজেদের ঢাকতে চায় কঠোরতার আবরণ; নইলে দলের মধ্যে 'কায়ের' (কাপুরুষ) বলে দুর্নাম হয়ে যাবে। এর চেয়ে বড় দুর্নাম দলের মধ্যে নেই, এক কেবল 'খুফিয়া'

১ দলের সকলকে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে তৈরী হবার জন্য হুকুম।

(গুপ্তচর) কথাটা ছাড়া। এরা সবাই সব সময় 'ক্রান্তিকারী' বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চায় ; যে যত নিষ্ঠুর সে তত ক্রান্তিকারী, যে যত বেপরোয়া সে তত ক্রান্তিকারী, যে যত মুখখিস্তি করতে পারে সে তত ক্রান্তিকারী, খাওয়ার সময় যে যত ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে সে তত ক্রান্তিকারী ; আরও অনেক অনেক কাজ, হাবভাব থেকে দলের সাধারণ অশিক্ষিত সদস্যরা অন্য লোকের ক্রান্তির কাছে যোগ্যতার সম্বন্ধে বিচার করে।

দশজোড়া বিদ্রূপভরা চোখ পড়েছে রামায়ণজীর দিকে। এখনও লজ্জায় মিশে গেল না রামায়ণজী। 'না না, প্যাটেল, একে অন্য কোনো সাজা দাও।' তখন বাধ্য হয়ে বিশুনির উপর লঘুদণ্ডের আদেশ দেয় প্যাটেল।

ক্ষিপ্রহস্তে আজাদ হাফপ্যান্টের পকেট থেকে আম আর নখ কাটবার ছুরিটা বার করে। মানুষের নাকের মাংস যে এত শক্ত তা ক্রান্তিদলে আসবার আগে কারও জানা ছিল না। আজাদ এ কাজে বিশেষজ্ঞ। পরিত্রাহি চিৎকার করছে বিশুনি কেওট। বলুক তাকে সকলে ভীরু। এ আর দেখা যায় না, রামায়ণজী চোখ বুঁজে ফেলে।

আবার ঘোড়ার পিঠে চড়বার সময় রামনেওয়াজ মুন্সি ছুটতে ছুটতে এসে বলে যায় যে, বিশুনির কাছ থেকে পাওয়া দু'শ টাকা যেন তাঁর চাঁদা বলে লিখে নেওয়া হয়…না, না, একেবারে রজিস্টারের সত্যিকারের লেখা নয়— তাঁরাও ছা-পোষা মানুষ…এই মনে করে রাখবেন আর-কি, আমার নামে টাকাটা, প্যাটেলজী …

বেলা পড়ে আসছে। রামায়ণজীর কর্মব্যস্ত জীবনের একদিনের প্রোগ্রাম শেষ হয়। এখনও হয়তো আর একটা নতুন কিছু মনে পড়ে যেতে পারে গান্ধীর না-হয় প্যাটেলের।…

শ্রান্ত দেহ আর মন নিয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে পর্যন্ত ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় পথের পাশেই শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঢোঁড়াইজী জানে রাতের আঁধারে, চৌকিদারের দেওয়া 'দিহাত'-এর[১] পুলিন্দাগুলো মাথায় দিয়ে সার সার যখন সকলে শুয়ে ঘুমোবার ভান করে, তখন সবাই মনের কাছে হিসাব খতিয়ে দেখে। আর সকলে অস্বীকার করুক, রামায়ণজী করবে না। সাঁইবাবলার বনে বৌকাবাওয়ার দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে যায়, তারাগুলোর নিষ্পলক চাউনিতে মনে পড়ে একজনের কথা, আকাশের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া হিমে ভিজে ওঠে ধোঁয়ার দাগে ভরা বন্দুকের নলটা পর্যন্ত, তখন কি ঘুম আসতে পারে রামায়ণজীর।…আবার কাল ভোর না হতে হতেই হয়তো কত জমা করা

১ বিহার গভর্ণমেণ্টের প্রচারপত্র।

কাজের কথা মনে পড়ে যাবে এদের। এই নিত্য নূতন 'পোরোগারেমের' মধ্যে এত একঘেয়েমিও কি থাকতে পারে।

অন্ধকার গাঁথানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সর্দার বলে ঐ শোন শোন কী বলছে। পাশের খড়ের ঘরখানার ভিতর মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

খোকন!
এতগুলো ভাত খাবে?
'কেরান্টি'তে যাবে?
ওরে হাতি দাম দে
'কেরান্টি'তে নাম দে।
ঘোড়ার লাগাম দে
'কেরান্টি'তে কাম দে।[১]

গান্ধী বলে, দেশে আর ছাগল চরাবার লোক জুটবে না রে এর পর।

তার রসিকতায় কেউ হাসে না। একজন অপরিচিতা মায়ের ক্রান্তিদলের উদ্দেশে দেওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি রামায়ণজীর মনের অবসাদ মুছে দেয়। তাদের অসাক্ষাতে বলা বলেই, কথাটার এত দাম। তাহলে হয়তো তারা মহাৎমাজীর কাজ কিছু কিছু করছে! লোকে তাহলে তাদের অনেক উঁচুতে মনে করে—ক্রান্তিদলের জাতকে। কনৌজী ব্রাহ্মণ হলে নিশ্চয় এই রকমই মনে হয়। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখলে হয় সর্দারকে।

হতাশা-কাণ্ড

সাগিয়ার পুনরাবির্ভাব

সরকার মানে ফৌজ। সেই ফৌজের বুকের পাটা বেড়েছে। আগে ফৌজদের ক্যাম্পগুলো থাকত গাঁয়ের বাইরে, অনেকদূর পর্যন্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। এখন তারা থাকে গাঁয়ের ইস্কুলের ঘরগুলোতে। বেলুচী ফৌজের দল যখন-তখন ঘোড়ায় চড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়ায়। গিধর মণ্ডল রাতে কানী মুসহরনীকে ফৌজী 'অফসরের' তাঁবুতে পাঠায়। আর দিনে তাঁকে নিয়ে নতুন খাঁ-সাহেব ইনসান আলির বাড়িতে বসে পাইকারী জরিমানার লিস্ট তয়ের করে। চৌকিদার 'দিহাত'এর পুলিন্দাগুলো আর

[১] আগে ঘুমপাড়ানী ছড়া ছিল: এতগুলো ভাত খাবে—ছাগল চরাতে যাবে?—ইত্যাদি।

ক্রান্তিদলকে দেয় না, বিক্রি করে দেয় বাবুসাহেবের বাড়ির 'কণ্ট্রোল'-এর দোকানে ঠোঙা তয়ের করবার জন্য। লাডলীবাবু আর ইনসান আলি মিলে চাল কাপড়ের আড়ত খোলে নেপালে; এখান থেকে নিয়ে যায় রাতে। বাবুসাহেবের দস্তখতে লোকে কাপড় পায়। একদিন ক্ষেতে কাজ করিয়ে নিয়ে তারপর দস্তখত দেন তিনি।

আগে রামায়ণজী শুনত কোশীজী থেকে আরম্ভ করে শিলিগুড়ি পর্যন্ত 'পাক্কী'। এখন এতদূর পাক্কী সে দেখেছে কিন্তু এর আদি অন্ত পায়নি। শুনেছে পুবে পাক্কী চলে গিয়েছে চীনের দেশে কামাখ্যামাই হয়ে। পচ্ছিমেও কোথায় যেন গিয়েছে নাম মনে আসছে না। এই রকমই হয়! রামায়ণ পড়তে শিখলেও 'দিহাত'-এর[১] পাতা পড়া যায় না। শেষ নেই কিছুর।

দলের যত লোক ধরা পড়ে, তত নতুন লোক ভর্তি হয় না। আসে মধ্যে মধ্যে দু-একটা ইস্কুলিয়া এখনও, রহস্য আর রোমাঞ্চের টানে।

দল ছোট হয়ে এলে কী হবে, দলের মধ্যের গোলমালটা দিন দিনই বাড়ছে। এটা বেশিদূর গড়িয়েছে কিছুদিন থেকে। গান্ধী গিয়েছিল জিরানিয়ায় ভাল লোহার ব্যবস্থা করতে। সেখানকার ফৌজী হাওয়াগাড়ি মেরামতের কারখানার সর্বণ মিস্ত্রির সঙ্গে পরিচয় আছে দলের। জামালপুরের লোহাটা বড় খারাপ দিচ্ছিল। সে লোহার তৈরি পিস্তলের নিশানা বড় তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ইদানীং। জিরানিয়া থেকে গান্ধী এর জন্য টাকা চেয়ে পাঠায়। প্যাটেল গঞ্জের বাজারের নৌরঙ্গীলাল গোলাদারের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গান্ধীকে টাকা পাঠায়। চাঁদাটা অবশ্য তোলা হয়েছিল সাবেক ক্রান্তিদলের ধরনে, একটু জিরিয়ে নেবার অছিলায় রিভলবার সুদ্ধ কোমরের বেল্টটা খুলে সম্মুখের খাটিয়ায় রেখে। পুরনো থিতানো মনোমালিন্য হঠাৎ নাড়া পেয়ে উপরে উঠে আসে। প্যাটেল বলে' 'বিলাকে'[২] আমার বাবাও যদি লাখ টাকা রোজগার করত তাহলে আমি তাকেও ছাড়তাম না। এই ঝগড়াটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে দলের মধ্যে। একজনের সমর্থকদের হাতে বেশি বন্দুক গেলে অন্যের সমর্থকরা ভরসা পায় না। রাতের পাহারায় দু দলের দুজনের এক এক সঙ্গে ডিউটি পড়ে।

দল থেকে ঠিক হয়েছে যে, যেসব লোক বিয়াল্লিশ সালে জেলে গিয়েছিল এখন ফিরে আসছে, তাদের দলে টানবার চেষ্টা করতে হবে। না হলে আনাড়ী রংরুটদের দিয়ে বেশি কিছু কাজ হবে না। জেলফেরতদের দলে

---

১ বিহার গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন প্রচারপত্রের নাম ছিল 'দিহাত'।

২ ব্ল্যাকমার্কেটে।

আনতে পারলে লোকের চোখে দলের সম্মানটা বাড়ে আর টাকাপয়সা-সংক্রান্ত দুর্নামটা একটু কমে। দলে যদি সে নাও আসতে চায়, বাইরে থেকেও তো সাহায্য করতে পারে। সরকার একবার যখন ছেড়েছে তখন আর চট করে ধরবে না তাদের। তাই কে কবে ছাড়া পাচ্ছে সব খবর দলের লোকের নখাগ্রে।

বিসকান্ধার বিল্টা আর বড়কামাঝি ছাড়া পেয়েছে দিনকয়েক আগে। তাই প্যাটেল রামায়ণজীর উপর ডিউটি দেয় তাদের সঙ্গে দেখা করবার।

যাওয়ার সময় হঠাৎ প্যাটেল বলে,

'না রামায়ণজী, আমি ভেবে দেখলাম যে, বড়কামাঝির সঙ্গে দেখা করে আর দরকার নেই। ওর বুদ্ধিটা বড় মোটা। চুপচাপ কোনো কাজ ওকে দিয়ে করান যাবে না। কেবল বিল্টার সঙ্গেই কথাবার্তা বলবেন। আর কিছু না করুক দলের লোকগুলোর মোকদ্দমার তদ্‌বিরটাও যদি করতে পারে ঠিক করে কাছারীতে তাহলেও অনেক কাজ হয়। তিনগুণ করে টাকা নেবে বিজন উকিল বলেছে; তারিখের আগে তাকে মনে পড়িয়ে দেওয়ার জন্যও তো একজন লোকের দরকার। আপনার দোস্ত সে, আপনি বললে শুনবে।'

'বিজন উকিলের দেবার টাকাটা আসবে কোথা থেকে?'

রামায়ণজী বিশেষ কিছু ভেবে বলেনি কথাটা। সকলে এর মানে করে নেয় উলটো দলের টাকা যোগাড় করবার ধরনের উপর ইঙ্গিত বলে ধরে নেয় সকলে এটাকে। আরও একটা প্রচ্ছন্ন মনের ভাব আছে রামায়ণজীর কথার পিছনে, নিজেকে দলের অন্য সকলের চাইতে ভাল ভাবা। এটা ক্রান্তিদলের লোকেরা বরদাস্ত করতে পারে না। এতগুলো উদগ্র স্নায়ুর বারুদে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

গান্ধী কম্বল চাপড়ে বলে, 'যেমন করে হোক জোটাতেই হবে এর টাকা আর সর্বণ মিস্ত্রির টাকা।' কে একজন বলে, 'রামায়ণগিরি ফলাতে আসো, আর নিজের ইমানদারির দিকে তাকিয়েও দেখ না?'

'মুখ সামলে কথা বলবি বলছি!' তাই ইমানদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এরা।

'এরা তাৎমাটুলির 'পঞ্চ' না, যে ঢোঁড়াইয়ের চোখ রাঙানো দেখে ভয় খেয়ে যাবে।

'সার্চ করা হোক রামায়ণজীর বটুয়া'। কেঁপে ওঠে রামায়ণজীর বুক। এতক্ষণে সে বোঝে এরা কী বলতে চায়। তার ঘুমোনোর সময় এরা বোধ হয় বটুয়াটা খুলে দেখে থাকবে।

'না, না, বিশ্বাস করো গান্ধী; সর্দার তুমি অবিশ্বাস কোরো না। এ

মাহাজানির জিনিস নয়। ভুল ভেবো না। এই রামায়ণ হাতে করে বলছি। আমার ইমানদারিটুকুতেও যদি সন্দেহ কর তাহলে আমার আর থাকল কী ?'

নানা রকম জেরা করে সকলে। তার বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষও জমানো ছিল এ লোকগুলোর। এটা তার মরা ছেলের গলার মালা, এ কথা কেউ বিশ্বাস করল কিনা কে জানে। বলেনি কেন সে এ কথা আগে নিজে থেকে। তার কথাটা বিশ্বাস করলেও হয়তো সবাই তাকে স্বার্থপর ভাবছে; দলের এত দরকারের সময়ও নিজে জিনিসটা দলকে দেয়নি বলে। প্যাটেল আর গান্ধী দুজনেই তাকে নিজের দলে টানতে চায়। যে-কোনো একটা দলে গেলে তার সমর্থন পাওয়া যেত এখন। শেষ পর্যন্ত সকলকে ঠাণ্ডা করে গান্ধী। প্যাটেল রামায়ণজীর পিঠ চাপড়ে কথাটা ভুলে যেতে বলে। দলের অন্য সকলে হাসি তামাশা আরম্ভ করে অন্য একটা বিষয় নিয়ে। এসব ভাব-আড়ির খেলা তাদের অষ্টপ্রহর। একটা জিনিস নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানো আজকাল আর তাদের ধাতস্থ হয় না। মুহূর্তে মুহূর্তে এদের মন বদলায়। আমাদের শোনাতে এসেছিল কথা, তোমাকেও শুনিয়ে দিয়েছি, দলের আর দশ জনের চাইতে তুমি এক চুলও ভাল না—এই হচ্ছে সকলের মনের ভাব।

আগুনে ঝলসানো ছোলার গাছগুলো নিয়ে ততক্ষণে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে দলের মধ্যে। একজন রামায়ণজীকেও কতকগুলো দিয়ে গেল।

মনের উপর একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে রামায়ণজী বিসকান্ধার পথে বেরোয়। যাত্রাটা প্রথমেই খারাপ হয়ে গিয়েছে আজ; বরাতে কী আছে কে জানে। বটুয়াটা বাইরে থেকে টিপে টিপে দেখে। এইটাকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল হল আজকে। অথচ যার দেওয়া, সে একটা খবরও রাখে না; সে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার মাকে দেখতে। রাখতে পেরেছে কি তার কথা ?

রামায়ণজী যখন বিসকান্ধায় পৌছুল তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ভজন শেষ হওয়ার পর বিল্টা বাড়ি ফিরলে, তখন গিয়ে চুপচাপ দেখা করবে তার সঙ্গে। ততক্ষণ এই শীতের মধ্যে কোথায় বাইরে বসে রাত কাটাবে, তার চাইতে টোলার বাইরে মোসম্মতের বাড়িতে যাওয়াই ভাল। তা ছাড়া সাগিয়ার যাওয়ার সময়ের কথাটাও রাখা হবে। আজকের আসবার আগের ঘটনাটার জন্যই বোধহয় সাগিয়ার কথাটা বার বার মনে পড়ছে।

এদিকটায় কোনো ভয় নেই। ফৌজের ক্যাম্প কুশীর ধারে, গুটিপোকার ঘরের পাশে। মাঘ মাসে জলা জমিটার জল শুকিয়েছে। মানুষসমান একরকম ঘাসের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ। দূরে বাবুসাহেবের বাড়ির দিকে, আর

কোয়েরীটোলায় গিধর মণ্ডলের বাড়ির দিকে, শীতের ধোঁয়ার মধ্য দিয়েও অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। বাকি গাঁখানা অন্ধকার।

মোসম্মতের বাড়ির মধ্যে যেন কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও বুড়ির চিরকাল আপন মনে বকা অভ্যাস। যাক, বুড়ি তাহলে ভালই আছে। উঠোনের ঝাঁপ বন্ধ ভিতর থেকে, এই সাঁঝ রাতেই। গাঁয়ে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে বলে বোধ হয়। রামায়ণজী দরজা খুলে রাখে। এই জুতো পরা আর চা খাওয়ার কথাটা লোকে ব্যবহার করে ক্রান্তিদলের বিরুদ্ধে, ডাকাতি অভিযোগের প্রমাণে। গাঁয়ের সাধারণ লোক জানে যে সৎপথে থাকলে তাদের শ্রেণীর কারও পক্ষে এই বিলাসিতা ও ব্যসনের খরচ জোটানো সম্ভব নয়। তাই জুতো পরে সাগিয়ার মায়ের সম্মুখে যেতে লজ্জা করে।

'মোসম্মত! ও মোসম্মত! বাড়ি আছ নাকি মোসম্মত!'

'কে?'

কথার স্বরটা কী রকম যেন একটা লাগে। মনটা এখনও সুস্থির হয়নি, সেই জন্য বোধ হয় এমন মনে হচ্ছে।

'মেহমান'[১]।

বোধ হয় ভরসা পাচ্ছে না বুড়ি। পাশের গোয়ালঘরে একটা গোরু ডাকছে। অনেক দিন মোসম্মতের গোয়ালঘরে কাটাতে হয়েছে তাকে। গোরুটা কি তার গলার স্বর চিনতে পারল নাকি? সে গোরুটা কি আর এতদিন বেঁচে আছে?

বেড়ার ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। গোবর লাগানো পাটকাঠির আলোটা কাছে আসছে।

'কে?'

'ঢোঁড়াই।'

'ঢোঁড়াই!'

'সাগিয়া!'

অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে ঢোঁড়াইয়ের মনে। ঝাঁপখানাকে ধরে দাঁড়াতে হয়।

'ও মা, দেখে যাও কে এসেছে। সকালে দেখি এই বেড়ার উপর একটা কাক আর একটা কাকের মুখে খাবার গুঁজে দিচ্ছে। তখনই আমি মাকে বলেছি ঘরে অতিথি আসবে। আমরা মায়ে বেটিতে ভেবে মরছিলাম যে না আছে ভাতারপুত না আছে সাতগুষ্টিতে আপনার বলতে একটা কেউ!

১ অতিথি।

ভয়ে মরি! অতিথি বলতে চোরডাকাত, না-হয় ফৌজী ক্যাম্পের সেপাই।'

এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের কথা বেরোয়। 'কবে এলে?' অনেক দূর থেকে যেন এল স্বরটা।

'এই তো কিছুদিন আগে। এসেই সব শুনেছি তোমাদের কথা মা'র কাছ থেকে। দেখি একবার 'মেহমানের' চেহারাখানা ভাল করে।'

সাগিয়া পাঠকাঠিটা তুলে ধরে ঢোঁড়াইয়ের দিকে। ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, সাগিয়া বোধ হয় আগের চেয়ে একটু প্রগল্‌ভা হয়েছে।

'একি ছাই চেহারা হয়েছে ঘুরে ঘুরে! কিছু খাও-দাও, না উপোস করেই থাক? আবার ফৌজের উর্দি চড়েছে গায়ে! ও উর্দি আজকাল পচে গিয়েছে!'

না, সাগিয়া বদলায়নি। দরদভরা বকুনিগুলো শুনেই ঢোঁড়াই বুঝতে পারে। একটু কালো হয়েছে আগের চেয়ে, আর কথাবার্তায় আত্মপ্রত্যয় অনেক বেড়েছে। বোধ হয় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌছেছে বলে, কিম্বা হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে এই কয়বছরের যাযাবরী পরিচয়ের ফলে। ঢোঁড়াই লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে যে সাগিয়ার চোখদুটো তার চোখের মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে কি না, সেই আগেকার মতো। না। প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় পেয়ে গিয়েছে সে। হয়তো তার আর জবাবের দরকার নেই। কিন্তু সেই সাগিয়া ঠিক তেমনই আছে। নইলে তার বকুনিটাকে কি কখনও আদর বলে মনে হয়?

বুড়ি এসে ঢোঁড়াইকে জড়িয়ে ধরে। আর তো আমাদের ভুলেই গিয়েছিস তুই, বড়লোক হয়ে। তবু যে মনে পড়েছে আজ, সে আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

মোসম্মতের কথায় প্রতিবাদ করে না ঢোঁড়াই। বুড়ো মানুষ! ভাল মনে বলছে। ভাগ্যে সে জুতোজোড়া বাইরে রেখে এসেছে।

কী করবে সাগিয়া ভেবে পায় না। খাটিয়াখানার উপর কম্বল বিছিয়ে দেয়, ঘটিতে জল এনে দেয় পা ধোয়ার জন্য, নারকেলতেলের শিশিটা পেড়ে নিয়ে গরম করতে বসে পাটকাঠি জেলে।[১]

'ওমা, ছাখ আমার আক্কেল! মা'র সঙ্গে গল্প করো ততক্ষণ। তেলের শিশিটা ঢোঁড়াইয়ের হাতে দিয়েই সাগিয়া ছোটে গোয়ালঘরের দিকে।

'মিছে দৌড়ুচ্ছিস সাগিয়া। বাছুর খুলে দেওয়া হয়েছে কখন। এখন কি আর পাবি এক আঁজলাও?'

---

১ এদেশে মাথায় তেল মাখার সঙ্গে স্নানের কোনো সম্বন্ধ নেই।

মোসম্মতের কাছ থেকেই ঢোঁড়াই সব জানতে পারে। যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিল, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই ফিরে এসেছে। মাঝের জীবনের ঢোঁড়াই শুনতে চায় না। সাগিয়া ফিরে এসেছে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা। কী রকম যেন সাগিয়ার মা'টা! সব খবর সে ঢোঁড়াইকে শোনাবে। বিদেশিয়ার দলের সেই গুঁফো হারামজাদাটা, কী একটা ফৌজে কাজ পেয়েছে। জায়গায় জায়গায় গিয়ে নাকি ফৌজদের গানবাজনা শুনিয়ে বেড়াতে হবে। যেমন সরকার তার তেমনি ফৌজ! সাগিয়াকে ছেড়েই দিয়েছে না-কি? সে তারপরই চলে এসেছে। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি তাকে। সে নিজে থেকেই যা কিছু বলেছে। যেদিন আসে সেদিন শুধু বলেছিল যে, বয়স তুকুড়ি পেরোনোর পর লোকে কিছু বললে গায়ে লাগে না।

তারপর ফিসফিস করে ঢোঁড়াইয়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, টোলার লোকও নরম হয়েছে আমাদের উপর এখন। হবে না? সেই তুই যখন পালালি না, সেই সময় টমিরা কার বাড়িতে কী করেছিল সে তো সবার চোখে দেখা। রাজ্যিসুদ্ধ লোকে জানত যে টমিরা ভুট্টা-ক্ষেতে ঢোকে না। তাই গাঁয়ের মেয়েদের রাখা হয়েছিল ভুট্টাক্ষেতে। ঢোকে আবার না! যেতে দে সে সব কথা। আর গিধর কোয়েরী পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাতে যায়?···

কী বকতেই পারে বুড়িটা! এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সাগিয়া কী যেন উনুনে চড়িয়েছে। মুখের একদিকে আগুনের আলোটা পড়েছে। সে চলে যাওয়ার দিনও হাটে তার এই রূপই দেখেছিল। মাথার কাপড়টার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কাঠিন্যের মুখোশটা খসে পড়েছে। এই কাজেই তাকে মানায় ভাল। কতদিন আগের দেখা কোথাকার একটা লোকের একটু তৃপ্তির জন্য, নিজের সমস্ত একাগ্রতা নিঃশেষ করে দিয়েছে সাগিয়া। অন্য লোকের তৃপ্তির জন্য নয়; নিজের তৃপ্তির জন্য। এর বদলে সে কিছু চায় না নতুন করে।

তার জন্য রাঁধা···দুধ দোয়ানো···ন্যাতা দিয়ে নিকিয়ে তার উপর পিঁড়ি পাতা,···খাওয়ার সময় একটার পর একটা করে পাটকাঠি জ্বালানো,···তার একার জন্য···আর কারও জন্য নয়···ভাবতেও বেশ লাগে ঢোঁড়াইয়ের।

কীর্তনের মাতন কানে আসছে দূর থেকে। এইবার বোধ হয় শেষ হবে। আঙিনার বেড়ার উপর দিয়ে দেখা যায় ঘন কুয়াশার মধ্যে জোনাকিপোকা জ্বলছে মিটমিট করে···

মোসম্মত বলে, 'হাতে জল ঢেলে দে সাগিয়া।'[১]

---

১ অতিথি নিজে হাতে জল ঢেলে নিলে গৃহস্থের পক্ষে তা অসম্মানসূচক।

সাগিয়া হেসে ওঠে, 'ঢোঁড়াই আবার 'মেহমান'—তার আবার হাতে জল ঢেলে দিতে হবে!'

বলে, কিন্তু জল ঢেলে দেয় ঠিকই।

'এই যে গো সিরি পঞ্চমীর মেহমান[1], তোমার শোবার খাটিয়া।'

'আজ সিরি পঞ্চমী নাকি? আর কি আমাদের দিনক্ষণের হিসেব আছে।'

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা করে দুটো ক্রান্তিদলের কথা বলে সাগিয়ার কাছে একটু বাহাদুরি দেখাতে, আরও একটু আদর কাড়তে। সে সুবিধা সাগিয়া দেয় না। একটা ভাঙা কড়াতে করে উনুন থেকে আগুন নিয়ে আসে। নাও, হাত-পা গরম করে নাও। সিরি পঞ্চমীর ফাগ একটু কপালে দিয়ে দেয়। সদ্যমাখা নারকেলতেলের উপর ফাগটা লেপটে বসে। কম্বলের নিচে এই কাঁথাখানা দিয়ে নাও আরাম হবে।

খেরোর বালিশটার বহুদিনের সঞ্চিত নারকেল তেলের পচা গন্ধটা, খারাপ লাগে না। মনের মধ্যে এই গন্ধের পরিচয় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে;[2] ধূপকাঠি নিভাবার অনেকক্ষণ পরের ফিকে সুবাসের মতো; নিরাপত্তা আর স্নিগ্ধ আরামের আবেশ মেশানো। ঢোলক খঞ্জনীর শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। শোনা গেলে বেশ হত। বিল্টা তাহলে এবার বোধ হয় বাড়ি ফিরেছে। শীতের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার পর একবার কম্বলের মধ্যে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছা করে না।

উঠোনের দুয়ারের বাইরে একটা আলো দেখা যায়। ঢোঁড়াই উঠে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। ক্রান্তিদলের লোকের জীবনে এসব বহুবার ঘটে গিয়েছে। কারা যেন কথা বলছে বাইরে! অন্ধকারের ভিতর সাগিয়া সাগিয়ার মা কারও মুখচোখ দেখা যাচ্ছে না।

সাগিয়া কোনো কথা না বলে ঢোঁড়াইয়ের হাতটা ধরে তাকে টেনে এনে বিছানায় শোয়ায়। তারপর কম্বল আর কাঁথাটা দিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। ছি! ছি! কী ভুলই করে ফেলেছে সাগিয়া। ভিতরের থেকে দরজার ঝাঁপটা বেঁধে দিলেই খানিকটা সময় পাওয়া যেত। কে আবার এল এই রাতে। সাগিয়ার দেখাদেখি মোসম্মতও উঠোনে নামে। হাতে লণ্ঠন কেরোসিন তেল জ্বালানো বাড়ির লোক দেখছি। কে, কারা?

'কোথায় গো মোসম্মত।'

---

১ শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকে ফাগের খেলা আরম্ভ হয়।

২ নারকেল তেল কেবল শৌখিন মেয়েরা মাখে।

'কে ? গিধরের বৌ। আয় আয়। এত রাত্তিরে ? টোলার বার তো মনের বার।'

'মনের বার হলে কি আর এসেছি। আজ টোলার সিরি পঞ্চমীর ভজন আমাদের দুয়ারেই হল কিনা। তাই ভাবলাম বচ্ছরকার দিনের প্রসাদ আর ফাগ দিয়ে আসি দিদিকে। তোমার ছেলে বলল, তা দিয়ে এস না কেন। দূরও তো কম নয়। তার উপর যা দিনকাল। একা পথে চলতে দিনেই সাহস হয় না তার আবার রাতে ; ঐ মুখপোড়াগুলোর জ্বালায়। অতি কষ্টে গনৌরীর ছেলেটাকে সঙ্গে করে এসেছি।'

আজকাল পাইকারী জরিমানার ফৌজী হাকিম গিধর মণ্ডলের হাতের মধ্যে। তাই কেউই আর এখন গিধরকে চটাতে রাজী নয়। সেও এই হিড়িকে জাতের মণ্ডলের হৃত সম্ভ্রম ফিরিয়ে পাবার চেষ্টা করছে। তাই তার বাড়িতে সে সিরি পঞ্চমীর ভজনের আয়োজন করেছিল। আর সাগিয়ার কাছে গিধরের বৌ কৃতজ্ঞ। সেইজন্যই বোধহয় আজ এই প্রসাদ আর ফাগ নিয়ে এসেছে।

গিধরের বৌ আর গনৌরীর ছেলেটা অন্ধকার শোবার ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। ঢোঁড়াইকে দেখতে পাচ্ছে না তো ? এদের উঠে বসতে বলবে নাকি বারান্দায় ? আগুনের কড়াখান আনবে নাকি ?

সাগিয়া বলে, 'মা, প্রসাদ আর ফাগ নাও। শীতের মধ্যে ওরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে এমন করে ?'

'না না আমি আর বসব না। বাড়ির ছিষ্টি কাজ ফেলে এসেছি।'

গিধরের বৌকে আগিয়ে দেবার জন্য সাগিয়া আর মোসম্মত উঠোন থেকে বার হয়। দরজার বাইরে গিয়েই গিধরের বৌ বলে, 'জুতো দেখছি।'

হাতের ফুলুরিটা অতর্কিতে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে—যেমন ব্যাপারটা ঠিক ভাল করে বোঝাই যায় না, তেমনি অবস্থা হয় মোসম্মত আর সাগিয়ার। কী আক্কেল ঢোঁড়াইয়ের। এই কথাই তাহলে ওরা বাড়িতে ঢোকার আগে বলাবলি করছিল। সাগিয়া বলে, 'ও-ও-ও-মা। নিশ্চয়ই ফেলে গিয়েছে সেই বৈদটা[১]। সাদা বলদটা খাচ্ছেও না দাচ্ছেও না, দিন দিন হাড়পাঁজরা বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা বৈদ যাচ্ছিল হেঁকে। তাকেই মা ডাকল। সে বলে যে এ কিছু না। গায়ে পোকা হয়েছে তাই। একটু হলুদ খাওয়াও। কেরোসিন তেলে ছাই ভিজিয়ে তাই দিয়ে গা ডলে দাও, একদিনে সেরে যাবে। পোড়াকপালে রামজী ছাই দিয়েছেন, ছাই না-হয় জুটল ; কিন্তু আজকালকার দিনে কেরোসিন তেল জোটাই কী করে। '

---

১ গোবদ্যি।

বিদেশিয়ার দলের সঙ্গে এতকাল সাগিয়া বৃথায় কাটায়নি।

গিধরের বৌ এ কথায় ভুলল কিনা বোঝা যায় না। গনৌরীর ছেলেটা বলে, 'ফৌজী জুতো'!

'কোনো ফৌজের লোকের কাছ থেকে কিনে থাকবে বৈদটা।'

গিধরের বৌয়ের কানে কথার সুরটা একটা অযাচিত কৈফিয়তের মতো ঠেকে।

তারা দূরে চলে গেলে সাগিয়া মাকে বলে যে, এসব কথা আর ঢোঁড়াইয়ের কাছে তুলে দরকার নেই। একদিন একটু আরামে ঘুমোক।

আজকের মতো দিনে, তাদের বাড়িতে সে ঢোঁড়াইয়ের দুর্বহ জীবনকে অযথা ভারাক্রান্ত করতে চায় না।

মোসম্মত গম্ভীর হয়ে তামাক খেতে বসে। তার মনের মধ্যে কুয়াশা জমে আসে। তার মেয়ে বুঝি 'মেহমান'কে বাঁচাতে গিয়ে, আবার নতুন করে একটা কলঙ্কের টিকা নিল কপালে। এ ব্যাপার এখন থামলে হয়।

প্রসাদ খাওয়ার পর, ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে, এইবার যাওয়া উচিত বিল্টার সঙ্গে দেখা করতে। নইলে বিল্টা ঘুমিয়ে পড়বার পর গেলে অসুবিধা। তাছাড়া ক্রান্তিদলের নির্দেশ যে যার বাড়িতে খাবে তার ওখানে শুয়ো না। অনেক অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই নির্দেশ। এ কথা না মেনে কে কোথায় কবে ধরা পড়েছে সব ঢোঁড়াইয়ের জানা। তাই আর এই ঢালা আদেশকে অহেতুক মনে হয় না ঢোঁড়াইয়ের। সে একরকম জোর করেই বিছানা থেকে উঠে পড়ে। অবাক হয়ে যায় সাগিয়া।

'আমায় যেতে হবে এখনি, কাজ আছে।'

'এই রাত্তিরে!'

'রাত্তিরে না তো কী? সিঁদ কি দিনে কাটে নাকি লোকে?' হেসে ঢোঁড়াই হালকা করে দিতে চায় মনের উপরের বোঝাটাকে। তাকে যেতেই হবে।

'হ্যাঁ, তোমরা হলে কাজের মানুষ'—

ঢোঁড়াই বুঝতে চেষ্টা করে সাগিয়া কী ভেবে কথাটা বলল। ঠাট্টা করল না তো? ঠিক বোঝা যায় না। মোসম্মত দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল একটু ফাগ ছুঁইয়ে প্রণাম করে তাকে ঢোঁড়াই। বড্‌ডো ভাল লেগেছে তা আজকে মোসম্মতকে।

বুড়িও হুঁকোটা ঢোঁড়াইয়ের মাথায় ঠেকিয়ে বচ্ছরকারদিনে আশীর্বা

করে, 'রামজী করুন যেন তাদের সুমতি হয়। কেবল টাকা কামাচ্ছিস, এবারে বিয়ে-থা করে সংসারী হ।'

প্রসাদের থালা থেকে চিনিটুকু সাগিয়া একখান নেকড়ায় বেঁধে ঢোঁড়াইয়ের উর্দির পকেটে দিয়ে দেয়।

বুড়ি বলে, 'ঐ গিধর মণ্ডল বলেই চিনিটা যোগাড় করতে পেরেছিল। নইলে আজকাল কি আর পূজাপার্বণ করবার জো আছে।'

বলে সে নিজেই বোঝে যে তার কথাটা সময়োপযোগী হয়নি। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে, 'এ আসবার দরকার কী ছিল?'

…ঢোঁড়াই কতক্ষণই বা ছিল। মাত্র তিন-চার ঘণ্টা হবে। তবু সে চলে যাওয়ার পর বাড়িটা খালি খালি লাগে। শীতের রাতের ঝিঁঝির ডাকে নিঃসঙ্গতাটা আরও বেশি মনে হয়। ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে করে, আগুনের কড়াইখানা কোলের কাছে টেনে নিতে সংকোচ লাগে। আকাশ পাতাল ভেবে নিঝঝুম ঠাণ্ডা মনটাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার চেষ্টা করতে হয়। মোসম্মতের তবু তো হুঁকোটা আছে।

বাড়ির কাছেই শিয়াল ডেকে ওঠে। রাত দুপুর হয়ে গেল নাকি এরই মধ্যে? তারপর ডাকে একটা কুকুর। কুকুরের স্বরটা একটু ভাঙা ভাঙা গোছের। মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে, তার আবার কুকুর। গাঁয়ের কুকুর এতদূর এসেছে শিয়ালের পিছনে? সত্যিই ঢোঁড়াইটার কী আক্কেল! কুকুর শিয়ালেও তো জুতোটা বাইরে থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারত।… মিয়াও। মিয়াও।…মা মেয়ে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকায়। আর ভুল হয় না কারও। এতক্ষণ প্রায় বুঝেও মনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছিল।

'তখনই আমি বলেছি সাগিয়া।'

'মিয়াও!'

'কে?'

'তোর পিসেমশাই।'

ঝাঁপ ঠেলে টোলার ছেলের দল উঠোনে ঢোকে। গনৌরীর ছেলেটা ফিরে গিয়ে পাড়ায় বন্ধুদের খবর দিয়েছিল। ফৌজের লোক! ফৌজী জুতো! গাঁয়ের বাইরে করে দিলে কী হবে? জাতে তো কোয়েরী। এ কি কানী মুসহরনী পেয়েছে?

এখানে এসে দেখে যে ফৌজ ফেরার। জুতোজোড়া নেই। সকলে গনৌরীর ছেলেটাকে দোষ দেয়। জুতোজোড়া তার নিয়ে যাওয়া উচিত

ছিল। হাকিমের কাছে দাখিল করবার জন্ত। তারপর সব রাগ গিয়ে পড়ে সাগিয়ার উপর।

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে ; স্বভাব যাবে কোথায়। ফের যে-কে-সেই। ফৌজের লোক না হলে আর শানায় না আজকাল।···

সাগিয়া কোন কথা বলে না। এইসব ছোট ছোট পাড়ার ছেলেরা। তার পেটের ছেলে বেঁচে থাকলে এদের থেকে কত বড় হত আজ। এদের কাছে নিজের চরিত্রের সাফাই দিতেও ঘেন্না করে। আর ঢোঁড়াইয়ের নাম জানাজানি হলে হয়তো এখনই গিধর মণ্ডল ফৌজে খবর দিয়ে দেবে। হয়তো ঢোঁড়াই এখনও কাছাকাছিই আছে।··

'আগে একবার টোলা-ছাড়া করেছিলাম, এবার দেশছাড়া করাব। ভাবিস না যে ঐ ফৌজের বাপও তোদের বাঁচাতে পারবে।'

হাসি-টিটকারি গালির তোড়ে, আর আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মোসম্মত আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না! এই ঢোঁড়াইটাই হয়েছে তার মেয়ের কাল।

'শোন গো বাছারা।'

তারপর মোসম্মত সব কথা বলে ছেলেদের। একটা কথাও লুকোয় না। ফৌজের লোক ঘরে আনবার দুর্নামের চেয়ে ঢোঁড়াইকে ঘরে আশ্রয় দেবার দুর্নাম অনেক ভাল।

রামায়ণজী! চুপ! চুপ। আস্তে।

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এত হট্টগোল চুপি চুপি সেরে ফেলা যায় না। টোলার লোকেও তখন লাঠি নিয়ে পৌছে গিয়েছে চেঁচামেচি করতে। গনৌরীর ছেলের কাছ থেকে খবরটা জানবার পর বড়রা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করছিল।

জমাট কুয়াশা চিরে ফৌজী ক্যাম্পের হুইসল বেজে ওঠে। গুটিপোকার ঘরের দিক থেকে অনেকগুলো টর্চের আলোর ঝাঁটা দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

সিটি মেরেছে রে! পালা পালা। এই এসে পড়ল বলে।

থাকে কেবল, যারা যেতে পারে না। লচুয়া চৌকিদার, মোসম্মত, আর সাগিয়া।

···ফৌজ যেন আগে এখানেই আসে রামজী। তাহলে ঢোঁড়াইটা খানিকটা সময় পায় দূরে চলে যাবার।

রামায়ণজীর ক্ষোভ ও আশা

মাস্টারসাহেবদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। মাস্টারসাহেব বেরিয়েই ছাপা ইস্তাহার বার করেছেন। প্যাটেল পড়ে শোনাল।

'কংগ্রেসের লোক যাঁরা আজও ফেরারী আছেন, মহাত্মাজীর আদেশ অনুযায়ী, তাঁরা যেন সরকারের সম্মুখে অবিলম্বে নির্ভীক চিত্তে হাজির হয়ে যান। মহাত্মাজীর এই আদেশের পর কারও আত্মগোপন করে থাকবার অর্থ হয় না। সর্বসাধারণকেও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, এই মাসের পর কোনো ফেরারী ব্যক্তিকে, তাঁরা যেন কংগ্রেসের লোক বলে ভুল না করেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত সেই সময়ের মোকদ্দমাগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব।'...

দলের মধ্যে হট্টগোল পড়ে যায়। ছাগলের দুধ খেতে খেতে মাস্টার-সাহেবের বুদ্ধিতেও বোটকা গন্ধ হয়ে গিয়েছে; যাদের ফাঁসির সাজা হতে পারে, তাদের বলে কিনা সারেণ্ডার করতে? এর পর আর কেউ চাঁদা দেবে ক্রান্তিদলকে? ধরিয়ে দেবে। নিজেরা তো জেলের মধ্যে বসে মজা উড়িয়েছিস এতদিন! যারা প্রাণ হাতে করে কাজ করল এতদিন বাইরে থেকে, তাদের মোকদ্দমা পর্যন্ত তদ্বির করবে না!

দলের কে কী মানে করে মাস্টারসাহেবের ইস্তাহারের, তা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু দেখা যায় যে, প্যাটেল হাকিমের কাছে 'সলণ্ডর' করে দিনকয়েক পরে। আজাদ একটা কাজে নেপালে গিয়ে আর ফিরে আসে না। শুধু রিভলবার নয়, দলের দু হাজার টাকাও তার কাছে ছিল।

রামায়ণজীর দুঃখ যে, মোসম্মত আর সাগিয়াকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবরে ক্রান্তিদল 'লেজটা পর্যন্ত নাড়ায়নি'। মুখ ফুটে অবশ্য এ কথা সে বলেনি দলের লোকের কাছে। বললে তারা মিথ্যাবাদী রামায়ণজীর সঙ্গে তখনই ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিত। 'লেজটা পর্যন্ত নাড়ায়নি'! বললেই হল। কত সওয়াল কভ বহস হয়েছিল বলে! নূতন প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, কোনো কাজে কারও বাড়ি গেলে কেউ যেন জুতো খুলে না রাখে।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে রামায়ণজী বলতে চায় অন্য কথা। মেয়েদের স্বীকারোক্তি নেবার সময় তাদের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হয়েছিল বলে যে কথাটা রটেছিল, সেটাকে নিয়ে ক্রান্তিদল মাথা ঘামায়নি। একটু খোঁজও

তো নিতে পারত। নাকের সামনে যে জুলুম করছে, তাকে সাজা দেবার সাহস যদি চলে গিয়ে থাকে, আজ তবে দরকার কী এত কার্তুজ আর পিস্তল তয়ের করে। তার মনের মধ্যে দলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো জড় হয়েছে, তার সঙ্গে এটাকে সে গেঁথে রেখে দিয়েছে। সব ভাল-না-লাগাগুলো জমে জমে দানা বেঁধে বেঁধে অভিযোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে। প্রথম প্রথম যেমন দলটাকে আপন মনে হত, এখন আর তা হয় না। তা না হলে যে নিজের কাজেই নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হত।

তবু দরকার প্রাণ বাঁচানোর। তাছাড়া আর এখন কাজই বা কী? দুদিন উপরোউপরি এক জায়গায় থাকবার উপায় নেই। চৌকিদারগুলোকে পর্যন্ত দেখলে আজকাল লুকোতে হয়। মায়া বসাবার মতো কোনো জিনিস মনের কোনায় পাওয়া যায় না। কাল মাথা গুঁজবার মতো জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, এ কথা ভেবে মন খারাপ করতেও ভয় করে। রাতে কুকুরের ডাক শুনলে ধড়মড় করে উঠে বসতে হয়। বাতায় ঘুণধরা বাঁশের কুট্ কুট্ শব্দকেও ঘোড়ার খুরের শব্দ বলে ভুল হয়। রাতের আঁধারে পথ চলতে হয়। মাঠের গোরু মোষ আর অন্য জানোয়ারগুলো বর্ষাকালে শুকনো জায়গা দেখে দেখে দাঁড়ায়। তাই রাতে জলকাদার মধ্যে পথ চলবার সময় পথ ঠিক করতে হয়, কোথায় তাদের চোখ জ্বলছে তাই দেখে। রাতটা তো তবু একরকম করে কাটে, দিন আর কাটতে চায় না। ঘোড়সওয়ার ফৌজদের টহল দেওয়ার নিয়ম রাতে। কিন্তু রাতে তারা কাজে ফাঁকি মেরে ঘুমোয়, আর দিনে ঘোড়ায় চড়ে হাটে যায়, ডিউটি আর সস্তায় জিনিস কেনা একসঙ্গে সারবে বলে। তাছাড়া আছে টোলায় টোলায় সরকারের 'খুফিয়া'[১]। দিনের বেলা এদের নজর এড়িয়ে চলা শক্ত।

শক্ত করে ধরবার মতো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না মনের কাছে। এর পর কী তা কেউ জানে না। এত কথা, এত তর্ক, কিন্তু রামায়ণজীর মনে পড়ে না কেউ একদিনও রামরাজ্য স্থাপনার কথা বলেছে দলের মধ্যে।

এই প্রাণ বাঁচানোর চাইতেও দলের বেশি দরকার টাকার। এতগুলো লোকের খাওয়াপরা চালাতেই হবে। অনিশ্চিত এবং প্রায় অজ্ঞাত কোনো উদ্দেশ্যের জন্য কার্তুজ আর পিস্তল তৈরির কাজ চালিয়েই যেতে হবে। ক্রান্তিদলের মোকদ্দমায় বিজন উকিল তিনগুণ ফি নেয়। সে খরচ যেমন করে হোক জোটাতেই হবে। একজন দুজন করে এক এক গেরস্তর বাড়ি গেলে তবু খেতে পাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাতে ভয় আছে, গেরস্ত দুষ্টু

১ গুপ্তচর।

হলে। তাছাড়া নতুন লোকদের বন্দুক নিয়ে একা ছাড়তেও ভয়-ভয় করে। কত লোক যে বন্দুক নিয়ে পালিয়েছে, তার ঠিকানা নেই।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও রোজ কানাঘুষো শোনা যায়, দলের অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধে। এ কেবল বাবুসাহেবের মতো 'কিসানের' বক্রোক্তির মধ্যে দিয়ে নয়। আজকাল অভিযোগ আনে ঘোড়ায়-চড়া গরিব হাটুরে, পাটের গাড়ির গাড়োয়ান, পরিষ্কার ভাষায়; ক্রান্তিদলের লোকের বন্দুক দেখিয়ে পাঁচ টাকা দশ টাকা নেওয়ার অভিযোগ। সব বুঝেও গান্ধী বলে, ক্রান্তিদলের নাম করে কোনো বদমাশ রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে। একবার ধরতে পারলে হয় শালাকে!

রাঙাআলু তোলা ক্ষেতের মধ্যে খুঁটে খুঁটে, খুঁজে খুঁজে যখন আর একটা কড়ে আঙুলের মতো মোটা শিকড়ও পাওয়া যায় না, তখন যদি দলের দুজন নতুন লোক বলে যে দেখি কিছু মুড়ি-চিঁড়ের যোগাড় করতে পারা যায় কিনা গাঁয়ে, কে আর জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছে তাদের কাছে পয়সা আছে কিনা। কথা বাড়িয়ে লাভ কী।

এই অস্থির অনিশ্চিত জীবনে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে, ভাববার ধারা চলে অপ্রত্যাশিত খাতে, ত্রস্ত চঞ্চল চোখের চাউনিতে সকলের সন্দেহের ছায়া পড়ে। কেউ কাউকে বিশ্বাস পায় না। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বেধে ওঠে। উৎসাহের ফেনা মরে এসেছে। শক্ত অবলম্বন চায় মন। মন্থনদণ্ডের গায়ে ফেনাটা লেগে থাকলে বাঁচতে পারে। তাই রামায়ণজী দিন দিন নিজেকে বেশি করে গুটিয়ে নেয়, রামায়ণখানার মধ্যে।

দৈবানুগ্রহে এণ্টনির সাক্ষাৎ লাভ

রামায়ণের আড়ালে গিয়েও মনের অস্থিরতা কাটে না রামায়ণজীর; ওর মধ্যে ডুবে থেকেও মনে বল পায় না। স্বাদ পাওয়া যায় না কিছুতে। একটা সর্বগ্রাসী উদাসীনতার ছায় পড়েছে মনের উপর। হয়তো রামায়ণজীর মতো দলের আরও অনেকের মনের ভাব এই রকম। কে আর জানতে পারছে! আজকাল দলের লোকেরা যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না। সর্দারেরও সকাল সন্ধ্যার পুজোটা বেড়েছে।

আবার বলতে আসে যে, সাগিয়াদের গ্রেপ্তারের সময়—'লেজ নাড়ায়নি' সে কথা ভুল! দল কই, দলের লেজটুকুই তো আছে। সেইটুকুই তিড়িং-

মিড়িং করে লাফায় টিকটিকির খসা লেজের মতো; প্রাণটুকু বাঁচানোর উদ্দীপনায় লাফায়; না ভাবার লোকসানটা পুরিয়ে নেবার জন্ত লাফায়। মূল শিকড় কেটে গিয়েছে। এখন বাঁচতে হলে ছোট ছোট বিধিনিষেধ, আর বড় বড় কথার মধ্যেই বাঁচতে হবে। প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার একঘেয়েমি-টুকুকেই ভালবাসতে হবে; প্রাত্যহিক মিটিনের বিরামহীন তুচ্ছতাগুলোতে আনন্দ পেতে হবে।

নইলে হবে এই রামায়ণজীর হাল। সে সমান তালে পা ফেলে চলেছে দলের সঙ্গে; কিন্তু হোঁচট খেতে খেতে ছুটেছে একঘেয়েমি থেকে উদাসীনতার পথে, তারপর উদাসীনতা থেকে বিতৃষ্ণার দিকে। পথ ফুরিয়ে এসেছে।

তাই আজকাল মিটিনের সময়ও সে বহু দূরে বসে থাকে রামায়ণ খুলে। কেউ কিছু বলে না। দলের যে ঝাঁঝ মরেছে। সকলেই জানে যে, পড়তি পরিবার যখন আর চাল মেরামতের পয়সা জোটাতে পারে না, তখন দেওয়ালের হাতি ঘোড়ার 'রঙ্গেলি'গুলোতে[১] ভাল করে রঙ দেয়।

সেইজন্য আজকাল হয়েছে মিটিন আর মিটিন, আর মিটিন। সুযোগ আসছে, তৈরি হও, তৈরি কর, এ কথা গত আড়াই বছর ধরে প্রতি মিটিনে তারা শুনেছে।

আজকের মিটিনে মনোহর ঝা বলেই ফেলল। 'আবার কবে আসবে? আর এসেছে সুযোগ।'

গান্ধী চটে ওঠে, 'সেদিনের ছোকরা ইস্কুল পালিয়ে ক্রান্তিদলে এসেছ। শালিখের রেঁায়ার মতো গোঁফ। আজ দরকার পড়লে যে গোঁফদাড়ি গজিয়ে চেহারা বদলাতে পারবে, সেটুকুসুদ্ধ হয়ে উঠবে না তোমার দ্বারা। আর কেবল বড় বড় কথা! তুমি হচ্ছ ভাদ্রের শিয়াল, বোঝো তো? একটা শিয়াল ভাদ্র মাসে জন্মেছিল। আষাঢ় শ্রাবণ দেখেইনি। জন্মেই বলে এত বৃষ্টি তো কখনও দেখিনি। তোমার হয়েছে তাই।'...

সকলের মনের কথা বলেছে 'ইস্কুলিয়া'টা। কিন্তু কেউ তার পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে সাহস করে না। তাহলেই সে হয়ে যাবে হয় কাপুরুষ, না হয় গুপ্তচর। কেবল এই ভয়টার জন্যই কেউ কিছু বলল না তা নয়। ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্তুর বিজা সিং হওয়ার স্বপ্ন এদের বহুদিন আগেই ভেঙেছে। সকলে মনে মনে বোঝে যে, এ দানের খেলায় তারা হেরে গিয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ফিরবার পথটা পর্যন্ত বন্ধ করে এসেছে। একটা কিছু হয়তো এখনও ঘটে যেতে পারে, এই মিথ্যে সান্ত্বনাটুকুও যদি নিজের মনকে না দিতে

১ রঙিন আলপনা।

পারে, তাহলে এরা কী নিয়ে বাঁচে। সেটাও বন্ধ করে দিতে চলেছিল আজকে মনোহর ঝা, খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে। ঠিক জবাব দিয়েছে গান্ধী—।

কিন্তু আজকের 'মিটিন'টা আর এরপর জমবে না। 'ইস্কুলিয়া'দের দল এরই মধ্যে বিড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছে। এখনই নিশ্চয় তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। রামায়ণজীর রামায়ণ যেমন-কে-তেমন সম্মুখে খোলা পড়ে রয়েছে। অন্যমনস্কভাবে একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে সে দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সম্মুখে, কিন্তু দেখছে না; মন উড়ে গিয়েছে কোথায়।

নতুন একটা ছোকরা এল এখনই। চুপ! চুপ! কে আবার এল! কোনো খবর ছিল নাকি আসবার, গান্ধী? সকলের হাত চলে গিয়েছে কোমরে। কাঁধে একটা থলে! মোচ ওঠেনি এখনও ভাল করে! তাহলে নিশ্চয়ই 'ইস্কুলিয়া'! কামিজ আর হাফপ্যান্ট দেখেই বোঝা গিয়েছে। এরকম তো হরহামেশা যায় আসে, ক্রান্তিদলের আজকের এই দুর্দিনেও! একজন বড় বড় গোঁফদাড়িওয়ালা লোক ঠাট্টা করে, 'গান্ধী, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে নিও, মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কিনা। না হলে আবার হরেসোয়ারের মতো রাতে কান্নাকাটি করবে ভূতের ভয়ে।'

এই হাসির অভ্যর্থনায় ছেলেটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তবু খানিকটা সময় কাটবে। ভিড়ের মধ্যে থেকে গান্ধীর গলার আওয়াজ শোনা যায়।

'সর্বন মিস্ত্রি এত কম লোহা দিল কেন?' এটুকুতে কী হবে?'

'বলেছে বারে বারে নিয়ে আসতে। এক সঙ্গে বেশি আনা ঠিক নয়।'

'বাড়ি কোথায়?'

'জিরানিয়ায়।'

রামায়ণজীর কান খাড়া হয়ে ওঠে। সে সোজা হয়ে বসে। ছি! রামায়ণ পড়তে পড়তে হাত এঁঠো করেছে। হাতের ঘাসের শিষটা ফেলে সে হাতধোয়ার জলের জন্য ওঠে।

'নাম?'

'এনটনি।'

'আসল নাম বলুন। আমাদের কাছে লুকোনোর দরকার নেই।'

'ওই এনটনিই আমার আসল নাম। আমরা কিরিস্তান যে।'

'কিরিস্তান!'

কিরিস্তান এসেছে ক্রান্তিদলে! সকলে এই অদ্ভুত জীবটিকে ঘেঁসে দাঁড়ায়। সরকারের চর নয় তো? কিরিস্তান, মুসলমান, এরা কখনও ক্রান্তিদলে আসে? পাইকারী জরিমানার লিস্টে নাম চড়ে না এদের।

'সর্দার।'

সর্দারকে কী একটা ইঙ্গিত করে মুখে বিড়ি দুটো 'ইস্কুলিয়া' হাসতে হাসতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

সর্দার কনৌজী ব্রাহ্মণ। ক্রান্তিদলে এসেছে বলে জাত দিতে পারে না। গত বছর একজন মুসলমান নাচগান শেখানোর জন্য দিন পনের দলের সঙ্গে ছিল। তখন খাওয়ার সময় সর্দার অন্য লাইনে বসত। তাই নিয়েই এই ঠাট্টা। আবার এক কিরিস্তান এল। এইবার জমবে সর্দারের!

সর্দার কটমট করে ছেলেদুটোর দিকে তাকায়। 'ফাজিল কোথাকার—!'

গান্ধীর জেরা এখনও শেষ হয়নি।

'আপনার পিতাজীর নাম?'

'আমার পিতাজীর নাম ছিল সামুয়র।

'বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'বাড়ি জিরানিয়ার কোথায়?'

'শহরে না। ধাঙড়টুলি জানেন? ঐ পাক্কীর ধারে যেদিকে ফৌজী হাওয়াগাড়ির কারখানা আর টমি অফসরদের ঘর হয়েছে, সেইদিকে ছিল আমাদের বাড়ি! ধাঙড়টুলির সকলকে উঠে যেতে হয়েছিল সেই সময়। টোলাসুদ্ধ সকলে চলে গিয়েছে মোরঙ্গে[১] চাষবাস করতে। লোক জন বেশি হলে তার মধ্যে ধাঙড়রা থাকে না। কেবল কিরিস্তানরা যায়নি। কলেস্টর-সাহেব নিজে এসে তাৎমাটুলিতে সব কিরিস্তানের থাকবার জায়গা করে দিয়েছে। তাই আমরা এখন থাকি তাৎমাটুলিতে।'

'আমরা মানে?

'আমি আর আমার মা।'

'তোমাদের চলে কিসে?'

'জিরানিয়ার সাতজন ফৌজী অফিসার থাকে, 'টমি'। ঘাসের অফিসার, চাষের অফিসার, ঘোড়া গোরুর অফিসার, মোটর মেরামতির কারখানার অফিসার, সব মিলিয়ে। তাদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশুনো করে বেটিস-

১ নেপালের একটি জেলা।

সাহেবের বিধবা মেম। আর তাকেই সাহায্য করে আমার মা। ফাদার টুডু পাদরিসাহেব আছে না, সেই করিয়ে দিয়েছিল কাজটা।'

থাক, সর্বন মিস্ত্রি বিশ্বাসী লোক। সে যখন পাঠিয়েছে তখন আর ভাববার দরকার নেই। এত খুঁটিনাটি কেউ বানিয়ে বলতে পারে না। গান্ধী প্রশ্ন করা বন্ধ করে।

'কিছু মনে কোরো না। নতুন লোককে এসব জিজ্ঞাসা করা আমাদের নিয়ম।'

রামায়ণজী এঁটো-হাতটা ধুয়ে ঘটিটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিল। প্রথমটায় মাথার মধ্যেটা মুহূর্তের জন্য হঠাৎ নিভে যায়। তারপর ঠাণ্ডা ঝিমঝিম মাথাতে, একটা অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার ঢেউ লাগে। সম্বিতের সঙ্গে সঙ্গে এটা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে আর মনে।

…যা ভয় করছে যদি তাই হয়! চারিদিক থেকে সকলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছেলেটাকে। সরবার কোনো লক্ষণ নেই। কেবল কতকগুলো মাথা, উর্দি আর পায়ের মেলা। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার চেহারাটা ভাল করে দেখবার সাহস নেই রামায়ণজীর। কৌতুহলের চাইতে আশঙ্কা বেশি তার মনে। অথচ এই সত্যি কথাটা সে স্বীকার করতে চাইছে না। তবু তাকে দেখতেই হবে। যতক্ষণ না দেখছে নিস্তার নেই তার!

ওদিকে আগিয়ে যাবার সময় তার বুক দুর্‌দুর্‌ করে। শেষ মুহূর্তে মনে হয় যে, সে মিছে এতদিন নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে এসেছে। ছেলেটার রঙ নিশ্চয় সাহেবদের মতো, চুল কটা, চোখ বিড়ালের মতো। দেউলে যদি হতেই হয়, তবে কিনে নে হাতি, এমনি একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভান করে সে ভিড় ঠেলে ঢোকে। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা আছে যে খারাপটা ভেবে নিলে ভালটা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

জয় হো রামচন্দ্রজী! ধন্য তোমার করুণা! ছেলেটার রঙটা ঘষা ঘষা কালো। চোখ চুল, সব কালো, বয়সের আন্দাজে বেশ জোয়ান চেহারা। কতই আর বয়স হয়েছে! এই তো পনর বছর এখনও পোরেনি।…

তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ থেকে আজ রামায়ণজী বেঁচে গিয়েছে।

এ যে না হয়েই পারে না। এখনও যে চন্দ্র সূর্য মুছে যায়নি আকাশ থেকে। সবাই মিলে একে পর করে দিয়েছে। কিরিস্তান করে দিয়েছে। হয়তো অখাদ্য কুখাদ্যও খাইয়ে থাকবে। কিন্তু তাহলেই কি আপন রক্ত পর হয়ে যায় নাকি? গঙ্গাজীতে ময়লা পড়লে কি জল খারাপ হয়। ছেলে যে সোনা। গলালে পোড়ালেই যে সোনার আসল রূপ খোলে। গায়ের

আঁচিলটা বলে খুঁটে ফেলা যায় না, আর এ তো হল ছেলে। আপন বলতে তো তার এই একটা জিনিসই আছে।

গান্ধী পরিচয় করিয়ে দেয়, 'ইনিই রামায়ণজী।'

'রামায়ণজী!'

এঁর নাম শুনেছে এণ্টনি ক্রান্তিদল-ফেরত স্কুলের একজন বন্ধুর কাছে।

ছেলেটি রামায়ণজীকে নমস্কার করে। নম্র অথচ বেশ সপ্রতিভ ছেলেটি। কতদূর হেঁটে এসেছে! একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো! এখনও মুখে চোখে জল দেবার সময় পায়নি।

'এই ইস্কুলিয়ারা। তোমরা কি কেবল গল্পই করবে। অন্তত প্রথম দিনটাতেও একটু খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দাও এণ্টনির জন্য।'

উদির পকেটের নেকড়া বাঁধা চিনিটুকু রামায়ণজী সকলের অলক্ষ্যে ঘটির মধ্যে গোলে, এই শ্রান্ত ছেলেটাকে একটু শরবত খাওয়ানোর জন্য।

হতাশার রাজ্যে নূতন নাগপাশ

রামজীর কৃপায় রামায়ণজী তার হারানো ধন ফিরে পেয়েছে। নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে কতরকম করে দেখে। আদেখলের তৃপ্তি আর হয় না, রোজ রোজ দেখেও। মনের আলগা শিকড়গুলো আবার খানিক রসাল মাটির সন্ধান পেয়েছে। পরিবেশের একটানা রুক্ষতায় তার প্রাণ আর হাঁফিয়ে ওঠে না। আঁকড়ে ধরবার মতো জিনিস পেয়েছে সে হাতের কাছে। দুনিয়া আজ তার প্রতি অনুকূল। মনের উপরের গাদ মরেছে, নিচের থিতুনো তলানি মরেছে। একটা অনাবিল ক্ষমাশীলতায় তার মনপ্রাণ ভরে আছে।

…সব ভাল, সবাই ভাল। উপর থেকে শুধু খারাপ টুকুনি দেখা যায় বলে লোকে ভুল ভাবে। দলের লোকেরা যে ছোট ছোট তুচ্ছতার মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রাখে, তা তাদের মন ছোট বলে নয়; রামরাজ্য না আনতে পারবার দুঃখ ভুলতে চায় বলে। আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচতে চায় বলে। তাৎমাটুলির সমাজও তাকে ন্যায্য শাস্তিই দিয়েছিল। ছেলে হয়ে সে বাওয়ার মনে দুঃখ দিয়েছিল। অভিমানে বাওয়াকে দেশত্যাগী হতে হয়। জাতের দেবতা 'পঞ্চের' মুখ দিয়ে সেই অভিমান শাপ হয়ে বেরিয়েছিল, মনের কাছ থেকে প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেবার ব্যথা কেমন হয়, সেইটা বুঝিয়ে দেবার জন্য। চোখের জলে বুক ভেসেছিল বাওয়ার; আর তার মন কেঁদেছে এতদিনে গুমরে গুমরে। বাওয়া ছিল পুণ্যাত্মা লোক, তাই সে ঘুরে বেড়াতে পেরেছে 'রামজীর' মন্দিরের দুয়োরে দুয়োরে। আর রামায়ণজী পাপী মানুষ,

তাই তাকে ঘুরে মরতে হচ্ছে মঘাইয়া ডোমের[১] মতো। রামিয়ার উপরও সে অন্যায় করেছিল, অবিচার করেছিল। সীতাজীর চাইতেও বেশি দুঃখ তাকে সইতে হয়েছে। পশ্চিমের তরিবত আর উঁচু সংস্কার ভুলতে হয়েছে। যে লোকটার আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা সুদ্ধ মরেছে আসামের চা-বাগানে। এখন পাদরির পা চেটে, আর 'টমিদের' পাত চেটে দু-দুটো পেট চালাতে হচ্ছে। এণ্টনির কাছ থেকেই সকলে শুনেছে এসব কথা। নিজের থেকেই যা বলে, নইলে রামায়ণজী কি জিরানিয়ার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে ছেলেটার কাছে। রামায়ণজীর সবচেয়ে জানতে ইচ্ছা করে যে, সামুয়র হিন্দু হয়ে গিয়েছিল বলেই সবাই জানত। আবার কিরিস্তান হল কী করে। ঐ পাদরিটার জন্যই তাহলে রামিয়ার জাতিধর্ম সব গিয়েছে। কত কী হয়তো খেতে হয়েছে। তা হোক তবু পাদরিসাহেব লোক ভাল। এণ্টনিই বলেছে গান্ধীর কাছে যে, সে জিরানিয়ার জিলা ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুলে পড়বার খরচ দেয় পাদরি সাহেব। বড়লোকদের ইস্কুল সেটা, লাডলীবাবুর ছেলে পড়ে, রাজপারভাঙার ছেলে পড়ে। এই পাদরিসাহেবকে কি সে খারাপ লোক ভাবতে পারে?

যেদিন থেকে এণ্টনি এসেছে, ঢোঁড়াই তাকে চোখে চোখে রেখেছে। ক্রান্তিদলের মেম্বর হওয়ার গৌরবের আমেজ, তার মন থেকে এখনও কাটেনি। এইটাকেই রামায়ণজী ভয় করে। আর দুদিন যেতে দে, তারপর বুঝবি। এখন নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি। এখনও কেন যে মরতে আসে ছেলেরা এই দলে তা রামায়ণজীর মাথায় ঢোকে না। দলে নিত্যি নতুন কাণ্ড লেগেই আছে। হতাশার আঁধারের মধ্যে ছুটতে ছুটতে দলের অনেকে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কবে একটা কী করে ফেলবে, তখন আর এণ্টনির ফিরে যাওয়ারও পথ থাকবে না। ইস্কুলে কী পড়ায় ছেলেদের? ইস্কুলিয়াগুলোর আজকের দিনেও মোহ কাটছে না। ক্রান্তিদলের নামের! এণ্টনিটা এখন 'সোবাসবাবু'[২] কবে যেন রেডিওতে কী বলেছিলেন, সেই কথাই বলে। তিনি আর এসেছেন! একে এই নিরর্থকতার গণ্ডি থেকে বাঁচাতেই হবে। ঐ অবুঝ ছেলেটার ভবিষ্যৎ সে নষ্ট হতে দিতে পারে না। ক্রান্তিদলকে সাহায্য করতে ইচ্ছা হলে, জিরানিয়াতে থেকেও করা যায়। দরকার পড়লে সর্বন মিস্ত্রির কাছ থেকে জিনিসপত্র পৌঁছে দেবার কাজ করতে পারে! একবার ভালভাবে জড়িয়ে পড়বার পর বাঁধনটা কাটা বড় শক্ত। এখনও ছেলেটার মনে পেঁচ ঢোকেনি। সেদিন ও জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা রামায়ণজী, ইস্কুলে যে

১ বেদেদের মতো একটি যাযাবর জাত। এরা Criminal Tribes-এর অন্তর্ভুক্ত।

২ সুভাষবাবু।

শুনেছিলাম, একদিন ফৌজের গুলি লেগেছিল তোমার গায়ে। সেটা পকেটের রামায়ণখানায় লাগাতে তুমি বেঁচে গিয়েছিলে। নিশ্চয়ই ছিটেভরা কার্তুজ ছিল? তাই নয়?'

'দূর বোকা কোথাকার! এসবও তোরা বিশ্বাস করিস মেয়েদের মতো! ইস্কুলে পড়িস কেন বুঝতে পারি না!'

ছেলেটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন হুল্লোড় করে সবাই স্নান করছে কুয়োর ধারে। এণ্টনিটা মাথায় জল ঢালছে। জলটা মাথা দিয়ে পিঠ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু ঘাড়ের কাছের খানিকটা জায়গা, ঠিক যেমনকে-তেমন শুখনোই থেকে যাচ্ছে। গায়ে জলটা পর্যন্ত নিজে নিজে ঠিক করে ঢালতে শেখেনি ছেলেটা। দেখে দেখে আর রাময়ণজী থাকতে পারে না। 'দে তো দেখি বালতিটা' বলে কুয়োতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই এমনি এমনি এমনি করে ভিজো ঐ জায়গাটা! অন্য সব ইস্কুলিয়াগুলো হেসে ওঠে। রামায়ণজীর এই ছেলেটাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি সকলেই লক্ষ্য করেছে। রামায়ণজী এ হাসি গায়েও মাখে না। সে তখন নিজের ভাবেই বিভোর—ছেলেটার মাথায় যদি একটি টিকি থাকত, তাহলে কী সুন্দর মানাত!

সবচেয়ে আনন্দের কথা, ছেলেটাও রামায়ণজীকে পছন্দ করে। এমন বেআক্কিলে ছেলে যে বাড়ি থেকে একখান কম্বল পর্যন্ত আনেনি সঙ্গে।··

রামায়ণজীকে চুপি চুপি বলেছিল, 'সেগুলো মিলিটারি অফিসারদের কম্বল কিনা। কোনার দিকে ইংরাজী হরফ লেখা। দেখলেই সবাই বুঝবে যে, কোথা থেকে পেয়েছে। তাই আনিনি সংকোচে।'

'লজ্জাটা কিসের শুনি? ক্রান্তিদলের কি মিলিটারি রিভলভার নেই?'

বলে বটে রামায়ণজী। তবু মিলিটারি অফিসারগুলোর উপরে কৃতজ্ঞতার বদলে কেন যেন আক্রোশ জমে ওঠে।

'লজ্জা কী, আমার কম্বলেই শো। আমি বলছি শো।'

সবাই ঘুমোলে, ঘুমন্ত ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। অন্ধকারে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে কার সঙ্গে যেন একটা সাদৃশ্যর কথা মনে ভাবতে চেষ্টা করে। নিজে হাওয়া খাওয়ার ছলে একখানা পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে ছেলেটার গায়ের থেকে মশা তাড়ায়। আহা, পিঠটা ঘেমে উঠেছে। মাটি থেকে এখনও গরম ভাপ উঠছে কিনা!

নিদ্রাহীন চোখের সম্মুখে তাৎমাটুলির মধুর স্মৃতির ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠছে···একটা পচ্ছিমা ছবি···পিদিম দিতে এসেছে গোঁসাইথানে।···

রামায়ণজী বুঝতেও পারেনি, কখন সে গুনগুন করে একটা রামায়ণের চৌপই গাইতে আরম্ভ করেছে, ছোটবেলায় বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষা করতে যাবার সময় যেমন গাইত!...হঠাৎ এই কথাটা তার খেয়াল হয়। পাগলামি না! গত এক বছরের মধ্যে দলের কেউ গান গেয়েছে বলে মনে পড়ে না। সেণ্ট্রি ডিউটিতে ছিল একজন ইস্কুলিয়া। সে ঘুমেভরা স্বরে চেঁচায়, 'রস জেগেছে কার এই রাত দুপুরে? দলসুদ্ধ সকলকে ধরাবে নাকি?'

যাক! রামায়ণজী আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছে। নতুন ইস্কুলিয়াদের মধ্যে কেউ জানেও না যে, রামায়ণজী আবার গাইতে জানে।

ঘুমন্ত ইস্কুলিয়াদের মধ্যে থেকে একজন গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠে। তারপর একে একে সব ইস্কুলিয়াগুলোর গলা খাঁকারের শব্দ রামায়ণজীর কানে আসে। সব-কটা তাহলে মটকা মেরে পড়ে ছিল এতক্ষণ! এখন খিকখিক করে হাসা হচ্ছে! অতি বদ এই ছেলেগুলো! একটা বলছে, 'রামায়ণ পড়া ছেড়ে দিয়েছে আজকাল রামায়ণজী কিছুদিন থেকে, দেখেছিস?' পছন্দ না করলেও রামায়ণজী মনে মনে স্বীকার করে যে, কথাটা মিথ্যে নয়। তবে হ্যাঁ! ছেড়ে দিতে যাবে কেন রামায়ণ পড়া। এমনিই পড়ে না; মানে এই—হয়ে ওঠে না—আর-কি।...

হৃদয় অন্বেষণের ফল

সেদিন পামারসাহেবের ভাঙা নীলকুঠিটাতে ছিল ক্রান্তিদল। এই পামার-সাহেবরা বাপদাদার আমলে নোট ছাপত। এখন এদিকটায় এত ঘন জঙ্গল যে, লোকজন কেউ আসে না। লোকে বলে বাঘ থাকে।

দিনের লু বাতাসটা থেমেছে অনেকক্ষণ আগেই। কিন্তু গরম কমেনি তখনও। এণ্টনি অনেকক্ষণ ধরে কম্বলের উপর এপাশ-ওপাশ করছে। দুবার ঘটি থেকে জল খেল। রামায়ণজী আর থাকতে পারে না।

'কী রে, কী হয়েছে এণ্টনি? উঃ আঃ করছিস কেন? ঘুম আসছে না? জবাব দিস না কেন? দম আটকানি ধুলোতে হাঁসফাঁস লাগছে? এ ছেলে কিছু কি বলবে?'

গায়ে হাত দিয়ে দেখে গাটা গরম আগুন!

সেই রাতেই আরম্ভ হয়ে যায়, এণ্টনির 'মূলবাই'[১]। পশ্চিমে ধুলোর ঝড়ে

---

১ ব্যাসিলারী আমাশয়ের লক্ষণযুক্ত একটি রোগে প্রতি বৎসর এই সময় জিরানিয়া জেলায় বহু লোক মারা যায়। 'মূলবাই'-এর সাধারণ অর্থ আমাশয়।

বোশেখ মাসে প্রতি বছর এর বিষ ছড়িয়ে দেয় 'মুলুক' জুড়ে এ কথা জিরানিয়া জেলার প্রত্যেকে জানে। ছোট ছেলেপিলের এ রোগ হলে আর নিস্তার নেই; বড়দের মধ্যে তবু অনেকে বাঁচে। তাই বছরের মধ্যে ধুলোর ঝড়ের সময় এলে মায়েরা ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। অন্য রোগে তবু ঝাড়ফুঁক তন্তরমন্তর চলে; কিন্তু এর দেবও নেই, দানোও নেই। বেহুঁশ জ্বরে আরম্ভ, তারপর বাস! চারদিনের মধ্যেই খতম। যেটা বাঁচে লোকে বলে বাগভেরেণ্ডার রস বাতাসার মধ্যে দিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল বলেই বেঁচেছে। আর যেটা মরে সেটার বেলায় বুকচাপড়ানি কান্নার মধ্যে বাগভেরেণ্ডার রস কেন কাজে লাগল না, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর সময় পায় না।

এর পরের কয়দিন রামায়ণজী লড়েছে যমের সঙ্গে একা হাতে।

ভাগ্যে নীলকুঠিটার কাছে তারা তখন ছিল, তাই ছেলেটা মাথা গুঁজবার একটা জায়গা পেয়েছিল। 'জরুরী মিটিন' বসে। দলের সকলের এক জায়গায় বেশিদিন থাকা ঠিক নয়। তার উপর রোগটাও ছোঁয়াচে। সারলেও গায়ের জোর ফিরে পেতে অনেক সময় নেবে। রাময়ণজীকে এণ্টনির সেবার জন্য অনেকদিন থেকে যেতে হবে, সেটা দলের লোকেরা এত ভালভাবে জানে যে, সে সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করতেও তারা ভুলে যায়। কেবল ঠিক হয় যে, কাস্তলাল বলে একজন রামায়ণজীকে সাহায্য করবার জন্য এখানে থাকবে। লোকটা বেশ চালাক চতুর।

যাবার সময় গান্ধী রামায়ণজীকে আশ্বাস দিয়ে যায়। এ রোগে বড়দের ভয় কম। এণ্টনি জোয়ান ছেলে। ওষুধের চেয়ে দরকার সেবার আর পথ্যির।...

তারপর কদিন আর ঢোঁড়াই সেখান থেকে নড়েনি। কাস্তলালকে রুগীর কাছেও আসতে দেয়নি। বলেছে তুমি খালি রোজ সকালে একখান বাতাসায় সাদা বাগভেরেণ্ডার রস নিয়ে আসবে, তাহলেই হবে।...

সবজান্তা কাস্তলাল বলে, এখানকার মাটিতে অভ্র আছে। লোকে যা ইচ্ছে হয় বলুক, আমার ধারণা ধুলোর সঙ্গে অভ্রের গুঁড়ো পেটে গিয়ে এই রোগ হয়। অভ্র গলাতে 'বার্লিস'-এর[২] মতো আর কিছু নেই। অভ্র এমনিতে আগুনে পোড়ে না। ফেলো তো তার উপর এক কৌটা 'বার্লিস'; ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে আমি বলে রাখলাম।'

'আচ্ছা তুমি বাগভেরেণ্ডার রস নিয়ে তো এস।' রামায়ণজী চায় যে

২ বার্ণি।

লোকটা দূরে দূরে থাকুক! ছেলেটা যন্ত্রণায় অধীর হয়ে যখন মাইগে[1] বলে কাতরায় তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না।

কী হয়েছে বেটা! বলবি তো! নাইয়ের চারিধারটা আস্তে আস্তে একটু টিপে দি? এইবার আরাম লাগছে একটু? একটু সেরে ওঠ্‌, বেটা; তারপর তোকে নিয়ে যাব, তোর মা'র কাছে। মায়ের কাছে যাবার জন্য বড্‌ডো মন কেমন করছে? তাই নয়। রোগ হলে তাই হয়। মায়ে যেমন করে রুগীর দেখাশুনো করতে পারে, তেমন করে কি আর কেউ পারে?

পনের বছরের ছেলেটাকে রামায়ণজীর মনে হয় এতটুকুনি বাচ্চা! নিজের অক্ষমতার কথা রামায়ণজী নিজে যতটা জানে, ততটা আর কেউ না!

...কেউ না সে এণ্টনির। কেউ না। সরকারী কানুনের মোহর পড়ে গিয়েছে তার উপর। না হোক সে এণ্টনির কেউ। থাকুক ছেলেটা একা তার মায়ের! রামিয়ার যে আর কেউ নেই দুনিয়ায়। বাঁচিয়ে দাও রামচন্দ্রজী ছেলেটাকে! এ গেলে সে কী নিয়ে থাকবে দুনিয়াতে। কিরিস্তান বলে পায়ে ঠেলো না!

ছেলেটার একটু তন্দ্রা এলে তার অলক্ষ্যে রামায়ণখানা বার করে তার মাথায় ঠেকিয়ে দেয়। হোক কিরিস্তান। রামচন্দ্রজীর আবার জাতবিচার আছে নাকি। গুহক চণ্ডালকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছিলেন। আহা দেখা হয়নি; রামায়ণখানার পাশের দিকে একরকম পোকায় বাসা করেছে, ঠিক ধুনোর মতো চটচটে একটা জিনিস দিয়ে। একেবারে এঁটে গিয়েছে পাতাগুলো। খোলা যায় না। একখান একখান করে খুলতে অনেক সময় লাগবে। থাক এখন!...

ভগবান রামায়ণজীর ডাকে মুখ তুলে চেয়েছিলেন।

এখন ছেলেটার বিপদ কেটে গিয়েছে। একটু ভালর দিকে। সেবার ত্রুটি রামায়ণজী হতে দেয়নি একটুও। মা কাছে নেই বলে আবার ছেলেটা না ভাবে যে তার দেখাশুনো ঠিক হচ্ছে না। এরই মধ্যে একটু খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে।...ছেলে কি একা মায়েরই নাকি? তবু মায়েরা জাদু করে রাখে ছেলেকে। বাপ যে পর সেই পরই থেকে যায়।...এ রোগে দরকার সেবার আর পথ্যির। বলে তো গেল গান্ধী যাবার সময়। কিন্তু ব্যবস্থা কী করে গেল তার। পথ্যি আসবে কোথা থেকে? 'বার্লিস' বললেই হয় না। তাতেও পয়সা লাগে। আর আজকাল যা আগুন দাম! যেমন দল তার তেমনি ব্যবস্থা! এ কয়দিনের মধ্যে খবরটা পর্যন্ত নেওয়া দরকার মনে করল

১ মাগো।

না। না, গান্ধী টাকা-পয়সা দেবে কোথা থেকে? দলের পয়সা কোথায়। কাস্তলালকে বললেই সে এখনি কোনো রকমে কিছু যোগাড় করে নিয়ে আসবেই।…সে রামায়ণজী হতে দেবে না কিছুতেই।…অংরেজ বাদশার চাইতেও বড়লোক ছিল এক সময় পামারসাহেব। তাই না তার নামের নোট চলত এক যুগে। তারই ভাঙা কুঠিতে বসে ছাখো রামজী রামায়ণপড়া বাপে রোগা ছেলের মুখে 'বালিস' দিতে পাচ্ছে না।

·· কোমরের বটুয়াটার থেকে রামচন্দ্রজী আঁকা আর ফারসি লেখা সিক্কার মালাটা সে বার করে দেয় কাস্তলালের হাতে। গঞ্জের বাজারের সোনারের কাছে বেচিস। তা আর বলতে হবে না কাস্তলালকে। লোকটা দরকারের চাইতেও বেশি চটপটে।

কাস্তলাল অবাক হয়ে রামায়ণজীর মুখের দিকে তাকায়। এই জিনিসটাকে নিয়ে দলের মধ্যে কত বদনাম হয়েছিল তার। থাক রামায়ণজী। এটা তোমার মরা ছেলের জিনিস। আমি যেমন করে হোক, সব জিনিস যোগাড় করে আনছি।

কাস্তলালদের 'যোগাড় করার' নাড়ীনক্ষত্র রামায়ণজী জানে।

না না! কাস্তলালের হাতে মালাটা গুঁজে দেবার সময় রামায়ণজী সেদিকে তাকাতে পারে না। যায় যদি যাক তুটো বানভাসি মনের মাঝের একমাত্র সেতু। পিছনের ও-পথে রামায়ণজী আর কখনও ফিরবে না। পারলে, মনের উপর থেকে স্মৃতির সেই খোসাটা সে আলগোছে ছাড়িয়ে ফেলে দেবে।…হয়তো আপনা থেকেই খসে পড়বে।

এখন কোনো রকমে, এ যার ছেলে তাকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দিতে পারলে সে বাঁচে। তারপর…

তার পরের কথাগুলোও ছেলে ভাল হবার মুখে এলে আস্তে আস্তে ভাবতে আরম্ভ করে রামায়ণজী। অনেক দিন আগের মনের নিচের চাপা-পড়া কথাগুলো উপরে ভেসে ওঠে! সেই পচ্ছিমা আওরতের কথাটা তার সমস্ত মনখানাকে জুড়ে বসে। এতকাল সে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। মনটাকে আড়াল করার জন্য কতরকমের পলকা পাঁচিল তুলবার চেষ্টা করেছে। জলের উপরে কুমিরের দেহের কতটুকুই বা দেখা যায়। বেশিটাই তো থাকে নিচে। জাতিস্মর জানতে পেরেছে যে এক যুগ আগের সেই স্মৃতিটুকুই আসল। বাকি সব সেই শাঁসটুকুর উপরের খোসা। পেঁয়াজের খোসার মতো পরতের পর পরত সাজানো, কোনোটা পুরু।…সামুয়রটা মরে গিয়েছে চা-বাগানে…

রাতে কোনো গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে রাজী নয়, মিলিটারির ভয়ে। অতি কষ্টে একখানা গাড়ি যোগাড় করে কাস্তলাল। ঘোড়সওয়ারগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আট আনা করে পয়সা দিতে হয়। সেটা যে গাড়ি ভাড়া নিচ্ছে সেই দেবে, এই শর্তে গাড়োয়ান রাজী হয়। সাঁঝ-রাতেই টহল দেয় ফৌজগুলো ; তাই অর্ধেক রাতে রওনা হয় ঢোঁড়াইরা গাড়িতে।

'নমস্তে কাস্তলালজী! বলে দিও গান্ধী আর সর্দারকে যে, আমি গিয়েছি এণ্টনিকে তার মায়ের কাছে পৌছে দিতে।'

কাস্তলালের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রান্তিদলের সঙ্গের শেষ সম্বন্ধটুকুও মনের আড়াল হয়ে যায়। ঘর-পালানো ঢোঁড়াই আবার সেই ঘর-জ্বালানী আওরতটার কাছে ফিরে যাচ্ছে, রামায়ণজী না, ঢোঁড়াই। আড়াই বছরের রামায়ণজী ফেলে এসেছে পিছনে, ক্রান্তিদলের দৈনন্দিন তুচ্ছতা আর বিধিনিষেধগুলোর সঙ্গে। ঢোঁড়াইয়ের মনে হচ্ছে যে সে এতদিনে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে। এতদিনকার গুপ্ত জীবনের ঝিমিয়ে-পড়া মনটা, জীয়নকাঠির পরশ পেয়ে চোখ তাকিয়েছে।

ছেলেটা এখনও গায়ে জোর পায় না। রামায়ণের ঝোলাটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে তার হেলান দেবার তাকিয়া করে দিয়েছে ঢোঁড়াই। রুগ্ন ছেলে, ঘুমুতে পেলে ভাল হত ; কিন্তু তার কি উপায় রেখেছে ফৌজে। পাক্কী দিয়ে গোরুর গাড়ি যেতে দেবে না। খানা-ডোবার পথে কি গাড়িতে ঘুমোন যায়! রোগের পর একেবারে ছোট্‌টো আবদারে ছেলের মতো হয়ে গিয়েছে এণ্টনি। রাগ অভিমান, কথা গল্পের মধ্যে দিয়ে, খুব কাছে এসে গিয়েছে সে ঢোঁড়াইয়ের। এণ্টনির গল্প আর ফুরোয় না···

ধাঙড়টুলির লোকদের কলস্টরসাহেব জমি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ফৌজদের কাছাকাছি থাকতে তারা কিছুতেই রাজী হল না।···যাবার আগেও বুড়ো এতোয়ারী মা'র কাছে এসে বলে গেল, ধাঙড়টুলির ভাত আমাদের কপালে নেই, তার আর ভেবে কী করবে এণ্টনীর মা। মা যত বোঝায় যে টমিদের যত খারাপ লোক মনে করছে, তত খারাপ নয় তারা। তাতে এতোয়ারী বলে কী জান? বলে যে তারা কিরিস্তানদের জন্য ভাল হতে পারে, হিন্দুদের জন্য নয়। টাকা যখন কিছু দিচ্ছে সরকার, তখন জমি নিয়ে চাষবাসই করব নেপালে।···

…ধাঙড়টুলির শুক্রা, এতোয়ারী, বড়কা বুদ্ধু, ছোটকা বুদ্ধু, কর্মাধর্মার নাচ, শনিচরা মাদল বাজাচ্ছে…। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে বলেই বোধ হয় এত সেখানকার গল্প করছে ছেলেটা।

'টমিদের সকলেই খারাপ লোক নয়। একটা খোঁড়া পাগলী মেয়ে আছে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলে, গোঁসাইথানের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির টিউব-ওয়েলটার পাশে থাকে, সেটা টমি দেখলেই বলে সাহেব ওটা কি! বন্দুক! একটা ভুঁড়োশিয়াল মেরে দিয়ো তো আমাকে বন্দুক দিয়ে। সাহেবরা বলে কাল দেব। আর রোজ তাকে সিগারেট দেয়, পয়সা দেয়। এক-আধটা পয়সা না, দু আনা, চার আনা করে পয়সা। সে পাগলীটা তো আর কিরিস্তান নয়।'

…ও ফুলঝরিয়া, অশথের পাতার আচার একটু ঢোঁড়াইকে দিয়ে যা।… স্পষ্ট মোড়লগিন্নির গলা মনে হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে ঢোঁড়াই।

'রতিয়া ছড়িদার বলে একটা বুড়ো আছে তাৎমাটুলিতে, সে ফৌজী সহিসদের নিমের দাঁতন দেবার ঠিকে কেমন করে পেয়েছিল জানতো রামায়ণজী! এক ডালা মুলো ভেট নিয়ে একেবারে বড়োসাহেবের অফিসে হাজির। সাহেব হেসেই খুন। পাছে লোকটা দুঃখিত হয় ভেবে একটা মুলো অফিসে বসেই খেল সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে রতিয়া ছড়িদারকে দাঁতনের ঠিকেদারি দিয়ে দিল। রতিয়া ছড়িদার কি কিরিস্তান? কিরিস্তান হওয়ার যে কী দুঃখ, সে যে কিরিস্তান নয় সে বুঝবে না। তাৎমাটুলিতে কি আমরা সাধ করে এসেছি! অথচ কেউ সেখানে দেখতে পারে না আমাদের। বাড়িটা কিন্তু বেশ। উঠোনে কুয়ো আছে। নইলে মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েলে যা ভিড়! বাড়িটা ছিল বাবুলাল চাপরাসীর ছেলে দুখিয়ার। বাবুলাল এবার পেন্সন নিয়েছে বলে দুখিয়ার চাকরি হয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দারোয়ানগিরির। সেখানেই কোয়ার্টার দিয়েছে দুখিয়াকে। খালি ঘরখানাতে বাবুলাল পেন্সনের পর চায়ের দোকান দেবে ঠিক করেছিল। এখন ভাল চলতে পারে দোকান ওখানে। জায়গাটা ভাল। তার জন্যই তো বাবুলালের রাগ আমাদের উপর।'

চায়ের দোকান! ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে যে তাকেও একদিন বাওয়া দোকান খুলতে বলেছিল। কত জল্পন-কল্পনা তাই নিয়ে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়।

'তা এণ্টনি, তোমরাই ওখানে একটা দোকান খোল না কেন?'

ছেলেটা চুপ করল কেন! ও তাই বল! ঢুলুনি এসে গিয়েছে! দুর্বল শরীর! ভাল করে শুয়ে পড় এণ্টনি। এই ঝাঁকানির মধ্যে ঘুমুবি কী করে?

ধুলোর ঝড়টাও আরম্ভ হয়ে গেল বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে! তাৎমাটুলির গল্প শুনে ঢোঁড়াইয়ের তৃপ্তি আর হয় না। খানিক পরই নিজের চোখে এইসব জিনিস দেখবে। তবু তীর্থযাত্রীর ব্যাকুলতা-ভরা মন মানে না। 'অবধ তঁহা জঁহ রাম নেবাস[1]; যেখানে রাম থাকেন সেইখানেই অযোধ্যা। অবধ তঁহা জঁহা রামিয়া নিবাস; যেখানে রামিয়া থাকে সেখানেই অযোধ্যা। বেশ লাগে কথাটা। বারকয়েক মনে মনে লাইনটা আওড়ায়। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির আজকালকার ছবি কল্পনা করতে চেষ্টা করে; কিন্তু পনের বছর আগের, তারও আগের ছবিগুলোই শুধু তার মনে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে যুগের তার পরিচিত দুনিয়াটুকুর ক্লেদগ্লানি আবর্জনাগুলো, সারের মাটি হয়ে তার মনের গহীনের খানাডোবাগুলোকে ভরাট করে তুলেছে! ছেলেটার মাথায় রোদ্দুর লাগছে। ঢোঁড়াই একটু সূর্যের দিকে আড়াল করে বসে।...কিরিস্তান হওয়ার যে কী দুঃখ, তা যে কিরিস্তান নয় সে বুঝবে না।

এতকালের বন্ধ্যা প্রতীক্ষা হঠাৎ নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছে।

পনের বছর আগেও তাৎমাটুলির পঞ্চায়ত যা করেছিল, টাকা খরচ করতে পারলে আজও হয়তো তা সম্ভব হবে। করবে আবার না! টাকা পেলেই করবে। গোঁসাইথানে জোড়া ভেড়া কবলালেই করবে! যে পঞ্চায়তের মোড়ল গাড়ি হাঁকায়, ছড়িদার দাঁতনের ঠিকেদারি করে, মোড়লের ছেলে রাজমিস্ত্রি, সে পঞ্চায়তের বিষদাঁত কি আর আছে।

দূরে পাকীর গাছের সারি, এত ধুলোর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে, ধোঁয়ার মতো! ঘুঘুগুলো একটানা ডেকে মরছে। ধাঙড়টুলির লোকগুলো কী চালাকি করেই ঘুঘু ধরত সেকালে। আগে একটা ঘুঘু ধরে, তারপর ঘুঘুর ডাকের নকল করত। এ ডাক যে ঘুঘু শুনেছে তার আর নিস্তার নেই। সাথী পাবার দুর্বার আকর্ষণ তাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবেই।

বেলাবাড়ার পাখি[2] হুক হুক করে ডাকছে। বোধ হয় তার সাথী খুঁজছে।

....তোমার আজ নাওয়া-খাওয়া নেই নাকি? বেলাবাড়ী পাখি কখন থেকে ডাকছে। কী আদেখলে বলদই হয়েছে! বলদের গায়ে এটুলি ওবেলা ছাড়ালেও চলবে।...মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। দূরটা কাছে এসে গিয়েছে। বকুনিটুকুও কত মিষ্টি ছিল। হবে না? পচ্ছিমের মেয়ে।

গাড়োয়ান গাড়ি থামায়। এই পর্যন্তই যেতে দেয় গোরুর গাড়ি! ধুলোর

১ তুলসীদাস থেকে।

২ এক জাতের সবুজ রঙের পাখি। চৈত্র-বৈশাখ মাসে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের ডাকের অবিরাম ধ্বনি চরমে ওঠে।

গন্ধটা বদলে গিয়েছে। আগেকার চেনা ধুলোর গন্ধটা ঢোঁড়াই চোখবাঁধা হলেও বলে দিতে পারত। যেখানে সেকালে রেবণগুণীর বাড়ি ছিল, সেখানে এখন কেবল তার লিচুগাছ দুটো আছে। গাছের নিচের মাচায় কজন ফৌজের উর্দিপরা লোক জটলা করছে। মেয়েলোকও আছে সেখানে; বোধ হয় লিচুগাছ জমা নিয়েছে।

কোথাও একটাও কুল, ময়না কাঁটা, কামিনী কিম্বা শিমুল গাছের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কয়েকটা ছেলেমেয়ে রোদে ঝলসানো মাঠে গোবর কুড়োচ্ছে। তার মধ্যে দুটো আবার হাফপ্যাণ্ট পরেছে! তাৎমা বলেই মনে হচ্ছে ওদের দলের মেয়েগুলোকে! ছোটবেলায় ঢোঁড়াইরা এই রোদে ঝলসানো মাঠে আগুন লাগাত। আজকালকার ছেলেরা বোধ হয় মিলিটারির ভয়ে পারে না··বকরহাট্টার মাঠটা কিন্তু সবুজ হয়ে রয়েছে। এণ্টনি দেখায় ঐগুলো ঘাসের ক্ষেত। ঐ দিকটা 'হাতিঘাস'। 'হাতিঘাস' ঘোড়ায় খায় না, গোরুতে খায়। জুটি কেটে খাওয়াতে হয়। এই দিকটা 'গোলোভার'[১] ঘাস। ঘোড়াদের জন্য বাক্স করে প্যাক করা ঘাস আসে রেলগাড়িতে।

যা রোদ্দুর! আকাশে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে তিন পহর বেলা হবার আর বেশি দেরি নেই। ছেলেটার মুখটা গরমে লাল হয়ে উঠেছে। নিজের জামাটা খুলে এণ্টনির মাথায় জড়িয়ে দেয়; ঢোঁড়াইয়ের এক কাঁধে কম্বল জড়ানো রামায়ণের ঝুলিটা। ছেলেটা তার কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে। এখনও পায়ে জোর পায় না। তাকে সূর্যের দিকে তাকাতে দেখে এণ্টনি বলে, 'দুটো বাজল এখন। ঐ যে তাৎমাটুলির লোকের সার চলেছে 'হাতিঘাসে' জল দিতে। একটা থেকে দুটো খাবার ছুটি।'

মরণাধারের কাঠের পুলটা সেই রকমই আছে। পুলের গায়ে সে ছোটবেলায় ছুরি দিয়ে কেটে যে তারাটা এঁকেছিল, সেটা অস্পষ্ট হয়ে এলেও এখনও বোঝা যায়। পুলের নিচে বড় বড় চৌবাচ্চা করেছে।

এণ্টনি বলে এগুলোতে বারমাস জল থাকে। ঐ পাশের বাটিগুলো দেখছ না, গোরুতে যেই ঐ বাটিতে মুখ দেবে আর অমনি ওগুলো ভরে যাবে জলে; যেই মুখ তুলে নেবে অমনি আর জল থাকবে না।···

তার গর্ব মেশানো কথার সুরটুকু ঢোঁড়াইয়ের কান এড়ায় না। গর্বেরই তো কথা! আগে এইখানে পথের উপর ঢোঁড়াইদের কল্কেফুলের বীচি দিয়ে খেলার গর্ত থাকত। আজকাল ছেলেরা সে খেলা খেলে না নাকি?

'একটু বসবি নাকি এণ্টনি গাছটার তলায়?'

১ Clover।

'না, একেবারে বাড়ি গিয়ে বসা যাবে।' বসলে একটু সময় পাওয়া যেত। তার কাঁধে হাত দিয়ে রয়েছে এণ্টনি। তার বুকের হঠাৎ ধড়ফড়ানিটা বুঝতে পারছে নাকি? মনটা দুর্বল-দুর্বল লাগছে শেষ মুহূর্তে। তার এতক্ষণকার আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ সে হারিয়েছে। হয়তো এই দাড়ি-গোঁফওয়ালা ফেরার ঢোঁড়াইকে চিনতে পারবে না রামিয়া। রামিয়ার মন এখন কী চায়, সে কথা তো ঢোঁড়াই জানে না।

…সারা দুনিয়ার দুয়োরে মাথা কুটে-কুটে ফিরে এসেছে ঢোঁড়াই তোমার কাছে। তোমার টানে, তোমার দুঃখের কথা মনে করে। তারই জন্য রামচন্দ্রজী তোমায় সৃষ্টি করেছিলেন। তারই সঙ্গে তোমার জীবন বাঁধা। ঢোঁড়াই অপমানের কথা ভুলেছে, কোনো অভিমান নেই তার আজ। বিনা শর্তে সে নিজেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য ফিরে এসেছে। তুমিও ভুলে যাও মাঝের যুগের এইসব কথা। জীবনের রামায়ণখানার মাঝের অধ্যায়টা ধুনোর মতো পোকার আঠা দিয়ে আঁটা থাক। খুলবার দরকার নেই সে পাতাগুলো। তোমার দুঃখ ঢোঁড়াই যদি না বোঝে তবে আর কে বুঝবে।…

রামচন্দ্রজী ছাড়া এখন ঢোঁড়াইয়ের মনে বল আনবার আর কোনো সম্বল নেই! তাই কম্বলের বোঝাটাকে সে শক্ত করে চেপে ধরেছে। এণ্টনি যে বাড়িটায় নিয়ে যায়, সেটা ঢোঁড়াইয়ের নিজের বাড়ি। এইটাই তাহলে সে চলে যাওয়ার পর দুখিয়ার মা দুখিয়াকে দিয়েছিল! বানভাসি চড়ায় ঠেকার সময়ের মুহূর্তের আঘাতের মধ্যেও এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত দেখতে পায়।

…বলদের নাদা দুটো নেই। সেখানে দুটো মাটির ঢিবি উঁচু হয়ে রয়েছে।…হাকিম এই বাড়ি পাইয়ে দিয়েছেন এণ্টনির মাকে। এণ্টনির মা কথাটা শুনতে ভাল লাগছে না রামিয়াকে। ঐ মনে হয় হাকিম করেছেন! কিন্তু হাকিমের হাত দিয়ে দুনিয়াতে কে করাচ্ছেন এসব, তার খবর রাখে কজন!

'মা নিশ্চয়ই বাড়ি এসেছে। দুটোর সময় অফিসারদের খাওয়া হলে, তারপর মা খাবার নিয়ে আসে বাড়িতে।'

এণ্টনি ডাকে, 'মা কোথায়?'

উঠোনে ঢুকেই ঢোঁড়াই কম্বলের পুঁটলিটা দাওয়ার উপর খুঁটির পাশে রাখে। তারপর সেইখানেই বসে, মনের উত্তেজনাটা একটু কমাবার জন্য। এই খুঁটিতে হেলান দিয়েই, ঢোঁড়াই গাঁ ছাড়বার দিন, রামিয়া বসে ছটপরবের জিনিস পাহারা দিচ্ছিল। নেড়া তুলসীতলার মাটির বেদীটার উপর আমসি শুকোচ্ছে।

ঘরের ভিতর থেকে গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। রামিয়ার গলাটা একটু

বদলেছে মনে হচ্ছে। নিজের বদল নিজে বোঝা যায় না। কম দিনের কথা হল না তো!

'কে রে—তাই বল! এ কী চেহারা হয়েছে! রোজ মনে করি এণ্টনির চিঠি আসছে, চিঠি আসছে। সে চিঠি আজও আসছে, কালও আসছে। থাকতে না পেরে কাল তালঝড়ির মিশনে চিঠি লেখালাম। ঠিক বুঝেছি। অসুখ করেছিল। কী অসুখ? দাঁড়া এক মিনিট, বিছানাটা পাতি। না গেলেই চলছিল না তালঝড়ির পাদ্রিসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। কী জ্বালানোই যে জ্বালাস তুই আমাকে! মা যদি হতিস তাহলে বুঝতিস! মরদে বোঝে না সে কথা। আমার কপালই যে পোড়া। আর কার ঝাড় দেখতে হবে তো। সেই বাপেরই তো ছেলে!'...

এণ্টনি মায়ের স্বভাব জানে। এসব কথা একবার আরম্ভ হলে তার মুখরা মা শিগগির থামবে না, সে তা জানে। তাই মাকে চুপ করাবার জন্যই বোধ হয় বারান্দায় ঢোঁড়াইকে দেখিয়ে বলে, উনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।'

এখানে বসে কেন? ছেলে বলছে তুমি করেছ খুব ওর অসুখের সময়। একে তুমি আমার হাঁটুর বয়সী, তার উপর তালঝড়ি মিশনের লোক। তোমাকে কিন্তু বাপু আপনি বলতে পারব না, আগে থেকেই বলে রাখছি।'

ঢোঁড়াইয়ের তখন সম্বিৎ নেই। খাকী রঙের শাড়ি পরা এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটিই এণ্টনির মা! মুখটি অস্পষ্টভাবে চেনা-চেনা মনে হয়। কোথায় যেন দেখেছে আগে। আয়নায় আলোর ঝলকের মতো হঠাৎ মনে পড়ে। মলিসাহেবের বাড়ির সেই ডাকসাইটে আয়াটা যেটাকে নিয়ে সাহেবদের বাড়ির বাবুর্চি আর আরদালী মহলে সেকালে খুব হৈ-চৈ ছিল। অনেকের সঙ্গে এর আশনাই ছিল। ধাঙড়টুলির পাক্কী মেরামতির দলের গল্পের একটা মস্ত খোরাক, এর সঙ্গে সামুয়রের আশনাইয়ের ব্যাপারটা। রামিয়া কি তাহলে...

এণ্টনির মা ততক্ষণে জমিয়ে বসেছে ঢোঁড়াইয়ের কাছে, হারানো কথার খেইটা সামলে নিয়ে। নিজের একটানা দুরদৃষ্টের কথা বলে চলেছে সে।

...'এদের ঝাড়টাই এই রকম। এর বাপ বিয়ের পর যে কদিন একসঙ্গে ঘর করেছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে আমাকে। নেশাভাঙ করে সব খুইয়ে শনিচরা ধাঙড়ের বৌটাকে নিয়ে পালিয়েছিল। মরেছে কি বেঁচে আছে দশ-বারো বছরের মধ্যে কোনো খবর নেই। মরলে পরে হাড় জুড়িয়েছে। শুধু কি বিয়ের পর জ্বালিয়েছে? বিয়ের আগেই বা কী! সে কাণ্ড যদি শোন তো বলি।'...

সেই কাণ্ডই ঢোঁড়াই শুনতে চায়। চায় কিনা তাও ঠিক করে ভাববার

ক্ষমতা নেই তার এখন···রামিয়া? অতল শূন্যতার মধ্যে কতকগুলো অস্পষ্ট কথার আবর্তে সে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে।···কুর্বাঘাটের মেলায় জুয়োর দোকানের সাদা ছকটার উপর কাঁটাটা বনবন করে ঘুরছে। কোথায় গিয়ে ঠেকবে···

'বলার কি আর কথা। ছেলে বড় হয়েছে। নিজেরও তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আর লাজই বা কী; শরমই বা কী।'

তারপর গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলে, এই যে বাড়িটা দেখছ না, এটা বাবুলাল চাপরাসীর ছেলে ঢোঁড়াইয়ের। তারই বৌটাকে বিয়ে করবে বলে পঞ্চদের টাকা খাইয়ে, নিজের জাতধম্ম খুইয়েছিল। সে বৌটা তো একটা মরা ছেলে বিয়োনোর পর মারা যায়। সে মেয়েটার দোষ ছিল কি না-ছিল ভগবান জানেন। শুনি তো যে তাকে না জানিয়েই পঞ্চরা এই কাণ্ড করেছিল। সেবারে সাহেব পাদরিরা চলে গিয়েছিল কিনা এখান থেকে, তাই এণ্টনির বাপের সাহস হয়েছিল, গোঁসাইথানে ভেড়া বলি দিতে। আমার তখন এণ্টনি পেটে। রাঁচীতে গিয়ে সাহেব পাদরিকে ধরি। সাহেব তো চটে আগুন, এণ্টনির বাপের জাত দেবার কথা শুনে। সাহেব নিজে এসে, খোরপোষের মোকদ্দমার ধমকি দিয়ে, কোনোরকমে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেয়।···এই ছেলেটার মুখ চেয়েই বিয়ে করেছিলাম ঐ হতভাগাটাকে। নইলে আমার জন্য আমি ভাবি না। যতদিন গতর আছে খেটে খাব। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, যখন শরীরের শক্তি যাবে, তখন যেন আর বাঁচতে না হয়। না হলে এই ছেলে আমায় রোজগার করে খাওয়াবে? তাহলেই হয়েছিল! আমি ওর ইস্কুলের খরচের জন্য কোথায় গিয়েছি আর কোথায় না গিয়েছি! আরে না পড়িস তো তাই বল পরিষ্কার করে। রোজগার করে খাওয়ার বয়েস হয়েছে। ফৌজের সাহেবকে ধরে একটা চাকরিই জুটিয়ে দি। অনিরুধ মোক্তারের ছেলেটা হাওয়াগাড়ি মেরামতের কারখানায় মিস্ত্রির কাজ শিখছে, আর তুই শিখতে পারিস না। না-হয় এখানেই দোকান দে। বিজন উকিলের নাতির গোঁসাইথানের চায়ের দোকান চলছে কি না? মিলিটারিগুলো থাকতে চলবে আবার না! তা নয়, ইস্কুল কামাই করে উনি চললেন তালঝাড়ি মিশনে! এই দেখ! একদম ভুলে গিয়েছি। জল এনে দি, হাত-পা ধোও। যাহোক চারটি খেয়ে-দেয়ে নাও। এণ্টনির কলা খাওয়া বারণ নাকি? আজ ভাল কলা এনেছি মেস থেকে।

কথাগুলো ঢোঁড়াই শেষপর্যন্ত বোধ হয় শোনেওনি। কয়েকটা কথার বালি পড়ে তার শরীরের আর মনের সব যন্ত্রণাগুলো বিকল হয়ে গিয়েছে। জুয়োর খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে। অবচেতনের মতো সে উঠোন

থেকে বেরিয়ে আসে। এই নিঃসীম রিক্ত জগৎটার মধ্যে 'পাক্কী' না কী নামের যেন একটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে চলছে। ঠিক অনুতাপ নয়। হতাশার গ্লানি তার নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড়, আরও দুঃসহ করে তুলেছে। একেবারে একা সে আজ এই দুনিয়াতে। বুকের বোঝার চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আশমানে দিনের চাকা ঘুরোনোর গোঁসাই 'পশ্চিমে' ঝুঁকেছেন। তাঁর কাজের কামাই নেই, নিচে গোঁসাইথানের গোঁসাই হাল ছেড়ে দিয়ে ভাঁটবনে উইয়ের ঢিবি হয়ে গিয়েছেন। পশ্চিমে ধুলোর ঝড় জিদ ধরেছে থামবে না বলে। ঝাপসা চোখের মধ্যে একটা আকৃতি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সর্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে এই পথটা তবু পা রাখবার একটু শক্ত জমি। সিধা চলে গিয়েছে কাছারি, জেলখানা, আরও কত দূরে। আর বেশি দূরে সে যেতে চায় না। জেলে সাগিয়া আছে! চিনিও মিষ্টি, গুড়ও মিষ্টি। তবু লোকে চিনিই চায়। আর চিনি না পেলে? সব পুঁজি খোয়ানোর পর তার মনে পড়েছে বহুদিন আগের জমানো বাতায় গোঁজা পয়সার কথা। ঢোঁড়াই চলেছে সারেণ্ডার করতে, এ-সি-ও সাহেবের কাছে।

একাওয়ালা চেঁচায়—'এক সওয়ারি! কাছারি! চার-আনা!' পাঞ্জাবী বাসওয়ালা চেঁচায়—'কচহরী! শহর! তিন আনা! তিন আনা! কচহরী!'

এস-ডি-ও সাহেব এজলাস থেকে উঠে গেলে আজ হয়তো জেলে নিয়ে যাবে না; থানা হাজতেই রেখে দেবে রাতটা। ঢোঁড়াই বাসে চড়ে বসে। তাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে হবে এস-ডি-ও সাহেবের কাছে।···

এণ্টনির মা হয়তো এখন বলছে—এটা কীরে কম্বল জড়ানো? লোকটা ফেলে গেল। রামায়ণ? লোকটা তাহলে কিরিস্তান নয়? তালঝাড়ি মিশন থেকে এসেছিল বলে আমি ভাবলাম বুঝি কিরিস্তান। তাই এখানে না খেয়ে চলে গেল। আসবেখুনি বাজার থেকে খেয়ে এগুলো নিতে।

ক্রান্তিদলের লোকেরা বলবে, 'কাংগ্রিসের বড় নেতাদের সরকার ছাড়ছে বলে সুযোগ বুঝে সলগুর করেছে 'কায়েরটা'।'[১]

বুড়ো এতোয়ারী ধাঙড় থাকলে ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলত, 'ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরক্কে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়।'

[১] কাপুরুষ।